‘আব্বাস আলী খানের জীবন দর্শন ও তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা

429838

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাস আলী খানের জীবন দর্শন ও তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

GIFT

429888

Dhaka University Library
429888

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. বি. এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

আব্দুল্লাহ আল মামুন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে- ২০০৮ ইং

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পি.এইচ.ডি. (লন্ডন), এম.এ. (ডাবল), বি.এ. অনার্স (ঢাকা),
এম.এম. (ঢাকা), এফ.আর.এ.এস

সিনিয়র অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

دكتور محمد حبيب الرحمن شودرى
الاستاذ الكبير والرئيس السابق
قسم الدراسات الاسلامية ومقارنة الاديان
جامعة داكا، بنغلاديش

Dr. A.B.M. Habibur Rahman Chowdury
Ph.D. (London), M. A. (Double), B. A. Hons (Dhaka),
M. M. (Dhaka), F. R. A. S

Senior Prof. & Ex. Chairman
Dept. Of Islamic Studies & Comparative Religion
University Of Dhaka, Bangladesh
Phone : Off. - 505161/277, 505710
: Res. - 862992
Fax : 880-2-835342, 831062

Ref ..... Date .....

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম. ফিল গবেষক আব্দুল্লাহ আল মামুন কর্তৃক দাখিলকৃত, "আব্বাস আলী খানের জীবন দর্শন ও তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে।

২. এটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম। কোন যুগ্ম কর্ম নয়।

৩. এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম।

429839

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতে এ শিরোনামে এম. ফিল বা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এ অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

এ.বি.এম. চৌধুরী ৩/৪/০৮

প্রফেসর ড. এ. বি. এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী
তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "'আব্বাস আলী খানের জীবন দর্শন ও তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল কোন যুগ্ম কর্ম নয়। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে আমি অন্য কোথাও কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

আব্দুল্লাহ আল মামুন
এম. ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"'আব্বাস আলী খানের জীবন দর্শন ও তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়ায় মস্তক অবনত করছি। দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর এ. বি. এম হাবিবুর রহমান চৌধুরীকে, যিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করে গবেষণা কর্মের সার্বিক নির্দেশনা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন এবং অভিসন্দর্ভটি নিখুঁতভাবে আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, তা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। আমি তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ ও চির ঋণী।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর আ. ন. ম রইসুদ্দিন, অধ্যাপক এ. এইচ. এম মুস্তফা হোসাইন, অধ্যাপক আবদুল মালেক, ডক্টর মুহাম্মাদ রুহুল আমিন, ডক্টর আবদুল লতিফ, ডক্টর আবদুর রশিদসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলিকে, যাঁরা সব সময় আমাকে গবেষণার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদের প্রতিও জ্ঞাপন করছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বহুভাষাবিদ ডক্টর আবদুল ওয়াহিদকে, যিনি আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার গবেষণা কর্মে যিনি সবচেয়ে বেশী তাকিদ ও উৎসাহ দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান হাবিবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল। আমি তাঁর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার এ মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম আত্মীয়বর্গকে। বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা এবং আম্মাজান, শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই ওমর ফারুক, আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর এড. আবদুস সালাম খান, শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ি আম্মা ও আমার জীবন সঙ্গিনী মিসেস সালমা খানমকে। আমার উচ্চতর ডিগ্রী লাভের পেছনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। আমি তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও পরম কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া আরও যাঁদের কথা স্মরণ না করলে আমি অকৃতজ্ঞদের কাতারে শামিল হয়ে যাবো তারা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীনসহ তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা ঢাকার সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, ফেনী আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার লাইব্রেরী, জাতীয় আরকাইভ, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী লাইব্রেরী, জাতীয় প্রেসক্লাব লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ইকবাল স্মৃতি পাঠাগারসহ বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতিও জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ ও পরম কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে থিসিসের কম্পোজসহ বিভিন্ন তথ্য ও বই-পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছেন এম আজিজ উল্লাহ, মাহবুবুর রহমান ফেরদৌসী, মোঃ কামাল হোসেন ও মোঃ আবদুর রহিম-তাঁদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

নির্দেশিকা

এ অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত বানান নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা হয়েছে-

১. 'আরবি, ফারসি ও ইংরেজি (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন :

أ=আ.a	ج =জ dj,j	ڑ =ড় r	ظ =জ z	م =ম m
إ =ই i	چ =চ c	ز =য z	ع ='	ن =ন n
ا =উ u	ح =হ h	ژ =ঝ zh	غ =গ gh	و =ও w
ب =ব b	خ =খ kh	س =স s	ف =ফ f	ء ='
پ =প p	د =দ d	ش =শ sh	ق =ক k,q	ى =য় y
ت =ত t	ڈ =ড d́	ص =স s	ك =ক k	ي =এ ে y
ث =ছ th	ذ =য dh	ض =দ/য d	گ =গ g	
	ر =র r	ط =ত t	ل =ল L	
যের+ى =ঈ, ী,	পেশ+و =উ, ু			

২. অভিসন্দর্ভে কোন উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে অনুসৃত প্রতিবর্ণায়নের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে ।

৩. ফুটনোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমবার গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম, খণ্ড, অনুবাদকের নাম, প্রকাশক, প্রকাশনার সময়কাল, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে শুধু গ্রন্থকারের নাম, অথবা গ্রন্থের নাম কিংবা শুধু (প্রাগুক্ত) ও (Ibid) ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. জার্নাল, পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে লেখকের পরিবর্তে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়ে

৫. ফুটনোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা ক্রমিক নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা বক্তব্য

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ 'আব্বাস আলী খান (১৯১৪-১৯৯৯) ইসলামী শিক্ষা জ্ঞান ও গবেষণা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে তিনি সফলতার সাথে মসি ধারণ করেন, অনুবাদ করেন এবং গবেষণা করেন। রচনা করেন প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ। এছাড়া দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন আমৃত্যু। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি অন্যতম পুরোধা। তাঁর অর্ধশতাধিক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- মৌলিক রচনা, গবেষণা এবং অনুবাদগ্রন্থ। তিনি ছিলেন অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির অধিকারী। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি কেবল দেশের ভেতরেই সুপরিচিত নন। সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের কাছেও তিনি সমভাবে পরিচিত। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল ও সহনশীল। অত্যন্ত অমায়িক ও স্বল্পভাষী। অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিত্ব। দেশের সামগ্রিক শিক্ষাকাঠামোর পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তিনি তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত সাহিত্য সমগ্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আব্বাস আলী খানের মাঝে সমাবেশ ঘটেছিল চমৎকার সকল গুণের। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক, অনুবাদক, সুবক্তা এবং বড় মাপের একজন আল্লাহ প্রেমিক। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কণ্ঠ ছিল যুবকের মত পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়। ভাষার গাঁথুনী, বলার ভঙ্গি, যে শব্দের ওপর যতটা জোর দেয়ার দরকার তা দিতেন খুব মজবুতভাবে। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সুগভীর। ইতিহাসের ওপর তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল। তাঁর লিখিত "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" ইতিহাসের ওপর তাঁর দখলের অন্যতম দলিল। বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তাঁর দখল ছিল ঈর্ষণীয়। একজন আধুনিক ধারার শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আরবিতেও তাঁর ভাল দখল ছিল। তিনি ছিলেন প্রলিফিক রাইটার এবং জাত গবেষক।

তাঁর কর্মময় জীবনও ছিল বর্ণাঢ্য। সরকারি চাকরি নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু, এরপর শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের পি. এস-এর দায়িত্ব পালন, প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাব্রতী, জাতীয় পরিষদ সদস্য, প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী এবং সর্বোপরি সমাজসেবক হিসেবে তাঁর কর্মময় জীবন অমর হয়ে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী মানুষকে প্রেরণা যোগাবে। ১৯৫৫ সাল থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সাথে একজন খাঁটি দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে একামতে দ্বীনের কাজ করেন। এ দেশের মানুষের ঘরে ঘরে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি একাধিকবার হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন। ইসলামী সংগঠন ও সংস্থাসমূহের আহ্বানে দ্বীনি ইলম ও দ্বীনের আলো বিতরণের কাজে তিনি বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, লিবিয়া, পাকিস্তান ও ভারত সফর করেন। স্বৈরাচারী আইয়ুববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আইয়ুববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিরোধী দলগুলো 'কপ', 'পিডিএম' এবং 'ডাক' নামে যেসব জোট গঠন করেছিল তিনি ছিলেন এ জোটগুলোর অন্যতম নেতা। ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আশির দশকে তিনি রাজনৈতিক ময়দানে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও আপোষহীন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। খান সাহেবের[১] এ বর্ণাঢ্য জীবনকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সুন্দর ও পরিপাটি করে উপস্থাপন সময়ের দাবী। কিন্তু এখনো এ বিষয়ে তেমন কোন কাজ হয়নি। "মৃত্যুহীন প্রাণ" এবং

১. অতঃপর এ গবেষণায় আব্বাস আলী খানকে সংক্ষিপ্তভাবে খান সাহেব বলে উল্লেখ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত "আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম" ও অধ্যাপক মাজহারুল ইসলামের "স্মৃতির পাতায় জননেতা মরহুম আব্বাস আলী খান" এ স্মরণিকা সংকলনগুলোরই সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোতে খান সাহেবের জীবন ও কর্ম, অবদান এবং সাহিত্যকর্মের প্রতিচ্ছবিও পুরোপুরি উপস্থাপিত হয়নি। তাছাড়া এগুলো গবেষণাধর্মীও নয়। অবশ্য এতে কিছু কিছু তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। এ গবেষণাকর্মে সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে খান সাহেবের জীবনদর্শন এবং সাহিত্য রচনায় তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, প্রতিভা এবং তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা তথা ইসলামের অন্তর্নিহিত তথ্যের সুন্দর উপস্থাপনা যথাযথভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। আমি যেসব উপাদান অবলম্বন করে গবেষণা কাজে নিয়োজিত হয়েছি তা হল :

১. খান সাহেবের রচনাবলী।

২. তাঁর পারিবারিক সদস্য, সমসাময়িক বিশেষ ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র, সহকর্মী ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

৩. তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ।

৪. বিভিন্ন রিসার্চ একাডেমী এবং লাইব্রেরী ও গ্রন্থাগার থেকে তাঁর সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ।

৫. তাঁর সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ-বিবৃতি, ইতিহাস, দলিল দস্তাবেজ, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, স্মরণিকা-সংকলন ও আনুষঙ্গিক উপাদান সংগ্রহপূর্বক ব্যাপক পাঠ।

এ গবেষণা কর্মকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য সাতটি অধ্যায় ও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে- 'জীবন চরিত'। বস্তুত একজন ব্যক্তিকে জানার জন্য তাঁর জন্ম, বংশ পরিচয়, পারিবারিক ঐতিহ্য, জন্মস্থান, শিক্ষা জীবন, শিক্ষক মন্ডলি, ছাত্র, পারিবারিক জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট, কর্মতৎপরতা এবং তাঁর সমকালীন মনীষী গনের জীবন ইতিহাস জানা প্রয়োজন। এ দিকটি বিবেচনা করে উক্ত অধ্যায়ের অবতারনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। রাজনীতির হাতে খড়ি, বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসাবে ভুমিকা পালনসহ তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে পুঙ্খানোপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর সাহিত্য সাধনা, লেখালেখির সূচনা, তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলীর সমীক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা, তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা, তাঁর লেখনী প্রতিভার মূল্যায়ন, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা তাঁর চিন্তা ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আল্লাহর এ জমীনে তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল খান সাহেবের রাজনৈতিক চিন্তাধারা। তাঁর দর্শন ছিল মানুষ কেবল আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর গুনবৈশিষ্ট্য ও অবদান সর্ম্পকে আলোছনা করা হয়েছে। খান সাহেব ছিলেন আল্লাহর একজন একনিষ্ঠ বান্দাহ। তিনি ছিলেন কর্মঠ, পরিশ্রম প্রিয়, সময়ানুবর্তি, সুবক্তা, সুসাহিত্যিক। তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর গুনাবলী ও অবদানগুলো সকলের সামনে তুলে ধরার নিমিত্তে এ অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত একজন ব্যক্তিকে জানা এবং তাঁর কর্মের যথাযথ মুল্যায়নের জন্য তাঁর সমকালীন পরিবেশ, প্রেক্ষাপট সর্ম্পকে জানা অপরিহার্য। তদুপরি, তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থা এবং সমসাময়িক সাংস্কৃতিক অবস্থাকে মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়ে তথা উপসংহারে সমগ্র অভিসন্দর্ভের একটি সার্বিক পর্যালোচনা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর রাজনৈতিক সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যদের মতামত ও অনুভূতি উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে গ্রন্থপঞ্জী ও একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত করা হয়েছে।

অত্র গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান করার কাজে গবেষককে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। নির্ভুল তথ্য আহরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অনাগত ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে এটাই আমার প্রত্যাশা। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের সব ভালো কাজ কবুল করুন। আমীন।

আব্দুল্লাহ আল মামুন

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাস আলী খানের জীবন দর্শন ও তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র			
ঘোষণাপত্র			
কৃতজ্ঞতা স্বীকার			১
নির্দেশিকা			২
সূচনা বক্তব্য			৩
সূচীপত্র			৬
প্রথম অধ্যায়	:	**জীবন চরিত**	**৯-৬১**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	জন্ম ও বংশ পরিচয়	৯
		জন্মস্থান	১২
		শৈশবকাল	১৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	শিক্ষাজীবন	১৮
		প্রাথমিক শিক্ষা	১৮
		মাধ্যমিক শিক্ষা	২০
		উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা	২০
		উচ্চ শিক্ষা	২২
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকমন্ডলী	২৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	কর্মজীবন	২৬
		সরকারী চাকুরি (১৯৩৬-১৯৪৮)	২৬
		শিক্ষকতা (১৯৫২-১৯৬১)	৩১
		হজ্জ পালন	৩৫
		ছাত্রবৃন্দ	৩৫
		সহকর্মীবৃন্দ	৩৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	পারিবারিক জীবন	৩৭
		দাম্পত্য জীবন	৩৭
		সন্তান-সন্ততি	৩৮
		পরিবারের অন্যান্য সদস্য	৩৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	বিদেশ ভ্রমণ	৩৯
		যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, কানাডা	
		ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, জাপান	

Dhaka University Institutional Repository

			পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	আধ্যাত্মিক জীবন	৫৩
		ইলম তাসাউফ চর্চা	৫৩
		দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী	৫৪
		স্বভাব-চরিত্র	৫৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	ইন্তেকাল	৫৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	রাজনৈতিক জীবন	৬২-১০৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	রাজনৈতিক জীবনের সূচনা	৬২
		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান	৬২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল	৬৭
		আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র	৬৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ	৬৯
		পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিল উত্থাপন	৭০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	সামরিক শাসক আয়ুববিরোধী আন্দোলন	৭৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ	৭৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন	৭৮
		চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন বায়োলজী পাঠ্য তালিকাভুক্ত করণ	৭৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তার পটভূমি	৭৯
		মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব	৭৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক তৎপরতা	৮৮
		ইসলামী বিপ্লবের সাত দফা গণদাবী ঘোষণা	৯০
নবম পরিচ্ছেদ	:	কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলন	৯২
		১৯৮৩ সালে প্রকাশ্য জনসভায় কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা প্রকাশ	৯৩
দশম পরিচ্ছেদ	:	সামারক শাসক এরশাদবিরোধী আন্দোলন	৯৬
		১৯৯০ এর গণআন্দোলনে নেতৃত্বদান	৯৭
একাদশ পরিচ্ছেদ	:	১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ	৯৮
		জাতির উদ্দেশে রেডিও- টেলিভিশনে ভাষণ	৯৮
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	:	১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ	১০২
		ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬-পরবর্তী রাজনৈতিক তৎপরতা	
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	:	জীবনের সর্বশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচী	১০৩

Dhaka University Institutional Repository

			পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়	:	সাহিত্য সাধনা	১০৪-১৬১
		'আব্বাস আলী খানের লেখালেখির সূচনা	১০৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	'আব্বাস আলী খান রচিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলি একটি : সমীক্ষা	১০৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা	১১১
চতুর্থ অধ্যায়	:	খান সাহেবের চিন্তাধারা	১৬২-১৬৬
পঞ্চম অধ্যায়	:	গুণাবলী ও অবদান	১৬৭-১৭২
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	খান সাহেবের গুণ-বৈশিষ্ট	১৬৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	খান সাহেবের অবদান	১৭১
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	'আব্বাস আলী খানের সময়কাল (১৯১৪-১৯৯৯)	১৭৩-২৩৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল	১৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	পাকিস্তানি শাসনামল	১৯৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশী শাসনামল	২১৫
সপ্তম অধ্যায়	:	উপসংহার	২৩৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	'আব্বাস আলী খান রাজনৈতিক সহকর্মীদের অনুভূতি	২৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	'আব্বাস আলী খান পরিবারের সদস্যদের অনুভূতি	২৪১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	গ্রন্থপঞ্জী	২৪৬
পরিশিষ্ট	:	গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণপত্রের ফটোকপি ও আলোকচিত্র	২৫৪-২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায় : জীবন চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও বংশ পরিচয়

বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী মরহুম 'আব্বাস আলী খান একাধারে ছিলেন লেখক, সাহিত্যিক, অনুবাদক, রাজনীতিক, গবেষক, বাগ্মি। তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি অন্যতম পুরোধা। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি কেবল দেশের ভেতরেই সুপরিচিত নন, বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোর কাছেও সমভাবে পরিচিত।

নামকরণ

'আব্বাস আলী খানের প্রকৃত নাম মোহাম্মাদ 'আব্বাস আলী খান। জন্মের পর তাঁর কী নাম রাখা হবে তা নিয়ে পরামর্শ চলছিল, কয়েকজন মুরুব্বী শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দেন আবুল কাসেম। কিন্তু এ নাম খান সাহেবের দাদার পছন্দ হলো না। তাঁর দাদা সুবিদ আলী খান বলেন, জুমুয়ার খোতবায় যে ক'টি নাম পড়া হয় তার একটি উনার নিকট খুব পছন্দনীয় তা হল আব্বাস। সে সময় খান সাহেবদের বাড়ীতে এক মৌলভী সাহেব থাকতেন। তাঁর দাদা মৌলভী সাহেবের মতামত চাইলে তিনি এ নামের পক্ষে পরামর্শ দেন। এবং বলেন, এ নাম নবীজির একেবারে আপন চাচার।[২] সুতরাং 'আব্বাস' নাম রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর দাদা গরু-খাশী জবাই করে ধুমধাম করে আকীকা[৩] - এর আয়োজন করলেন। এ প্রসঙ্গে খান সাহেব বলেন, "আমার নামকরণ নিয়ে চিন্তাভাবনা চল্লো।

---

২. নবীজীর চাচার নাম আবুল ফজল আব্বাস, পিতা আব্দুল মুত্তালিব, মাতা নাতিলা, মতান্তরে নাসিলা বিনতে খাব্বাব। রাসূলুল্লাহ সা. - এর পিতা 'আব্দুল্লাহর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর সা. সমবয়সী। ঐতিহাসিকদের ধারণা, সম্ভবত তিনি রাসূলুল্লাহর সা. দুই বা তিন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে হিসাবে তিনি ৫৬৮ মতান্তরে ৫৬৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে তিনি ছিলেন কুরাইশদের একজন প্রতাপশালী রইস। 'আব্বাস ছিলেন খুবই মর্যাদাসম্পন্ন, প্রভাবশালী, বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ। পুরুষানুক্রমে খানায়ে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্ব লাভ করেন। বানূ হাশিমের নিঃস্ব ও অসহায় গরীবদের অন্ন, বস্ত্র ও অপরাপর প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বও তিনি বহন করতেন। 'আব্বাস যদিও দীর্ঘদিন যাবত প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবে তিনি এ দাওয়াতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি 'আকাবার সমাবেশে রাসূলুল্লাহ সা. কে সহযোগিতা করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে তিনি মদিনায় গমন করে স্বপরিবারে রাসূলুল্লাহর সা. খেদমতে হাজির হয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং স্থায়ীভাবে মদিনায় বসবাস শুরু করেন। তিনি মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্বাস ৩২ হিজরির রজব/মুহাররম মাসের ১২ তারিখ ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান রা. জানাজার নামাজ পড়ান এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কবরে নেমে তাঁকে সমাহিত করেন। মদিনার বাকি গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, অতিথিপরায়ন। 'উমার তাঁকে বদরী সাহাবীদের সমান মর্যাদা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহর সা. থেকে তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু সাহাবী ও তাবেয়ী হাদিস বর্ণনা করেছেন। (অধ্যাপক আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১৯৮৯, ২০০৪) পৃষ্ঠা নং ১০৮-১১১। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃ : ৩৯৬)।

৩. 'আকীকার মূল অর্থ 'সদ্যপ্রসূত শিশুর মাথার চুল'। শিশুর জন্ম উপলক্ষে যবেহকৃত বকরীকেও আকীকা বলা হয় এই কারণে যে, বকরী যবেহ করার সময় নবজাতকের মাথার চুল মুণ্ডানো হয়। আরবগণ কখনও একটি বস্তুকে সম্পর্কযুক্ত অপর বস্তুর নামে নামকরণ করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। যবেহকৃত বকরীকে এ জন্য আকীকা বলা হয় যে, সেই দিন নবজাতকের 'আকীক

Dhaka University Institutional Repository

কতেক মুরব্বি শুভাকাঙ্ক্ষী বল্লেন, আবুল কাসেম, দাদার মনে ধরলো না। বাড়ীতে এক মৌলভী থাকতেন, দাদা বলেন, 'মৌলভী সায়েব। আপনি যে কয়টি নাম খুতবায় পড়েন, তার একটা আমার বড্ডো ভাল লাগে, তা হ'চ্ছে আব্বাস। কি বলেন?' মৌলভী সায়েব বলেন, 'বেশত, সেটা খুব ভালো নাম। এ হচ্ছে আমাদের নবীজীর চাচার নাম। একেবারে আপন চাচা।' সে নাম রাখাই স্থির হল। দাদা গরু-খাশী জবাই করে ধুমধাম করে আকীকা করলেন।"[৪]

বংশ পরিচয়

আব্বাস আলী খানের পিতার নাম আব্দুল আজীজ খান। মাতার নাম ছবিরুন্নেছা। দাদার নাম সুবিদ আলী খান[৫]। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা বহুকাল পূর্বে আফগানিস্তান[৬] থেকে এদেশে আগমন করেন, তাঁরা ছিলেন আফগানিস্তানের পাখতুন (পাঠান) বংশোদ্ভূত। পাঠান আমলে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটে এক দশ হাজারী মুনসেবদার থাকতেন।

খান জাহান আলী খান[৭] ও ছিলেন একজন মুনসেবদার। যিনি অন্তিম শয্যায় খুলনার বাগেরহাটে শুয়ে আছেন। তাঁদের সময় খান সাহেবের পূর্ব পুরুষগণ এ দেশে বসবাস শুরু করেন। খান সাহেবের দাদার মধ্যে

(চুল মুণ্ডন) করা হয়। আল্লামা যামাখশারীরও এই অভিমত (তুহফাতুল মাওদূদ বি-আহকামিল মাওলূদ, পৃ.৫২)। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, 'আকীকা শব্দটি 'আক্ক (ফাঁড়িয়া ফেলা, কাটিয়া ফেলা) হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ইবন আবদিল বার এই মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই মতের সপক্ষে খাত্তাবী বলেন, শিশুর জন্ম উপলক্ষে যবেহকৃত বকরীকে উহার গলা কাটিয়া ফেলার কারণে 'আকিকা বলা হয়। ইবনুল ফারিস বলেন, নবজাতকের মাথার মুণ্ডনকৃত চুল এবং এই উপলক্ষে যবেহকৃত বকরী উভয়কেই 'আকীকা বলা হয় (তাজুল 'আরূস, ৭খ., পৃ. ১৬;, আওজাযুল মাসালিক, ৯খ., পৃ. ২০৩)। আকীকা শব্দটি কখনও নদী, নাস্তার থলিয়া, তরবারি, লিঙ্গাগ্রের কর্তনকৃত চামড়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় (তাজুল 'আরূস, ৭খ, পৃ. ১৬; মিসবাহুল লুগাত, পৃ. ৫৬৫)। শারহুল ইকনা গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে, শরী'আতের পরিভাষায় 'নবজাতকের কেশ মুণ্ডনের দিন যবেহকৃত প্রাণীকে আকীকা বলা হয়'। ইহা কোন বস্তুকে তাহার উদ্দেশ্য বা কারণের নামে নামকরণ করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা চুল কর্তনের কারণেই পশু যবেহ করা হয়। প্রাচীনতর 'আলিমদের কেহ কেহ (দাউদ আজ-জাহিরী প্রমুখ) আকীকাকে অবশ্য করণীয় (ওয়াজিব) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) ইহাকে শুধু পুণ্যজনক (মুস্তাহাব) বলিয়া বিবেচনা করেন। শরী'আতে এই চুলের ওজনের সমান রৌপ্য দান করিতে নির্দেশ দান করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে খাতনাহ, যাবহ প্রভৃতি ইবরাহীমী আ. এর প্রথার ন্যায় আকীকাও একটি প্রাচীন প্রথা। মহানবী সা. আকীকাতে বালকের জন্য দু'টি এবং বালিকার জন্য একটি মেষ বা ছাগল কুরবানী করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড : পৃ ১৬৫-১৬৬)

৪. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ,(বই-কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬,১৯৮৮) পৃষ্ঠা : ১৮।

৫. সুবিদ আলী খানের পিতার নাম রকিম উদ্দীন খান এবং তদীয় পিতার নাম মুছা খান।

৬. যে দেশটি আফগানিস্তান নামে পরিচিত এই নামে ইহার পরিচিতি ঘটিয়াছে মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে (১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ যখন হইতে আফগান জাতির রাষ্ট্রীয় আধিপত্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের পৃথক পৃথক নাম থাকিলেও সমগ্র দেশটির কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক একক ছিল না এবং ইহার বিভিন্ন অংশ বংশগতভাবে কিম্বা ভাষাগতভাবে ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধও ছিল না। পূর্বে আফগানিস্তান শব্দের সরল অর্থ ছিল আফগানদের আবাসভূমি। তখন ইহা একটি সীমিত অঞ্চল ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত উহার অনেকগুলোই তখন ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অবশ্য পূর্বে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন কিছু বড় বড় অঞ্চল বর্তমানে হয় স্বাধীন হইয়া গিয়েছে অথবা পাকিস্তানের এলাকাভুক্ত হইয়াছে। বরাকযাঈ বাদশাহদের অধীনে (সাবেক আমীর) অধীনে গঠিত আধুনিক আফগানিস্তান উত্তরে ২৯০ ৩০ও ৩৮ -এর মধ্যে এবং পূর্বে ৬১ ও ৭৫-এর মধ্যে (ওয়াখানের লম্বা ফালিকে বাদ দিলে ৭১ ৩০ পূর্বে) বিসম আকৃতির পরিসীমাভুক্ত একটি অঞ্চল। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড : পৃষ্ঠা ৫৬০)

৭. খান জাহান আলী শাসক ও সুফী দরবেশ, যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাগেরহাটে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর উপাধি ছিল উলুগ খান ও খান-ই-আজম। সে সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের পথম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯)।

খান জাহানের পূর্বপুরুষ সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) অধীনে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং সুলতান তাঁকে বংশ পরম্পরায় 'খান-ই-জাহান' খেতাবে ভূষিত করেন। খানজাহান সম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রে এ খেতাবলাভ করেন। তৈমুরের বাহিনী কর্তৃক দিল্লি নগরীর ধ্বংসলীলার (১৩৯৮) অব্যবহিত পরে খান জাহান বাংলায় আসেন বলে মনে হয়। তিনি প্রথমে দিল্লির সুলতানের এক

Dhaka University Institutional Repository

পাঠানদের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা খান সাহেব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "দাদার পূর্ব পুরুষ পাঠান মুল্লুক থেকে আসা লোক পাঠান আমলে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটে এক দশ হাজারী মুনসেবদার থাকতেন। দাদা সুবিদ আলী খানের মধ্যে পাঠানদের বৈশিষ্ট্য আমরাও লক্ষ করেছি।"[৮] সুবেদ আলী খানের পিতা দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট থেকে এসে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার চকবম্বু গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সুবেদ আলী খান ছিলেন তিন পুত্রের জনক। ১. আব্দুল আজীজ খান ২. আব্দুল কাদের খান ৩. রায়চাঁদ খান। তাঁরা সকলে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আব্দুল আজীজ খান ছিলেন এক পুত্র ও ছয় কন্যার[৯] জনক। এই এক পুত্রের নাম আব্বাস আলী খান। ইনি আলোচ্য অভিসন্দর্ভের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

জন্ম

'আব্বাস আলী খান ১৯১৪ সালে বাংলা ১৩২১ (তেরশত একুশের) ফাল্গুনের শেষের দিকে সোমবার সকাল ৯টায় জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট শহরে পারুলিয়া গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে খান সাহেব বলেন, "আমি দুনিয়ার আলোক দেখেছিলুম বাংলা তেরোশ একুশের ফাল্গুনের শেষের দিকে। মা বাপ মাসের তারিখ লিখে রাখেন নি। তবে মাসের শেষ হপ্তায় সোমবার বেলা ৯ টায় এ দুনিয়ায় প্রথম চোখ খুলেছিলুম।"[১০] আবদুস শহীদ নাসিম বলেন-এই মহান ব্যক্তিত্ব ১৯১৪ সালে জয়পুরহাটে জন্মগ্রহণ করেন।[১১]

পরবর্তী সময়ে বাংলার সুলতানের কাছে থেকে সুন্দরবন বনাঞ্চল জায়গির লাভ করেন। তিনি সুন্দরবন এলাকায় গভীর বন কেটে সেখানে জনবসতি গড়ে তোলেন। অচিরেই তাঁর দুই নায়েব বুরহান খান ও ফতেহ খানের অক্লান্ত পরিশ্রমে মসজিদকুড় (খুলনা জেলার কয়রা থানাধীন) এবং কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরবর্তী সন্নিহিত এলাকা মানুষের বাসোপযোগী করে তোলা হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, খান জাহান বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জেলার অংশে প্রথম মুসলিম বসতি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সমাধিসৌধের ফলকে উৎসকীর্ণ 'উলুগ খান' ও 'খান-ই-আজম' উপাধি থেকে বোঝা যায় যে, খান জাহান একজন মুক্ত সৈনিক ছিলেন না, বরং খুব সম্ভবত তিনি গৌড় সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি নড়াইলের উত্তরে অবস্থিত নলদি পর্যন্ত বিস্তৃত খলিফাতাবাদ পরগনা শাসন করতেন। খান জাহান ছিলেন একজন প্রখ্যাত নির্মাতা। তিনি বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জেলায় কয়েকটি শহর প্রতিষ্ঠা, মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, মহসড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং বহুসংখ্যক দিঘি খনন করেন। তাঁর দুর্গবেষ্টিত সুরক্ষিত রাজধানী শহর খলিফতাবাদ বাগেরহাটে ছাড়াও তিনি মারুলি কসবা, পৈগ্রাম কসবা ও বারো বাজার এ তিনটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাগেরহাট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মহাসড়ক, সামন্তসেনা থেকে বাঁধখালি পর্যন্ত বিশ মাইল দীর্ঘ সড়ক এবং শুভবারা থেকে খুলনার দৌলতপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অপর একটি সড়ক নির্মাণ করেন বলেও শোনা যায়। খান জাহানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ (আনু. ১৪৫০), মসজিদকুড় গ্রামের মসজিদকুড় মসজিদ (আনু. ১৪৫০), বাগেরহাটের নিকটে স্বীয় সমাধিসৌধ (১৪৫৯) এবং তৎসংলগ্ন এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। তাঁর খননকৃত বহুসংখ্যক দিঘি ও পুকুরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর সমাধির নিকটস্থ খাঞ্জালি দিঘি (১৪৫০) এবং ষাটগম্বুজ মসজিদের পশ্চিমে অবস্থিত ঘোড়াদিঘি (পরিমাপ ১৫০০ ×৭৫০)। খান জাহান তাঁর নির্মিত ইমারতে এক নতুন স্থাপত্যরীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর নামানুসারে এটি খান জাহানি রীতি নামে পরিচিত। বৃহত্তর খুলনা, যশোর ও বরিশাল জেলায় কিছুসংখ্যক ইমারতে খান জাহানি রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সম্ভবত গৌড় সুলতানের একজন পদস্থ কর্মকর্তা হয়েও খান জাহান তাঁর নির্মিত ইমারতে দিল্লির তুগলক স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। এর থেকে তুগলব স্থাপত্যরীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের এবং সম্ভবত তুগলক প্রশাসনের সঙ্গে প্রথম জীবনে তাঁর সম্পৃক্ততার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।

খান জাহান ১৪৫৯ সালের ২২ অক্টোবর (২৬ জিলহজ্ব, ৮৬৩ হি.) ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর নিজের তৈরী সৌধে সমাহিত হন লোকেরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং অসংখ্য লোক তাঁর মাযার জেয়ারত করে। চৈত্র মাসে চাঁদের শুক্লপক্ষে তাঁর দরগাহ প্রাঙ্গণে বার্ষিক ওরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। (মুয়াযযম হুসায়ন খান, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩. ২০০৪, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭)।

৮. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা : ১৯।

৯. আব্দুল আজীজ খানের ছয় কন্যার নাম হল : তন্মধ্যে দুজন শৈশবে ইন্তেকাল করেছেন। সাজেরন বিবি, হাজেরা খাতুন, জোবেদা খাতুন, ও সালেহা খাতুন।

১০. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা : ১৮।

১১. মৃত্যুহীন প্রাণ : আব্বাস আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১১।

Dhaka University Institutional Repository

জয়পুরহাটের প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ডা: এস এম আনসার আলীর মতে, ১৯১৪ সালে জয়পুরহাট উপজেলার পারুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে এই সংগ্রামী মহাপুরুষের জন্ম।[১২]

১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মরহুম আব্বাস আলী খান রহ. জয়পুরহাট-১ আসনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের প্রাক্কালে এক নির্বাচনী প্রচারণায় অডিও ক্যাসেটে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, জনাব আব্বাস আলী খান ১৯১৪ সালে বগুড়া জেলার জয়পুরহাটে এক সম্ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩] 'জয়পুরহাটের ডায়েরী' নামক স্মারক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সারা বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ আব্বাস আলী খান ১৯১৪ সালে সদর উপজেলার পারুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন'।[১৪]

জন্মস্থান

খান সাহেবের জন্মস্থান জয়পুরহাট জেলা বিভিন্নভাবে ঐতিহ্য মণ্ডিত। "জয়পুরহাট জেলার (রাজশাহী বিভাগ) আয়তন ৯৬৫.৪৪ বর্গ কিমি। উত্তরে দিনাজপুর জেলা, পূর্বে গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে বগুড়া ও নওগাঁ জেলা, পশ্চিমে নওগাঁ জেলা ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গরাজ্য। সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৪.৬° সে. সর্বনিম্ন ১১.৯° সে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬১০ মি মি। প্রধান নদী ছোট যমুনা, তুলসিগঙ্গা, হারাবাতি। নান্দাল দীঘি, আছরাঙ্গাদীঘি ও পাথরঘাটাদীঘি উল্লেখযোগ্য। জেলা শহর ৯টি ওয়ার্ড ও ৪৮টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৮.৫৩ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা ৫৬৩২৩; পুরুষ ৫১.৬০%, মহিলা ৪৮.৪০%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ৩০৪০ জন। শিক্ষার হার ৫১.৪%। ডাকবাংলো ১, সার্কিট হাউস ১।

প্রশাসন ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত জয়পুরহাট জেলা বগুড়া জেলার একমাত্র মহকুমা ছিল। ১৯৮৪ সালে মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। উপজেলা ৫, পৌরসভা ৩, ইউনিয়ন ৩২, গ্রাম ৯৮৯, মৌজা ৭১৯, ওয়ার্ড ২৭, মহল্লা ৭৪। উপজেলাসমূহ : আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই ক্ষেতলাল ও পাঁচবিবি। প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ রাজা জয়গোপালের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, 'ভীমের পান্টি' নামক স্থানে প্রাচীন 'গুড়ুর স্তম্ভ', নিমাই পীরের দরগাহ।ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের[১৫] সময়

---

১২. জয়পুরহাটের সাহিত্য শিল্প : এস এম আনসার আলী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ২৭।

১৩. ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারণার একটি অডিও ক্যাসেট।

১৪. জয়পুরহাটের ডায়েরী, প্রকাশকাল ৩০ জানুয়ারী ২০০৪ : জয়পুরহাটের কৃতী সন্তান অধ্যায়।

১৫. স্বদেশী আন্দোলন : ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ হতে উদ্ভূত হয়ে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। এ আন্দোলন ছিল গান্ধী-পূর্ব আন্দোলনসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফল। প্রাথমিক পর্যায়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান, অসংখ্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত ও স্মারকলিপি পেশ করে এবং ১৯০৪ সালের মার্চ ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিশাল সম্মেলন প্রভৃতি নরমপন্থী উপায়ে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয়েছিল। এ সকল কৌশলের সার্বিক ব্যর্থতা নতুন ধরনের বিরোধিতা যথা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, রাখি বন্ধন, অরন্ধন ইত্যাদি পন্থা অনুসন্ধানে বঙ্গভঙ্গবিরোধীদের অনুপ্রাণিত করে।
তাত্ত্বিকভাবে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দুটি মূলধারা শনাক্ত করা যেতে পারে 'গঠনমূলক স্বদেশী' এবং 'রাজনৈতিক চরমপন্থা' স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার জন্য 'বর্জননীতি' ছিল মূল হাতিয়ার। 'গঠনমূলক স্বদেশী' ছিল স্বদেশী শিল্পকারখানা, জাতীয় স্কুল. গ্রাম উন্নয়ন ও সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মসংস্থানের ধারা। প্রফুল্লচন্দ্র রায় অথবা নীলরতন সরকার এর ব্যবসায়িক উদ্যোগ. সতীশচন্দ্র মুখার্জী কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রিত ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে গ্রামসমূহে গঠনমূলক কাজের ভেতর দিয়ে এটা প্রকাশ লাভ করে। পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় অশ্বিনীকুমার দত্ত এর স্বদেশ বান্ধব সমিতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তির উন্নয়ন বলে অভিহিত করেছেন।
রাজনৈতিক চরমপন্থী আদর্শের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট বাংলার উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদের কাছে এর আবেদন অতি সামান্যই ছিল। গঠনমূলক স্বদেশী প্রচারকদের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে। (রঞ্জিত রায়, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৮)।

Dhaka University Institutional Repository

কমরেড মোঃ আব্দুল কাদের চৌধুরী ও মিহির মুখার্জীর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বোমা মেরে ট্রেন আক্রমণে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনার পর ব্যাপক নিরাপত্তা অভিযান চালিয়ে তাদেরকে ব্রিটিশ বাহিনী গ্রেফতার করে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন দেয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন বধ্যভূমি ৪, স্মৃতিসৌধ ২, গণকবর ৩। জনসংখ্যা ৮৪৪৮১৮; পুরুষ ৫১.০৩%, মহিলা ৪৮.৯৭%। মুসলমান ৮৮.১৮%, হিন্দু ৯.৫৭%, খ্রিষ্টান ০.৪৪%, আদিবাসী ও অন্যান্য ১.৮১%। উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা, মাহাল, কোঁচ, পাহান, বুনা, হো, মাহাতো, রাজবংশী ও কোচ উল্লেখযোগ্য।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ১৬৪৪, মন্দির ১০৪, গির্জা ৯, মাযার ৬, তীর্থস্থান ৩। শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দির, লেঙ্গার পীরের মাযার, দ্বাদশ শিবমন্দির, খঞ্জনপুর চার্চ মিশন (১৮৯৮), বড়তারা মন্দির উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার গড় হার ১৯.৮%; পুরষ ২৭.৪%, মহিলা ১১.৮%। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান[১৬] শিক্ষা বিস্তারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী অবলুপ্ত; আলোড়ন (১৯৪৯-৫২), সোনার বাংলা (১৯৭২-৭৫), সেবক (১৯৭৮-৮২), সাপ্তাহিক সীমান্ত (১৯৮২-৮৯), সাপ্তাহিক জয়পুর বার্তা (১৯৮৭-৮৮), পাক্ষিক দিগন্ত (১৯৮১-৮৪), সাপ্তাহিক বঙ্গধ্বনি (১৯৮৫-৮৮), সাপ্তাহিক বালিঘাটা, সাপ্তাহিক পাঁচমাথা, মহুয়া (মাসিক)।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পাবলিক লাইব্রেরি ১, বেসরকারী লাইব্রেরি ১০, সিনেমা হল ১৫, ক্লাব ২২৪, মহিলা সংগঠন ৭৫, নাট্যমঞ্চ ১, নাট্যদল ৫, সাহিত্য সংগঠন ৮, শিল্পকলা একাডেমী ১, সমবায় সমিতি ৩৬।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৫৩.৩৩%, কৃষি শ্রমিক ২১.৮৫%, অকৃষি শ্রমিক ১.৬৬%, ব্যবসা ৯.৯৫%, চাকরি ৪.৩৯%, পরিবহন ১.৩৮%, অন্যান্য ৭.৪৪%।

ভূমি ব্যবহার মোট জমি ৯৭১৭৭ হেক্টর; চাষযোগ্য জমি ৮০,০২৮ হেক্টর, পতিত জমি ২০ হেক্টর। এক ফসলি ৫%, দো ফসলি ৬০%, তিন ফসলি ৩৫%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৮৫%। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ভূমিহীন ১১%, ক্ষুদ্র চাষি ৫৩.৫%, মধ্যম চাষি ২১.৮%, বড় চাষি ১৩.৭%। মাথাপিছু আবাদি জমি ০.০৯ হেক্টর। প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ৭০০০ টাকা। প্রধান প্রধান কৃষি ফসল ধান, আলু, ইক্ষু, কলা, পাট, হলুদ, সরিষা, শাকসবজি। বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি আউশ ধান, মাষকলাই, অড়হর, মান, ঝিঙ্গে, মিষ্টি আলু, তরমুজ, পান, তামাক, চীনাবাদাম। প্রধান ফল-ফলাদি কলা, আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, আমড়া, জলপাই, ডাব, আঙ্গুর, সফেদা ও কমলা।

মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার-গবাদিপশু ৩২৫, হাঁস-মুরগি ৩৬২, মৎস্য ১৬৮৬, হ্যাচারি ৯।

যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকা রাস্তা ২৪২ কিমি, আধাপাকা রাস্তা ৬৪.৪ কিমি, কাঁচা রাস্তা ১৮৩১.২৮ কিমি; নৌপথ ৩৮ নটিক্যাল মাইল, রেলপথ ৪৫ কিমি।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন হাতি, পাল্কি, নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি (টমটম)।

---

১৬. সরকারি কলেজ ২, বেসরকারি কলেজ ১৫, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২, বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭৬, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৩, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০৯, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৬, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ১, ভকেশনাল ইনস্টিটিউট ১, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ১, ভকেশনাল ইনস্টিটিউট ১, আইন মহাবিদ্যালয় ১, কারিগরি মহাবিদ্যালয় ১, মাদ্রাসা ৮৩টি। কালাই ময়েনউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৩), সোনামুখী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৬), খঞ্জনপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৭), খঞ্জনপুর মিশন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯১৯), কড়ই নুরুল হুদা আলিয়া মাদ্রাসা (১৯২৬), বানিয়াপাড়া মাদ্রাসা (১৯৩৬), রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৬), জয়পুরহাট সরকারি কলেজ (১৯৪৬) উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প ও কলকারখানা চিনিকল, চুনাপাথর ও সিমেন্ট[১৭] ফ্যাক্টরি, কয়লা ফ্যাক্টরি, টেক্সটাইল মিল, ঔষধ শিল্প, চাল কল, আটা ও ময়দা কল।

কুটিরশিল্প তাঁত ৯২৫, বাঁশের কাজ ৭০১, স্বর্ণকার ১১৬, কামার ১৪৪, কুমার ২৩৮, কাঠের কাজ ১৮৪, সেলাই কাজ ৬৩০, ওয়েল্ডিং ৮৮। হাট-বাজার ৯২, মেলা ১১।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য চিনি, পাট।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র আধুনিক জেলা হাসপাতাল ১, ডায়াবেটিক হাসপাতাল ১, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৫, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১৩, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১০, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১, রেড ক্রিসেন্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১, ক্লিনিক (বেসরকারি) ৫, পশু হাসপাতাল ১, থানা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ৫, প্রজনন উপকেন্দ্র ৫, পশু হাসপাতাল ১, থানা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ৫, প্রজনন উপকেন্দ্র ৫।"[১৮]

খান সাহেব জয়পুরহাট সদর উপজেলার পারুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জয়পুরহাট সদর উপজেলাটি জয়পুরহাট জেলার রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত। "এর আয়তন ২৩৮.৫৪ বর্গ কিমি। উত্তরে পাঁচবিবি উপজেলা, দক্ষিণে ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর ও বদলগাছি উপজেলা, পূর্বে কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলা, পশ্চিমে ধামুরহাট উপজেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)। উপজেলা শহর ৯টি ওয়ার্ড ও ৪৮টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৮.৫৩ বর্গ কিমি। জনসখ্যা ৫৬৩২৩; পুরুষ ৫১.৬০%, মহিলা ৪৮.৪০%। ডাকবাংলো ১, সার্কিট হাউস ১। প্রশাসন থানা সৃষ্টি ১৯১৮ সালে। বর্তমানে এটি উপজেলা। ইউনিয়ন ৮, মৌজা ১৯১৮, গ্রাম ১৯২, ওয়ার্ড ৯ ও পৌরসভা ১।

জনসংখ্যা ২৫২৭১; পুরুষ ৫.১৮%, মহিলা ৪৭.৮২%। মুসলমান ৮৬.০৬%, হিন্দু ১১.৯৭%, খ্রিষ্টান ০.২৯%, আদিবাসী ও অন্যান্য ১.৯৭%। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ৪২৫, মন্দির ৪৬, গির্জা ৮, তীর্থস্থান ১। উল্লেখযোগ্য: দ্বাদশ শিব মন্দির, খঞ্জনপুর চার্চ মিশন (১৮৯৮)।

শিক্ষার হার গড় হার ৩৩.১%; পুরুষ ৪০.২%, মহিলা ২৫.২%। মহাবিদ্যালয় (সরকারি) ২, মহাবিদ্যালয় (বেসরকারি) ৫, আইন মহাবিদ্যালয় ১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সরকারি) ২, মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বেসরকারি) ২৪, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, মাদ্রাসা ৪৫, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮০, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯। উল্লেখযোগ্য : রামদেও বাজলা উচ্চবিদ্যালয় (১৯৪৬), খঞ্জনপুর উচ্চবিদ্যালয় (১৯১৭), খঞ্জনপুর মিশন উচ্চবিদ্যালয় (১৯১৬)।

দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী অবলুপ্ত পত্র-পত্রিকা : সাপ্তাহিক অভিযান, সাপ্তাহিক জয়পুহাট বার্তা, সাপ্তাহিক বঙ্গধরনী, দৈনিক নবান্ন।

---

১৭. **সিমেন্ট :** দীর্ঘকাল ধরেই নির্মাণ কাজে ইটপাথর বা অন্যান্য বস্তু দিয়ে গাঁথার কাজে সিমেন্ট সংযোজক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রচলিত সিমেন্টের মধ্যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বহুল ব্যবহৃত, যা চুন ও কাদার মিশ্রণ পুড়িয়ে পাউডারের মতো চূর্ণ করে তৈরি করা হয়। বালি ও পানির সাথে সিমেন্ট মিশিয়ে 'মর্টার' এবং ইট বা পাথরের টুকরা, সিমেন্ট, বালি ও পানি মিশিয়ে কংক্রিট তৈরি করা হয়। দেশে এখন বছরে প্রায় ৫ মিলিয়ন টন সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদন সর্বোপ্রায় ২ মিলিয়ন টন; অবশিষ্ট চাহিদার সিমেন্ট আমদানি করে যোগান দেওয়া হয়। দেশে মাথাপ্রতি সিমেন্ট ব্যবহার এখনও নগণ্য (৩৮ কিলোগ্রাম)। বিশেষত পার্শ্ববর্তী ভারত (৮৯ কিলোগ্রাম), ইন্দোনেশিয়া (১২৭ কিলোগ্রাম), মালয়েশিয়া (৫৮২ কিলোগ্রাম) এবং থাইল্যান্ডের (৬৪২ কিলোগ্রাম) তুলনায় এ পরিমাণ খুবই কম। (মুশফিকুর রহমান, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮)।

১৮. মোঃ আজিজুল হক, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৪৮.৭১%, কৃষি শ্রমিক ২০%, অকৃষি শ্রমিক ১.৭৬%, শিল্প ১.০৫%, ব্যবসা ১১.৩৮% , পরিবহন ২.১৫%, নির্মাণ ১.০১%, চাকরি ৭.২১%, অন্যান্য ৬.৭৩%।

ভূমির ব্যবহার চাষযোগ্য জমি ২০৩৯০ হেক্টর, পতিত জমি ৩২২৩ হেক্টর। এক ফসলি ৫%, দো ফসলি ৫৭%, তিন ফসলি ৩৮%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৭১%।

ভূমি নিয়ন্ত্রণ ভূমিহীন ৫৫%, ক্ষুদ্র চাষি ২৯%, মধ্যম চাষি ১৪%, বড় চাষি ২%। মাথাপিছু আবাদি জমি ০.১২ হেক্টর। প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ৫০০০ থেকে ৭০০০ টাকা।

প্রধান প্রধান কৃষি ফসলাদি ধান, পাট, গম, আলু, আখ, পটল, শাকসবজি, সরিষা, বেগুন।

বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি বোনা আমন, নীল। প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল , নারিকেল, কলা, লিচু, পেঁপে, তাল। মৎস, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার-গবাদি পশু ১২ , হাঁস-মুরগি ৩৫ , মৎস্য ৩৫, হ্যাচারি ৩।

যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকা রাস্তা ৩৮ কিমি, আধাপাকা ৮.১ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৭৭৩ কিমি; রেলপথ ১৩.৫ কিমি।

হাটবাজার, মেলা হাটবাজার ২৩; উল্লেখযোগ্য: দুর্গাদহ, জয়পুরহাট, পুরান বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। শিল্প ও কলকারখানা চিনিকল ১, চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট তৈরি প্রকল্প ১, অটো রাইস মিল ৪, অটো ফ্লাওয়ার মিল ৩, কুটিরশিল্প[১৯] বাঁশের কাজ ২৫৭, স্বর্ণকার ৪০, কামার ২৮, কুমার ১০৫। পৈল, দরগাতলী, হেলকুণ্ডা, খঞ্জনপুর। মেলা ১ (তেঘড়িয়া মেলা)। স্বাস্থ্যকেন্দ্র জেলা হাসাপাতাল ১, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৬, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ১।"[২০]

---

১৯. **কুটির শিল্প** : কুটির শিল্প বলতে বোঝায় পরিবারভিত্তিক বা পরিবারের মালিকানাধীন ক্ষুদ্রাকার ও সামান্য মূলধনবিশিষ্ট শিল্প-কারখানা, যার উৎপাদনপ্রক্রিয়া প্রধানত স্থানীয় কাঁচামাল এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কারিগরি দক্ষতা ও সহজ দেশজ প্রযুক্তিনির্ভর। কুটির শিল্প গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই বিদ্যমান এবং এগুলিতে পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন কিছু মজুরিভিত্তিক শ্রমিকও নিযুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে স্থাপিত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা। এর অধীনস্থ কুটির শিল্পের ধরন হচ্ছে পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত একই পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প-কারখানাসমূহ। দেশজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং বিদ্যুৎ-চালিত নয় এমন কুটির শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক কুড়ি, আর এর যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ-চালিত হলে শ্রমিকের সংখ্যা অনধিক দশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও কর আরোপের প্রয়োজনে কুটির শিল্পের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে যে, এটি একটি শিল্প-কারখানা যা বিদ্যুৎ-চালিত যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করে না এবং যেখানে দেশজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সর্বাধিক পঞ্চাশ জন কাজ করে।

কুটির শিল্প দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ করে, বাংলাদেশের মতো প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাৎপদ ও স্বল্প আয়ের দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। তা দরিদ্র ও মধ্য শ্রেণীর মানুষদের জন্য আয় বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কুটির শিল্প মূলত গ্রামভিত্তিক; অবশ্য বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিবহন, বিপণন সুবিধাদি ও আর্থিক আনুকূল্য ব্যবহার করে তা শহরাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। কুটির শিল্পের পরিধি এখন দেশজ প্রযুক্তিভিত্তিক ঘরে তৈরি দ্রব্য থেকে বিবিধ বৈচিত্রপূর্ণ কারুশিল্প পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে। (বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৫)।

২০. শাহনাজ পারভীন, বাংলাপিডিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

শৈশবকাল

অত্যন্ত আদর, যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্য দিয়ে খান সাহেবের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তিনি ছিলেন বাড়ীর সকলের নিকট প্রিয়। বাটি ভর্তি দুধ এবং খাশী, মুরগীর কলিজি, মাছের মুড়ো তার খাওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকত। সবাই তাকে প্রশ্রয় দিত। তাঁর দাদা সুবেদ আলী খান সবচেয়ে বেশি আদর-যত্ন দিয়ে তাঁর শৈশবকালকে আনন্দঘন করে তুলেন। তার শৈশবকাল কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে খান সাহেব লিখেছেন "আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা। একেবারে শৈশবকাল। সারা বাড়ির বড়ো আদুরে সন্তান। দুধের সরসহ বাটি ভর্তি দুধ চাই। খেতে বসলে মাছের মুড়ো, খাশী, মুরগীর কলিজি নির্ঘাত থালায় থাকতে হবে। নইলে লংকাকাণ্ড। তার কারণ হলো সারা বাড়ির প্রাণঢালা আদর-যত্ন। আর অতিশয় প্রশ্রয়দান। এ আদর-যত্ন ও প্রশ্রয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দাদা মরহুম। আমি ছিলুম তাঁর বড় ছেলের একমাত্র পুত্র সন্তান। তখনো তাঁর অন্য ছেলেরা নিঃসন্তান"।[২১]

খান সাহেবের বয়স যখন আট-ন'বছর অর্থাৎ শৈশবকাল তখন এ দেশে বৃটিশ খেদাও আন্দোলন চলছিল। এর প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন বগুড়া জেলার জয়পুরহাটেও। বৃটিশ ১৯১৯ সালে তুরস্ক আক্রমণ করলে ভারতীয় মুসলমানগণ খেলাফত আন্দোলনে[২২] ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। গান্ধীজী এ সময় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২১ সাল পর্যন্ত

---

২১. আব্বাস আলী খান ,স্মৃতি সাগরের ঢেউ, বই-কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ১৭, ১৮

২২. খেলাফত আন্দোলন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উদ্ভূত একটি প্যান-ইসলামি আন্দোলন। ওসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯) প্যান-ইসলামি কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। নিজ দেশে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন নির্মূল করার লক্ষ্যে এবং বিদেশী শক্তির আক্রমণ থেকে তাঁর ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে বিশ্ব-মুসলিম সম্প্রদায়ের 'সুলতান-খলিফা' মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি এ আন্দোলনের সূচনা করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে তাঁর দূত জামালুদ্দীন আফগানি প্যান-ইসলামবাদ প্রচারের জন্য ভারত সফর করার পর এ মতবাদের প্রতি কিছু ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে অনুকূল সাড় জাগে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), তুরস্কের উপর ইতালীয় (১৯১১) ও বলকান আক্রমণ (১৯১১-১৯১২) এবং তুরস্কের বিপক্ষে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে (১৯১৪-১৮) গ্রেট ব্রিটেনের অংশগ্রহণের ফলে বিশ শতকের শুরুতে প্যান-ইসলামি আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় এবং সেভার্স চুক্তির (আগস্ট ১০, ১৯২০) অধীনে তুরস্কের ভূখন্ড ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ায় ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের ওপর খলিফার অভিভাবকত্ব নিয়ে ভারতে আশংকা দেখা দেয়। এ কারণে তুর্কি খিলাফত রক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপীয় শক্তিগুলির তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি গোঁড়া সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। আলী ভ্রাতৃদ্বয় মুহম্মদ আলী ও শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ, ড. এম. এ আনসারী ও হসরত মোহানীর নেতৃত্বে এ আন্দোলন সূচিত হয়। উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রাদেশিক শাখার বিধানসহ বোম্বাই শহরে একটি কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। শেঠ ছোটানী নামীয় এক ধনী ব্যবসায়ীকে এ কমিটির সভাপতি ও মওলানা শওকত আলীকে সম্পাদক করা হয়। ১৯২০ সালে আলী ভ্রাতৃদ্বয় খিলাফত ইশতেহার ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি তুরস্কে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়তা দান এবং দেশে খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য একটি তহবিল গঠন করে।

এ সময়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯১৯ সালের এপ্রিলে সংঘটিত জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড এবং ১৯১৯ সালের রাওলাট অ্যাক্টকে সরকারি নির্যাতনের প্রমাণরূপে চিহ্নিত করে এর প্রতিবাদে অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'সত্যাগ্রহ' শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য গান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সদস্য হন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নাগপুর সম্মেলনে (১৯২০) গান্ধী 'স্বরাজ' কর্মসূচিকে খিলাফত আন্দোলনের দাবির সঙ্গে যুক্ত করেন এবং উভয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য অসহযোগ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। (বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৭)।

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীজী ও কংগ্রেস এবং খেলাফত আন্দোলন একযোগে বৃটিশের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন করতে থাকে। একযোগে আন্দোলন করলেও গান্ধীজীর মনে অভিলাষ ছিল উপমহাদেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার। উপমহাদেশের এহেন সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানরা মূলত হিন্দুদের ক্রীড়নক ছিলো। এ প্রসঙ্গে খান সাহেব লিখেছেন : "বৃটিশ ১৯১৯ সালে তুরস্ক আক্রমণ করে এবং ভারতীয় মুসলমানগণ খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলী ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। গান্ধীজী এ সময় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২১ সাল পর্যন্ত গান্ধীজী ও কংগ্রেস এবং খেলাফত আন্দোলন একযোগে বৃটিশের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন করতে থাকে। তবে গান্ধীজী বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, খেলাফত আমাদের দুজনের নিকট কেন্দ্রীয় বিষয়- মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নিকট এটা তাঁর ধর্ম। আর আমার হচ্ছে, খেলাফতের জন্যে জীবনপাত করে আমি গো নিরাপত্তা নিঃসংশয় করছি অর্থাৎ আমার ধর্মকে মুসলমানের ছুরিকা থেকে রক্ষা করছি!' বুঝতেই পারছেন; আসলে মুসলমানদের সাথে মনের মিল ছিল না। ছিল লোক দেখানো আর মনে ছিল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিলাষ।

উনিশ-শ' বাইশ সালের কথা। তখন আমার বয়স আট-ন'বছর। বাব-চাচার সাথে কখনো কখনো শখ করে জয়পুরহাটে শনি-বুধবারের হাটে যেতুম। দেখতুম মুসলমান যুবকরা, 'রাম-রহিম না জুদা কর ভাই দিলকো সাচ্চা রাখোজি'-গান গাইত এবং বিলাতি কাপড়, বিলাতি লবণ বর্জন আন্দোলন করতো। স্কুল ছেড়ে বহু মুসলমান ছাত্র জেলের ঘানি টানতে গিয়ে তাদের লেখাপড়া চিরদিনের মতো চুলোয় গেল। হিন্দু ছাত্র-যুবক জেলখানায় বসে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলো। তবে 'রাম-রহিম না জুদা কর ভাই'- গানের দ্বারা হিন্দু-মুসলমানকে এক জাতি করার প্রেরণা দেয়া হলেও মিঃ গান্ধী হিন্দু ধর্মকে মুসলমানের ছুরিকা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। 'রাম- রহিম, এক হয়ে গেলে রহিম তলিয়ে যাবে এবং রামরাজ্য স্থাপিত হবে। তেল আর পানি এক করতে চাইলেই কি আর হয় কোনদিন? কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একযোগে যে খেলাফত আন্দোলন চলছিল, তাও ব্যর্থ হয়ে গেল।"[২৩]

২৩. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা : ২০০, ২০১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষা

আব্বাস আলী খান তাঁর শৈশবকাল বাড়ীর সকলের প্রাণঢালা আদর-যত্নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। বিশেষ করে দাদার পরম আদর-যত্ন তাঁর শৈশবকালকে বেশী আনন্দময় করে তুলেছিল। এর কারণ ছিল তিনি ছিলেন তাঁর দাদার বড় ছেলের একমাত্র পুত্র সন্তান। সে সময় তাঁর অন্য কোন নাতি জন্মগ্রহণ করেনি। খান সাহেবের বাড়ীতে এক মৌলভী[২৪] থাকতেন, একটু বড় হওয়ার সাথে সাথে মৌলভী সাহেবের নিকট প্রথম সবক গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "বাড়িতে এক মৌলভী সাহেব থাকতেন। একটু বড়ো হলে সেই মৌলভী সাহেবের কাছে আলিফ-বে'র সবক নিই।"[২৫] ছোটবেলা থেকে তিনি ধার্মিক ছিলেন এবং ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। শৈশবে কুরআনের[২৬] সবক নেয়ার পূর্বেই তিনি আযান[২৭] দেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণ করেন। মৌলভী সাহেবের নিকট তিনি আমপারা এবং কিছু বাংলা ও উর্দু শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯২১ ইং সাল তখন খান সাহেবের বয়স আট বছর। তাঁর দাদা তাঁকে গ্রামের দেড় মাইল উত্তরে হানাইল মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আরেফ উদ্দীন খান ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেন।

ছোটবেলা থেকে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় দাদা ও ছোট চাচার সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তৃতীয়

---

২৪. খান সাহেবের বাড়িতে যে মৌলভী সাহেব থাকতেন তাঁর বাড়ি ছিল জলপাইগুড়ি।

২৫. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ : পৃষ্ঠা ১৮, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

২৬. আল-কুরআন : (কুর'আন) ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। মহান আল্লাহ্-তা'আলার বাণীসমূহ এতে সংকলিত হয়েছে। নুবুওয়াত লাভের পর দীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর নিকট এ বাণীসমূহ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়। সম্পূর্ণ কুরআনে ৩০টি পারা, ১১৪টি সূরা, ৭টি মান্যিল, ১৬টি (শাফি মাযহাবে ১৫টি) সিজদা এবং ৬৬৬৬টি আয়াত রয়েছে (আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে)। সূরাগুলির কিছু মক্কায় এবং কিছু মদিনায় অবতীর্ণ হয়। কোন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় মক্কায়, কিন্তু তার কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয় মদিনায়। অনুরূপভাবে মদিনায় অবতীর্ণ কোন কোন সূরার কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয় মক্কায়। আবার মক্কা-মদিনার বাইরেও কোন কোন সূরার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলি মাক্কী এবং হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরাগুলি মাদানী নামে পরিচিত। মাক্কী সূরাসমূহে আল্লাহ্র অস্তিত্ব, একত্ব, কুরআনের সত্যতা, কিয়ামত, পুনরুত্থান, পাপ-পুণ্যের শাস্তি ও প্রতিদান, বেহেশত ও দোযখ, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। অপরদিকে মাদানী সূরাসমূহে ধর্মীয় বিধি-বিধান, শরী'আতের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও সমস্যাসমূহের সমাধান উল্লেখ করা হয়েছে। (বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮)।

২৭. আযান : আরবি শব্দ, এর অর্থ আহ্বান করা বা ঘোষণা করা। শুক্রবারের জুমু'আর নামায ও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যোগদানের জন্য আহ্বানসূচক কয়েকটি নির্দিষ্ট বাক্যসমষ্টির পারিভাষিক নাম 'আযান'। মুআয্যিন মসজিদের এক পাশে বা দরজায় কিংবা মিনারে দাঁড়িয়ে আযান দেন। ইসলামের আদিযুগে 'হায়্যা 'আলাস সালাত' (নামাযের জন্য আসুন) বলা হতো। হিজরতের দু-এক বছর পর মহানবী সা. নামাযের প্রতি আহ্বানের উপায় নিয়ে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কেউ কেউ নামাযের সময় আগুন প্রজ্জ্বলিত করার, কেউ কেউ ঘণ্টাধ্বনি করার, আবার কেউ কেউ শিঙ্গা ফোঁকার বা নাকু'স বাজাবার মত প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। পরে 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ রা. স্বপ্নে আযানের বর্তমানে প্রচলিত শব্দসমূহ লাভ করেন। একই রাতে হযরত 'উমর রা.-সহ আরো কয়েকজন সাহাবীও অনুরূপ স্বপ্ন দেখে মহানবী সা.-এর নিকট তা ব্যক্ত করেন। তাঁর হুকুমে তা-ই আযানের রূপ ধারণ করে। হযরত বিলাল রা. ঐ শব্দের মধ্য দিয়ে নামাযের আযান দিতে থাকেন, যা আজও মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত আছে। (বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬)।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীতে তিনি আরবী ও ফার্সী পড়া শুরু করেন। ইংরেজীর প্রাথমিক বই কিং প্রাইমার তিনি এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও এ সময় তিনি বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। চতুর্থ শ্রেণীতে তিনি শেখ সাদীর গুঁলিস্তা অধ্যয়ন করেন।

তাঁর সময়কার মাদরাসা শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, " সেকালে ওল্ডস্কীম[২৮] মাদরাসার সিলেবাস আলবৎ কঠিন ছিল। কিন্তু মুসলমানদের আরবী, ফার্সী, উর্দু পড়তেই হত মুসলমানী বজায় রাখার জন্য। আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, ভূগোল পড়ারও দরকার ছিল। মেধাবী ছাত্রের জন্য এমন কঠিন কিছুই ছিল না, কিন্তু ব্যাপার হলো এ যে বাপের ভাল ছেলেকে সাধারণত পাঠানো হতো স্কুলে। আর হাবা ক্যাবলা কান্তাকে মাদরাসায়। ফলে তারা প্রায়ই হতো সব বিষয়ে আধা খেচড়া যাকে ইংরেজীতে বলে Jack of all trades. Master of none."[২৯]

---

২৮. ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা আলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ারেন হেস্টিং মাওলানা মাজুদ্দীন নামক এক আলেমকে মাদরাসার সিলেবাস বা নেসাব তৈরীর জন্য নির্দেশ দেন এবং তিনি এমন নেসাব তৈরীর জন্য দায়িত্ব দেন যাতে ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতির কিছুই না থাকে। শুধু তাফসীর ও হাদীস সংক্রান্ত বিষয়াদি থাকবে। সেমতে কল-কাতাতে যে আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে সব জ্ঞান আহরণে সামর্থ্য মাওলানা ও মৌলভীগণের পক্ষে ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ছিল না, মুসলিম সমাজের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ বণিকদের যেসব আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হবে, তার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করা সম্ভব হবে না, এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। মোল্লা মাজুদ্দীন প্রণীত কলিকাতা আলীয়া শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ-

(১) ছরফ : মিজান মুনশাব, ছরফেমীর, পাঞ্জেগাঞ্জ, বুবদা, ফসলে আকবরী ও কাফিয়া।
(২) নাহু : নাহুমীর, শরহে মিয়াতে 'আমেল, হেদায়াতুন নাহু, কাফিয়া ও শরহে জা'মি।
(৩) মানতিক : ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তাহজীব, শরহে তাহজীব, কিবতী মা'মীর ও ছুলুমুল উলুম।
(৪) হেকমত (বিজ্ঞান) মায়জুরব, ছোগরা, শামছে বাজেগা।
(৫) অংক : খোলাসাতুল হেছাব, তাহরিকে আকলিদাস (মালাকায়ে উলা) তা'শরিহুল আখলাক, রেছালায়ে কুশজিয়া, শরহে চগমুনী।
(৬) বালাগাত : ভাষা (শরী) মুখতাছারুল মা'আনী, (মোতায়ায়াল)।
(৭) ফিক্‌হ : শরহে বেকায়া, হেদায়া (আখেরাইন) ও আউয়ালাইন।
(৮) উছুলে ফিকহ : নূরুল আনোয়ার, তাওজিহ, তালবিহ, মুছল্লমুদ ছবুত।
(৯) কালাম : শরহে আকায়েদ নছফী, শরহে আকায়েদ জালালী, মীর জাহেদ ও শরহে মাওয়াকেফ।
(১০) তাফসীর : জালালাইন ও বায়জাবী।
(১১) হাদীস : মেশকাত।

উপরে উল্লিখিত সিলেবাসকে ওল্ডস্কীম বলা হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রভাষা যখন ফার্সী ছিল তখন এই ওল্ডস্কীম মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের প্রশাসনের জন্য ছাত্রদের গড়ে তোলা হতো। কিন্তু যখন ইংরেজী ফার্সীরি স্থলাভিষিক্ত হলো তখন মাদরাসা শিক্ষ নিরাশায় ভরে উঠল, ফলে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে পড়ে। যদিও তা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি মৌলিক শিক্ষা এ শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতির আশাবাদে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এটা ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ফসল। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিধানের আলোকে শিক্ষাধারাবে মনেপ্রাণে ভালোবাসত এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিল, যার দ্বারা তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে। কিন্তু এই পদ্ধতির ওপর তাদের সাধারণ অসন্তোষ ছিল এজন্য যে, কুরআন, হাদীস, তাফসীর প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং ঐতিহ্য মাদরাসার কারিকুলামে সঠিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়নি। এই শিক্ষা ব্যবস্থার বড় অসুবিধা হলো, তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় মানের লেখাপড়ার কোন সম্পর্ক ছিল না। বাস্তবে তা ছিল একটি অন্ধ আবেগের আবর্তে নিমজ্জিত। যদি বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ততা থাকতো, তাহলে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা নিজের এবং সমাজের আরও বেশি উপকারে আসতে পারতো। এ পদ্ধতি ১৯০৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

২৯. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ : পৃষ্ঠা ২২, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক শিক্ষা

'আব্বাস আলী খান অত্যন্ত মনোনিবেশের সাথে পড়ালেখা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যান। তিনি কৃতিত্বের সাথে ৫ম শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁর এক দূরসম্পর্কীয় মামার তত্ত্বাবধানে তাঁকে হুগলী ম্যাদরাসায় পাঠানো হয়। হুগলী মাদরাসা সবেমাত্র ওল্ডস্কীম থেকে নিউস্কীম[৩০] হয়েছে। তার বাড়ী থেকে হুগলী মাদরাসা ছিল দু'শ মাইল দূরে অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে খান সাহেব বলেন, "মা-বাপের স্নেহ-ভালোবাসা ও শাসনের বাইরে বহু দূর দু'শ মাইল দূরে পাঠানো হলো ইলিম হাসিলের জন্য। তবে দু'বছর আগে দাদা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলেন।" [৩১]

খান সাহেব ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে জুনিয়র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট করেন। যদিও পরীক্ষা চলাকালীন তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন এবং সিক বেড়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ইংরেজিতে তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে এক বছর স্থায়ী গভর্নমেন্ট স্কলারশীপ এবং চার বছর স্থায়ী মুহসীন স্টাইপেন্ড পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা : রাজশাহী সরকারী কলেজ

ত্রিশের দশকে মাদরাসাগুলো পরিচালিত হতো বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন ঢাকা-এর অধীনে। হুগলী ওল্ড স্ক্রীম মাদ্রাসা হতে সেকেন্ডারী পাসের পর জনাব খান রাজশাহী সরকারী কলেজে ভর্তি হন। রাজশাহী সরকারী কলেজ[৩২] ছিলো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এক দেশ থেকে আর একদেশে যেতে যেমন পাসপোর্ট ভিসার দরকার হয়, তেমনি একটি বোর্ড থেকে আর একটি বোর্ড বা

---

৩০. ১৯০৪ সালে শামছুল ওলামা মাওলানা আবু নদর ওহীদকে (১৮৭২-১৯৫৩) নব গঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম সরকারের গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার কর্তৃক ঢাকা মাদরাসায় সুপার নিযুক্ত করা হয়। তিনি মাদরাসা শিক্ষিতদের দুর্দশা লাঘবের জন্য নিউস্কীম নামক একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এবং তৎকালীন সরকারের কাছে পেশ করেন। সে নিউস্কীম-মাদরাসায় আরবী, ফার্সী, উর্দু, কুরআন, হাদীসের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃক আনিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিত মাওলানা- মৌলভিদের পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা লাভ সম্ভব ছিল। তাদের পক্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ সম্ভব ছিল এবং সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয়া সহজ ছিল। ১৯১৪ সালের ৩রা জুলাই (৪৫০ নং পত্রে) সরকার এ নিউস্কীম শিক্ষাধারা অনুমোদন করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারাই অবিভক্ত বাংলায় প্রবর্তিত ছিল। আবু নসর ওহীদের নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আরবী ভাষা ও ব্যাকরণকে প্রায় ঠিক রেখে ম্যাট্রিকের ইংরেজী, বাংলা, অংক, ইতিহাস ও ভূগোল যোগ করে নতুন সিলেবাস প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিকে নিউস্কীম বলা হয়েছে।

৩১. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ : পৃষ্ঠা ২২, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

৩২. রাজশাহী কলেজ ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দুবলহাটির রাজা হরলাল রায় বাহাদুরের আর্থিক সহযোগিতায়। ১৮৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জমি প্রদান করেন। এই জমি থেকে বার্ষিক পাঁচ হাজার রুপি আয় হতো। প্রতিষ্ঠার পরপরই এটি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, বিহার, পূর্ণিয়া এবং আসাম অঞ্চলের অধিবাসীদের উচ্চশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজশাহী জেলা স্কুলে (পরবর্তী সময়ে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল) একজন মুসলমান ছাত্রসহ মোট ছয়জন ছাত্র নিয়ে রাজশাহী কলেজের এফ. এ ক্লাস শুরু হয় ১৮৭৩ সালের ১ এপ্রিল। শুরুর দিকে এই কলেজে কেবল ছাত্ররাই ভর্তি হতে পারত এবং ১৯৩০ সালে কলেজে ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। ১৯৩১ সালে কলেজটিতে ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। ১৯৭০ সালে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৮৪০ তন্মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল কেবল ৩০০। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পর কলেজের পরিসর ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯০ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪,৭৩২, যাদের মধ্যে ছাত্রী ১,৩৫২। ২০০০ সালে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮,০০০।
কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন রাজশাহী জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরগোবিন্দ সেন এবং তিনি পাঁচ বছর (১৮৭৩-১৮৭৮) অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। (বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪)।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পাসপোর্ট-ভিসা তথা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন। তাই, রাজশাহী সরকারী কলেজে ভর্তির জন্য উক্ত ঢাকা বোর্ড থেকে মাইগ্রেশন ছিল অপরিহার্য। খান সাহেবের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ছিলো না। ফলে কলেজে কেরানী বাবু ভর্তি করাতে নারাজ। কিন্তু তৎকালীন ইংরেজ প্রিন্সিপাল টি. টি. উইলিয়ামস বল্লেন, 'ঠিক আছে ভর্তি হয়ে যাও, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পরে আনিয়ে নিলেই চলবে'। ভর্তি হয়ে খান সাহেব থাকতেন ফুলার হোস্টেলে। নতুন কলেজ জীবনের এক অভূতপূর্ব আনন্দ, নতুন অজানা-অচেনা লোকের সাথে মিতালী, তাদের সাথে গল্পেস্বল্পে হাসি ঠাট্টা ও ফুর্তিফার্তিতে কাটছিলো তার কলেজ জীবনের দিনগুলো। এরই মধ্যে সারা ভারতে চলছিলো ভয়ানক রাজনৈতিক উত্তাপ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সারা ভারতবর্ষের বড়ো শহরগুলোর কলেজে মাঝে মাঝে হৈ চৈ, সভা-সমাবেশ, ক্লাস বর্জন প্রভৃতি চলছিলো। তারই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী কলেজে ক্লাস বর্জন ঘোষণা করা হলো । এ প্রসঙ্গে খান সাহেব লিখেছেন :

"সারা দেশে অর্থাৎ সারা ভারতে তখন ভয়ানক রাজনৈতিক উত্তাপ । স্বাধীনতা আন্দোলন বলতে গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি তাই বড়ো শহরগুলোর কলেজে মাঝে মাঝে হৈ চৈ, সভা-সমাবেশ, ক্লাশ বর্জন প্রভৃতি চলছে। একদিন রাজশাহী কলেজে ক্লাস বর্জন ঘোষণা করা হলে তার এক পর্যায়ে ছাত্র নেতারা ক্লাসরুমের দরজায় দরজায় শুয়ে পড়লেন, যাতে ছাত্রবিহীন ক্লাসে শিক্ষকগণ ঢুকতে না পারেন। চাকুরী রক্ষার খাতিরে দর্শন শাস্ত্রের ইয়া ভুঁড়িওয়ালা অধ্যাপক কৌশিক ভট্টাচার্য শায়িত ছাত্রের ওপর দিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। আমরা সব তামাশা দেখছি। তাই নিয়ে শুরু হলো সারা কলেজে হৈ হল্লা, সমাবেশ, গরম গরম ইংরেজী বক্তৃতা। আজকালের মতন তখন লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, ফাঁকাগুলি কিছুই ছিলো না। তবে একটা অশান্ত পরিবেশ, থমথমে ভাব। কলেজ আর হলো না। রাজশাহী কলেজের গা ঘেঁষে প্রবাহিত পদ্মানদীর উত্তাল তরঙ্গের সাথে রাজনৈতিক তরঙ্গও ছিল রাজশাহী কলেজের উপর"[৩৩]।

রংপুর কারমাইকেল কলেজ

রাজশাহী সরকারী কলেজের অবিরাম ক্লাস বর্জন এবং ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে খান সাহেব বছরের শেষের দিকে টিসি নিয়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজে[৩৪] ভর্তি হলেন। কারণ, আন্দোলনের সামান্য ছোঁয়াও তখন এ কলেজে স্পর্শ করেনি। রংপুর কারমাইকেল কলেজ ছিল একেবারে শান্ত মা-বাপের অতি শান্তশিষ্ট ছেলের মত। ১৯৩২ সালে তাঁর আই এ পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিলো। কিন্তু রংপুরের আবহাওয়া তাঁর শরীরের জন্য খাপ না খাওয়ায় এবং দু'মাস ম্যালেরিয়ার সাথে লড়াই করায় ক্লাসে হাজিরা এতো কম হয় যে, তিনি

---

৩৩. প্রাগুক্ত পৃ: ১৬৭

৩৪. **কারমাইকেল কলেজ, রংপুর :** বাংলার বড় লাট লর্ড কারমাইকেল-এর নামানুসারে ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুরের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় জমিদার এর প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ৩২১ একরেরও বেশি জমির ওপর কলেজ ভবনটির প্রাথমিক নির্মাণ কাজের জন্য তারা সাড়ে সাত লাখ টাকা সংগ্রহ করেন। ড. ওয়াটকিন্স নামীয় এক জার্মান নাগরিক এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। ৬১০ ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট প্রশস্ত কলেজ ভবনটি বাংলার জমিদারি স্থাপত্যকলার এক অনুপম নিদর্শন, যা বাংলার আভিজাত্যের সাথে মুগল স্থাপত্যকলার এক আবেগঘন সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধিভুক্ত হয়ে ১৯১৭ সালে আই. এ ও বি. এ শ্রেণী এবং ১৯২২ ও ১৯২৫ সালে আই. এসসি ও বি. এসসি খোলার অনুমতি লাভ করে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলেজে ১৩টি বিষয় পড়ানো হতো। ভারত বিভক্তির পর ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত ছিল। ১ জুলাই ১৯৬৩ সালে কলেজটি পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে থাকে। অতঃপর কলেজটি নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর আওতাভুক্ত হয়। বর্তমানে এটি একটি স্নাতকোত্তর কলেজ। এখানে মানবিক, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদসমূহে ১৪টি বিষয় পড়ানো হয়।
[(মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪)।

]

Dhaka University Institutional Repository

একবারে ডিসকলেজিয়েট হয়ে যান। পরের সেশনে আবার নতুন করে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হন। বছরের শেষ মাথায় আই. এ. পরীক্ষার জন্য টেস্টে বেশ ভাল রেজাল্ট করেন। টেস্ট পরীক্ষার পর মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট না আনার কারণে ফরম ফিলাপে কিছুটা সমস্যা হয়। পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল ডি.এন. মল্লিকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে আই. এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং ভাল ফলাফলের জন্য মুহসীন[৩৫] স্টাইপেন্ড লাভ করেন।

উচ্চ শিক্ষা

১৯৩৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের[৩৬] অধীনে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি. এ. পাস করেন। বি. এ. পাস করার পর পড়াশুনার খরচের অভাবে তিনি চাকুরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন।

---

৩৫. মুহাম্মদ মোহসীন হাজী (১৭৩২-১৮১২) একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম, চিরকুমার ও মহান জনহিতৈষী ব্যক্তি। ১৭৬৯-৭০ সালের সরকারি দলিল থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ের মহাদুর্ভিক্ষে তিনি বহু লঙ্গরখানা স্থাপন করেছিলেন এবং সরকারি সাহায্য তহবিলে অর্থ প্রদান করেছিলেন। ১৭৩২ সালে হুগলিতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা হাজী ফয়জুল্লাহ এবং মাতা জয়নাব খানম। এটি ছিল জয়নাবের দ্বিতীয় বিবাহ। তাঁর প্রথম স্বামী আগা মোতাহার ছিলেন একজন ইরানি ব্যবসায়ী। তিনি হুগলিতে বসতি স্থাপন করেন এবং হুগলি, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় বিস্তীর্ণ জায়গির লাভ করেন। তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তি তাঁর একমাত্র কন্যা (মন্নুজান খানম) এর নামে উইল করে যান। ফয়জুল্লাহর পিতাও ছিলেন একজন ইরানি এবং জায়গিরদার। মোহসীনের জন্ম এক ধনী পরিবারে এবং ফয়জুল্লাহ তাঁর পুত্রকে সেই আমলের সম্ভাব্য শিক্ষায় যথেষ্ট শিক্ষিত করে তোলেন। একজন গৃহশিক্ষক মোহসীন ও তাঁর সৎ বোন মন্নুজানকে শিক্ষা প্রদান করতেন। মনোযোগী ছাত্র হিসেবে মোহসীন কুরআন, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে বাংলা সুবাহর তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ গমন করেন। ভ্রমণ মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে এই বিশ্বাসে তিনি খুব শীঘ্রই বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি ইরান, ইরাক, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি মক্কা, মদীনা, কুফা, কারবালা প্রভৃতি তীর্থস্থানে যান। ইতোমধ্যে তাঁর পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর একমাত্র বোন মন্নুজান হুগলির নায়েব- ফৌজদার ও একজন দায়িত্ববান পুরুষ মির্জা সালাহউদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে যাওয়া নিঃসন্তান মন্নুজান তাঁর সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য মোহসীনকে ব্যাকুলভাবে দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান। বোনের সনির্বন্ধ অনুরোধে মোহসীন দীর্ঘ ২৭ বছর পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮০৩ সালে মন্নুজানের মৃত্যুর পর মোহসীন তাঁর বিশাল সম্পত্তি লাভ করেন। জমকালোভাবে ধর্মীয় আচারাদি ও উৎসব পালনে তিনি তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। কঠোর তপস্বী মোহসীন ১৮০৬ সালে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন এবং দুজন মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর সম্পত্তিকে নয়টি শেয়ারে ভাগ করেন। তিনটি শেয়ার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য; পেনশন, বৃত্তি এবং দাতব্য কাজে ব্যয়ের নিমিত্ত চারটি শেয়ার এবং দুটি শেয়ার রাখা হয় মুতাওয়াল্লিদের বেতন হিসেবে। মোহসীন খুব সাধারণ ও ধর্মীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলার এ মহান ব্যক্তি ১৮১২ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হুগলির ইমামবাড়ায় তাঁর সমাধির ওপর সৌধ স্থাপন করা হয়। মুতাওয়াল্লিদ্বয় তহবিল তসরুফ করায় ১৮১৮ সালে সরকার মোহসীন ফান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্জিত সম্পত্তির বর্ধিত অংশ বিভিন্ন দালান-কোঠা নির্মাণ কাজে ব্যয় করা হয়। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে নির্মিত এই সকল দালান- কোঠার মধ্যে ছিল আবাসস্থল, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, সমাধিসৌধ ও ইমামবারার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বাজার। [মোহম্মদ আনসার আলী বাংলাপিডিয়া ৮ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, ২০০৪]

৩৬. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলর মধ্যে প্রাচীনতম। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এর (১৮৫৬-১৮৬২) শাসনামলে ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৮৫৭ সালের ২ নং আইন) বলে এটি প্রতিষ্ঠিত তার মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, মহারানীর সকল শ্রেণীর ও ধর্মসম্পদায়ের প্রজাদের নিয়মিত ও উদার শিক্ষাক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং একই সংগে সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষার মাধ্যমে সকল ব্যক্তির দক্ষতা নিরূপণ করাই হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য। এ সকল লোককে তাদের সাফল্যের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তি এবং ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে একজন ভাইস চ্যান্সেলরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ভাইস চ্যান্সেলরের পদটি ছিল অবৈতনিক। তিনি সিনেট ও সিন্ডিকেটের সম্মতি ও সুপারিশক্রমে মনোনীত হতেন এবং এদের সম্মতি ও পরামর্শ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। স্যার জেমস উইলিয়ম কোলভিল (২৪ জানুয়ারি ১৮৫৭ থেকে ২৪ জানুয়ারি ১৮৫৯) থেকে শুরু করে প্রথম দিকের সকল উপাচার্যই ছিলেন ইউরোপীয়। এ পদে মনোনীত প্রথম ভারতীয় ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী। তিনি ১৮৯০ সালের ১ জানুয়ারি এ পদে মনোনীত হন এবং ১৮৯২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিন পর বি. আর. এর অ্যাকাউন্টস অফিসে একটা চাকুরী লাভ করেন। ক'মাস পরে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হলেন বি. টি. পড়ার জন্য। তৎকালীন সময়ে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মুসলিম মেয়র। এ সময় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের কিছু সমস্যার ব্যাপারে মুসলমানদের মুরব্বি হিসাবে তাকে অবহিত করা হয়। বি. টি. পড়াকালীন একটা বিষয় তার মনের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও ভাবধারা সৃষ্টি করে, তা হল মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বক্তৃতা কলেজের পাশে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওপর একটি মসজিদে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ শুক্রবারে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জ্বালাময়ী খুতবা দিতেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল সুস্পষ্ট জোরালো, হৃদয়গ্রাহী, হৃদয়ে প্রাণশক্তি জাগিয়ে দিত। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল ছিল না বলে তাঁর পড়াশোনায় মন বিশেষ লাগছিল না। সব সময় মন উড়ো উড়ো থাকত। তাই পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি চাকুরী অনুসন্ধান করতে থাকেন।

১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে বিটি পড়া অবস্থায় বনবিভাগের হেড অফিসে একটি চাকুরী পেয়ে যান। অনেক চিন্তাভাবনা করে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি চাকুরীতে ঢুকে পড়লেন। চাকুরীর কারণে তিনি আর বিটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেন না এবং ডিগ্রীও অর্জন করা হল না। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "ছত্রিশ-এর মাথায় হঠাৎ শিকে ছিঁড়লো। বন বিভাগের হেড অফিসে একটা চাকুরী জুটেই গেল। ক'মাস পর বিটি পরীক্ষা। পরীক্ষা দিলে ডিগ্রী একটা মিলবেই। কিন্তু ইয়ার বন্ধুর বল্লো, 'চাকুরীতে ঢুকে পড়। হাতের পাঁচ কি ছেড়ে দিতে আছে? ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষাটরীক্ষা দিয়ে ওপরে উঠতে পারবে।' অনেক সাতপাঁচ ভেবে চাকুরীতে ঢুকে পড়লুম।"[৩৭] এভাবে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকমন্ডলী

গৃহশিক্ষক

আব্বাস আলী খান সাহেবের দাদার বাড়ীতে এক মৌলভী সাহেব থাকতেন। সে মৌলভী সাহেবের কাছে তিনি আলিফ বে'র সবক নেন। তাঁর কাছে আমপারা আর কিছু বাংলা, উর্দু শিখেছিলেন; এ মৌলভী সাহেবের বাড়ি ছিল জলপাইগুড়ি।

মাওলানা আরেফ উদ্দীন খান

তিনি খান সাহেবের গ্রামের দেড় মাইল উত্তরে হানাইল মাদরাসার শিক্ষক। তিনি খান সাহেবের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন।

অধ্যক্ষ ডা. পি. ডি. শাস্ত্রী

তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, খান সাহেব এ কলেজে বি. টি পড়েছিলেন।

---

৩৭. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ; পৃষ্ঠা : ৩৬ প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাবু গংগাচরণ দাস গুপ্ত,

তিনি ছিলেন ডেভিড় হেয়ার[৩৮] ট্রেনিং কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ। পি. ডি. শাস্ত্রী যখন বিলেতে তখন তিনি কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। খান সাহেব বিটি পড়ার কারণে তাঁর ছাত্র হওয়ার সুযোগ হয়। গংগাচারণ বাবু পড়াতেন "মাইন্ড এন্ড বডি" মনস্তত্ত্বের বই।

টি. টি উইলিয়ামস

তিনি ছিলেন রাজশাহী কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ। খান সাহেব আইএ পড়ার জন্য রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন। এভাবে তিনি তাঁর ছাত্র হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

অধ্যাপক আবু হেনা

তিনি ছিলেন রাজশাহী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। আবু হেনা সাহেব রাজশাহী কলেজে যোগদান করার পর তৎকালীন ফুলার হোস্টেলের সামনে কলেজের খেলার মাঠে শামিয়ানা খাটিয়ে খান সাহেব এবং তার বন্ধুরা মিলে নবীর জন্ম দিবস পালন করেন। তিনি সে অনুষ্ঠানে ইংরেজীতে ঘণ্টা দেড়েক বক্তৃতা করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজী ভাষায় দক্ষ। এবং এর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন মুসলমানরা কারো পেছনে নয়। এ অনুষ্ঠানে ছাত্ররা খুশীতে "আল্লাহু আকবার" ও "ইয়া নবী সালামু আলাইকা" ধ্বনিত করার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন।

অধ্যাপক কৌশিক ভট্টাচার্য

তিনি ছিলেন রাজশাহী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। আব্বাস আলী খান এ কলেজে পড়ালেখার সময়ে তাঁর ছাত্র হওয়ার সুযোগ পান। তখন ভারতবর্ষের জ্ঞান রাজনীতির কারণে ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে এবং ক্লাসের দরজায় শুয়ে পড়ে। কৌশিক সাহেব চাকুরী রক্ষার খাতিরে শায়িত ছাত্রদের ওপর দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করেন। এনিয়ে কলেজে হৈ হল্লা শুরু হল। আন্দোলন শুরু হয়। এভাবে রাজশাহী কলেজে পড়ালেখার সুন্দর পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় খান সাহেব তখন এ কলেজে আর পড়ালেখা না করে রংপুর কারমাইকেলে চলে যান। টি. সি নিয়ে সেখানে ভর্তি হন।

অধ্যাপক বাবু হরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ

'আব্বাস আলী খান রংপুর কারমাইকেলে পড়ালেখা করার সুবাদে বাবু হরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ সাহেবের ছাত্র হওয়ার সুযোগ লাভ করেন, অধ্যাপক হরেণ চন্দ্র ছিলেন অভিজ্ঞ নামকরা অধ্যাপক। দেশজুড়ে তাঁর নাম ও সুখ্যাতি। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ও নীতিবান ব্রাহ্মণ। একবার খান সাহেব কলেজের মাসিক ম্যাগাজিনে প্রকাশ করার জন্য আকবর ও আওরঙ্গজেবের[৩৯] ওপর ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। হরেণ চন্দ্র বাবু এ প্রবন্ধ দেখে বলেছিলেন "This is real history"। এবং এটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল।

---

৩৮. হেয়ার, ডেভিড (১৭৭৫-১৮৪২) স্কটল্যান্ডের একজন ঘড়ি নির্মাতা। স্বীয় ব্যবসার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উপনিবেশের শাসনে নিষ্পেষিত বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করেন নব্য ঔপনিবেশিক সরকার ইউরোপের শিল্পী ও কারিগরদের বাংলায় এসে চিত্রশিল্প, জুতা তৈরি, পোশাক সেলাই, চুল-ছাঁটা ও কেশবিন্যাস এবং অনুরূপ পেশার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেয়। ডেভিড হেয়ার স্কটল্যান্ডের একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যারা পেশায় ছিল ঘড়ি তৈরির কারিগর। ১৮০০ সালে তিনি কলকাতা আসেন এবং ঘড়ি তৈরি ও মেরামত করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। দেশে ফিরে গিয়ে উপার্জিত অর্থে বাকি জীবন তিনি আরামেই কাটাতে পারতেন। কিন্তু হেয়ার তা না করে তাঁর সমসাময়িক মানবতাবাদীদের মতো বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং দুস্থ মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন।

৩৯. আওরঙ্গযেব : আবুল মুজফ্ফার মুহাম্মদ মুহয়িদ দীন আওরগযীব 'আলমগীর বাদশাহ গাযী (১০২৭-১১১৮/১৬১৮-১৭০৭) ষষ্ঠ মুগল সম্রাট এবং ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত নরপতি, দক্ষ রাষ্ট্রনীতিবিদ, রণনিপুন সৈনিক, সুশাসক, সুপণ্ডিত

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ডি, এন, মল্লিক

ডঃ ডি, এন, মল্লিক ছিলেন রংপুর কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ। তিনি একজন সুযোগ্য প্রশাসক। তিনি বিলেতে লেখাপড়া করেছেন। অংক শাস্ত্রে ডক্টরেট করেছেন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার 'WRANGLER'। অংকে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস। অত্যন্ত ভদ্রলোক ও উদারচেতা। রংপুর কারমাইকেল কলেজে পড়ালেখার সুযোগে খান সাহেব তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

অধ্যাপক বাবু জিতেন্দ্র মোহন দে

অধ্যাপক বাবুজিতেন্দ্র মোহন দে ছিলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইতিহাসের খ্যাতনামা অধ্যাপক। তিনি খান সাহেবকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এ কলেজে পড়ার সুবাদে খান সাহেব তাঁর ছাত্র হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। জিতেন বাবু তাঁর পেপারে খান সাহেবকে সর্বোচ্চ নম্বর দিতেন।

অধ্যাপক বাবু অমূল্যধন মুখার্জি এম. এ. পি. আর. এস

তিনি ছিলেন (প্রেমাচাঁদ রায় চাঁদ স্কলার) রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। তিনি ছিলেন একলেজের ম্যাগাজিনের সম্পাদক। লিটারারী সোসাইটি নামে কলেজে একটি সংস্থা ছিল। তিনি ছিলেন এ সোসাইটির চেয়ারম্যান। খান সাহেব ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। খান সাহেব ইংরেজীতে আকবর ও আওরঙ্গজেবের ওপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন অমূল্য বাবু এ প্রবন্ধটি অ্যার্পুভ করে যথারীতি ম্যাগাজিনে প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন।

ও উন্নত চরিত্রিক গুণের অধিকারী। তাঁর শাসনকালে মুগল সম্রাজ্য ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে বৃহত্তম মুসলিম সম্রাজ্যে পরিণত হয়। উত্তর হিমালয়ের পাদদেশ হতে দক্ষিণে সমুদ্রসীমা এবং পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম হতে পশ্চিমে কাবুল পর্যন্ত তাঁর সুবিশাল সম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারত উপমহাদেশের আর কোন নরপতি কোন যুগেই এত বড় সম্রাজ্য শাসনের গৌরব অর্জন করতে পারেননি তৎকালীন ইউরোপের বিখ্যাত নরপতি ফ্রান্সের চর্তুদশ লুই (Louis xiv,১৬৪৩-১৭১৫ খৃ.) ও রাশিয়ার মহামতি পিটার (১৬৮২-১৭২৭ খৃ.) তাঁর সমসাময়িক কিন্তু উন্নত আদর্শ, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতিতে তিনি তাঁর সমকালীন সকল নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শুধু শাসক হিসাবেই নয় ইসলাম ধর্মের একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসেবেও তিনি অনন্যসাধরণ কৃতিত্বের অধিকারী। আকবর জাহাঙ্গীরের উদার ধর্মনীতির ফলে উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল তা রোধ করার জন্য তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আওরঙ্গযেব পঞ্চম মুগল সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী মুমতাজ মহল-এর তৃতীয় পুত্র। ১৬১৮ খৃ., ৩ নভেম্বর মালওয়ার যুদ-এ তাঁর জন্ম, ১৬৫৮ খৃ., ২১শে জুলাই তাঁর সিংহাসন লাভ এবং ১৭০৭ খৃ. ২ এপ্রিল দাক্ষিনাত্যের আহমাদনগরে তাঁর মৃত্য হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কর্মজীবন

সরকারী চাকুরিঃ (১৯৩৫-১৯৪৭)

চাকুরির সন্ধানে

১৯৩৫ সালে বি. এ পাস করে খান সাহেব পড়ালেখা করার উদ্দেশ্যে কলকাতা গমন করেন। কিন্তু অভিভাবকগণ পড়ালেখার খরচ চালাতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন। তাই অভিভাবকদের পরামর্শে চাকুরীর চেষ্টা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে খান সাহেব বলেন, গার্জিয়ান বলেন, "পড়াশোনার খরচপত্তর জোগানো আর যাবে না ধানের মন বারো আনা চাল দেড় টাকা। এবার ফসলও পাইনি। চাকুরীবাকুরীর চেষ্টা করে গে। যাই হোক অতএব চাকুরীর জন্যে ঘুরাফেরা শুরু করলুম। তার জন্য অফিস থেকে অফিসান্তরে যাতায়াত"[৪০]।

ই. বি. আর. অফিসে চাকুরী

খান সাহেব যে সময় চাকুরীর সন্ধান করছিলেন তখন চাকুরীর বড়ই সংকট। এছাড়া সেকালে চাকুরীর যতটুকু সুযোগ ছিল তা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের করায়েত্তে। বহু চেষ্টা করে জে. সি-মুস্তাফী[৪১] নামে এক কর্মকর্তার মাধ্যমে ই. বি আর-এর একাউন্টস অফিসে একটি চাকুরী পেয়ে যান। কিন্তু ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন হয়নি। কিছু দিন পর নামাজ পড়ার ব্যাপার নিয়ে বড় বাবুর সাথে কথার কাটাকাটি হয়। এর পর থেকে সব সময় কথা কাটাকাটি লেগেই থাকত। অবশেষে কমাস পরে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন। এদিকে কলেজের পরিবেশ ভাল না হওয়ায় এবং ভবিশ্যতে এ পড়ালেখার মাধ্যমে চাকুরীবাকুরীর সুযোগ সুবিধা কম হওয়ায় পড়াশোনায় মন বসছিল না। তাই চাকুরীর খোঁজে আবার চেষ্টা শুরু করেন।

বনবিভাগের হেড অফিসে চাকুরী

১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে হঠাৎ বন বিভাগের হেড অফিসে একটি চাকুরী পেয়ে যান। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "ছত্রিশের মাথায় হঠাৎ শিকে ছিঁড়লো। বন বিভাগের হেড অফিসে একটা চাকুরী জুটেই গেল।"[৪২]

অনেক চিন্তাভাবনা করে বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে বি. টি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে তিনি চাকুরীতে ঢুকে পড়েন। এ প্রসঙ্গে খান সাহেব বলেন, "ক'মাস পর বি. টি পরীক্ষা, পরীক্ষা দিলে ডিগ্রী একটা মিলবেই। কিন্তু ইয়ার বন্ধুরা বল্লো, 'চাকুরীতে ঢুকে পড়। হাতের পাঁচ কি ছেড়ে দিতে আছে? ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষাটরীক্ষা দিয়ে উপরে উঠতে পারবে।'[৪৩]

ফরেস্ট অফিসে চাকুরীতে ঢুকে তিনি জানতে পারেন যে বন বিভাগের হেড অফিস কোলকাতা থেকে দার্জিলিঙে স্থানান্তর করার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।

অফিস স্থানান্তরের কথা শুনে তিনি চাকুরী ছেড়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। পুনরায় বন্ধুদের উৎসাহে দার্জিলিঙ দেখার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া না করে চাকুরী করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন ।

দার্জিলিঙে বেতন বেশি পাওয়া যাবে। জিনিসপত্তর খুব সস্তা। বাড়ি ভাড়াও নাম মাত্র । সবকিছু মিলে প্রকৃতির সুষমামণ্ডিত দার্জিলিঙে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করলেন।

---

৪০. 'আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ; পৃষ্ঠা : ২৪, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ: ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

৪১. মুস্তাফি সাহেব মুসলমান নন। খাঁটি মাদ্রাজী বামন; নাম যোগেশচন্দ্র মুস্তাফী।

৪২. 'আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ; পৃষ্ঠা : ৩৬, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

৪৩. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

খান সাহেব দার্জিলিঙে ছ'মাস চাকুরী করার পর আগস্ট মাসের দশ তারিখে চাকুরী ছেড়ে দার্জিলিঙ ত্যাগ করেন। তিনি মূলত চাকুরী করার উদ্দেশ্যে দার্জিলিঙ আসেননি। আর এখানে টিকে থাকাও বড়ো কঠিন। প্রকৃতির সুষমামণ্ডিত দার্জিলিঙে কিছুদিন ফুর্তিফার্তি করার জন্য তিনি এখানে ছ'মাস অতিবাহিত করেন।

মিলেটারী সার্ভে অব ইন্ডিয়া অফিসে চাকুরী

দার্জিলিঙ থেকে আসার পর তিনি মিলিটারী সার্ভে অব ইন্ডিয়া অফিসে এক বছর চাকুরী করেন।

বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী

মিলিটারী সার্ভে অব ইন্ডিয়া অফিসে এক বছর চাকুরী করার পর তিনি বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটে চাকুরী নেন। আব্বাস উদ্দীন[৪৪] ও খান সাহেব একসাথে চার বছর বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটের প্রচার বিভাগে কাজ করেন। ১৯৪২ ইং সালের ডিসেম্বর মাস, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলছে। তখন, বাংলার গভর্নর স্যার জন আর্থার হার্বাট।

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক[৪৫]। খান সাহেব তখন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। সরকারী চাকুরীর সুবাদে তিনি এ দায়িত্ব

---

৪৪. আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-১৯৫৯) কণ্ঠশিল্পী। ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা জাফর আলি আহমদ ছিলেন তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতের উকিল। বলরামপুর স্কুলে আব্বাসউদ্দীনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। তুফানগঞ্জ স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা (১৯১৯) এবং কুচবিহার কলেজ থেকে আই. এ (১৯২১) পাস করেন। এখান থেকেই বি. এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে একসময় গানের জগতে প্রবেশ করেন। আব্বাসউদ্দীনের মৌলিক পরিচয় একজন কণ্ঠশিল্পী হিসেবেই। তিনি আধুনিক গান, স্বদেশী গান, ইসলামি গান, পল্লীগীতি, উর্দুগান সবই গেয়েছেন, কিন্তু পল্লীগীতিতেই তাঁর মৌলিকতা ও সাফল্য সবচেয়ে বেশি। কোন
ওস্তাদের কাছে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালিম নিয়ে তিনি গান শেখেন নি। তিনি প্রথমে ছিলেন পল্লীগাঁয়ের একজন গায়ক। যাত্রা-থিয়েটর ও -স্কুল-কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান শুনে তিনি গানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজ চেষ্টায় গান গাওয়া রপ্ত করেন। তারপর কলকাতায় অল্প সময়ের জন্য তিনি ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিখেছিলেন। রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলের ভাওয়াইয়া-ক্ষীরোলচটকা গেয়ে আব্বাসউদ্দীন প্রথমে সুনাম অর্জন করেন। তারপর জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিচ্ছেদী, দেহতত্ত্ব, মর্সিয়া, পালাগান ইত্যাদি পল্লীগানের নানা শাখার গান গেয়ে ও রেকর্ড করে তিনি জনপ্রিয় হন। তাঁর দরদভরা সুরেলা কণ্ঠে পল্লীগানের সুর যেভাবে ফুটে উঠত, অন্য কোন গায়কের কণ্ঠে তেমনটি হতো না। এ ক্ষেত্রে তিনি আজও অদ্বিতীয়। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখের ইসলামি ভাবধারায় রচিতগানেও কণ্ঠ দিয়েছেন। আব্বাসউদ্দীনের গান প্রথম রেকর্ড করে ১৯৩০ সালে হিজ মাস্টার্স ভয়েস; পরে মেগাফোন, টুইন, রিগ্যাল প্রভৃতি কোম্পানিও তাঁর বহু গান রেকর্ড করে। গ্রাম-গঞ্জ-শহরের আসর-অনুষ্ঠান-জলসায় গান গেয়ে এবং গ্রামোফোনে গান রেকর্ড করে আব্বাসউদ্দীন বাংলার সঙ্গীতবিরোধী মুসলিম সমাজকে সঙ্গীতানুরাগী করে তোলেন। আব্বাসউদ্দীন ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বসবাস করেন। প্রথমে তিনি রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডি. পি. আই অফিসে অস্থায়ী পদে এবং পরে কৃষি দপ্তরে স্থায়ী পদে কেরানির চাকরি করেন। এ. কে ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের সময় তিনি রেকর্ডিং এক্সপার্ট হিসেবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। চল্লিশের দশকে আব্বাসউদ্দীনের গান পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে মুসলিম জনতার সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি সরকারের প্রচারদপ্তরে এডিশনাল সং অর্গানাইজার হিসেবে চাকরি করেন। তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৫৫ সালে ম্যানিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সঙ্গীত সম্মেলন, ১৯৫৬ সালে জার্মানিতে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলন এবং ১৯৫৭ সালে রেঙ্গুনে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন। আব্বাসউদ্দীনের গানের রেকর্ডগুলো এক অমর কীর্তি। আমার শিল্পী জীবনের কথা (১৯৬০) তাঁর রচিত একমাত্র গ্রন্থ। তিনি সঙ্গীতে অবদানের জন্য মরণোত্তর প্রাইড অব পারফরমেন্স (১৯৬০), শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৯) এবং স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে (১৯৮১) ভূষিত হন। ১৯৫৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য যে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মোস্তফা জামান আব্বাসী এবং কন্যা ফেরদৌসী রহমানও খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী। [ওয়াকিল আহমদ বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪)।

৪৫. এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালক ও জননেতা। তিনি কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩) এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৫) এবং পূর্ব বাংলার গভর্নরের পদ (১৯৫৬-১৯৫৮) সহ বহু উঁচু রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লোকপ্রিয়ভাবে শেরে বাংলা বা হক সাহেব রূপে পরিচিত আবুল কাশেম ফজলুল হক বাকেরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গ্রাম সাটুরিয়ায় ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তবে তাঁর পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল বরিশাল শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে চাখার গ্রামে। তিনি ছিলেন মুহম্মদ ওয়াজিদ ও সায়িদুন্নিসা খাতুনের একমাত্র পুত্র। হকের পিতা বরিশাল আদালতের একজন খ্যাতিমান দীউয়ানি ও ফৌজদারি উকিল ছিলেন এবং তাঁর পিতামহ কাজী আকরাম আলী ছিলেন আরবি ও ফারসিতে দক্ষ পণ্ডিত ও বরিশালের একজন বিশিষ্টি মোক্তার। বাড়িতে আরবি ও ফারসিতে সনাতন ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ শেষে ১৮৯০ সালে ফজলুল হক বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ এবং ১৮৯৪ সালে বি. এ. পরীক্ষায় (রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা তিনটি বিষয়ে অনার্সসহ) উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গণিত শাস্ত্রে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৯৭ সালে কলকাতার 'ইউনিভার্সিটি ল কলেজ' থেকে বি. এল ডিগ্রি লাভ করে ফজলুল হক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বহুরূপে ও বিভিন্নভাবে অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় এর স্নেহলাভের সৌভাগ্য হকের হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর হক বরিশাল শহরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৩-১৯০৪ সময়কালে তিনি এ শহরের রাজচন্দ্র কলেজে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবেও কাজ করেছিলেন। ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে হক সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতেও তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত হক ছিলেন সমবায়ের সহকারী রেজিস্ট্রার। সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি জনসেবামূলক কাজ ও আইন ব্যবসাকে বেছে নেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

স্যার সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি হয়। তাঁদের সহযোগিতায় ১৯১৩ সালে তিনি তাঁর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রায়বাহাদুর কুমার মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে পরাজিত করে ঢাকা বিভাগ থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মাঝখানে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে দুবছর সময়কাল (১৯৩৪-১৯৩৬) ছাড়া ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বাংলায় দ্বৈতশাসনামলে ১৯২৪ সালে প্রায় ছয় মাসের জন্য হক শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দেশে শিক্ষা সংক্রান্ত অবকাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম এডুকেশনাল ফান্ড গঠন করে তিনি যোগ্য মুসলমান ছাত্রদের সাহায্য করেন। মুসলমান ছাত্রদের ফারসি ও আরবি শিক্ষাদানের জন্য তিনি বাংলায় একটি পৃথক মুসলমান শিক্ষা পরিদপ্তরও গঠন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণেরও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলায় মাদরাসা শিক্ষার নতুন কাঠামো তৈরীতেও তাঁর ভূমিকা ছিল।

হক সাহেব ও তাঁর অনুসারীরা ১৯৩৫ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির নাম পরিবর্তন করে কৃষক প্রজা পার্টি (কে. পি. পি) রাখে। হকের নেতৃত্বে কে. পি. পি. এক গণআন্দোলন শুরু করে। কৃষকদের অধিকার পুনরুদ্ধার, মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্তিদান এবং জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে রায়তদের জমির মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে। এ সব শ্লোগান ১৯৩৫ সালের আইনের বলে ভোটাধিকার লাভকারী কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কে. পি. পি-কে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কে. পি. পি আইন সভায় তৃতীয় বৃহত্তম দলরূপে আবির্ভূত হয়। কংগ্রেস প্রথম ও মুসলিম লীগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল এবং বাংলার রাজনীতিতে হক একজন শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হন। তিনি বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত, হক-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনে রাজি না হওয়ায় হক অত্যন্ত বিব্রত ও হতাশ হন। এ রকম পরিস্থিতিতে হক মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে বাধ্য হন। জিন্নাহ আগ্রহের সঙ্গে এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। এভাবে ১৯৩৭ সালে বাংলায় হককে মুখ্যমন্ত্রী করে হক লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির অভাবে জিন্নাহর সমর্থকরা যে বাংলায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে লোকপ্রিয়ভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত লাহোর প্রস্তাব উথাপনের জন্য জিন্নাহ তাঁকে নির্বাচিত করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ-বিভক্তির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি লক্ষ করে হক অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করতে শুরু করেন এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ফজলুল হক আহত হন। এক মুসলিম লীগবিরোধী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতারূপে আবির্ভূত হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন দিকনির্দেশনা দান করে। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই ফজলুল হক 'শ্রমিক-কৃষক দল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য হক, মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেন। হক এ জোটের নেতা নির্বাচিত হন। তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণার পক্ষে জনগণকে সমবেত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। শেরে বাংলার ভক্তি ও উৎসাহ সঞ্চয়ের ক্ষমতা বিপুল ভোটে ফ্রন্টের জয়লাভের একটি প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

পালন করেন। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ছিলেন কৌশুলী, দূরদর্শী এবং সাহসী। একদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোমা হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাটসাহেব তাকে দার্জিলিঙে অফিস স্থানান্তরের প্রস্তাব দিলে তাতে তিনি রাজী হননি। এ প্রসঙ্গে আব্বাস আলী খান বলেন, "একদিন লাটসাহেব প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে বলেন 'মিঃ চীফ মিনিষ্টার বোমার ঠেলায় ত টেকা দায়। চলুন দার্জিলিঙ যাই। সেথায় আমাদের অফিস চলবে, কি বলেন?'প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব লাটকে ধমক দিয়ে বলেন, 'তা কি কখ্খনো হয় সাহেব? লোকে ছিঃ ছিঃ করবে তাদের মনোবল যে ভেঙ্গে যাবে তার চেয়ে বরঞ্চ মাথায় বোমা নিয়ে আমাদের এখানেই থাকতে হবে।'[৪৬]

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক একজন দরদী ব্যক্তি ছিলেন যা খান সাহেব সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। একবার খান সাহেব প্রধানমন্ত্রীর সাথে দিল্লী সফরে গিয়েছিলেন কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত তিনি সেখানে প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। দিল্লী থেকে কোলকাতা ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী বড়ো বড়ো স্টেশনগুলোতে গাড়ি থামলে খান সাহেবের কামরায় এসে মাথায় হাত রেখে স্নেহ আদর মাখা কণ্ঠে তাঁর খোঁজ খবর নেন। এবং তাকে সান্তনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে খান সাহেব বলেন, "দিল্লী থেকে হাওড়ার পথে বড়ো বড়ো স্টেশনগুলোতে গাড়ি থামলে হক সাহেব আমার কামরায় এসে আমার মাথায় হাত রেখে স্নেহ-আদর মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাস করেছেন শরীর কেমন? কি খেতে মন চাইছে? কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ ভরসা।"[৪৭] আব্বাস আলী খান সাহেব ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের পি এস এর দায়িত্ব পালন করেন।

কারণ ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন, যদিও আইনসভায় তাঁর দল আওয়ামী মুসলিম লীগের চেয়ে অনেক কম আসন লাভ করেছিল রাজনৈতিকভাবে এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা না হয়েও হক দুবার বংলার এবং আরও একবার পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। এটা তাঁর রাষ্ট্রপরিচালনায় দক্ষতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশক।

১৯৫৫ সালের আগস্টে হককে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন এবং ১৯৫৮ সালে সে পদ থেকে অপসারিত হন। তার পর থেকেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রায় পাঁচ লক্ষ শোকাহত মানুষ শরীক হয়েছিল। কাজী নজরুল ইসলাম এভেনিউর দক্ষিণপ্রান্তে শিশু একাডেমীর পশ্চিম পাশে তাঁর সমাধিসৌধ অবস্থিত।

ব্যক্তিগত ও জনজীবনে হক ছিলেন অত্যন্ত সরল। তাঁর জীবদ্দশায়ই জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণ তাঁর উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। দুর্দশাগ্রস্ত ও অতি দরিদ্রদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বাংলার মানুষ হককে তাঁর চাতুর্য বা তাঁর অস্থির রাজনৈতিক আচরণের জন্য স্মরণ করে না, তারা তাঁকে স্মরণ করে পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, বিপুল সংখ্যক কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচন ও তাঁর উদার প্রকৃতির জন্য। [অমলেন্দু দে ও এনায়েতুর রহিম, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি-২০০৩, ২০০৪]

[৪৬] আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ; পৃষ্ঠা : ৫৯, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

[৪৭] আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ; পৃষ্ঠা : ৮৭, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্যার জোন আর হার্বার্ট[৪৮] এসময় শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী থেকে অপসারণ করেন। হক সাহেবের সাথে সাথে 'আব্বাস আলী খানকে ও চাকুরী হতে অপসারণ করেন লাট সাহেবের ফিন্যান্স সেক্রেটারী আর এল ওয়াকার আই. সি. এস.। এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিমুদ্দীন[৪৯]। সৌভাগ্যবশত সেসময়ে সরকারী দলের একজন আবার খান সাহেবকে চাকুরীতে বহাল করেন।

---

৪৮. **হ্যারিংটন, জন হার্বার্ট** (১৭৬৪-১৮২৭) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেসামরিক কর্মকর্তা, প্রাচ্যবিদ এবং আইনজ্ঞ। ১৭৮০ সালে তিনি ছিলেন রাজস্ব প্রশাসনের অধস্তন কর্মকর্তা। কিন্তু স্বীয় প্রচেষ্টা, মেধা ও কৃতিত্বের গুণে অত্যন্ত দ্রুত অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যান। কোম্পানি শাসনের আইনগত বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। চাকুরির সাথে সাথে প্রাচ্য সভ্যতা বিষয়ে তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করেন। প্রাচ্যবিদ হিসেবে ভারতীয় সভ্যতার আইনগত দিকে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর অ্যানালিসিস্ অফ দি লজ অ্যান্ড রেগুলেশন্স্ অফ দি ফোর্ট উইলিয়ম গভর্নমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৮০৫-১৭) বইটি উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রশাসক ও আইনবিদদের দ্বারা মানসম্পন্ন রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাচ্যবিদ হিসেবেই তিনি শেখ সাদীর রচনাবলী পারসিয়ান অ্যাণ্ড অ্যারাবিক ওয়ার্কস অফ সাদী নামে সংকলন ও সম্পাদন করে এই মহৎ পারস্য কবিকে পাশ্চাত্যের সাহিত্যামোদীদের কাছে পরিচিত করেছিলেন।

জন হার্বার্ট হ্যারিংটন ১৮০১ সালে সদর দীউয়ানি ও নিজামত আদালতের জুনিয়র বিচারকের, ১৮১১ সালে প্রধান বিচারকের, ১৮২২-২৩ সালে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সদস্য এবং 'বোর্ড অফ ট্রেড'-এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আইনের অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে কলেজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৮২৭ সালে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং একই বছর লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৯. **খাজা নাজিমুদ্দীন** : (১৮৯৪-১৯৬৪) আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ। জন্ম, ১৯ জুলাই ১৮৯৪, ঢাকার খাজা পরিবারে। পিতা খাজা নিজামউদ্দীন ঢাকা পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। খাজা নাজিমউদ্দীন কৈশোরে গৃহশিক্ষকের কাছে এবং পরে আলীগড় কলেজে, লন্ডনের ডানস্টাবল গ্রামার স্কুলে পড়াশোনা করেন। তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি হল থেকে এম. এ এবং মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৯২২ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খাজা নাজিমউদ্দীন বহু পাবলিক অফিস অলংকৃত করেন।

তিনি ১৯২২ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যও ছিলেন। ১৯২৯ সালের ভারত আইনের অধীনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক কাউন্সিলে তিনি ১৯২২, ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বরিশাল (মুসলমান) নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। তিনি ডিসেম্বর ১৯২৯ থেকে জুন ১৯৩৪ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩০ সালে তাঁর মন্ত্রিত্বকালে প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাস হয়। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সরকারের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তাঁর বিশেষ উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে 'বঙ্গীয় ঋণ সালিশি বোর্ড' বিল এবং ১৯৩৬ সালে 'বঙ্গীয় পল্লী উন্নয়ন বিল' পাস হয়।

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে খাজা নাজিমউদ্দীন মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে পটুয়াখালী থেকে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ.কে ফজলুল হক কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু পরে উত্তর কলকাতা নির্বাচনী এলাকা থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এর ছেড়ে দেওয়া আসনটি লাভ করেন। ঐ সময় তিনি মুসলিম লীগ পুনর্গঠন কাজে মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন এবং বঙ্গদেশে মুসলিম লীগের একজন সেরা নেতারূপে পরিচিত হন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় খাজা নাজিমউদ্দীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। হক-জিন্নাহর মতবিরোধের কারণে তিনি ১৯৪১ সালে ১ ডিসেম্বর জিন্নাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪২-৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার সময়ে বিরোধী দলীয় নেতারূপে সংসদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৩ সালে ২৮ মার্চ শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ২৪ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ উক্ত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ১৯৪৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৪৬ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শেষ অধিবেশনে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব বাংলার (পূর্বপাকিস্তান) মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ ইন্তেকাল করলে তিনি ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দীন ১৭ অক্টোবর অস্থায়ীভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব গোলাম মুহম্মাদকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হলে খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৫১ সালে ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ বছরই নভেম্বরে তিনি, পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৬ নভেম্বর মুসলিম লীগের সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৫২ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে তিনি সমালোচিত ও নিন্দিত হন। ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট গোলাম মুহম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের প্রিভেনসিভ অফিসার

দেড় বছর পর তিনি বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের প্রিভেন্টিভ অফিসার হন। এ চাকুরীটা ভাল ছিল । বেতন ও সুযোগ সুবিধা ভাল ছিল। আড়াই বছর পর্যন্ত তিনি এ চাকুরীতে বহাল ছিলেন।

সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তেফা প্রদান

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন পাকিস্তান ও ভারত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। চৌদ্দ আগস্ট তিনি কলকাতা ছেড়ে নিজ দেশে রওয়ানা হন। এক সপ্তাহ বাড়ীতে অবস্থান করে ঢাকায় আগমন করেন তৎকালে পূর্ব বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা[৫০]। যা পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়।

ঢাকায় আসার পূর্বে তাঁর কর্মস্থল ইনফোর্সমেন্ট বিভাগটি পুলিশ বিভাগের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। যাদের মধ্যে ১৮ আঠার জন অফিসার পুলিশ বিভাগে চাকুরী করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে বিষয়টি বিবেচনার জন্য আবেদন জানান, তিনি ঢাকায় সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ঢাকায় এসে এ আঠার জনকে যেসব চাকুরী দেয়া হয়েছিল তা তাঁর পছন্দ হলো না। অবশেষে সার্কেল অফিসারের প্যানেলে তার নামটি স্থান পায়। বেতন কোলকাতার বেতনের এক তৃতীয়াংশ। তাও কতদিন-অপেক্ষা করতে হবে কে জানে? কোথায় যেতে হবে তাও জানা নেই। হয়তো কোন অজপাড়াগাঁয়ে যেতে হবে। সুপারিশ করার মত কোন আত্মীয়-স্বজন ছিলনা। সকল কিছু চিন্তা ভাবনা ও বিচার বিবেচনা করে ১৯৪৮ সালের জানুয়ালী মাসে চাকুরী থেকে ইস্তেফা দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন।

শিক্ষকতা : (১৯৫২-১৯৬১)

রংপুর দারোয়ানী হাই স্কুলের হেডমাস্টার

'আব্বাস আলী খান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান, যা তাঁর ছাত্রজীবনে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৩৫ সালে কৃতিত্বের সাথে ডিস্টিংশনে বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার পরপরই আব্বাস আলী খান অল্প কিছুদিনের জন্য রংপুর জেলার দারোয়ানী

খাজা নাজিমউদ্দীনকে পদচ্যুত করে বগুড়ার মুহম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতির পদটিও ত্যাগ করেন এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। ১৯৬৩ সালে তিনি রাজনীতিতে ফিরে এসে পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

ব্রিটিশ সরকার ১৯২৬ সালে তাঁকে সি. আই. ই এবং ১৯৩৪ সালে কে. সি. আই. ই. উপাধি প্রদান করে। ১৯৪৬ সালে রাজনৈতিক কারণে তিনি উপাধিগুলো পরিত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব 'নিশান-ই-পাকিস্তান'-এ ভূষিত হন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ২২ অক্টোবর খাজা নাজিমউদ্দীন ইন্তেকাল করেন। ঢাকা হাইকোর্টের পশ্চিমে তিন নেতার মাযার নামে পরিচিত সমাধি সৌধের অভ্যন্তরে তিনি সমাহিতরয়েছেন। [মোহাম্মাদ আলমগীর]

৫০. ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, যার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রাক-মুসলিম আমলে ঢাকার অস্তিত্ব সুনির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ। তবে সুলতানি আমলের এটি একটি নগর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং মুগল আমলে প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পাওয়ার পর এটি প্রসিদ্ধ লাভ করে। ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু জানা যায় না। এ সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ: (ক) এক সময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ (বুটি ফ্রনডোসা) ছিল; (খ) গুপ্ত অবস্থায় থাক দুর্গা দেবীকে (ঢাকা-ঈশ্বরী) এ স্থানে পাওয়া যায়; (গ) রাজধানী উদ্বোধনের দিনে ইসলাম খানের নির্দেশে এখানে ঢাক অর্থাৎ ড্রাম বাজানো হয়েছিল; (ঘ) 'ঢাকা ভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল। মুগল-পূর্ব যুগের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে ঢাকা শহরে দুটি এবং মিরপুরে একটি মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীনতমটির নির্মাণ তারিখ ১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দ। জোয়াও দ্য ব্যারোস ঢাকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে দেখতে পান এবং ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত তাঁর মানচিত্রে এর অবস্থান নির্দেশ করেন। আকবরনামা গ্রন্থে ঢাকা একটি 'থানা' (সামরিক ফাঁড়ি) হিসেবে এবং আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার বাজুহার একটি পরগনা হিসেবে ঢাকা বাজু উল্লিখিত হয়েছে। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশতি সুবাহ বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। প্রশাসনিকভাবে জাহাঙ্গীরনগর নামটি ব্যবহৃত হলেও সাধারণ মানুষের মুখে ঢাকা নামটিই থেকে যায়। সকল বিদেশী পর্যটক এবং বিদেশী কোম্পানীর কর্মকর্তারাও তাঁদের বিবরণ এবং চিঠিপত্রে ঢাকা নামটি ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলে হেডমাস্টারির চাকুরী নেন। তখন তার বয়স কুড়ি একুশের মাঝে। একেবারে ছেলে মানুষ। তার এক বন্ধু অনেক অনুরোধ করে তাকে চাকুরীতে নিয়োগ দিয়ে দেন। এক মাস পনের দিনের মাথায় বাড়ি থেকে চিঠি পেলেন। তাতে লিখা ছিল পত্র পাঠমাত্র বাড়ি চলে আসতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আরো পাঁচ দিন চাকুরী করে বিদায় নিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন। এ জন্য তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানের জন্য স্কুলের হলঘরটি অপরূপ সাজে সাজানো হয়। ডে-লাইট ও হেচাগবাতি জ্বালিয়ে দিনের মত আলোকিত করা হয়। বিদায় অনুষ্ঠানে বেদনাভরা হৃদয়ে কয়েকজন অভিভাবক বক্তৃতা করেন। শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের চোখে পানি টলটল করছে। তিনি নিজেও বক্তৃতা দিতে গিয়ে কান্নার চাপে বক্তৃতা দিতে পারেননি। পরে সকলের অনুরোধে হলভর্তি দর্শক ও শ্রোতামণ্ডলীকে আব্বাসউদ্দীনের কয়েকটি গান শুনিয়ে বিদায় নেন। এ হল তাঁর জীবনের প্রথম বিদায় গ্রহণ অনুষ্ঠান।

জয়পুরহাট হাই স্কুলে হেডমাস্টার

১৯৫২ ইংরেজি সাল, এ বছরের শেষের দিকে তিনি জয়পুরহাট হাই স্কুলে হেড মাস্টার হিসেবে চাকুরীতে যোগ দেন। স্কুলের সাবেক হেডমাস্টার প্রতিষ্ঠানে ফান্ডের অনেক টাকা নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে চলে যান। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ছাত্ররাও খুব খারাপ ফলাফল করেছে। স্কুলের অবস্থা তখন যায় যায়। প্রথমত স্কুল কমিটির সদস্যগণ তাঁকে স্কুলের দায়িত্ব নেয়ার অনুরোধ করলেও তিনি রাজী হননি। অবশেষে কমিটির সভাপতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে তিনি স্কুলের চাকুরী করতে সম্মতি প্রদান করেন।

এটি তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। মাস্টারি না করার সিদ্ধান্তের কারণে তিনি বি. টি কলেজে পড়ালেখার ইতি টেনেছিলেন, কিন্তু আবার সে শিক্ষকতার পেশায় ফিরে এলেন।

তিনি অত্যন্ত সচেতনতার সাথে দূর্নীতি মুক্ত থেকে আপন দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সহকর্মীরাও ছিলেন দায়িত্ব সচেতন, সুশৃংখল, নীতিবান। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কও ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। যে কোন ধরনের উশৃংখলতা মোকাবেলায় তাঁরা ছিলেন সজাগ ও হুশিয়ার।

খান সাহেব অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে চোখ-কান খোলা রেখে বিচক্ষণতার সাথে সকলের সহযোগিতায় স্কুলটিকে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে নিয়ে যান এবং এ কঠিন কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন।

জয়পুরহাট হাই স্কুলের হেডমাস্টার পদ থেকে ইস্তেফা প্রদান

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে জামায়াতে ইসলামী[৫১] থেকে নির্দেশ দেয়া হল চাকুরী ছাড়ার জন্য। সে মোতাবেক স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা, ম্যাট্রিক টেস্ট পরীক্ষা সেন্টাপ করার যাবতীয় কাজ সেরে তিনি চাকুরীর

---

৫১. জামায়াতে ইসলামী : ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার নীতিতে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের গোড়া থেকেই অবিভক্ত ভারতে ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'ল মওদুদীর নেতৃত্বে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মাসিক পত্রিকা তারজুমান আল-কোরআন-এর মাধ্যমে ১৯৩২ সাল থেকেই এ লক্ষ্যে প্রচার কার্য শুরু হয়। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ' শীর্ষক এক বক্তৃতায় মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের কথা প্রকাশ করেন। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। তদনুসারে ঐ বছর ২৫ আগস্ট লাহোরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। মাওলানা মওদূদী এ দলের আমীর নির্বাচিত হন। যুদ্ধাবস্থার কারণে প্রায় চার বছর জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৪৫ সালের (১৯-২১) এপ্রিল পাঞ্জাবের পাঠানকোটে দলের প্রথম নিখিল ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর জামায়াতে ইসলামী দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জামায়াতে ইসলামী হিন্দ দিল্লীতে এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান লাহোরে দলের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতত্বে অধিষ্ঠিত হন দলের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

Dhaka University Institutional Repository

ইস্তাফা পত্র দাখিল করেন। স্কুল কমিটি এক মাস ধরে অনেক অনুনয়-বিনয় করেও কমিটির সেক্রেটারী, সদস্যবৃন্দ ইস্তিফা প্রত্যাহার করাতে পারলেন না। অবশেষে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তায় ম্যানিজিং কমিটির মিটিং ডাকা হলো। শেষবারের জন্য বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেও তাঁরা যখন ব্যর্থ হলেন তখন খান সাহেবের ইস্তিফাপত্র গ্রহণ করা হল। এভাবে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের আপাতত সমাপ্তি ঘটে।

পাকহিলি হাই স্কুলের হেডমাস্টার

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের ৮ তারিখ আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। শাসনতন্ত্র বাতিল, মন্ত্রিসভা ও পরিষদ বাতিল, সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেন। চাকুরী থেকে তিনি পূর্বেই অব্যাহতি নিয়েছিলেন। জামায়াতের কাজও বন্ধ। এখন শুধু বেকার জীবন অতিবাহিত করছিলেন। সে সময় দিনাজপুর জেলার পাকহিলি হাইস্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন খান সাহেবের বন্ধু। ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে তিনি এসে খান সাহেবকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর স্কুলে হেডমাস্টারি করার জন্য। এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না তিনি। এ কারণে তাঁর বন্ধুর অনুরোধে ১৯৫৯ সালে দু'বছর পর পুনরায় মাস্টারিতে মনোনিবেশ করেন। ১৯৬২ সাল, এ বছরের এপ্রিল মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের[৫২] ভোটে

---

৫২. মৌলিক গণতন্ত্র। ১৯৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রবর্তিত একটি স্বল্পকাল স্থায়ী স্থানীয় সরকার পদ্ধতি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯' জারি করেন। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ এ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতো এবং তারা একে জেনারেল আইয়ুব খান এবং তাঁর সহযোগী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার একটি সুনিপুণ কৌশল হিসেবেই গণ্য করতো।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল (১) ইউনিয়ন পরিষদ (পল্লী এলাকায়) এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি (পৌর এলাকায়), (২) থানা পরিষদ (পূর্ব পাকিস্তানে), তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা পরিষদ, (৪) বিভাগীয় পরিষদ এবং (৫) প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ। একজন চেয়ারম্যান এবং প্রায় ১৫ জন সদস্য নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। এতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্যই থাকতেন। পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন মনোনীত বেসরকারি সদস্য, যারা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হতেন। তবে, ১৯৬২ সালের এক সংশোধনী দ্বারা মনোয়ন প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। ফলে পরিষদের সদস্যবৃন্দ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্ব স্ব ইউনিয়নের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে সদস্যদের দ্বারা তাদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতেন। এক দিক দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল পূর্বেকার ইউনিয়ন বোর্ডেরই অনুরূপ, তবে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলা হতো মৌলিক গণতন্ত্রী। সারা দেশে সর্বমোট পরিষদের সংখ্যা ছিল ৭৩০০।

সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় স্তরের থানা পরিষদ গঠিত। এ সকল প্রতিনিধি নিজেরা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান। সরকারি সদস্যবৃন্দ দেশ গঠনমূলক কাজে থানার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং এদের সংখ্যা নির্ধারণ করতেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডেপুটি কমিশনারগণ। তবে, সরকারি সদস্যদের সর্বমোট সংখ্যা কোনক্রমেই বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে পারতো না। থানা পরিষদের প্রধান থাকতেন মহকুমা অফিসার (এস ডি ও), যিনি পদাধিকারবলে থানা পরিষদের চেয়ারম্যান হতেন। মহকুমা অফিসারের অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদাধিকারবলে থানা পরিষদের সদস্যের দায়িত্ব পালন করতেন এবং থানা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে থানাকে পরিষদ বলে অভিহিত করা হতো এবং এর সভাপতিত্ব করতেন তেহশিলদার। তখন পাকিস্তানে মোট ৬৫৫টি থানা এবং তেহশিল ছিল। তৃতীয় স্তরের জেলা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। সদস্যদের সংখ্যা ৪০-এর বেশি হতো না। সকল থানা পরিষদের চেয়ারম্যানই সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সদস্য থাকতেন এবং অন্যান্য সরকারি সদস্য উন্নয়ন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন এবং সমান সংখ্যক সদস্য মনোনীত হতেন বেসরকারি সদস্যদের মধ্য থেকে। বেসরকারি সদস্যদের অন্তত অর্ধাংশ মনোনীত হতেন ইউনিয়ন পরিষদ ও শহর কমিটির চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে। ডেপুটি কমিশনার পদাধিকারবলে এ পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন, অন্যদিকে পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তাঁর অর্পিত দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনার পালন করতেন। পাকিস্তানে ৭৪টি জেলা পরিষদ ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর ছিল এ জেলা পরিষদ। এটি ছিল জেলা বোর্ডের উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠান। সদস্যসংখ্যার দিক

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে খান সাহেব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। কোন রকম টাকা-পয়সা খরচ করা ছাড়াই তিনি নির্বাচিত হয়ে যান। জুনের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের জন্য তিনি রাওয়ালপিন্ডি গমন করেন।

প্রথমে জাতীয় পরিষদের সদস্যদেরকে কেন্দ্রীয় হাসপাতালের জন্য নির্মিত একটি বিরাট বাড়ীতে থাকতে দেয়া হয়, তবে কিছু দিন পরে ইস্ট পাকিস্তান হাউস নামক এক টিপটপ বিলাসবহুল রেস্ট হাউসে তাঁদেরকে স্থানান্তর করা হয়।

দিয়ে এ পরিষদ ১৯৮৫ সালের অবস্থান থেকে অনেকখানি সরে এসেছে, কেননা তখন শতকরা ২৫ ভাগ সদস্য মনোনীত হতো। চতুর্থ ও শীর্ষ স্তর ছিল বিভাগীয় পরিষদ। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকারবলে এ পরিষদের চেয়ারম্যান থাকতেন। এতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের সদস্য ছিলেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য ছিলেন ৪৫ জন। সরকারি সদস্য ছিলেন বিভাগের অন্তর্গত সকল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সরকারি উন্নয়ন বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ। সর্বমোট বিভাগীয় পরিষদের সংখ্যা ছিল ১৬। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশে একটি প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা ছিল। গঠনবিন্যাসের দিক দিয়ে এটি ছিল বিভাগীয় পরিষদের অনুরূপ। ব্যতিক্রম এই যে, নিয়োজিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হতো। এ পরিষদের বলতে গেলে কোন ক্ষমতাই ছিল না। তবে, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ার পর এ পরিষদ বাতিল হয়ে যায়।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশবলে যে পাঁচটি পরষদ সৃষ্টি করা হয় তাদের মধ্য থেকে শুধু দুটি পরিষদ অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পরিষদ এবং থানা পরিষদ প্রধানত সমন্বয়মূলক দায়িত্ব পালন করতো। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের কার্যে নিয়োজিত থাকতো, যেমন ইউনিয়নের কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, সমাজ উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্য। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পুলিশবাহিনীর দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতো এবং তদীয় সালিসি কোর্টের মাধ্যমে ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিস্পত্তি করতো। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ, জমিতে জলসেচখাল তৈরি এবং জলাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বভারও ন্যস্ত ছিল ইউনিয়ন পরিষদের ওপর। এছাড় ইউনিয়ন পরিষদকে কর ধার্য ও আদায় এবং মূল্য, টোল ও ফি আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় পরিষদ ও দুটি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮০,০০০ সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে। থানা পরিষদ/তেহশিল পরিষদ মূলত একটি সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানমূলক সংগঠন। থানা পরিষদ তার আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও শহর কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় বিধান করতো থানা পরিষদই চলতি প্রকল্পসমূহ তত্ত্বসাধনসহ ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর কমিটির প্রণীত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় বিধান করতো। থানা/তেহশিল পরিষদ জেলা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতো এবং ঐ পরিষদের নিকট দায়ী থাকতো। জেলা পরিষদ মূলত তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করতো (১) বাধ্যতামুলক দায়িত্ব, (২) ঐচ্ছিক দায়িত্ব এবং (৩) সমন্বয়মূলক দায়িত্ব বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলোর মধ্যে ছিল সরকারি রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, সরকারি ফেরী নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন। ঐচ্ছিক দায়িত্বগুলোর বিষয় ছিল শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক কল্যাণ এবং গণপূর্ত।

এছাড়াও জেলা পরিষদের উপর কৃষি, শিল্প, সমাজ উন্নয়ন, জাতীয় পুনর্গঠনের প্রসার এবং সমবায় উন্নয়নের মত বিশাল কর্মকাণ্ডে দায়িত্বও অর্পিত হয়। জেলার মধ্যে স্থানীয় পরিষদসমূহের সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনও ছিল জেলা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব আশা করা হতো, জেলা পরিষদ জাতি গঠনমূলক বিভাগসমূহের গৃহীত পরিকল্প ও প্রকল্পসমূহ এবং এগুলোর আরও উৎকর্ষ ও উন্নয়ন সাধনের প্রস্তাব দেবে এবং বিভাগীয় পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এ প্রস্তাব সম্বলিত সুপারিশ পেশ করবে। চতুর্থ স্তরে সংগঠন বিভাগীয় পরিষদ কার্যত একটি অত্যন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এটি ছিল ঐ স্তরের কেবল একটি উপদেষ্টা পরিষদ। মৌলিক গণতন্ত্র স্থানীয় সরকারের ভিত্তি হিসেবে বলবৎ থাকা ছাড়াও জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারকে বৈধতা দানের জন্য রাজনৈতিক ও নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতো। ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য যে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয় তাতে মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব খানের সপক্ষে রায় দেয়। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিপুল জনসাধারণ মৌলিক গণতন্ত্রীগণ কর্তৃক একচেটিয়াভাবে নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, যার ফলে ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। মৌলিক গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুধু যে আইয়ুব সরকারকে বৈধতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বরং ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের পতনের পর এর বৈধতাও হারিয়ে ফেলে। [শামসুর রহমান বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ০৩,০৪]

Dhaka University Institutional Repository

পনেরই জুলাই জাতীয় পরিষদে Political parties Act পাস করা হয়। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পূনর্গঠনের সুযোগ হয়। এরপর খান সাহেব পুনরায় স্কুলের চাকুরী ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে সার্বক্ষণিক জামায়াতের রাজনীতি শুরু করেন। এরপর আর কখনো চাকুরী করেননি।

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। অন্য কোন পেশা গ্রহণ না করে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

হজ্জ্ব পালন

খান সাহেব তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে কয়েকবার আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহর হজ্জ্ব ও ওমরা পালন করেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ্জ্ব পালন করেন তাঁর একমাত্র কন্যা খানজেবুন্নেসা চৌধুরীকে নিয়ে।

ছাত্রবৃন্দ

'আব্বাস আলী খান লক্ষ লক্ষ ইসলামী জনতার মহান শিক্ষকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। গতানুগতিক অর্থে তিনি কেবল একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না। তাঁর কাছ থেকে হাজারো-লাখো জনতা অনেক অনেক কিছু শিখেছে। সে হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের লাখো লাখো কর্মী তাঁর ছাত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত। তথপিও তাঁর শিক্ষকতা জীবনের কয়েকজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হল।

বিনয় কুমার কুণ্ড . খান সাহেব যখন জয়পুরহাট হাইস্কুলের হেডমাস্টার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন তাঁর সময়ের ১০ম শ্রেণীর ফাস্ট বয় তাঁর একান্ত প্রিয় ছাত্র ছিল বিনয় কুমার কুণ্ড । খান সাহেব যখন স্কুল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এই ছাত্রটি তাঁর জন্য ইংরেজিতে ফেয়ারওয়েল এড্রেস হাতে লিখে মনোরম বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি ছাত্রদের কাছে এত বেশী প্রিয় ছিলেন যে, তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানের সময় সকল ছাত্র বিস্মিত-স্তম্ভিত, মর্মাহত, অশ্রুকাতর ছিল।

নাজমুস সায়াদাত, খান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী এন্ড কলেজে ১৯৮৬ সালে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে তাঁর ছাত্র হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর একান্ত অনুপ্রেরণায় তিনি ১৯৯৭ সালে এস.এস.সি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হন। ১৯৯৯ সালে অত্র কলেজ থেকে এইচ এস.সি ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হন। খান সাহেব তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীস থেকে আলোচনা রাখতেন এবং তাদেরকে ভালভাবে পড়াশুনা করতে বলতেন।

সহকর্মী বৃন্দ

আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-১৯৫৯) কণ্ঠশিল্পী,

খান সাহেব আব্বাসউদ্দীন এর সাথে চার বছর বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটের প্রচার বিভাগে একসাথে কাজ করেন করেন। তাঁদের দুজনের সম্পর্ক ছিল খুব ভাল। অবসর সময়ে তাঁরা দুজনে একসাথে ডিপার্টমেন্টের রীডিং রুমে বসে গল্প করতেন, একে অপরকে গান শুনাতেন।[৫৩]

---

৫৩. এ প্রসঙ্গে খান সাহেব বলেন, আব্বাস উদ্দীন ও আমি একসাথে চার বছর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের প্রচার বিভাগে কাজ করেছি আমাদের ডিপার্টমেন্টের রীডিং রুমে দুজনে অবসর সময়ে গিয়ে বসতুম। তিনি কত কথা, কত প্রেমের কাহিনী আমাকে শুনাতেন আমি গায়ক ছিলুম না। তবে আলবৎ গান গাইতে পারতুম। তাই কখনো তাঁর এআন্ত অনুরোধে উদু-হিন্দী গানের দু একটা কলি গাইয়ে শুনাতাম। ('আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ; পৃষ্ঠা : ৫২, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।)

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাপ্টেন সি জে রবার্টস

'আব্বাস আলী খান যখন চাকুরিরত, তখন তাঁর ইমিডিয়েট বড়ো অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন সি জে রবার্টস। তিনি ছিলেন মার্টিন লুথারের অনুসারী প্রটেস্ট্যান্ট ক্রিশ্চিয়ান। এ কারণে ক্যাথলিকদের সমালোচনা করে বলতেন- মারাত্মক পাপ করেও ফাদারদের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে সবকিছু মাপ নেওয়া সম্ভব হয়।

হাসান আলী

খান সাহেব আয়ুব খানের সময়ে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময়ে দিনাজপুরের হাসান আলীও জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালের জুন মাসে পাকিস্তান জতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য খান সাহেব রাওয়ালপিন্ডিতে আসেন। তাঁদের থাকতে দেয়া হয়েছিল ইস্ট পাকিস্তান হাউসে। এখানে তাঁর রুমমেট ছিলেন এ হাসান আলী। জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসাবে তাঁরা সহকর্মী ছিলেন।

শামসুর রহমান

শামসুর রহমান[৫৪] একজন রাজনীতিবিদ। ১৯৬২ সালে তিনিও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি খান সাহেবের সাথে একসাথে পার্লামেন্টে কাজ করেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে খান সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথী ও সহকর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মকবুল আহমদ

মকবুল আহমদ একজন রাজনীতিবিদ। তিনি খান সাহেবের রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথী ছিলেন। সাংগঠনিক জীবনে একসাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে একত্রে কাজ করেছেন।

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ছিলেন খান সাহেবের রাজনৈতিক সহকর্মী। সুদীর্ঘ সময় একত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করেছেন।

বদরে আলম

খান সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন বদরে আলম। তিনি একজন রাজনীতিক। সুদীর্ঘ সময় রাজনৈতিক ময়দানে একসাথে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক মুজিবর রহমান

অধ্যাপক মুজিবর রহমান একজন রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক জীবনে খান সাহেবের সাথে একসাথে কাজ করেছেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন।

আব্দুল কাদের মোল্লা

আব্দুল কাদের মোল্লা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদ। তিনি খান সাহেবের রাজনৈতিক সহকর্মী। বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করেছেন। সুদীর্ঘ সময় একত্রে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

মুহাম্মদ কামারুজ্জমান

মুহাম্মদ কামারুজ্জমান খান সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। তিনি একসাথে রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করেছেন। কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে একত্রে বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করেছেন।

---

৫৪. শামসুর রহমান, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে খান সাহেবের মৃত্যু দিন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাথী হিসাবে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। খান সাহেব যখন রাজশাহী বিভাগের আমীর তখন তিনি খুলনা বিভাগের আমীর। খান সাহেব যখন সিনিয়র নায়েবে আমীর তখন তিনি দ্বিতীয় নায়েবে আমীর।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পারিবারিক জীবন

দাম্পত্য জীবন

'আব্বাস আলী খান ১৯৩৬ সালে ফুরফুরা শরীফের পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের খাস খলীফা শাহ সূফী আলহাজ্ব সায়েম উদ্দীন আহম্মদের[৫৫] একমাত্র কন্যা খাদিজা আক্তারের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্বশুরালয় জয়পুরহাট শহর হতে দুই মাইল পশ্চিমে খনজনপুর নামক স্থানে অবস্থিত। তিনি (খান সাহেবের স্ত্রী) ছিলেন একজন পরহেজগার ও আবেদা নারী। যিনি রাত জেগে জেগে নামাজ পড়তেন। কুরআন তেলাওয়াত করতেন। হাদীস অধ্যয়ন করতেন। বিয়ে করার কিছুদিন পর খান সাহেব বনবিভাগের হেড অফিসে চাকুরী নিয়ে দার্জিলিঙ চলে যান। একমাস চাকুরী করার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে দার্জিলিঙ নিয়ে আসেন। পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য দার্জিলিঙ বোটানিক্যাল গার্ডেন সংলগ্ন জনৈক ইন্দ্রবাবুর ঈন্দ্রপুরীতে বাসা ভাড়া নেন। অফিস থেকে ফিরে চা-পানি খেয়ে তাঁরা দু'জনে বেরিয়ে পড়তেন। মাঝেমধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালী মুসলমানদের বাসায় বেড়াতে যেতেন। তাঁদের পেয়ে প্রবাসীরা খুব খুশী হতেন এবং অত্যন্ত আদর-যত্ন করতেন। এভাবে ছয় মাস কেটে গেল। ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসের ১০ তারিখে চাকুরী ছেড়ে দার্জিলিঙ ছেড়ে চলে আসেন। কয়েক মাসের আনন্দময় জীবনের যবনিকাপাত হলো। দার্জিলিঙ থেকে এসে তিনি বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটে চাকুরী নেন। তিনি তখন কলকাতার পার্ক সার্কাস নাসিরুদ্দীন রোডে স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে সাথে নিয়ে থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক মাস পূর্বে সবাইকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

খান সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, যা দু'-একটি ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। ১৯৫৭ সালে জামায়াতে ইসলামীর নির্দেশে তিনি যখন জয়পুরহাট হাইস্কুলের হেড মাষ্টারীর চাকুরী ছেড়ে বাড়ি ফিরেন তখন তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন "বাড়ি থেকে করা আরামের চাকুরী কেন ছাড়লুম এখন কিভাবে দিন যাবে"[৫৬]। খান সাহেব বিভিন্নভাবে তখন তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীতে খবর এলো চাকুরী ছাড়ার কারণে দু'-আড়াইশ লোক (ছাত্র ও জনতা) তাঁর বাড়ি ঘেরাও করেছেন একদিকে চাকুরী ছাড়ার কারণে তাঁর স্ত্রীর মন খারাপ, অন্যদিকে বাড়ী ঘেরাও করার কথা শুনে তিনি খান সাহেবের প্রাণ নাশের আশংকা করেন। তাই তাঁকে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার জন্য কঠোরভাবে বারণ করেন। এ প্রসঙ্গে খান সাহেবের স্ত্রী বল্লেন,

"খবরদার, বাড়ি থেকে বেরুনো চলবে না। চাকুরী ত গেল। শেষ জানটাও কি দেবে?" এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় তাঁদের সম্পর্ক কতটুকু গভীর ও আন্তরিক ছিল। খানসাহেবের স্ত্রী দীর্ঘ ১০ বছর অসুস্থ[৫৭] ছিলেন। এ সময় তিনি পাহাড় সমান ধৈর্য ধারণ করেছেন। কারো কাছে তাঁর স্ত্রীর অসুখের কথা বলতেন না। মাসে

---

৫৫. "জয়পুরহাট শহর হইতে দুই মাইল পশ্চিমে খনজনপুর হাইস্কুলের দক্ষিণ পাশেই বিখ্যাত সুফী সায়েম উদ্দীন আহম্মদ বিদ্যাবিনোদ সাহেবের মাজার অবস্থিত। ইনি জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্বাস আলী খানের শ্বশুর এবং বিখ্যাত বাগ্মী ও ইসলাম প্রচারক মাওলানা তোফাজ্জল হোসেনের পিতা। জয়পুরহাট রাজশাহী, দিনাজপুর এবং রংপুরে তাঁহার অসংখ্য শাগরেদ ছিল। তিনি ফুরফুরার পীর কেবলার সুযোগ্য খলিফা এবং উঁচু দরের অলীয়ে কামেল ছিলেন। বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। তিনি খনজনপুর হাই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্বাস আলী খান সাহেবের বাড়ী খনজনপুরেই অবস্থিত। এখানে একটি হাইস্কুল আছে। (বাড়ীর কাছে আরশী নগর: জয়পুরহাট জেলার হিন্দু- মুসলীম স্মৃতি, এস. এম. আনসার আলী, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃ: ২৭)।

৫৬. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ; পৃষ্ঠা : ১৩৪, প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

৫৭. ব্লাড প্রেসারে স্ট্রোক করে প্যারালাইজড ছিলেন ১০ বছর।

Dhaka University Institutional Repository

একবার বাড়ী আসতেন। এবং কয়েক দিন স্ত্রীর কাছে অবস্থান করে তাঁর খেদমত করতেন। বাড়ী এসে তিনি স্ত্রীর পাশে গিয়ে সালাম দিতেন। স্ত্রী মুচকি হাসি দিয়ে লজ্জায় মনে মনে সালামের জবাব দিতেন। স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার ফলে এটা প্রমাণিত হয় তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখময়।

সন্তান-সন্ততি

'খান জেবুন্নেছা চৌধুরী' আব্বাস আলী খানের একমাত্র সন্তান, একমাত্র কন্যা, খান সাহেব তাঁকে 'জেবু আম্মা বলে ডাকতেন। 'জেবু আম্মা' খান সাহেবের কলিজার টুকরা। খান জেবুন্নেছা চৌধুরী ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলা খঞ্জনপুরে নানার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন পাঁচবিবি উপজেলার খান সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীর ছেলে আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সাথে নিজ কন্যাকে বিবাহ দেন। যিনি অত্যন্ত বড় অন্তরের অধিকারী ছিলেন। জমিদার পরিবার হিসাবে সমাজে তাদের একটা পরিচিতি ছিল। ছোটবেলা থেকে জেবু আম্মার সব কাজ খান সাহেব করে দিতেন। খাওয়া, শোয়া, গোসল সবই করতেন।[৫৮] মাঝেমধ্যে শখ বশত মেয়ের সাথে রান্না করতেন। খান সাহেব বাইরে কোন সফরে, বেড়াতে গেলে চিঠি লিখতেন। কোথায় ঘুরলেন, কি খেলেন। কি করলেন সবই মেয়েকে জানাতেন।

পরিবারের অন্যান্য সদস্য

১৯৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর খান জেবুন্নেছা চৌধুরীর স্বামী স্ট্রোক ও লিভার সমস্যায় ইন্তেকাল করেন। খান জেবুন্নেছা তাঁর মায়ের দশ বছর খেদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মাকে নির্ভর করে তিনি বাকী দিনগুলো অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর মাকেও হারান। এর পর পিতা তাঁর সব দেখাশোনা করতেন। খান সাহেব জেবু আম্মাকে নিয়ে বায়তুল্লাহর হজ্জ[৫৯] পালন করেন। খান জেবুন্নেছা চৌধুরীর ১ ছেলে ৩ মেয়ে।[৬০] অর্থাৎ খান সাহেবের ১ নাতি ও ৩ নাতনি।

---

৫৮. "আব্বা আমাকে নিজ হাতে খাইয়ে ঘুমিয়ে দিতেন। কতো গল্প, আবৃত্তি, ইসলামী গান গাইতেন। এভাবেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। ('আমার আব্বা' খান জেবুন্নেছা চৌধুরী 'মৃত্যুহীন প্রাণ' আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ; পৃষ্ঠা ১৪৮)

৫৯. হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা, সাক্ষাৎ করা, মহান কোন কিছুর ইচ্ছা করা, হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। পারিভাষিক অর্থে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মাধ্যমে সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ। (কামুসুল ফিকহী)।

৬০. ১ছেলে : হাবিবুল হাসান চৌধুরী মাসুম, ১ম মেয়ে নাসিমা আফরোজ, ২য় মেয়ে লায়লা নাসরিন, ৩য় মেয়ে শাম্মি পারভীন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিদেশ ভ্রমণ

মালয়েশিয়া গমন

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বা ইফসুর[৬১] আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে একজন গেস্ট স্পীকার হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে আব্বাস আলী খান সাহেব আগস্ট ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়া সফর করেন। এই সময় তিনি মালয়েশিয়ান ইসলামী যুব সংগঠন ABIM[৬২] এর বিংশতি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত সম্মেলনে যোগদান করেন। এর আগে তিনি একটি পারিবারিক কাজে থাইল্যান্ড সফর করেন। পরে ব্যাংকক থেকে কুয়ালালামপুর গমন করেন।

মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্য সফর

মালয়েশিয়ার কেলান্তান নামক রাজ্যটিকে পাস (PAS) নামের ইসলামী সংগঠন সরকার গঠন করে। আগস্ট দশ তারিখে খান সাহেব কেলান্তান সফর করেন। কেলান্তানের রাজধানী কোটাভারু বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান পাস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হাসান শুকরী। এ সফরের খান সাহেবের সংগী ছিলেন জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ তাহের ও জনাব আমিনুল ইসলাম। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে তিনি মেহমান হন।

কেলান্তান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

কেলান্তান রাজ্যের ইসলামী সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সাদাসিদা সহজ-সরল খোদাভীরু জিন্দেগী দেখে তিনি মুগ্ধ হন।[৬৩]

আবিম অফিসে

কেলান্তান রাজ্যে সফর শেষে খান সাহেব ১৪ আগস্ট কুলালালামপুর পৌঁছে আবিম অফিসে কয়েকটি আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রদের এক সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেন।

নও মুসলিম ইউসুফ ইসলামের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

মালয়েশিয়া সফরকালে প্রাক্তন পপ তারকা গায়ক ক্যাট স্টিভেনস বর্তমান ইউসুফ ইসলামের সাথে খান সাহেবের দ্বিতীয়বারের মতো সাক্ষাৎ হয়। এর আগে ১৯৮৪ সালে লন্ডন সফরকালে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি আবিমের দাওয়াতে মালয়েশিয়া সফর করেন।

শিক্ষা সমাবেশে যোগদান

১৫ই আগস্ট এশার নামাযের পর খান সাহেব বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে এক শিক্ষক সমাবেশে যোগদান করেন। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।[৬৪]

---

৬১. International Islamic Feradation of Sudents Organisations

৬২. Angkatan Belia Islam –MalayasiaAbim –

৬৩. মুখ্যমন্ত্রী একজন সাদাসিদে সহজ-সরল খোদাভীরু মুসলমান। প্রখ্যাত আলেম। ভারত, পাকিস্তান, কায়রো জামে আযহার থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। বিলাসিতার পরিবর্তে সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তিনি সরকারী ভবনে বাস করেন না। সরকার থেকে বেতন যা পান তার চল্লিশ ভাগ ছেড়ে দেন সরকারের জন্য, চল্লিশ ভাগ দেন সংগঠনকে এবং বিশ ভাগ মাত্র খরচ করেন নিজের জন্য। ইসলামী আদর্শের পতাকা বাহী। তাই হযরত ওমরের জীবন ধারা অনুকরণের চেষ্টা করছেন। (আব্বাস আলী খান, দেশের বাইরে কিছু দিন, আধুনিক প্রকাশনী, আগস্ট ১৯৯৫ পৃষ্ঠা নং ২৯)

৬৪. শ্রদ্ধেয় ডীন ও অধ্যাপকবৃন্দ ! আপনারা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত, গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং অনেক অনেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আপনাদের এই সমাবেশে আমন্ত্রিত ও উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করছি এবং আপনাদের উপস্থিতির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

আবিমের সম্মেলনে

১৬ আগস্ট থেকে আবিমের তিন দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। এ সম্মেলনে খান সাহেব বক্তব্য রাখেন।

মালয়েশিয়া থেকে সিংগাপুর

১৭ আগস্ট খান সাহেব মালয়েশিয়া থেকে সিংগাপুর গমন করেন। সেখানে জুরং ইস্টের মসজিদে হাসানাতে বাংলাদেশীয়দের এক সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। সিংগাপুর থেকে ব্যাংকক হয়ে তিনি ২০ আগস্ট ঢাকা পৌঁছেন।

তাঁর এই সমগ্র ভ্রমণ কাহিনীটি তিনি 'দেশের বাইরে কিছুদিন' শিরোনামে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। এটি দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য সাময়িকীতে কিস্তি আকারে প্রকাশিত হয়।

ফসিস-এর সম্মেলনে আমন্ত্রণ

যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের যেসব সংস্থা আছে সেগুলোকে নিয়ে একটা ফেডারেশন আছে। তাই ফসিস-ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস ইসলামি সোসাইটিজ। একান্নবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইসলামী সংস্থা ফসিসের সদস্য এবং সাতাইশটি সংস্থা সহযোগী সদস্য আর একটি আছে এমএসএস মুসলিম স্টুডেন্টস সোসাইটি। এটা হলো শুধু আরব ছাত্রদের। এটাও ফসিসের সদস্য। জুলাই ১৯৮৪ সালে ফেডারেশন অব ইসলামিক স্টুডেন্টস সোসাইটিজ অব ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড সংক্ষেপে ফসিস-এর গ্রীষ্মকালীন ট্রেনিং ক্যাম্পে বক্তা হিসেবে যোগদানের জন্য জনাব আব্বাস আলী খান আমন্ত্রিত হন।

যুক্তরাজ্য যাত্রা

৫ জুলাই ১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ বিমানের ডিসি-১০ চড়ে খান সাহেব যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ভারতীয় সময় এগারোটায় বোম্বে বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। বোম্বে থেকে গন্তব্য হচ্ছে এথেন্স। সময় লাগে ছ সাত ঘণ্টা। বাংলাদেশ সময় ৭.২০ মিনিটে সউদী আরব, লেবানন, ভূ-মধ্যসাগরের উপর দিয়ে ডিসি-১০ এথেন্স পৌছে। রাত ৯.১০ মিনিটে রোমের উদ্দেশ্যে বিমান এথেন্স ত্যাগ করে এবং প্রায় পৌনে এগারোটায় রোম পৌছে। রাত বারোটার পরে বিমান হিথরো বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রোম ত্যাগ করে। রাত দুটোর দিকে হিথরো বিমান বন্দরে অবতরণ করে। লন্ডন শহর থেকে প্রায় পনেরো-ষোল মাইল দূরে হিথরো বিমান বন্দর। প্রায় সতেরো-আঠার ঘণ্টা আকাশ পথে ভ্রমণের পর তিনি গন্তব্যে পৌছেন।

গ্লাসগো শহরে

স্কটল্যান্ডের একটি বড় শহর গ্লাসগো। লন্ডনের পরে যুক্তরাজ্যের তৃতীয় বা চতুর্থ বৃহত্তম শহর গ্লাসগো কার্লাইল সম্মেলন থেকে আব্বাস আলী খান সাহেব গ্লাসগো রওনা দেন। সন্ধ্যার আগে গ্লাসগো পৌছেন

সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আজ আপনাদের কোন উপদেশ দিতে দাঁড়াইনি। কারণ আপনারা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই নন, বরঞ্চ ভবিষ্যৎ জাতির স্থপতি। নতুন প্রজন্মকে নিয়ে একটা গৌরবউজ্জল জাতি গঠনের গুরু দায়িত্ব আপনাদের। এই দায়িত্ব-অনুভূতি আপনাদের অবশ্যই আছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ আপনারা নিশ্চয় জানেন বিশ্ব মানবতা আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত ও হতাশাগ্রস্ত। খোদাহীন, জড়বাদী পশ্চাত্য সভ্যতা মানব জাতিকে কল্যাণকর কিছুই দিতে পারেনি। দিয়েছে ক্ষুধা, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, নৈতিক দেওলিয়াপনা এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতির নামে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাই আজ ইসলাম ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোন বিকল্প পথ নেই। এ এক শাশ্বত সত্য যে, একমাত্র ইসলামই একটি সুস্থ, সুখী, ও সুন্দর সমাজ-সভ্যতা গড়তে পারে। এই সমাজ-সভ্যতা গঠনে আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। (আব্বাস আলী খান , দেশের বাইরে কিছু দিন, আধুনিক প্রকাশনী আগস্ট ১৯৯৫ পৃষ্ঠা নং ৪০-৪১)।

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন বাদ ফজর ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। লাঞ্চের পর গ্লাসগোর বিলাসবহুল জনজীবন পরিদর্শন করেন। বিশ্ববিখ্যাত হ্রদ লক-ক্যাট্রিন পরিদর্শন করেন।[৬৫]

পনেরো জুলাই ১৯৮৪ খান সাহেব গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। দুপুরে ইউকে ইসলামিক মিশন গ্লাসগো শাখার উদ্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজিত এক সম্মেলনে ভাষণ দেন। বেলা তিনটায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আগত ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সমাপনী ভাষণে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ওপর আলোকপাত করে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। গ্লাসগোতে দুদিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থানের পর বিকেল ৫.১০ মিনিটের ট্রেনে লন্ডনের উদ্দেশ্যে গ্লাসগো ত্যাগ করেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ব্রিটিশ লাইব্রেরী পরিদর্শন

১৯৮৪ সালের সতেরো জুলাই মংগলবার তিনি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম যাদুঘর বৃটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ যাদুঘর তৈরী হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। প্রাচীনকালের বর্ণলিপির মধ্যে হযরত ওসমান রা. -এর অনুমোদিত কোরআন পাকের একখানি কপি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। বৃটিশ মিউজিয়ামের উল্লেখযোগ্য অংশ হলো বৃটিশ লাইব্রেরী।[৬৬] দুনিয়ার বৃহত্তম লাইব্রেরীর মধ্যে এ একটি।

---

৬৫. এ পরিদর্শন সম্পর্কে খান সাহেব লিখেছেন 'ঘণ্টা খানেকের মধ্যে লক-কেট্রিনে পৌছালাম। পাহাড়ের মাঝে হ্রদ। হ্রদের তীরে লোকের ভীড়। রাস্তার একধারে পাহাড়। পাহাড়ের নানান ধরনের গাছপালা। অপর ধারে লম্বা হ্রদ। হ্রদের ওপারে পাহাড়। যুবক-যুবতী প্রেমিক-প্রেমিকারা হয়তো বা অভিসারে এসেছে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে ক্যামেরা। আমাদের সাথেও। হ্রদের ধারে রাস্তার উপরে সব বয়সের মানুষ পায়চারী করছে। পাহাড় ঘেরা হ্রদের মনোরম প্রাকৃতিক শোভা প্রাণভরে উপভোগ করছে। কেউ হ্রদে নৌকা বিহারে আনন্দ উপভোগ করছে, কেউ ছবির উপর ছবি তুলছে। ছেলে-চোকরার দল পাহাড়ের উপর নামা-ওঠা করছে। কোথাও অর্ধবয়সী দুজন সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসে হয়তো বা অতীতের কোন এক সুখকর অধ্যায়ের স্মৃতি সাগরে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। অনেকে হ্রদের পাড়ে রেস্তোরাঁয় বসে স্ন্যাকস স্যান্ডউইচ ও লাল পানি গিলছে। কৃত্রিম হ্রদের মাঝখানটায় আবার কৃত্রিম দ্বীপও রয়েছে'। (যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, আব্বাস আলী খান, আল ইহসান প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৫ : পৃষ্ঠা ২৭-২৯)

৬৬. এই লাইব্রেরী সম্পর্কে খান সাহেব লিখেছেন-'এর পাঠাগার (Reading room) বড়ো দেখার জিনিস। মাঝখানে গোল চত্বর এবং চারধারে ছোট-বড় সারি বাঁধা বসার দীর্ঘকার বিশিষ্ট আসনসমূহ অত্যাধুনিক ডিজাইনে তৈরী। পরিকল্পনা ANTONIO PANNIZI -এর ডিজাইন তৈরী SADNEY SMIREK -এ। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পাঠাগারটি তৈরী করা হয়। প্রায় চারশ লোক একসাথে বসে দিব্বি আরামসে পড়াশোনা ও গবেষণা কাজ চালাতে পারে। উপরে ১৪০ ফুট ব্যাস ও ১০৬ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এক মনোরম গম্বুজ আছে। লাইব্রেরীতে নিম্নলিখিত বিভাগগুলো উল্লেখযোগ্য-

১. The British Library Reference Division (রেফারেন্স বিভাগ)
২. Department of Printed Books (ছাপানো গ্রন্থ বিভাগ)
৩. Department of Manuscripts (পাণ্ডুলিপি বিভাগ)
৪. Department of Oriental Manuscripts and Printed Books (প্রাচ্যের পাণ্ডুলিপি ও ছাপানো গ্রন্থ বিভাগ)
৫. India Ofice Library and Records (ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও রেকর্ড)
৬. Science Referece Library (বিজ্ঞানের রেফারেন্স বিভাগ)
৭. Select Bibliography (নির্বাচিত গ্রন্থ বিবরণী বিভাগ)

সতেরোশ তিপ্পান্ন সালের বৃটিশ মিউজিয়াম অ্যাক্ট অনুসরণে এ লাইব্রেরী নির্মিত হয়। প্রথমে এর উদ্বোধন করা হয় ব্লুমসবারীর (BLOOMSBURY) মন্টেগু হাউজে। বহুস্তর অতিক্রম করার পর ১৭৫৭ সালে এটাকে রাজা দ্বিতীয় জর্জ বৃটিশ মিউজিয়ামের কাছে হস্তান্তর করেন। গ্রন্থ সংগ্রহের কাজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল জনৈক স্যার হ্যানস স্লোনের। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ। তিনি বহু বিষয়ের বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেন ১৭৫৩ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি তাঁর সংগৃহীত মূলবান গ্রন্থাবলী জাতির কাছে উইল করে যান এই শর্তে যে, তাঁর মেয়েকে বিশ হাজার পাউন্ড দিতে হবে। অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ম্যাপ রেকর্ড দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতির সংখ্যা প্রকাশই বাড়তে থাকে এবং বর্তমানে গ্রন্থের সংখ্যা এক কোটিরও বেশী। এখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীন ম্যাপ ও এটলাস সংরক্ষিত আছে। তার আলাদা ম্যাপ লাইব্রেরী নাম দেয়া হয়েছে। অনেকের সংগৃহীত ও তৈরী ম্যাপও বৃটিশ লাইব্রেরীতে দান করা হয়েছে। ১৮২৮ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের

Dhaka University Institutional Repository

বার্মিংহাম সম্মেলনে

লন্ডন থেকে বার্মিংহাম প্রায় একশত পঁচিশ মাইল। ১৮ জুলাই খান সাহেব বার্মিংহাম যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হন। দুপুরের আগে তিনি বার্মিংহাম দাওয়াতুল ইসলাম অফিসে পৌছেন। সেখানে বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। আসর নামাজের পর ইউকে ইসলামিক মিশন মসজিদে মুসল্লীগণের সামনে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর বর্তমান অবস্থা, যুক্তরাজ্যে মুসলামানদের দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন। পরে দাওয়াতুল ইসলাম অফিসে বাংলাদেশীদের সমাবেশেও কিছু কথা বলেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

লিস্টার ইসলামিক ফাউন্ডেশনে

লিস্টার যুক্তরাজ্যের অন্যতম বড়ো শহর। বার্মিংহাম ভ্রমণ করে খান সাহেব লিস্টার রওনা দেন।[৬৭]

লাইব্রেরী থেকে পঞ্চাশ হাজার ম্যাপ এখানে জমা দেয়া হয়। KING'S LIBRARY থেকে বহু সামুদ্রিক চার্ট ও এটলাস এখানে স্থানান্তরিত করা হয়। তার মধ্যে আছে সপ্তদশ শতাব্দীর ওলনদাজ সামুদ্রিক এটলাস অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ও ফরাসী সামুদ্রিক এটলাস। এখানে আছে জোন মিচেলের উত্তর আমেরিকার ম্যাপ। বৃটিশ হাইকমিশনার রিচার্ড ওসওয়াল্ড ও ম্যাপের মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসীর দখলকৃত স্থানগুলোর মধ্যে লাল কালি দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করেন। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ম্যাপ আছে, যা এমস্টারডামের জনৈক ব্যবসায়ী ১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্যভিষেক উপলক্ষে উপঢৌকন প্রদান করেন। এটা ছ'ফুট উঁচু ভূমণ্ডলের এটলাস যার মধ্যে তৎকালীন সর্ববৃহৎ ওলন্দাজ ম্যাপ রয়েছে। উক্ত ব্যবসায়ীর নাম ছিল জোহান ক্লেংকি (Johan Clencke)। বৃটিশ লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিভাগ আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতো মনে হয়েছে। তারপর INDIA OFFICE LIBRARY & RECORDS এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ'। (যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, আব্বাস আলী খান, আল ইহসান প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৫ : পৃষ্ঠা ৩৫-৩৭)

৬৭. লিস্টার ভ্রমণ সম্পর্কে খান সাহেব লিখেছেন : মাওলানা আবদুর রহীম তাঁর গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চল্লেন লিস্টার। লিস্টার যুক্তরাজ্যের অন্যতম বড়ো শহর। শহরের কোন কোন অঞ্চলে রাস্তার দু'পাশেই শুধু সারি সারি বাংলো প্যাটার্নের ঘরবাড়ি ইংল্যান্ডের প্রাচীর ঐতিহ্য বহন করছে। আবার কোন কোন অঞ্চলে আধুনিক বহুতলা প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। আমরা যাব ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। মাওলানা আবদুর রহীম ইতিপূর্বে মাত্র একবার এসেছেন এখানে। এতো বিরাট শহর ছোট-বড় অসংখ্য রাস্তা। একবার মাত্র কোন স্থান দেখার পর দ্বিতীয়বার খুঁজে বের করা যেমন-তেমন কথা নয়। তাই গন্তব্যস্থল বের করতে আমাদেরকে কয়েকবার চর্কিঘোরা ঘুরতে হলো। অবশেষে ২২৩ লন্ডন রোড ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পেয়ে গেলাম। ফটক পার হয়ে ফুল বাগানসহ ঘাসের মখমল বিছানো লনের পাশ গাড়ি পার্কিং করার প্রশস্ত জায়গা। গাড়ীর শব্দ শুনে ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানালেন ফাউন্ডেশনের জনৈক রিসার্স অফিসার জনাব মুহাম্মদ মানাযের আহসান। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন জনাব খুররমজাহ মুরাদের অফিস কক্ষে। তিনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মকর্তা। তাঁর সাথে শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৭৫ সালে মুক্তামুকাররমায়। দশ বছর পর পুনরায় আমরা মিলিত হলাম যুক্তরাজ্যের লিস্টার শহরে। বুকে জড়িয়ে ধরে এক অনাবিল শান্তি লাভ করলাম। আনন্দে চোখের পাতা ভিজে উঠলো। একটু পরে খবর পেয়ে ছুটে এলেন আমাদের এক পুরাতন বন্ধু সাইয়েদ ফাইয়াজুদ্দীন। তিনি রিয়াদের ওয়ার্লড এসেম্বলী অব মুসলিম ইউথস (ওয়ামী) থেকে এ ফাউন্ডেশনে এসেছেন কিছুকাল আগে। ডক্টর মানাযের ও ফাইয়াজুদ্দীন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রকল্প ও কাজকর্ম ঘুরে ঘুরে দেখালেন। ইসলামের বিভিন্ন দিকের ওপর গবেষণা ও সাহিত্য রচনার কাজ ব্যাপক আকারে করছে ফাউন্ডেশন দুপুরে মুরাদ সাহেবের বাড়িতে আমরা কজন মিলে লাঞ্চ করলাম। মাওলানা আবদুর রহীম আমাদের পৌছে দেবার পর বার্মিংহাম ফিরে গেছেন। তার খানিক পর লন্ডন থেকে চৌধুরী মঈনুদ্দীন এসেছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। বিকেলে মুরাদ সাহেব তাঁর অফিস কর্মচারীদেরকে নিয়ে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করছিলেন। এমন সময় লন্ডন থেকে আগত একজন বল্লেন, আজ সকালে জং পত্রিকায় দেখলাম ইউকে ইসলামিক মিশন লন্ডন আপনার সম্মানে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেছে আসরের সময়ে। আমার সম্বর্ধন আর আমার জানা নেই। এমনও হতে পারে যে তাঁরা দাওয়াতুল ইসলামের মাধ্যমে এ আয়োজন করেছন এবং তা সরাসরি আমাবে জানাবার তাঁদের সুযোগ হয়ান। আর দাওয়াতুল ইসলামের জেনারেল সেক্রেটারী চৌধুরী মঈনুদ্দীন তো আমাকে নিতেই এসেছেন তার জন্যে মুরাদ সাহেব বললেন তাহলে তো আর আমাদের সম্বর্ধনা করা যায় না। বিকেলে লন্ডন প্রোগ্রাম থাকলে তো একটু পরেই রওয়ানা হতে হয়। অতএব সকলকে বিদায় দিয়ে ট্রেনে লন্ডন ফেরার জন্য লিস্টার স্টেশনে গেলাম। মানাযের সাহেব ড্রাইভ করে স্টেশনে পৌছে দিয়ে বিদায় হলেন। (যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, আব্বাস আলী খান, আল ইহসান প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৫পৃ : ৪০-৪১)

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবন পরিদর্শন

বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স পরিদর্শন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-'দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আব্দুস সালাম সাহেবসহ মাটির তলা দিয়ে ট্রেনে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবনে গেলাম। টেমস নদী এঁকে বেঁকে লন্ডন শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত। শহরেই এর উপরে এগারোটি ওভার ব্রিজ আছে। টেমস নদী লন্ডন শহরের উত্তর থেকে একটা দ এর আকার তৈরী করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। ল্যাম্বেথ ব্রিজ এবং তার পূর্বে দিকে একটু দূরে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ। এ দু'টি ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে নদীর দক্ষিণ ধারে ল্যাম্বেথ প্যালেস এবং উত্তর ধারে পার্লামেন্ট হাউস। হাউস অব কমন্সের একটু খানি উত্তর-পশ্চিমে হাউস অব লর্ডস অবস্থিত। কয়েকশ মানুষ যুবক-যুবতী লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সাথীকে বললাম, আমাদেরকেও কি লাইনে দাঁড়াতে হবে? বললেন- না। আমাদের তো স্পেশাল কার্ড আছে। বিরোধীদলীয় একজন পার্লামেন্ট সদস্য মি ..... আমাদের নামে কার্ড ইস্যু করেছেন। যারা সরাসরি Admission order office -এ আবেদন করে, তাদেরকে লাইনে দাঁড়াতে হয়।

যাহোক, আরও কয়েকটি ফটক ও পুলিশের প্রহরা ডিঙিয়ে দোতলায় আগন্তুকের গ্যালারীতে (Strangers Galllery) গিয়ে পৌছালাম। স্পীকারের ডানে, বামে ও সামনে উপরের তলায় আগুন্তকের গ্যালারী। গ্যালারীতে নারী-পুরুষ গিজ গিজ করছে। খালি জায়গা দেখে বসে পড়লাম। অধিবেশনটি ছিলো প্রশ্নোত্তরের। পরিষদ কক্ষের গঠন একেবারে সেকেল। রাজসিংহাসনের ন্যায় আসনে স্পীকার সমাসীন। তাঁর সামনে কোন টেবিল নেই। সামনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসা কয়েকজন পার্লামেন্ট কর্মচারী ক্লার্ক অথবা সেক্রেটারীগণ। স্পীকারের ডানধারে সরকারী দলের এবং বামধারে বিরোধী দলের আসন। হাউস অব কমন্স পরিচালনা দেখলাম এবং প্রশ্নোত্তরে উথাপিত বিতর্ক শুনলাম। এদিন প্রধানমন্ত্রী মিসেস থ্যাচার উপস্থিত থাকেন না। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণই সকল প্রশ্নের জবাব দেন।

অন্যদিন এলে আলোচনায় আনন্দ পাওয়া যেতো। তাই ঘন্টা দেড়েক পর হাউস অব কমন্স পরিত্যাগ করলাম। তবে পার্লামেন্ট অভ্যন্তরে এবং রাজনীতির অংগনে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ট্রাডিশন বিদ্যমান। পর পর দু'জন মহিলা সদস্যকে বিরাধীদলীয় আসনেই দেখলাম এবং তারা কিছুক্ষণ পর পর উঠে চলে গেলেন'।[৬৮]

মাদাম তুসাউদের মমি হাউস পরিদর্শন

লন্ডনের মেরিলিবোন রোডে মাদাম তুসাউদের মমি হাউস স্থানীয় বাংলাদেশী প্রবাসী এক গাইডকে সাথে নিয়ে তিনি এ হাউস পরিদর্শন করেন।[৬৯]

---

৬৮. যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, আব্বাস আলী খান, আল ইহসান প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৫ পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।

৬৯. এ পরিদর্শন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'তবে ঘুরে ঘুরে যা দেখলাম তা সত্যিই অভূতপূর্ব, আনন্দদায়ক ও বিস্ময়কর। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক-গায়িকা, বৃটেনের রাজ পরিবারের বিভিন্ন সময়ের সমাবেশ, গল্প-গুজন, হাসি-ঠাট্টা ও রং তামাশার প্রতিমূর্তি, যেন একেবারে বাস্তব, একেবারে রক্ত-মাংসের এবং সজীব। দেহের রং, চুল, চোখের চাহনি, ভুরু, দেহ ও অংগ প্রত্যংগের ভংগিমাং সাজ পোষাক একেবারে অবিকল। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে এতে জীবনের প্রবাহ নেই, প্রাণের চাঞ্চল্য নেই। তহে হ্যাঁ এক জায়গায় দেখলাম জনৈকা রাজকুমারী রোগ শয্যায় শায়িতা। ডাক্তার উপুর হয়ে তাকে পরীক্ষা করছে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং রোগীনির পেট উঠানামা করছে। মনে হয় যেন অবিকল জীবিত মানুষ। ম্যাডাম তুসাউদের যাদুঘর বা বিস্ময়কর মমিঘর দেখতে এসেছে অসংখ্য নারী-পুরুষ, তরুণী-যুবতী। অর্ধনগ্না অপ্সরীর সংখ্যাও কম নয়। বোরকা পরিহিতা দু-চারজনকেও দেখলাম।

... যা কিছু দেখতে এসেছি তার একটা পশ্চাৎ পটভূমি আছে। যে বিশাল স্থানটি জুড়ে এখন London Planetarium এবং আধুনিক মমিঘর রয়েছে প্রতিদিন যাকে হাজার হাজার নর-নারী দেখতে আসে সেখানে ছিল ম্যাদাম তুসাউদের সিনেমা ঘর। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লন্ডনের উপর জার্মানীর প্রবল বোমা বর্ষণে সিনেমা ঘরটি ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর সিনেমার মালিককে এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এখন এখানে কি করা যাবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ ইসলাম (পপগায়ক ক্যাট স্টিভেনস) -এর সাথে সাক্ষাৎ

লন্ডন প্লানেটেরিয়াম হল পরিদর্শনের পর তিনি নরউইচের বেশ কিছু নওমুসলিমদের সংগে মিলিত হন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন। এরপর তিনি লন্ডন ফিরে নওমুসলিম ইউসুফ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।[৭০] কারণ নওমুসলিম ইউসুফ ইসলামের পুরোনো নাম Cat Stevens.

সিদ্ধান্ত হয় একটা Planetarium নির্মাণ করার যা হবে কমনওলেথের মধ্যে এক অভিনব বস্তু। যুদ্ধ থেকে যাওয়ার পর একটা Planetarium Projector এর অর্ডার দেয়া হয় জগতের সেরা কন্ট্রাক্টর Carl Zeiss of Oberkochen কে। তার পর কয়েক বছরের প্রচেষ্টা ও শমের ফলে সিনেমার ধ্বংসস্তুপের উপর গড়ে ওঠে London Planetarium এর বিটার বিশাল গম্বুজসহ অট্টালিকা। এডিনবরার ডিউক যুবরাজ ফিলিপ ১৯৫৮ সালে এ Planetarium ও মমিঘরের দারোদ্ঘাটন করেন। এখন Planetarium সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক। একটা বিরাট বিশাল গম্বুজের তলার দিকটায় আলো ফেলে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারকারাজি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ গম্বুজের ভেতর দিকের ছাদকে একটা কৃত্রিম আকাশে পরিণত করা হয়েছে।

আটান্ন সালের মার্চ মাসে পাঁচশ লন্ডনবাসী Zeiss Projector -এর চারধারে চক্রাকারে বসে তাদের জীবনে প্রথমবার লন্ডন দিগবলয়ের পশ্চাতের স্থাপিত একটি কৃত্রিম সূর্য দেখে। তারপর গম্বুজের তলায় কৃত্রিম আকাশে যখন আঁধার ঘনিয়ে আসে তখন তারা দেখতে পায় অসংখ্য তারকারাজি ঝকমক করছে। দর্শকেরা এতোটা মুগ্ধ এতোটা বিস্ময়বিমূঢ় হয় যে, তারা যেন সত্যিকার আকাশেই সূর্য ও তারকারাজি দেখছে।

বিগত কয়েক বছর Planetarium Projector -এর প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এখন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, এখন প্রচণ্ড মেঘ গর্জন, বিদ্যুৎ স্ফুরণ উল্কাপাত প্রভৃতি দেখানো হয়। জ্যোতির্বিদগণের বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এতে। আমার জীবনেরও এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জ্যোতির্বিদ্যার এ এক বিস্ময়কর আবিষ্কার সন্দেহ নেই। বৈজ্ঞানিক উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করার সাথে সাথে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ যদি সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁর কাছে মাথা নত করতেন, তাহলে মানবতার সত্যিকার কল্যাণই করা হতো। প্রদর্শনী শেষে যখন বেরুচ্ছিলাম তখন সে কথাটাই মনে মনে ভাবছিলাম। বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি অদম্য বিশ্বাস ও আনুগত্যসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অংগনে প্রবেশ করলে সমস্যা জর্জরিত দুনিয়ার চেহারাটাই পাল্টে যেতো'। (যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, আব্বাস আলী খান, আল ইহসান প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৫ : পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮)।

৭০. নওমুসলিম ইউসুফ ইসলামের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'বিকেল ৬.৫০ -এ লন্ডন ফিরে সোজা ৩ নং ফার্লং রোডে নও মুসলিম ইউসুফ ইসলামের সাথে মিলিত হলাম। আনন্দে বুকে চেপে ধরলেন যেন ছাড়তেই চান না। তিনি তাঁর অফিসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ছত্রিশ বছরের লম্বা তাগড়া জোয়ান। মুখে চাপদাড়ি, পরণে পায়জামা ও লম্বা কোর্তা হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল রং টকটকে উজ্জ্বল। স্বামী-স্ত্রী ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁকে অফিসের কাজে সাহায্য করেন, নিয়মিত অফিসে আসেন।

সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে ওঠার পর দেখতে পেলাম, সিঁড়ির একপাশে মসজিদ আর একপাশে ইউসুফ ইসলামের অফিস। আমাদের নরুইচ থেকে আসতে বিলম্ব হয়েছে বলে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী অফিসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ফার্লং রোডে পৌছার একটু আগেই মাগরেবের নামায শেষ হয়েছে। আমাদের নামায পড়া হয়নি বলে এখানে পৌছার পর প্রথমে নামায আদায় করলাম। নামাযের পর ইউসুফ ইসলামের অফিসে ঢুকলাম। তাঁর বোরকা পরিহিতা লেবাননী বেগম আমাদেরকে দেখে পাশের কামরায় চলে গেলেন।

বসে আলাপচারিত শুরু করলাম। নওমুসলিম ভাই ইউসুফের সাথে। গোলাপের মতো তাঁর ছোট্ট দুটি মেয়ে এসে নির্ভয়ে আমাদের গ ঘেঁষে দাঁড়ালো। একটাকে তো আমার কোলেই তুলে নিলাম। স্ন্যাকস, কোল্ড ড্রিংক ও আলাপচারি একত্রেই চলছি। সংক্ষেপে ইউসুফ ইসলাম তাঁর বিপ্লবী জীবনের কথা শুনাচ্ছিলেন। তাঁর কথা শুনে বড্ড ভালো লাগছিল। কিন্তু এক দেড় ঘণ্টা বিলম্বে পৌছেছি বলে তাঁকে বেশীক্ষণ আটকে রাখা ঠিক মনে করছিলাম না। তবুও তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনছিলাম আনন্দের সাথে। বিলম্বে পৌছেছি এবং হয়তো বা বেগম সায়োবাকে ঘরে ফিরে রান্নাবান্না সামলাতে হবে। তবু তাঁর কথা শুনতে ভালো লাগছে।

ইউসুফ ইসলাম ইসলামের বেশকিছু গঠনমূলক কাজও শুরু করেছেন। ইসলামিক সার্কেল অরগানাইজেন নামে একটি প্রতিষ্ঠানও তিনি কায়েম করেছেন। উদ্দেশ্য আধুনিক মনের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরা এবং ভবিষ্যৎ বংশধরকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলা। তিনি তাঁর মহল্লায় একটি প্রাথমিক স্কুলও কায়েম করেছেন। এতে বর্তমানে একশ শিশু ইসলামী শিক্ষা লাভ করতে পারে। ইতিমধ্যেই পাঁচশ মুসলিম অভিভাবকের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বৃহত্তর স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে। স্থানীয় এডুকেশন কমিটি অব রেন্ট মুসলমানদের এ ধরনের নিজস্ব একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার আবেদন মঞ্জুর করেছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপার নিয়ে এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান মিসেস স্টীল ও ডিরেক্টর মিসেস রিকাসের (Ricus) সাথে স্থানীয় মুসলমানদের আলাপ-আলোচনা চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৯৬৫-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ দশ বছরে পপ সংগীতে এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, ইউরোপ আমেরিকায় তার লক্ষ লক্ষ কপি গানের রেকর্ড বিক্রি হয়েছিল। অবশেষে তিনি হেদায়াত প্রাপ্ত হন। কোরআন পড়েন এবং ১৯৭৭ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

লন্ডন থেকে ঢাকা

৩০ জুলাই বৃটিশ এয়ারওয়েজের রাত ১০.৪৫ মিনিটের ফ্লাইটে হিথরো বিমান থেকে খান সাহেব ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন ত্যাগ করেন। লন্ডন থেকে দোহা হয়ে কোলকাতা। তারপর বিকেল তিনটায় কোলকাতা বিমান বন্দর ত্যাগ করে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।

ঢাকা বিমান বন্দরে

তেইশ দিনের সফর শেষে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণের পর বিমান বন্দরের অব্যবস্থাপনা দেখে তিনি খুব ব্যথিত হয়েছেন। চরিত্র ও আচরনগত দিক থেকে তিনি বৃটেন ও এ দেশের মানুষের মধ্যে একটি তুলনা মূলক অবস্থা তুলে ধরেছেন।[৭১]

মুসলমানদের এ ন্যায়সংগত দাবীর বিষয়টি অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। শুনলাম সেন্ট মেরিস চার্চেস (St Mrys charch) রেভারেন্ড রজার ম্যাসন নাকি বলেছেন, I welcome this move by Muslims in the borongh, It is long overdue ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে ফাদার ব্রায়ান ওয়ার্ড বলেছেন, There could be no objection to this plan.

বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে যেমন চিন্তাভাবনা চলছে, তেমনি চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করে থোকবে। কারণ এককালীন ক্যাট স্টিভেসন শুধু স্বগোত্র ও স্বধর্ম ত্যাগই করেননি, বরঞ্চ ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে পড়েছেন। অন্তরে তাদের কিছু জ্বালা তো থাকারই কথা। এখন দেখা যাক কী হয়।

বিদায়ের আগে তিনি আমাকে কিছু কাগজপত্র ও বই পুস্তক দেন। মুসলমান হওয়ার পরও তিনি কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে 'এমএসএ' আমন্ত্রণে তিনি আমেরিকা যাবেন বলে জানলেন। আমি তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি উপর থেকে নিচে রাস্তায় এসে শেষবারের মতো বুকে বুক মিলিয়ে মেহমানদারীর সুন্নাত আদায় করলেন'। (যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, আব্বাস আলী খান, আল ইহসান প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৫ : পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)

৭১. 'বিমান থেকে নেমে ইমিগ্রেশনের সীমান্ত পেরিয়ে লাগেজ কালেকশনের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। ঢাকার স্যাঁতস্যাঁতে ও গরম আবহাওয়ায় গা দিয়ে ঘাম ছুটছে। পরনে প্যান্ট ও শিরওয়ানী। বলতে ভুলে গেছি আমি যখন লন্ডন বিমান বন্দরের ডিপার্চার লাউঞ্জে ঢুকি, তখন আমার সাথে ব্রিফকেস ও একটা সাইড ব্যাগ। বিমান বন্দরে জনৈকা মহিলা কর্মচারী আমার সাইড ব্যাগ আটকিয়ে দিল বললো দুটো সাথে নেবার নিয়ম নেই। যে কোন একটা নিয়ে যান। সে কোন কথাই শুনতে রাজী না। ব্যাগে বেশ কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র আছে। অপরের সীমানায় ঝগড়া করে লাভ নেই মনে করে ব্যাগটা ছাড়তে হলো। সে ওটাকে লাগেজে দিয়ে লাগেজ ট্যাক আমার হাতে দিল। অবশ্যি দেখলাম কিছু লোকের হাতে একাধিক বহনযোগ্য জিনিস। তার কারণটা কি মহিলাটির যাত্রীর সাথে বচসায় পরাজয় বরণ না পক্ষপাতিত্ব, বুঝলাম না। যাই হোক, ঢাকা বিমান বন্দরে ঘর্মাক্ত কলেবরে দাঁড়িয়ে আছি আমার লাগেজের জন্যে। অনেকক্ষণ পরে দুনম্বর লাগেজ পেয়ে গেলাম। কিন্তু সাইড ব্যাগটির তখনো কোন পাত্তা নেই। বড়ো দুঃখ হতে লাগলো কারণ মনটানা ব্যাগটা ছিলো বড়ো মূল্যবান এবং ততোধিক মূল্যবান জিনিস রয়েছে তার ভেতরে ও বাইরে পকেটগুলোতে।

অবশেষে অনেক বিলম্বে ব্যাগটা পাওয়া গেল। কিন্তু কাস্টম চেকিং -এর সময় দেখা গেলো কোন এক পাকা চোর অতি অল্প সময়ের ভেতরেই ব্যাগের বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস হাত ছাপাই করেছে। ব্যাগের তলাটা ছিল একেবারে বাজে। তাই সেটা খুলে আবার লাগিয়ে রাখা হয়েছে বড়ো কায়দা করে। বিলেতে কি দেখলাম আর দেশে ফিরে কি দেখছি? আমার কয়েকশ টাকার জিনিস চুরি হওয়ার যে দুঃখ তারচেয়ে লক্ষ গুণে দুঃখ পেলাম আপন জাতির চরিত্র দেখে। সমাজের সর্বস্তরে চুরি, লুট ও দুর্নীতি। সেসবের দৌরাত্ম সর্বত্র। আমার একুশ দিনের বিলাত সফরের শেষে আজ জমা-খরচ করতে বসেছি। সফরের সর্বত্র চেনা-অচেনা বন্ধুদের প্রাণঢালা ভালোবাসা, মন জয়কারী আতিথেয়তা, বিশ্বের প্রায় পাঁচশ তিরিশটি দেশের দ্বীনি ভাইদের সাথে মিলিত হয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক সুন্দর-সুখকর বন্ধনের অনুভূতি ইংরেজ নওমুসলিম ভাই-বোনদের সাথে সাক্ষাতের পর বুকের মধ্যে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ-উদ্যম, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিল্পকলা প্রভৃতিতে বৃটেনের চরম উন্নতি সাধন এবং তার অধিবাসীদের চরিত্র ও আচরনের পাশাপাশি আমাদের সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদতা এবং বিশেষ করে আমাদের জাতীয় চরিত্র এসব কিছুর যোগ-বিয়োগ করে যোগফল দাঁড়ায় অনেকটা হরিষে বিষাদ। তবে পাঠকের মনে বিষাদের ছায়া না পড়ুক এটাই আমার কামনা'। (যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, আব্বাস আলী খান, আল ইহসান প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৫ : পৃষ্ঠা নং ৮৩-৮৪)।

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সফর

৮ আগস্ট থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ পর্যন্ত মোট পঞ্চাশ দিন খান সাহেব বিদেশ সফর করেন। এ সফরে তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও ফ্রান্স সফর করেন।

আমেরিকায় গমন

ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা বা ইকনার[৭২] আমন্ত্রণে জনাব আব্বাস আলী খান যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন। 'Lking Islam With America'- আমেরিকার সাথে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপন অর্থাৎ আমেরিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার এ কেন্দ্রীয় বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইকনা -এর চতুর্দশ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে। তিন দিন ব্যাপী এ সম্মেলনে ইকনা -এর সাংগঠনিক বৈঠক, সদস্য বৈঠক, আত্মসমালোচনা এবং আগামী বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচন ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিলো।[৭৩]

---

৭২. Islamic Cercle of North America.

৭৩. সম্মেলনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে আব্বাস আলী খান লিখেছেন-'তিন দিন ধরে ইকনার সম্মেলন। আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হলো : Lking Islam With America'- আমেরিকার সাথে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপন অর্থাৎ আমেরিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার। এ তিন দিনের সম্মেলনে ইকনার সাংগঠনিক বৈঠক, সদস্য বৈঠক, আত্মেসমালোচনা এবং আগামী বছরেরর জন্যে সভাপতি নির্বাচন।

প্রথম দিনের বিকালের অধিবেশনে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল : ইসলামিক স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম ইন এশিয়া- এশিয়ার স্বাধীনতার জন্যে ইসলামী সংগ্রাম। আফগানিস্তান অভিজ্ঞতার ওপর বক্তব্য রাখবেন- সাইফুর রহমান হালিমী। মধ্যপ্রাচ্য ইসলামী আন্দোলন-বক্তা আহমদ আল কাদী। ইন্তিফাদাহ- বক্তা মুহাম্মদ আকরাম আবুল হারিস। বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন বক্তা আব্বাস আলী খান। দ্বিতীয় দিনের বৈকালিক অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়- বাণী ও বাণীবাহক আন্দোলন ও কর্মী। উক্ত বিষয়ের অনুসরণে- কিভাবে তিনি (নবী মুহাম্মদ স.) বিশ্ব জয় করলেন? এর ওপর বক্তব্য রাখবে সুদানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসান তুরাবী। অন্যরা (পরবর্তীকালে) কি করলেন? এ বিষয়ের বক্তা আব্বাস আলী খান। আমরা কিভাবে এটা করতে পারি? এ বিষয়ে বক্তা খুররম মুরাদ, পাকিস্তান।বিশেষ পরিস্থিতির কারণে আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও সুদান থেকে যথাক্রমে সাইফুর রহমান হালিমী, আহমদ আল কাদী এবং হাসান তুরাবী আসতে পারেননি। সুদানের সামরিক সরকার হাসান তুরাবীকে জেলে রেখেছেন। মুহাম্মদ আকরাম আবুল হারিসের পরিবর্তে ইয়াসার সারেহ ফিলিস্তিনে ইনতিফাদাহর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ পেশ করেন।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বললাম : বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও উত্থান- সুদীর্ঘ ৫৬২ বছর বাংলাদেশে মুসলিম শাসন এ অঞ্চলটির ক্রমশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হওয়া, এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে হরহামেশা ইসলামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। হাজার হাজার মুসলমানের সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভীর তাহরিকে মোজাহেদীনে যোগদান করে ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা প্রভৃতি বিষয় এ কথারই প্রমাণ যে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনশক্তি ইসলামী শাসন ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি।

আমার বক্তব্যে আরও বললাম- দুনিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্যে মুসলিম যুবসমাজের উচিত ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র সমৃদ্ধ হয়ে প্রজ্ঞা, মেধা, সহনশীলতা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করা। অতঃপর আমি বাংলাদেশের মুসলমানদের সংগ্রামী ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলি, আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এ দেশের জনগণের আছে। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার তীব্র আগ্রহ তাদের রয়েছে। জনগণ এ জন্যে তাদের আপোষহীন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

পরদিন ১২ আগস্ট বৈকালিক অধিবেশনে আমার বক্তব্যে এ কথা বলি যে, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. যে আদর্শ, যে জীবন বিধান এবং যে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করলেন তা কিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন রা. অমলিন ও অবিকৃত রাখলেন। তাঁদের পর খেলাফত যে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হলো এবং খেলাফতের নামে স্বৈরশাসন কায়েম হলো, হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ কিভাবে তাকে আবার ইসলামী খেলাফতের রূপদান করলেন, তার ওপরও কিছু আলোকপাত করলাম। অতঃপর জাহেলিয়াতের হাতে রাষ্ট্রশক্তি যাওয়ার পর কিভাবে আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফী রহ., ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. প্রমুখ আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং পরবর্তীকালে ইমাম গাজ্জালী রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. প্রমুখ মনীষী সংগ্রাম করে ইসলামের প্রাণশক্তি জিইয়ে রাখেন তাও আলোচনায় রাখলাম। অতঃপর এ উপমহাদেশে ইসলামকে নির্মূল করার যে ষড়যন্ত্র বাদশাহ আকবর করেছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

নিউইয়র্ক শহরে

সম্মেলনের শেষে জনাব খান নিউইয়র্ক শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে সন্ত্রাসী হামলার ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার -এর ১২০ তলায় উঠে তিনি বারশ ফুট উপর থেকে নিউইয়র্ক শহরকে উপভোগ করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'পনের তারিখ শহর একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে কেটে গেল। World Trade Centre- এর ১২০ তলার উপরে ওঠলাম। হাজার-বারশ ফুট উপর থেকে নিউইয়র্ক শহর দেখতে মনে হলো যেন ছোট ছোট খেলাঘর দিয়ে সাজানো। তার ভেতরে ভেতরে রাস্তায় গাড়ীর বহর যেন চলমান পিঁপড়ের সারি। শহরের পূর্ব পাশেই বিরাট-বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর। তারপর কিছু কেনাকাটার জন্যে গিয়ে পৌছালাম বহুতল শপিং কমপ্লেক্স কিং প্লাজায়। তিন তলার উপর গাড়ি পার্ক করে ঢুকলাম দোকানে। দোকান ত নয়, একটি বিরাট মার্কেট। যা চাইবেন তা-ই পাবেন। এমনকি ফলমূল, শাকসব্জি, তরিতরকারী থেকে শুরু করে জুতা, স্যান্ডেল, পোষাক পরিচ্ছদ, বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্য, তেল-সাবান-পাউডার, সুটকেস, ব্রীফকেস, গয়নাগাটি, ছাতা, লাঠি, বাসন-বাটি, ঘড়ি, কলম, শিশুদের খেলনা এবং আরও বহু কিছু পাবেন। এখানে-সেখানে ক্যাশে বসে আছে যুবতী-আধবয়সী মহিলা। এক গাদি জিনিসপত্তর কিনে সে মহিলার কাছে নিয়ে গেলে খটাখট কম্পিউটারে সেসবের মূল্য হিসাব করে বলে দেবে। মূল্য চুকে দিয়ে মাল নিয়ে চলে আসুন। এসব দোকানের ক্যাশে কালো মেয়েদেরই দেখা যায় বেশীর ভাগ। লিফটের সাহায্যে নিচতলা উপর তলা যাওয়া যায়'।[৭৪]

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের সম্মেলন

আমেরিকা সম্মেলন শেষ করে তিনি লন্ডনে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে লন্ডন গমন করেন। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইস্ট লন্ডনে ১৮৫ হোয়াইট চ্যাপেল রোডে।[৭৫]

প্রবাসী প্রকৌশলীদের সংবর্ধনা

আমেরিকান এসোশিয়েশন অব বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ার্সের কর্মকর্তাগণ তাঁকে একটি সংবর্ধনা দেন। এ সম্বর্ধনায় তিনি বক্তব্য রাখেন। এ সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এম. আরজ উল্লাহ, সেক্রেটারী ড. গোলাম

সে ষড়যন্ত্র কিভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ., তার ওপরও আলোকপাত করলাম। সর্বশেষে এ উপমহাদেশে সাইয়েদ আহমদ শহীদের তাহরীকে- মুজাহেদীন যার স্থায়ী সাফল্য অর্জিত না হলেও আজো লক্ষ-কোটি মুসলমানের মধ্যে জেহাদের প্রেরণা বলবৎ রেখেছে'। (বিদেশে পঞ্চাশ দিন, আব্বাস আলী খান, শৌমী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৭ : পৃষ্ঠা নং ১৭-১৯)।

৭৪. বিদেশে পঞ্চাশ দিন, আব্বাস আলী খান,শৌমী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৭: পৃষ্ঠা নং ২১

৭৫. এ সম্মেলন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'উনিশ তারিখের অধিবেশন ছিল প্রশিক্ষণমূলক। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল **'দুনিয়া আখেরাতের কর্মক্ষেত্র'**। মৃত্যুর পরে অনিবার্য রূপে যে চিরন্তন জীবন রয়েছে, তার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে এ দুনিয়া বা দুনিয়ার জীবন এখানে যে বীজ বপন করা হবে, মৃত্যুর পরের জীবনে সে বীজেরই ফসল ভোগ করতে হবে। তাই এ জীবনের কর্মের ওপরই পরকালীন জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।

সেসব জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে একজনকে মুসলিম বা মুসলমান বলা যেতে পারে তার মধ্যে একটি আখেরাত বা মৃত্যুর পরের জীবন ও জীবনকে সুখী ও সুন্দর করতে হলে দুনিয়ার জীবনে হর-হামেশা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মেনে চলতে হবে পরকালীন জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে যারা সুখী ও সুন্দর করতে চায়, দুনিয়ার জীবন তাদের চরিত্র ও আচরণ এক ধরনের হবে। যারা তা বিশ্বাস করে না তাদের চরিত্র হবে অন্য ধরনের। মোট কথা পরকালীন জীবনের অনিবার্যতা এবং সে জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সুখ-শান্তি লাভ করতে হলে দুনিয়ার জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করতে হয়ে তার ওপরই আলোকপাত করে বক্তব্য রাখলাম'। (বিদেশে পঞ্চাশ দিন, আব্বাস আলী খান, শৌমী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৭ : পৃষ্ঠা নং ২৩-২৪)।

Dhaka University Institutional Repository

এফ আখতার, ওয়াশিংটন শাখার সভাপতি মি. মুহাম্মাদ রমজান আলী, সেক্রেটারী মি. আনোয়ারুল করিম এবং সমিতির অন্য সদস্যগণ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

মসজিদে মুহাম্মদীর সেমিনার

মসজিদে মুহাম্মদীর সেমিনারে খান সাহেবের আলোচ্য বিষয় ছিল- ইসলাম ও সমাজবিপ্লব। এই সেমিনার সম্পর্কে তিনি লিখেছেন -

'নয়টি মুসলিম সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এ সেমিনার। আমার আগে বক্তব্য রাখলেন, কামারুজ্জামান, ড. আবুল কাসেম, মুহাম্মাদ ইউসুফ ও হামীদুল্লাহ। সভাপতি মসজিদে মুহাম্মদীর ইমাম কালো মুসলিম আবু তালিব আব্দুস সামাদ।

আমি আমার বক্তব্যে বল্লাম, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টমণ্ডিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রসূলগণ দুনিয়াতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে এসেছিলেন। সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈরি করে তাদেরকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা সমাজ বিপ্লবের সংগ্রাম করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সা. এভাবেই সমাজ পরিবর্তন করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তনের কাজের সূচনা হয়। ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে আমি বলি, দাওয়াতী তৎপরতার মাধ্যমেই মুসলিম সমাজ জীবন্ত থাকতে পারে। আমি আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে বলি যে, আল্লাহ শুধু মানুষের স্রষ্টাই নন-মানুষের বাদশাহ, শাসন ও আইনদাতাও। তিনি মানুষের গোটা জীবনের জন্যে যে আইন বিধান দিয়েছেন তা পুরোপুরি মেনে চলাই মানুষের কাজ। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষের আল্লাহর নিকটে ফিরে গিয়ে তার কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তৃতীয়ত, আল্লাহ তায়ালা মানুষের কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তাকে পুরস্কার অথবা শাস্তি দেবেন। এ মতবাদ ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন গড়তে হবে। আর এ জিনিসই দাবী করে তার চিন্তা-চেতনায়, তার জীবন পথে, চরিত্রে, আচার-আচরণে এবং কথা ও কাজে এক বিপ্লবী পরিবর্তন সূচিত করার। আর উন্নতি অগ্রগতির প্রক্রিয়া শুরু হয় পরিবর্তনের মাধ্যমে। এ পরিবর্তন মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তির, দুঃখ কষ্ট থেকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, দারিদ্র্য থেকে স্বচ্ছলতার এবং নৈতিক অধঃপতন থেকে এর উন্নত নৈতিক মানের। ইসলাম মানব সমাজে এ পরিবর্তন দাবী করে।

অতঃপর পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরে বলি, এ সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করলেও মানব জাতিকে কল্যাণকর কিছুই দিতে পারেনি। এ সভ্যতা মাত্র পঁচিশ বছরের ব্যবধানে মানব জাতির ঘাড়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ সামরিক বেসামরিক লোক নির্মমভাবে নিহত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিকলাংগ ও অকর্মন্য হয়েছে। কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। অগণিত বিধবা ও এতিম শিশুর আর্তনাদ-হাহাকারে আকাশ-বাতাস মথিত হয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরিণামে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি, যৌন অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও চরম নৈতিক অবক্ষয় মানবজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এখনও বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে শোষণ, লুণ্ঠন, বর্ণবাদ ও আধিপত্যবাদের প্রতিযোগীতা চলছে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতা গুণগত দিক দিয়ে প্রাচীন জাহেলিয়াত থেকে পৃথক কিছু নয়। আরব জাহেলিয়াতের কথাই ধরা যাক। তারও নিজস্ব একটা সভ্যতা ছিল, সংস্কৃতি ছিল, মূল্যবোধ ছিল, তাদের শিক্ষা কেন্দ্রও ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল, আতিথেয়তার জন্যে আরবদের সুখ্যাতি ছিল। বীরত্ব ও সাহসিকতা তাদের ছিল তুলনাহীন। তথাপি তাদের অত্যাচারে-নিষ্পেষণে মানুষের মধ্যে হাহাকার-আর্তনাদ শোনা যেত। সময়ের দাবী ছিল একটা পরিবর্তনের। নবী মুহাম্মদ সা. এসে সে পরিবর্তনই এনেছিলেন। তিনি শুধু ইসলামের বাণী প্রচারের জন্যেই আগমন করেননি। বরং তাঁর আগমন ছিল সমাজ পরিবর্তনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে, সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার এক নবযুগ সৃষ্টি করার জন্যে। এ জন্যে তিনি মানুষকে সংগঠিত করেন, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ করেন, তাদের নিয়ে ক্রমাগত তেইশ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম করেন। তিনি মানুষের যে সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়েন, তার কোন নজির নেই, তুলনা নেই। নবী মুহাম্মদের সা. সমাজ পরিবর্তনের সে প্রক্রিয়া-পদ্ধতিই আমাদের অনুসরণ করতে হবে'।[৭৬]

এয়ার এন্ড স্পেস মিউজিয়াম পরিদর্শন

২৮ আগস্ট তিনি আমেরিকান ন্যাশনাল এয়ার এন্ড স্পেস মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, তার বাস্তব প্রমাণ এ মিউজিয়াম দেখলে বুঝা যায়। সেসব রকেট ও নভোযান উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ করে নিরাপদে ফিরে এসেছে তার প্রত্যেকটি এ মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। যে নভোযান চন্দ্রগ্রহে অবতরণ করে নিরাপদে দুনিয়ার বুকে ফিরে আসে তাও রাখা আছে। চাঁদ থেকে যে তিন ধরনের মাটি আনা হয়েছিল, তাও সযত্নে রক্ষিত আছে। একটি মাটির খণ্ড কালো রঙের, একটি ধবধবে সাদা এবং একটি সাদা ও কালোর ফুটকে দেয়া। ১৯৮৬ সালে যে নভোযানটি (ভয়েজার) কোথাও না থেমে এবং কোথাও জ্বালানী গ্রহণ না করে পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাও রাখা আছে। এমনি আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের নমুনা এখানে রাখা আছে।

ভয়েস অব আমেরিকায় সাক্ষাৎকার

এরপর খান সাহেব ভয়েস অব আমেরিকার কার্যালয়ে যান। ভয়েস অব আমেরিকার কার্যালয়টি একটি সরকারের বিরাট সেক্রেটারিয়েটের মতো। তিনি ভয়েস অব আমেরিকায় একটি সাক্ষাৎকার দেন। এটি ছিল প্রায় ১২/১৩ মিনিটের সাক্ষাৎকার।

কানাডায় ইকনা' র সম্মেলন

৩১ আগস্ট খান সাহেব আমেরিকা থেকে কানাডায় যান। ইকনা কানাডা জোনের সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে টাওইংগো নামক এক নিভৃত পল্লীতে। এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা। এ সম্মেলনে খান সাহেব বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল : 'জিহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা'।[৭৭]

নায়াগ্রা জলপ্রপাত পরিদর্শন

কানাডা সফরকালে তিনি বিশ্ববিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত পরিদর্শন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে যা দেখলাম তার ওপর একখানা গ্রন্থ রচনা করা যায়। কিন্তু তার ফুরসৎ কোথায়?

নাগ্রা নদীর এক কিনারায় জলপ্রপাত। অপর তীরের উপরে সুন্দর কর্মব্যস্ত শহর গড়ে উঠেছে। আমরা এখানে পৌছাবার পর বহু চেষ্টা করে গাড়ি পার্ক করলাম। অতঃপর উপর থেকে প্রায় ২৫/৩০ ফুট নিচে নদী তীরে

---

৭৬. বিদেশে পঞ্চাশ দিন, আব্বাস আলী খান, শৌমী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৭ : পৃষ্ঠা নং ৩৩-৩৪।

৭৭. এ সম্পর্কে আব্বাস আলী খান লিখেছেন : 'এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রখতে গিয়ে বলি যে, নবীগণের ইসলামী আন্দোলন তথ জিহাদের পথে বাতিল শক্তিই সর্বদা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আধুনিক যুগে বাতিল শক্তি ছাড়াও তাদের তাঁবেদার মুসলিম শাসক গোষ্ঠীও এ পথের বিরাট প্রতিবন্ধক। মুসলিম দেশগুলোর জনগণ ইসলামের প্রতিষ্ঠা মনে-প্রাণে চাইলেও ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী ত চায় না। ফলে জনগণ ও তাদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ লেগেই থাকে। যার জন্যে জাতির সার্বিক উন্নতি-অগ্রতি ব্যাহত হচ্ছে। কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই ইসলামের অগ্রগতি পছন্দ করে না। আল্লাহর পথে সংগ্রাম জোরদার করার এবং আদর্শ ইসলামী চরিত্র পেশ করার আহ্বান জানিয়ে বলি যে, আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকদের পক্ষেই মুসলিম জাহানে ইসলামের নব জাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব। মুসলিম জাহানে ইসলামের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারলেই দুনিয়ায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং বিশ্ব মানবতা শান্তি ও মুক্তির সন্ধান পাবে'।

(বিদেশে পঞ্চাশ দিন, আব্বাস আলী খান, শৌমী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৭ : পৃষ্ঠা নং ৪৩-৪৪)।

Dhaka University Institutional Repository

নেমে গেলাম যেখানে সার্বক্ষণিক কার্নিভাল বা আমোদ প্রমোদের মেলা বসে। প্রশস্ত রাস্তার পাশে ফুলবাগান ও বিরাট সবুজ ঘাসের আস্তরণ। এ ঘাসের উপর একসাথে যোহর, আসর নামায পড়ে নিলাম। সাথে ছিল চিকেন রোস্ট ও রুটি। তার সাথে ফ্রুটজুস। তাই পেট ভরে খেয়ে নিলাম। তার পর ঘুরে-ফিরে দেখা। অসংখ্য নারী-পুরুষের ভিড়।

মেয়েদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই ক্যামেরা, ক্যামেরা আমাদের সাথেও আছে। আমার সাথী নিউইয়র্কে একটি অটোমেটিক ক্যামেরা কিনেছেন শখ করে। এখানে তার ব্যবহার হচ্ছে।

নদীর সুউচ্চ পাড় রেলিং দেয়া। তার ৮/১০ হাত পর গাড়ি চলাচলের প্রশস্ত পথ। পথের এপাড়ে ফুলবাগান কার্নিবাল, বিভিন্ন দোকানপাট, হোটেল, ক্যান্টিন, পাবলিক ওয়াশরুম। রেলিং -এর পাশে মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে নদীর ওপাড়ের জলপ্রপাতের চিত্তহরণকারী দৃশ্য উপভোগ করছে। খচাখচ ক্যামেরার শুটিং হচ্ছে। আমাদেরও চলতে হলো। মেঘ নেই। বৃষ্টিপাত নেই। ওন্টরিও হ্রদের লক্ষ লক্ষ টন পানি শক্ত পাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে নদীর রূপ নিয়ে দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে। পানির ছিটাগুলো দূর থেকে শুভ্রমেঘমালার মতো মনে হয়। তাই আকাশ মেঘহীন হলেও জলপ্রপাতের ওপর দিগন্তে সুস্পষ্ট রঙধনু (Rainbow) ভেসে ওঠে। তার ছবি নেয়ার জন্যে ক্যামেরাওয়ালারা খচাখচ শুটিং করতে থাকে। আমরাও বেরসিক হতে পারিনি।

নিয়াগারা NIAGARA) বা নাগ্রার আকর্ষণীয় বস্তু অনেক। তার মধ্যে কুইন ভিক্টোরিয়া পার্ক, কতশত বিচিত্র রঙের ফুল বাগান। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আকাশ ছোঁয়া স্কাইলন টাওয়ার ও তার মাথায় চড়ার জন্যে লিফট আছে। তার সাথে ভিক্টোরিয়া পার্ক রেস্তোরা। আমাদের মেলাগুলোতে যেমন শিশুদের জন্যে নাগরদোলা থাকে তেমনি তার অতি উন্নত ধরনের নাগর দোলাও আছে, যাকে বলে স্প্যানিশ অ্যারোকার (AEROCAR)।

যারা দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে, মৃত্যুর পর কোন জীবন আছে বলে যারা বিশ্বাস করে না, জীবনকে কানায় কানায় উপভোগ করাকেই যারা জীবনের সার্থকতা মনে করে তাদের জন্যে NIAGARA FALLS স্বর্গই বটে। এখানে রং বেরঙের সাজপরা হুরপরী আসে। এখানে ফুলকলিদের খিল খিল করে হাসা ফুলবাগান আছে, অতি উপাদেয় খাদ্য ও ফলমূল আছে। পাশ দিয়ে কুলকুল নাদে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী আছে। কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বেহেশতের সাথে এর সবের যে কোন তুলনাই হতে পারে না, খোদাদ্রোহী মানুষ তা বুঝবে কি করে। তাই ক্ষণিকের আনন্দঘনো পরিবেশকে তারা স্বর্গ মনে করে। এখানকার একটি কথা না বলে পারলাম না। আমরা অনেকক্ষণ ধরে জলপ্রপাতের সৌন্দর্য উপভোগ করার পর শপিং কমপ্লেক্সে ঢুকলাম। সাথীগণ ঘুরে-ফিরে রকমারি জিনিসপত্র দেখছেন। দু-একটা কিনছেনও। আমি দাঁড়িয়ে থেকে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই দোকানের বাইরে এসে কোথাও বসবার জায়গ খুঁজছিলাম। ফুলবাগানে এখানে-সেখানে বেঞ্চ পাতানো আছে। বসা যায় কিন্তু বৃষ্টির ছিটা পড়ছিল। তাই দোকানের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি। এক জোড়া মানুষ কোথা থেকে এলেন। স্বামী-স্ত্রী অবশ্যই হবেন। সাথে ৩/৪ বছরের একটি শিশু। মহিলাটি তাঁর স্বামী ও সন্তানকে রেখে সম্ভবত : ওয়াশরুমে গেলেন। ভদ্রলোক আমার পাশে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন। আমার পরনে প্যান্ট ও শার্ট। শার্টের বুক পকেটে আরবীতে আল্লাহ্ লেখা সোনালি রঙের একটা চাকতি সেফটিপিন দিয়ে লাগানো আছে। ভদ্রলোকে দৃষ্টি তার ওপরেই নিবদ্ধ হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল যেন কিছু বলবেন। কিন্তু বলতে পারছেন না।

এমন সময় আমার সাথীরা এসে গেলেন। আমি অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? বল্লেন- আপনি মুসলমান। বল্লাম- জি হ্যাঁ।

তখন আমাদের সকলেরই একটা স্বর্গীয় আনন্দে বুক ভরে গেল। মনে হলো প্রাণভরা কোলাকুলি করি। তবে আমাদের সাথী কুরবান সানী চৌধুরী ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। ভদ্রলোকের

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ি কোরিয়া, কানাডায় চাকুরী করেন। নাম মুহাম্মদ ইউনুস। ইসলামে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ভাষা, বর্ণ ও পার্থিব জাতিগত পার্থক্য দূরে নিক্ষেপ করে আমাদেরকে একে অপরের হৃদয়ের কাছে টেনে আনলো'[৭৮]।

টরেন্টো ভ্রমণ

কানাডায় দ্বিতীয় বার ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি টরন্টো গমন করেন। টরন্টো কানাডার সর্ববৃহৎ শহর। ওন্টারিও প্রদেশের রাজধানী। ওন্টারিওকে কানাডার হৃৎপিণ্ড বলা হয়। তিনি টরেন্টোর বিভিন্ন স্থান পদির্শন করেন[৭৯]।

ম্যানহার্টানে সংবর্ধনা

নিউইয়র্কের ম্যানহাটান পাবলিক স্কুল মিলনায়তনে তাকে বাংলাদেশী প্রবাসীদের পক্ষ থেকে একটি সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।[৮০]

জামাইকা মসজিদে বক্তৃতা

শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর। জামাইকা মসজিদে জুমার নামাযের আগে মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখেন।

---

৭৮. বিদেশে পঞ্চাশ দিন, আব্বাস আলী খান, শৌমী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৭ : পৃষ্ঠা নং ৪৬-৪৭।

৭৯. টরেন্টো বিশ্বের অভিজাত শ্রেণীর শহর। লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, টোকিও, রোম প্রভৃতি শহরের অভিজাত শ্রেণীর লোক এখানে বাস করে। টরেন্টোতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়। পাঁচটি টেকনিক্যাল কলেজ আছে। লন্ডন ও নিউইয়র্কের পরে এটি ইংরেজী ভাষাভাষীদের শহর। এখানে আছে রয়াল ওন্টারিও এবং ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল টাওয়ার (C.N TOWER) তার উচ্চতা ১৮১৫ ফুট। পৃথিবীর সর্বোচ্চ টাওয়ার। এতে চক্রাকারে আবর্তনকারী বিরাট রেস্তোরাঁ রয়েছে দুঃখের বিষয় (C.N TOWER) দেখার ফুরসৎ হয়নি। টরেন্টো ত্যাগ করার আগের রাতে মিসিসাগীতে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে ও ডিনার থেকে ফেরার সময় (C.N TOWER) এর পাশ দিয়ে ফিরেছিলাম। তখন রাত প্রায় বারোটা। অসংখ্য বিজলীবাতির শুভ্র উজ্জ্বল আলোকে টরেন্টো নগরী তখন এক অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করেছে। রাত একটার মধ্যেই নাইট ক্লাব ও মদ্যশালা বন্ধ হয়ে যায়। তারও আধঘণ্টা পর সাব-ওয়ে-মাটির তলার রেলগাড়ী বন্ধ হয়ে যায়। শ্রান্ত-ক্লান্ত শহরটি তখন ঘুমিয়ে পড়ে।

৮০. সংবর্ধনা সম্পর্কে খান সাহেব লিখেছেন 'বেলা তিনটায় তেলাওয়তে কালামে পাকের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন আসাদুজ্জামান খান। উদ্বোধনী ভাষণ দেন যাকিরুল ইসলাম। মানপত্র পাঠ করেন ডা: এ এস এম মান্নান। সভাপতিত্ব করেন মাওলানা সমির উদ্দীন আহমদ। মানপত্রের জবাবে আমি বলি মানব রচিত সকল তন্ত্রমন্ত্র মানব সমাজের সমস্যা সমাধানে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র স্বয়ং লন্ডন, ওয়াশিংটন ও মস্কোতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ও হচ্ছে। ইসলামই যে মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা ও মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি, সে কথা আজ পাশ্চাত্যের চিন্তাশীলগণও উপলব্ধি করা শুরু করেছেন এবং ইসলামের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ বেড়েই চলেছে।

আমি আরও বলি যে, ইসলাম এখন আর এশিয়া ও আফ্রিকা মরুভূমি ও বনাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরঞ্চ একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও জীবন বিধান হিসাবে সারা বিশ্বে এক গুঞ্জরণ-আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সে গুঞ্জরণ এ যুক্তরাষ্ট্রেও শুনা যাচ্ছে। এখন এ দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনার কথা উল্লেখ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এবং এ কথা বলি যে ইসলামের ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণের আগ্রহ-উদ্দীপনা নতুন কিছু নয়। দূর অতীত থেকেই তারা ইসলাম কায়েমের সংগ্রাম করে আসছে। মুজাহেদীন আন্দোলন, ফারায়েজী আন্দোলন এবং ইসলামী সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে তারা অশেষ ত্যাগ ও কুরবানীর পরিচয় দিয়েছে। অতীতের বিভিন্ন গৌরবময় আন্দোলনেই তারা যথার্থ ভূমিকা পালন করেছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করে বলি যে, এ সব সমস্যা সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ অবশ্যই করব'। (বিদেশে পঞ্চাশ দিন, আব্বাস আলী খান, শৌমী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৭ : পৃষ্ঠা নং ৬৬-৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

প্যারিস ভ্রমণ

বাইশে সেপ্টেম্বর খান সাহেব প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তার সাথে ছিলেন মামুন আযমী। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-'সকাল সকাল নাশতাপাতি সেরে পাতালপুরীর রেলগাড়িতে চড়ে ভিক্টোরিয়া রেল স্টেশনে গেলাম। এখান থেকে ট্রেনে মাটির উপর দিয়ে ডোভার বন্দর পর্যন্ত যেতে হবে। তারপর ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ওপারে বুলন বন্দর থেকে আবার ট্রেনে প্যারিস যেতে হবে। লন্ডন-প্যারি বিমান চলাচলও করে। সময় কিছু কম লাগলেও পয়সা খরচ বেশী। তাই লন্ডন থেকে ট্রেনে যাওয়াই ঠিক হয়েছে।

ইংলিশ চ্যানেল পানির জাহাজেই পার হতে হয়। তবে সম্প্রতি কিছুকাল যাবত এক অভিনব ব্যবস্থা চালু হয়েছে চ্যানেল পাড়ি দেয়ার। এক উদ্ভূত যানবাহন আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীগণ। এ না পানির জাহাজ আর না উড়োজাহাজ। এ অদ্ভুত যানটির নাম দেয়া হয়েছে হোভার ক্রাফ্ট (HOVER CRAFT) অথবা হোভার স্পীড (HOVER SPEED)। ইংরেজী হোভার শব্দের অর্থ বাতাসে ভেসে থাকা বা ফুলে থাকা হোভার ক্রাফ্ট অর্থ বাতাসে ভাসমান। এ তরীতে আবার ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল গতি সঞ্চার করা হয়েছে। তার ফলে হয়েছে হোভার স্পীড'।[৮১]

আইফেল টাওয়ার পরিদর্শন

প্যারিসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু আইফেল টাওয়ার। এ সম্পর্কে খান সাহেব লিখেছেন -'প্যারিসে দেখবার অনেক কিছু থাকলেও দুর্ভাগ্য যে সময় নেই। তথাপি জালাল সাহেবের গাড়িতে করে শহর দেখতে বেরুলাম। শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু আইফেল টাওয়ার (EIFFEL TOWER)। আইফেল টাওয়ার দেখার উদ্দেশ্যেই চল্লাম। কিন্তু পথে এক দুর্ঘটনার কারণে যানজট সৃষ্টি হওয়ায় প্রায় ৪০ মিনিট আটকা পড়ে রইলাম। আমরা যখন আইফেল টাওয়ার চত্বরে পৌছালাম তখন রাত প্রায় বারোটা।

টাওয়ারকে কেন্দ্র করে চারধারে মেলা বসে। বহু রকমের সৌখিন জিনিস বিক্রি হয়। যুবতী মহিলাও দিব্বি দোকান নিয়ে বসে থাকে। বিকিকিনির সাথে ফষ্টি-ফাষ্টিও চলে রাত বারোটা পর্যন্ত।

আমরা টাওয়ার আরোহনের জন্যে যখন টিকেটঘরের কাছে গেলাম তখন জানতে পারলাম যে সর্বশেষ লিফট উপরে উঠে গেছে। তারপর আর কোন লিফট উঠবে না। কারণ রাত বারোটা পার হয়েছে। আমাদের অগত্যা হতাশ হয়েই ফিরতে হলো'।[৮২]

---

৮১. বিদেশে পঞ্চাশ দিন, আব্বাস আলী খান, শৌমী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৭ : পৃষ্ঠা নং ৮১-৮২)

৮২. প্রাগুক্ত: পৃষ্ঠা ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ইলমে তাসাওউফ চর্চা

আব্বাস আলী খান ফুরফুরা শরীফের পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের খাস খলিফা শাহ সূফী আলহাজ্জ সায়েমউদ্দীন আহমেদ সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন, খান সাহেব সরকারী চাকুরী ছেড়ে বাড়ি আসার পর তাঁর শ্বশুর তাঁকে ফুরফুর শরীফের পীর সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। পীর সাহেব তখন যশোরের এনায়েতপুরে অবস্থান করেছিলেন। খান সাহেব এবং তাঁর শ্বশুর এবং আরো দু'জনকে সাথে নিয়ে যশোর রওনা হন। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে চড়ে কালিগঞ্জ পৌছেন। সেখান থেকে এনায়েতপুর পৌছেন। এখানে ফুরফুরার গদিনশীন পীর মাওঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের হাতে বায়আত করে মুরীদ হয়ে যান। পীর সাহেব খান সাহেবকে ইসালে সাওয়াব মাহফিলে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে দাওয়াত করলেন। শ্বশুর সাহেবের শরীর খারাপ বিদায় তিনি বাড়ীর পানে রওয়ানা হলেন আর খান সাহেব একাই ফুরফুরা শরীফের পানে রওয়ানা হয়ে যান। মাহফিলে খান সাহেব পীর সাহেবের সাথে দেখা করলেন। এতে পীর সাহেব খুশী হলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। এবং খাস মেহমান হিসাবে দায়রা শরীফে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, দায়রা শরীফের কক্ষটি ছিল মাওঃ ফারুকী সাহেবের। ফারুকী সাহেব মাওঃ আবুল কালাম আজাদের দুটি বই দিলেন। একখান "আল জিহাদ ফি সাবিল্লিাহ" এবং অন্য খানা "হিযবুল্লাহ"। প্রথমটি অনুবাদ করার দায়িত্ব তাঁকে দিলেন এবং দ্বিতীয়টি ডঃ শহীদুল্লাকে[৮৩]।

পরবর্তীতে বইটির অনুবাদ না করলেও বইটির ভাব অবলম্বনে বাংলা এবং ইংরেজীতে দুটি প্রবন্ধ লিখেন। মাসিক মুহাম্মাদী ও সাপ্তাহিক মুসলিমে প্রকাশিত হয়।

এলমে তাসাওউফের ময়দানে তরক্কি ছাড়াও মাওলানা আযাদের বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে জানার প্রচণ্ড আগ্রহ তৈরী হয়। উর্দুমনা ছিলেন বলে তিনি কিছু উর্দু বই কিনে পড়াশোনা শুরু করে দেন এবং পীর সাহেবের দরবারে ঘনো ঘনো যাতায়াত শুরু করেন এবং পীর সাহেবও তাকে সবকের ওপর সবক দেন।

খান সাহেব ছিলেন এলমে তাসাউফ[৮৪] এর দুর্দান্ত ছাত্র। পীর সাহেব বল্লেন উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। তাই সবকের ওপর সবক এবং বহু পর্যায় অতিক্রম করে তাঁর দৃষ্টিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে পোঁছেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি

---

৮৩. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ খৃ. ১০ই জুলাই, শুক্রবার (২৭আষাঢ়, ১২৯২ বঙ্গাব্দ) পশ্চিম বঙ্গেও চব্বিশ পরগনা জিলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী মফিজ উদ্দিন আহমদ। তাঁর মাতা- হুরুন্নিসা চব্বিশ পরগনার জলশিয়ার অধিবাসী কাজী আব্দুল লতিফের কন্যা। শৈশবে তিনি নিজ গ্রামে মকতবে ভর্তি হন। এরপর ১৮৯৯ সালে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষা পাস করেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। স্কুল জীবনেই তিনি একাধিক ভাষা শিখেন। ১৯০৬ সালে তিনি এফ এ ফাস করেন। ১৯১০ সালে সংস্কৃতে বি এ পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে তুলনা মুলক ভাষা তত্ত্বে এম এ ফাস করেন। ১৯১৪ সালে বি এল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৬ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা করেন। ১৯২৮ সালে প্রাচীন বাংলার অন্যতম নিদর্শন চর্যাপদের পদকর্তা কহ্নি ও সরহের সম্পর্কে অভিসন্দর্ভ লিখিয়া Docture de Literateure ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ শে জুলাই ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। বর্তমান শহীদুল্লাহ হলের উত্তরে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩শ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪১৭-৪২০)।

৮৪. তাসাওউফ (تصوف) : (১) শব্দ প্রকরণ, শব্দটির ধাতুমূল صوف (ص و - ف অর্থ-পশম, উল) হতে বাব-ই تفعل এর ক্রিয়ামূল(মাসদার) تصوف (অভ্যন্ত রূপে) পশমী পোশাক পরিধান করা। (لبس الصوف {সাম'আনী}) অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং 'সূফী' হয়ে সূফী দরবেশের ন্যায় (মোটাসোটা পশমী) পোশাক পরিধান এবং নিজেকে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সূফীবাদী (متصوفاله) জীবনযাপনের জন্য নিবেদিত (ওয়াক্‌ফ) করাকে ইসলামী পরিভাষায় তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে এর অর্থ নিজেকে সূফীসুলভ জীবনের জন্য সমর্পিত করা। মোটকথা, ভাষা তত্ত্বের বিচারে সূফী শব্দটি সূফ-এর সম্বন্ধ বাচক শব্দ। অনেক হাদীছে উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স. পশমী বস্ত্র পরিধান করেছেন। (বুখারী, কিতাবু'ল-লিবাস ১ম খণ্ড)। এখানে এটি ও উল্লেখ্য যে, সূফীসুলভ জীবন যাপন ও বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরিধানের পারস্পরিক সম্বন্ধ এতই অগভীর ও অপ্রয়োজনীয় যে, ওটা দ্বারা ইসলামের সকল সূফী-দরবেশের জন্য ব্যাপকভাবে সূফী শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কুশায়রী (র.) সূফ শব্দের সহিত সূফী শব্দের সর্ম্পক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন- এটা শব্দটির মাত্র একটি দিক: কিন্তু সূফীগণ পশমী পোশাক পরিধান করাকেই তাদের বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

ফুরফুরা শরীফের খলীফা হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এতে তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে জানার পিপাসা কমেনি। মনের মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা। কাঙ্ক্ষিত বস্তু যেন নাগালের বাইরে।

এরই মধ্যে ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে তিনি জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান এবং মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থাবলী পড়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর তিনি পীর সাহেবকে জানান এবং জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং দাওয়াত ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করেন। পীর সাহেব তার বক্তব্য শুনে বলেন, "বাবা! এটাই তো দ্বীনের আসল কাজ। আমি তো এই উদ্দেশ্যেই লোক তৈরি করছি। আপনি জানপ্রাণ দিয়ে এ কাজ করে যান"।

দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী

'আব্বাস আলী খান দিনের ছব্বিশ ঘণ্টা সময় সুনির্দিষ্ট রুটিন মাফিক চলতেন। ২৪ ঘণ্টার রুটিনে নিয়ম মেনে চলতেন বলেই তিনি আজীবন সুস্থ ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতেন। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করতেন। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। ফজরের সালাত মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করতেন। ফজরের সালাতের পর এক ঘণ্টা পরিমাণ সময় হাল্কা বিশ্রাম নিতেন, এর পর সকালের নাস্তা খেতেন, চা পান করতেন এবং সাংগঠনিক বৈঠকের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে অথবা অফিসে যেতেন। আর বৈঠক বা অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন না থাকলে পড়ার টেবিলে বসে পড়ালিখা শুরু করতেন। তিনি যখন অফিস করতেন প্রতিদিন সকাল ৯টায় অফিসে আসতেন। জোহরের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করে বাসায় যেতেন। দুপুরের খাবার গ্রহণ করে হাল্কা বিশ্রাম নিতেন। আবার আছরের নামাজ অফিসে এসেই অফিসের সংলগ্ন মসজিদে জামায়াতে পড়তেন। এশার নামাজ মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করে বাসায় চলে যেতেন।

বাসায় গিয়ে রাতের খাবার গ্রহণ করে দশটা/সাড়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তেন। সবকিছুই ছিল সুশৃংখল এবং সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি নিরিবিলি চুপচাপ কাজ করতেন। তাঁর চেম্বারে কোন লোক আছে কিনা বাহির থেকে তা বুঝা যেতো না। এমন চুপচাপ এবং নীরব থাকতো তাঁর কক্ষ। নীরবে গবেষণায় লিখায় মগ্ন থাকতেন। তাঁকে কখনো গল্প গুজবে সময় কাটাতে দেখা যায়নি। "তিনি তাঁর সব কাজে একটি স্টাইল মেইনটেইন করতেন চালচলন, খাওয়া, দাওয়া এবং কথা বলায় তাঁর নিজস্ব ধরন ছিল- যা সকলকে আকর্ষণ করতো। কোন গর্ব কোন অহংকারের লেশমাত্রা নেই অথচ তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতো প্রতিটি কাজে"[৮৫] তিনি নিজের কাজ নিজে করতে ভাল বাসতেন। তিনি শিশুদের নিয়ে ইসলামী গান শুনতেন। তার অন্তর ছিল খোলা ধবধবে সাদা। সে ধবধবে অন্তরে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েমের স্বপ্নই ছিলো খচিত, মুদ্রিত। তিনি নিজ হাতে শাকসবজি ভাজি, ডিম ভাজি, হরলিকস ইত্যাদি বানিয়ে খেতেন। গেস্ট আসলে তাদের নিজহাতে বানিয়ে কিছু খাওয়াতেন। তিনি নিজ হাতে ড্রাফট করতেন। এমনকি টাইফ করতেন। ব্যক্তিগত ইবাদতে ফরহেজগারীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তাঁর তাকওয়ার তুলনা হয় না। খসুখজুর সাথে তিনি নামায[৮৬]

পরিচিতি সাব্যস্ত করেননি (ولـــكـــن القوم لم يخـــتصـــوا بلـــبس الصـــوف) এবং প্রায় সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, س و - ف ধাতুমূলটি উচ্চারণ নির্দেশনা (ও ধ্বনি ব্যঞ্জনায়) এমনভাবে সম্বদ্ধ না হইলে 'সূফী' পরিভাষাটি কখনও এত অধিক ব্যাপকতা সাফল্য অর্জন করিত না। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৪)

৮৫. স্মৃতির পাতায় মহান নেতার জীবনের কয়েকটি খণ্ড ছবি, মাযহারুল ইসলাম, আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ-পৃষ্ঠা ১২৪

৮৬. নামায ফারসি শব্দ, আরবীতে সালাত, যার অর্থ ধর্মীয় প্রার্থনা। নামায ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয়। সালাত সকালে, মধ্যাহ্নে, দ্বিপ্রহরের পর, বিকেলে, সন্ধ্যায় ও রাতে পাঁচবার আদায় করতে হয় (আল-কুরআন, ১১ : ১১৪, ২০ : ১৩০, ২৪ : ৫৮, ৩০ : ১৭-১৮)। দিনে পাঁচবার নামায পড়া বাধ্যতামূলক। নামাযে আরবি ভাষা ব্যবহৃত হয়। মক্কা শরীফের মসজিদুল হারামে অবস্থিত পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে একা অথবা সমবেতভাবে জামাআতে নামায আদায় করা যায়। জামাআতে নামায পড়ায় সওয়াব বেশি। বাংলাদেশে মহিলারা সাধারণত ঘরেই নামায আদায় করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পড়তেন। অন্যকে নামায পড়ার তাকিদ দিতেন। তিনি জুমায়ার দিন আগে মসজিদে যেতেন। এবং সকলকে জুমায়ার দিন আগে মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। বলতেন এত অনেক নেকী হয়।

"বড় তাহাজ্জদ গুজার ছিলেন তিনি। ফযর ওয়াজিব ও সুন্নত নামাযসমূহ তো বটেই, নফল নামাযসমূহও তিনি নিয়মিত আদায় করতেন। নামাযের হিফাযতের ক্ষেত্রে এবং খুশু-খুজুর সাথে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগামীতা আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো। পঁচাশি বছর বয়সেও বিশ রাকা'ত তারাবীহর নামায পড়তেন। আমরা তাঁরই ইমামতিতে তারাবিহ পড়তাম। আমাদের জোয়ানদের মধ্যে কেউ যদি কখনো বিশ রাকা'তের কম পড়ার কথা বলতো, তখন তিনি কলতেন, রমযান মাসতো দুহাতে সওয়াব কামাই করার মাস! এ মাসে যতো বেশি সওয়াব সঞ্চয় করা যায়, ততোই লাভ। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলতেন তাবেয়ী ও তাবেয় তাবেয়ীদের যুগে মক্কার লোকেরা বিশ রাকা'ত তারাবি পড়ছে শুনে মদীনার লোকরা ছত্রিশ রাকা'ত পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। এটা ছিলো সওয়াব অর্জনের প্রতিযোগিতা। তিনি প্রায়ই নফল রোযা রাখতেন, সপ্তাহে একটি রোযা রাখতেন।"[৮৭]

ব্যক্তিগত জীবনে মরহুম খান সাহেব ছিলেন আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। ইসলামের বিধান মোতাবেক যে সকল ইবাদত সম্পাদন করে একজন মুমিন তাকওয়ার গুণ অর্জন করে আল্লাহর রঙ্গে নিজকে রঙ্গিন করে তোলে তিনি ছিলেন তার অন্যতম। আল্লাহ তাঁকে মুহসীন বান্দা হিসেবে কবুল করেছেন এটাই আমাদের বিশ্বাস।

'আব্বাস আলী খান পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, নিয়তের নিষ্ঠা ও ইখলাস, তাকওয়া ও পরহেজগারী, আদল ও ইহসান, ইবাদত বন্দেগী ও ইত্তেবায়ে রাসূলের দিক থেকে এবং ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের ময়দানে সবর, ইস্তিকামত, কুরবানী ও ইতমীনানে কলবের দিক থেকে ছিলেন 'আস-সাবিকুনাস সাবিকুনও' অর্থাৎ অগ্রগামীদের মধ্যে যারা অগ্রগামী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

"যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে। তারা হবে ঐসব লোকের সাথী ও সহযোগী। যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবী সিদ্দীক শহীদ এবং শুদ্ধ সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। কতো উত্তম সাথী এরা"[৮৮]।

স্বভাব-চরিত্র

আব্বাস আলী খানের দৈহিক গঠন, স্বভাব প্রকৃতি, চরিত্র এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত মাধ্যমগুলোর সাহায্য নেয়া হয়।

১. সমসাময়িক বিশেষ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
২. নিকট আত্মীয়দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ।
৩. আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ।
৪. তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী।

উক্ত মাধ্যমগুলো হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রতিবেদনটি সাজানো হয়েছে।

নামাযের জন্য নামাযীদের পোশাক ও দেহ পবিত্র থাকা প্রয়োজন। নামাযের জায়গাটিও পবিত্র হওয়া জরুরী। নামাযের জন্য সাধারণত জায়নামায বা মাদুর ব্যবহার করা হয়। নামায আদায় করার সময় মাথায় টুপি পরা সুন্নাত এবং জুতা খুলে রাখাই প্রচলিত বিধান। নামাযের জন্য উযু করতে হয়।(বাংলাপিডিয়া বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ২০০৪)

৮৭. আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম : আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ ; আব্দুস শহীদ নাসিম : পৃষ্ঠা : ১৭

৮৮. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصلحين وحسن أولئك رفيقا সূরা আন নিসা : ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

দৈহিক গঠন

"'আব্বাস আলী খানের উচ্চতার দিক থেকে মধ্যম আকৃতির দেহের রং গৌর বর্ণ, মাংসল, প্রণমত হালকা ও শেষ বয়সে শরীরে একটু মেদ হয়েছিল এবং একটু লম্বা চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর নাক ছিল খাড়া, চিকন ও সুন্দর, চুল ঘন-কৃষ্ণ, দেহে হালকা পশম এবং বাহুদ্বয় ছিল মধ্যম আকৃতির।"[৮৯]

বেশভূষা

খান সাহেবের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল পরিচ্ছন্ন পুত-পবিত্র ও পরিপাটি। তিনি প্রথম জীবনে টিপটপ দামী শার্ট, পেন্ট, কোর্ট, টাই পরতেন। এ প্রসঙ্গে খান সাহেব বলেন, "গাড়িতে উঠার আগে আমাকে প্যান্ট পরা টিপটপ সাহেবী পোষাকে দেখেছেন নিশ্চয়"[৯০]। পরবর্তীতে তিনি পাঞ্জাবী-পায়জামা পরতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৌখিন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর নাতনীর হাতের কাজ করা পাঞ্জাবী পরতেন। নিজেই ডিজাইন ছাড়া সাদা পাঞ্জাবী কিনে নাতনিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। দৈনন্দিন নামাজের জন্য পাক-সাফ করে আলাদা লুঙ্গি রাখতেন। তিনি জিন্নাহ টুপি ব্যবহার করতেন। শেরওয়ানী-পেন্ট পরিধান করতেন। ঘরোয়া পরিবেশে লুঙ্গি পরতেন। অধিকাংশ সময় টুপি পরতেন। তাঁর কাপড়-চোপড়, টেবিলপত্র সুন্দরভাবে গুছানো থাকত। তাঁর কক্ষে গেলে বুঝা যেত তিনি একজন রুচিশীল মানুষ ছিলেন।

অভ্যাস

চা সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে পান খেতেন। তবে অতিমাত্রায় পান খেতেন না। সব সময় অল্প খাবার খেতেন। প্রায়দিন বিকেলে চা নিজের হাতে তৈরী করতেন। তিনি নিজহাতে আতিথিয়তা করতে ভাল বাসতেন। কখনো কখনো তাঁর কক্ষে গেলে তিনি নিজ হাতে চা বানিয়ে খাওয়াতেন। সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষভাবে আতর ব্যবহার করতেন। ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে একটি ভাল আতরের ঘ্রাণ বের হতো। সর্বদা পরিপাটি থাকতে তিনি ভালোবাসতেন।

আচার-ব্যবহার

খান সাহেব ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও স্বল্পভাষী, কিন্তু সবসময় তাঁর কথার মধ্যে হাস্যরসের মিশ্রণ থাকতো। অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে জীবনযাপন করতেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে তিনি কোনদিন নিজেকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা মনে করেননি। তিনি কখনো ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলতেন না। কখনো তিনি কৃত্রিম কথা বলেননি। প্রতিশ্রুতি ভংগ করেননি কখনো। কখনো কাউকেও মন্দ কথা বলেননি। বক্তৃতায় হোক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় হোক, কখনো কারো ব্যাপারে তিনি অশালীন কথা উচ্চারণ করেননি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গালাগাল করা তো দূরের কথা কখনো মর্যাদাহানিকর কোন কথা তিনি বলেননি। তাঁর বক্তব্য খুবই বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট হতো। আলাপচারিতায় কখনো কখনো নির্দোষ রসিকতা করতেন। প্রত্যেককে সম্মানজনক সম্বোধন করতেন, কম কথা বলতেন, অর্থবহ কথা বলতেন।

প্রদর্শনেচ্ছা, অহংবোধ, দাম্ভিকতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, ছিদ্রান্বেষণ এবং বিপদে অধিরতা প্রকাশ ইত্যাদি ত্রুটি হতে খান সাহেব মুক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। সবচেয়ে বড় ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পারিবারিক জীবনে। খান সাহেবের স্ত্রী বহু বছর যাবৎ প্যারালাইসড অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এ অবস্থায় স্ত্রীকে রেখে, ইসলামী আন্দোলনের জন্য সারাদেশে ও বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। কারো কাছে তাঁর স্ত্রীর অসুখের কথা প্রকাশও করতেন না।

---

৮৯. সাক্ষাৎকার খান জেবুন্নেছা চৌধুরী (খান সাহেবের একমাত্র কন্যা)।

৯০. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ; পৃষ্ঠা : ১২ প্রকাশক : দিলরুবা আখতার, বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্য ও সহকর্মীর সাথে আচরণের ভারসাম্য রক্ষা করতেন, তিনি সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। নিজ হাতে আতিথেয়তা করতে ভালোবাসতেন। সফরসঙ্গীদের ছাড়া তিনি কখনো খেতেন না। আলাদা খেতে দিলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। খাবার টেবিলে ড্রাইভারও অন্তর্ভুক্ত থাকত।

ছাত্রদের কাছে ছিলেন তিনি অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক। ১৯৫৭ সালে হাই স্কুলের চাকুরী ছাড়লে ছাত্ররা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে চাকুরীর ইস্তেফাপত্র প্রত্যাহারের জন্য। এতে বুঝা যায় তিনি কতটুকু জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন।

আখেরাতকেন্দ্রিক জীবন গড়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি তীব্রভাবে অনুধাবন করতেন। পার্থিব জীবনের প্রাচুর্য্য-বিত্ত বৈভব ইত্যাদি সবই মানুষকে পিছুটান দেয়। যারা এর কবলে পড়ে তাদের পক্ষে পিছুটান মুক্ত হয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয় না। নেহায়েত বেছে থাকার জন্য যা প্রয়োজন অর্থ্যাৎ যা না হলে নয় এতটুকু চিন্তাতেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকতেন। রাসূলের সাহাবীদের মতই ছিল তাঁর জীবনযাপন[৯১]।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল। ভদ্র, মার্জিত, ও পরিপাটি জীবনযাপন করতেন। তিনি অত্যন্ত রুচিবান ছিলেন, নিজের কাজ নিজেই করতেন, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজের কাপড় নিজে ধুইতেন এবং ইস্ত্রি করতেন। তিনি সব কাজ সঠিক সময়ে করতেন। জীবনে তিনি কথা ও কাজে অপূর্ব মিল রক্ষা করে চলতেন। তাঁর চাইতে বয়সে ছোট হলেও তিনি অসংকোচে দায়িত্বশীলের আনুগত্য করতেন। আনুগত্য ও শৃংখলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ নানা, আদর্শ অভিভাবক। তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি মনে কষ্ট নেননি, অধৈর্য হননি। তিনি যে তাঁর সন্তানকে কতটুকু আদর-স্নেহ করতেন তাঁর একমাত্র মেয়ে খান জেবুন্নেছা চৌধুরী তাঁর বর্ণনা দিয়ে বলেন "আব্বা আমাকে নিজ হাতে খাইয়ে ঘুমিয়ে দিতেন। কতো গল্প, আবৃত্তি, ইসলামী গান গাইতেন। এভাবেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। আব্বা খুব সুন্দর রান্না করতে পারতেন। শখের বসে মাঝে মাঝেই আমাকে নিয়ে রান্না করতেন, নাস্তা তৈরী করতেন।"[৯২]

খান সাহেব তাঁর একমাত্র কন্যার ঘরে জন্ম নেয়া সন্তানদের অর্থাৎ তাঁর নাতি-নাতনিদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি মাঝেমধ্যেই নাতি-নাতনিসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে কুরআনের দারসের অনুষ্ঠান করতেন। তিনি নাতি-নাতনীদেরকে বলতেন, "যে মেয়ে বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। বিয়ের পরও মেয়ে নাতি-নাতনী ও তাদের বাচ্ছাদের সাথে দুনিয়ায় যেমন আল্লাহ আমাকে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন, পরকালেও আল্লাহ যেনো আমাদের সবাইকে নিয়ে বেহেস্তে একসাথে থাকার সুযোগ করে দেন।"[৯৩] এতে বুঝা যায় তিনি একজন আদর্শ নানাও ছিলেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি ইসলামী পরিবেশ সংরক্ষণ করতেন। নিকট দূরাত্মীয়দের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। শতকর্ম ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিতেন।

---

৯১. 'রাসূলুল্লাহ সা. এর নির্দেশে মক্কার সাহাবাগণ রা. যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন কোন পিছু টানই তাদের আটকে রাখতে পারেনি। বাড়ীঘর বিত্ত, বৈভব, চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য কোন কিছুর আকর্ষণই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অত্যন্ত প্রশান্ত মনে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেছেন। অন্যদিকে মদীনার আনসার সাহাবাগণ রা. এ অসহায় মুহাজীরদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। আর্থিক অবস্থা তাদেরও ভাল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রশান্তমনে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। মুহাজির ও আনসার উভয় পক্ষের এহেন ভূমিকা পালন সম্ভব হয়েছে এ জন্য যে, তাঁরা তাঁদের জীবনকে পূর্ণমাত্রায় আখেরাতকেন্দ্রিক গড়ে তুলেছিলেন। আব্বাস আলী খান এ পথেই তাঁর জীবন পরিচালিত করেন। (আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ, 'মৃত্যুহীন প্রাণ', আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৪৫)।

৯২. খান জেবুন্নেছা চৌধুরী 'মৃত্যুহীন প্রাণ', আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ। পৃষ্ঠা : ১৪৮।

৯৩. নাসিমা আফরোজ 'মৃত্যুহীন প্রাণ' আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ- পৃষ্ঠা ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দেশপ্রেমিক, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং কেয়ারটেকার সরকার[৯৪] আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। দেশের রাজনৈতিক সংকটে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। এবং তার বলিষ্ঠ বক্তব্য ও ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তিনি সুদীর্ঘ ১৪ বছর মানুষকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও কেয়ারটেকার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়েছেন। এ দেশের যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে তিনি গণমানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তাঁর আদম্য জ্ঞানস্পৃহা ছিল, বাল্যকাল হতে তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। জ্ঞান অর্জনে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। অধ্যয়ন, গ্রন্থ প্রণয়ন, গ্রন্থ সংগ্রহ ও পুস্তক রচনা এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান, মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছান তার জীবনের একমাত্র ব্রতি ছিল। তিনি ছিলেন গ্রন্থ প্রেমিক।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্টের অধীনে একটি স্কুল এন্ড কলেজ একটি মসজিদ এবং একটি লাইব্রেরী ছিল। তিনি এ লাইব্রেরীর জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম গাজ্জালী এবং শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী[৯৫], মাওলানা মওদূদীর মত মহামনীষীদের গ্রন্থাবলী সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ত্যাগ কুরবানীর ক্ষেত্রে খান সাহেব ছিলেন অনুকরণীয়। "নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ সবই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য"। অর্ধশতাব্দী ব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের কাফেলায় অনড়, অবিচল থেকে নিষ্ঠা, আনুগত্য, ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে আল কুরআনের ভাষায় নেয়া শপথকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন।

---

৯৪. **কেয়রটেকার সরকার :** একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সাধারণত যেকোন প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত বিদায়ী সরকারের স্থলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এরূপ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। এ স্বল্পস্থায়ী সরকার দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে এবং নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে, যাতে এই সরকারের কার্যাবলী নির্বাচনের ফলাফলে কোন প্রভাব সৃষ্টি না করে। এ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। সংসদীয় শাসন কাঠামোয় মন্ত্রিসভা বিলোপের পর একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার এই অনুশীলন উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই লক্ষ করা যায়। (বাংলা পিডিয়া)

৯৫. ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী দিল্লী নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম। শাহ ওলিউল্লাহর পূর্ব পুরুষ ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রা. -এর বংশধর। শাহ ওলিউল্লাহ তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর পিতা শাহ আবদুর রহীমের কাছে। পরে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বার বছর যাবত শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি আরবে গমন করেন এবং মক্কা মদীনায় সুদীর্ঘকাল কাটান। মক্কা মদীনা অবস্থানকালে শাহ সাহেব ইজতেহাদের উপযোগী গুনাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করেন। শিবলী বলেন, ইবনে রূশদ ও ইমাম তাইমিয়ার পর মুসলিম জগতের যে চরম অবনতি ঘটেছিল, তাকে পনুরায় উজ্জীবিত করেন শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী রহ.। সুদীর্ঘকাল যাবত কোরআন হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বিশেষ করে মক্কা-মদীনা সফরের ফলে লব্দ প্রেরণাই তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার জন্যে সচেষ্ট করে তুলেছিল। (আব্বাস আলীখান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ২৪২)

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ইন্তিকাল

অবশেষে প্রিয় প্রভুর ডাক এলো। যে মহান আল্লাহর জন্যে জানমাল উৎসর্গ করে খান সাহেব সারা জীবন কাজ করেছেন, এবার তাঁর দরবারে হাজির হবার পালা। ২১শে জুলাই'৯৯ জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার বৈঠক শুরু হয়েছে। কিন্তু জনাব আব্বাস আলী খান অনুপস্থিত। সব সময় তিনি বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই উপস্থিত থাকতেন। আজ তাঁর বসার আসনটি খালি। খান সাহেবের অনুপস্থিতির কারণ জানার জন্য সবাই উদগ্রীব।

কিছুক্ষণ পর আমীরে জামায়াত[৯৬] জানালেন, তিনি খান সাহেবের পক্ষ থেকে একটি চিরকুট পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি হঠাৎ করে অসুস্থতাবোধ করছি এবং গত এক মাসে আমার ওজন ৫ কেজি কমে গেছে। ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার মনে করছি।"

আমীরে জামায়াত সংগে সংগে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারী অধ্যাপক মাযহারুল ইসলামকে বল্লেন, তিনি যেন অবিলম্বে খান সাহেবকে ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো। ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ল তাঁর লিভার সিরোসিস হয়েছে। লিভারের অভিজ্ঞ বড় ডাক্তার এ, কিউ, এম মহসীন তাঁর লিভারের অবস্থা জেনে অত্যন্ত বিস্তিত ও দুঃখিত হলেন। তিনি বল্লেন যে, তার লিভার সম্পূর্ণ Damage হয়ে গেছে। এ প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু খান সাহেব এতদিন ব্যথা অনুভব না করে থাকলেন কিভাবে।

যাহোক ডাক্তাররা চিকিৎসা শুরু করলেন। তবে তাঁরা বল্লেন, এখন আর অবনতি ছাড়া লিভারের অবস্থা উন্নতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। বিদেশে নিয়েও কোন লাভ হবে না। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। তাঁর অবস্থার আর উন্নতি হলো না, ক্রমান্বয়ে খাবার রুচি শেষ হয়ে গেল। তিনি এগিয়ে চল্লেন অন্তিম অবস্থার দিকে। অবশেষে তাঁর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হল।

সেদিন ছিল ৩রা অক্টোবর '৯৯। ১৮ই আশ্বিন ১৪০৬ বাংলা ২২শে জমাদিউস সানী ১৪২০ হিজরী রোববার বেলা ১.১৫টার সময় রাজধানীর ইবনেসিনা হাসপাতালে লক্ষ লক্ষ ভক্ত-অনুরক্ত, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী ও দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে প্রিয় প্রভুর সাথে মিলিত হবার জন্য পাড়ি জমালেন।

খবর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। নেমে এলো শোকের ছায়া। সাথী সহকর্মী ও ভক্ত-অনুরাগীরা চোখের পানি ফেললেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁকে এক নজর দেখার জন্য হাসপাতাল ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিড় জমায়। সন্ধ্যা ৫.৩০ তাঁর লাশ এম্বুলেন্সযোগে আনা হলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হয়। অনেকেই বয়োবৃদ্ধ নেতাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে ডুকরে কেঁদে উঠেন। আমীরে জামায়াত ছিলেন সৌদি আরব সফরে। প্রিয় সাথীর ইনতিকালের খবর শুনামাত্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সফর সংক্ষেপ করে জরুরীভাবে ছুটে এলেন ঢাকায়। এসময় তাঁর প্রিয় সাথীর কফিন পল্টন ময়দানের উদ্দেশ্যে নেয়া হচ্ছে।

---

৯৬. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি ১৯২২ সালে ৭ নভেম্বর ঢাকা শহরের লক্ষী বাজার এলাকায় 'মিয়া সাহেবের ময়দান' নামে পরিচিত এক ঐতিহ্যবাহী পীর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এটা তাঁর নানার বাড়ি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামে লাভ করেন। এরপর ১৯৪০ সালে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪২ সালে হাই মাদরাসা পাস করেন। ১৯৫০ সালে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেন। ছাত্রজীবনে তিনি হল ও ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নে জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রংপুর কারমাইকেলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবেযোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। এরপর বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৭৮ সালে জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পুরানা পল্টনে ঢাকা মহানগর জামায়াতের অফিস চত্বরে ক্ষণিকের জন্য কফিনবাহী গাড়ী থামানো হয়। মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করা হল। অশ্রুসজল অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর প্রিয় সাথীর কপালে চুম্বন করলেন।

৪ অক্টোরব বাদ জোহর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল জানাযা। ইমামতি করেন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম। এ জানাযায় লাখো মানুষের ঢল নামে।

৪ অক্টোবর দিবাগত রাত পৌনে দুইটায় বগুড়ায় দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন মাওলানা আব্দুর রহমান ফকীর। ৫ অক্টোবর তাঁর শেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হয় জয়পুরহাট শহরের সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বিশাল ময়দানে। ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলাসা মতিউর রহমান নিজামী। দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছে, এ জানাযায় লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হয়েছে। জয়পুরহাট শহরে খান সাহেবের নিজবাড়ীর আঙ্গিনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক এ দেশের মানুষের প্রিয়নেতা আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে সারাদেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত-অনুরক্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও শুভানুধায়ী শোকে মুহ্যমান। তাঁর জানাযায় লাখো মানুষের ঢল নামে।

দৈনিক পত্রিকাসমূহে তাঁর মৃত্যুসংবাদ, শোকবার্তা ও জানাজার আলোকচিত্র ফলাও করে ছাফানো হয়। পরবর্তী দিন ৪.১০.৯৯ -এর দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলার বাণী, মানবজমিন, ইনকিলাব, সংগ্রাম, অবজারবার, বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকায় তাঁর মৃর্ত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্পাদকীয়, শোকবাণী লেখা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দ[৯৭] শোকবাণী দেন। বিভিন্ন দল সংগঠন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান শোকবার্তা পাঠিয়ে দেন। তাঁর স্মরণে সারা দেশে দোয়া-মাহফিল এবং স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৭/১০/৯৯ তারিখ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত দোয়া মাহফিলে জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তৎকালীন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে মগবাজারস্থ আল ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস, এইচ. এম.এরশাদ, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর এ. কে. এম ইউসুফ, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার মওদুদ, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব ফজলুল হক আমিনী, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কামারুজ্জামান, মুসলিম লীগ মহাসচিব জমির আলী, এন. ডি. -এর চেয়ারম্যান নূরুল হক মজুমদার প্রমুখ। প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সুসাহিত্যিক আব্বাস আলী খানের জীবনী ও কর্মের উপর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী এর উদ্যোগে আব্দুস শহীদ নাসিমের সম্পাদনায় একটি স্মারকগ্রন্থ "মৃত্যুহীন প্রাণ"[৯৮] প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবনীর উপর অনেকে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেন।

আমার প্রিয় মুরব্বী : গোলাম আযম।

আব্বাস আলী খান একটি জীবন একটি ইতিহাস : বদরে আলম

---

৯৭. যে সব বিশ্ব নেতা শোক বাণী পাঠিয়েছেন, মুয়াম্মার গাদ্দাফী : প্রেসিডেন্ট লিবিয়া, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আস সোবাইল : প্রধান ইমাম, মসজিদুলহারাম মক্কা মোকাররামা, করম এলাহী : মাসকাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, সউদ আব্দুল আজীজ আল মোখলেদ : চার্জ দ্যা এফেয়ার্স, কুয়েত এম্বাসী, ঢাকা। ড. এম এ বারী : সহসভাপতি ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ, প্রফেসর খুরীশদ আহমদ : চেয়ারম্যান ইসলামিক ফাউনোডশন লেষ্টার. ই. উ. কে সহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ।

৯৮. **মৃত্যুহীন প্রাণ** : আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ ,আব্দুশ শহীদ নাসিম সম্পাদিত, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি : আব্দুশ শহীদ নাসিম (আহবায়ক)। মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (সদস্য)। মুহাম্মদ নুরুয়্যামান (সদস্য)। আব্দুল মান্নান তালিব (সদস্য)। প্রকাশক : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রিচার্স একাডেমী। প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৯৯। পরিবেশক : শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আমার প্রিয় ভাই আব্বাস আলী খান : শামসুর রহমান

ইসলামী আন্দোলনের মহান শিক্ষক : মতিউর রহমান নিজামী

সত্যপন্থী ন্যায়পরায়ণ আব্বাস আলী খান : মকবুল আহমদ

যে মরণের জন্য আমার লোভ হয় : আবদুল কাদের মোল্লা

A Mafor Figure in Islamic Movement : Shah Abdul Hannan

মানব দরদী আব্বাস আলী খান : কবি আল মাহমুদ

নিবেদিত প্রাণ সৈনিকের তিরোধান : হাফেজা আসমা খাতুন

জানাযার স্মৃতি : আবদুল ওয়াহেদ

আমার আব্বা : খান জেবুন্নেসা চৌধুরী

যার মৃত্যু ঈর্ষণীয় : ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসল

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজনৈতিক জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক জীবনের সূচনা

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্বাস আলী খান এক বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী ছিলেন। সরকারী চাকুরীর সুবাদে তিনি তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পান। এর বাস্তব প্রতিফলন তার রাজনৈতিক জীবনে আমরা দেখতে পাই। যে সব মহান ও প্রবীণ ব্যক্তিকে বলা হয়ে থাকে ত্রিকালের সাক্ষী আব্বাস আলী খান ছিলেন তেমনি এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন জাতীয় পরিষদ সদস্য। প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। নিম্নে তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন (১৯৫৪-১৯৭০) উপস্থাপন করা হল।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান

১৯৫৪ সালের শেষের দিকে তিনি জামায়াতে ইসলামীর[১] দাওয়াত পান এবং মাওলানা মওদূদীর- এর গ্রন্থাবলী পড়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। এ সময় তিনি এক দিকে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক,

---

১. **জামায়াতে ইসলামী,** ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার নীতিতে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের গোড়া থেকেই অবিভক্ত ভারতে ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নেতৃত্বে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মাসিক পত্রিকা তারজুমান আল-কোরআন -এর মাধ্যমে ১৯৩২ সাল থেকেই এ লক্ষ্যে প্রচার কার্য শুরু হয়। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ' শীর্ষক এক বক্তৃতায় মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের কথা প্রকাশ করেন। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। তদনুসারে ঐ বছর ২৫ আগস্ট লাহোরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। মাওলানা মওদূদী এ দলের আমীর নির্বাচিত হন। যুদ্ধাবস্থার কারণে প্রায় চার বছর জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৪৫ সালের (১৯-২১) এপ্রিল পাঞ্জাবের পাঠানকোটে দলের প্রথম নিখিল ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর জামায়াতে ইসলামী দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জামায়াতে ইসলামী হিন্দ দিল্লীতে এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান লাহোরে দলের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতত্বে অধিষ্ঠিত হন দলের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হলে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দল বিধির আওতায় মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ (আই. ডি. এল) রাজনৈতিক দল হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনার অনুমতি লাভ করে এবং জামায়াতের সদস্যরা এ দলের ব্যানারে প্রকাশ্য রাজনীতিতে সক্রিয় হয়। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতের কতিপয় নেতা ডেমোক্র্যাটিক লীগের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৬ জন প্রার্থী জয়ী হন। ১৯৭৯ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে এ দলটি পুনরায় রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এবং **মাওলানা আব্বাস আলী খানকে** দলের ভারপ্রাপ্ত আমীর নির্বাচন করা হয়। এই দলের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে কোরআন ও হাদীসে বিধৃত ইসলামী জীবনবিধান কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জনই জামায়াতের উদ্দেশ্য। ১৯৭৯ সাল থেকে জামায়াতের ইসলামী বাংলাদেশে তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ১০টি আসনে জয়লাভ করে। জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কৌশল হিসেবে জামায়াতের ১০ জন সংসদ সদস্য ১৯৮৭ সালের ৩ ডিসেম্বর সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বি. এন. পির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট এবং ৫ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী পৃথকভাবে অংশ নেয়। এ সময় জোট ও দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে আন্দোলনের অভিন্ন পন্থা ও কৌশল নিরূপিত হতো। বিভিন্ন জোট ও জামায়াতসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের তীব্র আন্দোলন ১৯৯০ সালের শেষ দিকে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরিস্থিতিতে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হন। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৮টি আসনে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ফুরফুরার পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের খলিফা। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর তিনি পীর সাহেবকে জানান এবং তাঁকে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য এবং দাওয়াত ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করেন। পীর সাহেব তাঁর বক্তব্য শুনে বলেন, 'বাবা ! এটাই তো দীনের আসল কাজ। আমি তো এ উদ্দেশ্যেই লোক তৈরী করছি। আপনি জানপ্রাণ দিয়ে এ কাজ করে যান।'

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে খান সাহেব বলেন, "উনিশ শ' চুয়ান্ন'র ডিসেম্বর মাস। বার্ষিক পরীক্ষার ঝামেলা শেষ হয়েছে। বড়োদিনের বন্ধ সন্নিকট। স্থানীয় একটি মাদরাসায় ধর্মসভা-ইসলামী জলসা। প্রধান বক্তা ডঃ শহীদুল্লাহ, বিশেষ বক্তা রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক গোলাম আযম। ডঃ শহীদুল্লাহ অসুস্থ। টেলিগ্রাম এসেছে আসতে পারবেন না। আসছেন শুধু গোলাম আযম। মাদরাসার সেক্রেটারী বার বার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন উক্ত সভায় যোগদান করতে। বল্লেন, স্যার অবশ্যই যাবেন কিন্তু। সেক্রেটারী আমার এককালীন ছাত্র। অনুরোধ উপেক্ষাই করি কি করে। অগত্যা বিকেলে রওয়ানা হলুম দু'চাকার সাইকেল চড়ে। বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে সভাস্থল। দেখলুম অধ্যাপক গোলাম আযম বক্তৃতা করছেন। কালেমা তাইয়েবার ব্যাখ্যা করছেন বড়ো সুন্দর মনোমুগ্ধকর ভাষায়। সভাশেষে একসাথে খেতে বসেছি। খেতে খেতে পরস্পরের পরিচয় এবং আলাপচারিত হলো। বিদায়ের আগে কিছু বইপুস্তক কিনুলুম তাঁর কাছ থেকে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর লেখা সে বইগুলো।"[২] অধ্যাপক গোলাম আযমের পরামর্শে বগুড়া শহরের দায়িত্বপ্রাপ্ত শায়েখ আমীনুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর জামায়াতে ইসলামীতে দাখেল হওয়ার একখানা ফরম আমীনুদ্দীন সাহেব তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন, 'বাড়ি গিয়ে হাজারবার চিন্তাভাবনা করে দেখুন। যদি মন বলে যে, জামায়াত হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হলে ফরমখানা পূরণ করে পাঠিয়ে দেবেন'।

১৯৫৫ সালের পয়লা/দুসরা জানুয়ারী শুক্রবার বাদ ফজর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নামে ফরমখানা পূরণ করে ডাকযোগে আমীনুদ্দীন সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব এল। জবাবের সাথে নির্দেশ এল একটি ইউনিট গঠন করার। সে সাথে সাঁইত্রিশ খানা উর্দু বইয়ের তালিকা[৩] পাঠিয়ে বলেছেন তা তাড়াতাড়ি কিনে পড়াশোনা করতে।নির্দেশ অনুযায়ী একটি ইউনিট গঠন করে কাজও

বিজয়ী হয় এবং সরকার গঠনের জন্য সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে সমর্থন দেয়। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে জামায়াত ২টি আসন লাভ করে। ১৯৯১ সালে উচ্চ আদালত কর্তৃক অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বৈধ ঘোষিত হবার পর তাঁকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচন করা হয়। তিনি ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ শরীক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর জোর সমর্থন পায়। এই আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জামায়াত দলীয় সদস্যগণ সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হয়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর পদে অধ্যাপক গোলাম আযমের স্থলাভিষিক্ত হন। জামায়াতে ইসলামী বাংলদেশ আমীর -এর তালিকা (১৯৪৭-২০০০) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯৪৭-৭২), জনাব তুফায়েল মুহাম্মদ (১৯৭২), কাজী হুসাইন আহমেদ (১৯৭২), মাওলানা জাকারিয়া (১৯৭২-জুলাই ১৯৭৩), মাস্টার মোঃ শফিকুল্লাহ (জুলাই ১৯৭৩- সেপ্টেম্বর ১৯৭৪), মাওলানা আব্দুল খালেক (সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-মার্চ ১৯৭৫), জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলী (মার্চ ১৯৭৫-সেপ্টেম্বর ১৯৭৫), মাওলানা আবদুর রহীম (সেপ্টেম্বর ১৯৭৫-১৯৭৮), অধ্যাপক গোলাম আযম (১৯৭৮-২০০০), মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (২০০০-) ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সাধারণ বির্নাচনে বি.এন.পি-র নেতৃত্বে গঠিত ৪ দলীয় জোট জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে জয়লাভ করে এবং শরীক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পায় ১৭টি আসন। জোটের শরীক হিসেবে জামায়াত সরকারে অংশ নেয় এবং মন্ত্রিসভায় এ দলের দুজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হন। (এফ.এম মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলা পিডিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৬)।

২. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ (বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮) পৃষ্ঠা : ১২৫-১২৬

৩. ৩৭ টি বইয়ের মধ্যে তাফহীমুল কুরআন ১ম খণ্ড এবং তরজমানুল কুরআন, গোলাম রসুল মেহেরের- 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ' উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করলেন। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি শপথ গ্রহন করার মাধ্যমে জামায়াতের রুকন হলেন। অধ্যাপক গোলাম আযম[৪] খান সাহেবকে রুকনীয়তের শপথ[৫] করান।

রুকন হওয়ার পর তিনি পুরোপুরিভাবে ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। পীর সাহেবের দরবারে যাতায়াতও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ পীর সাহেবেও জামায়াতের কাজকে একজন মুসলমানের আসল কাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

১৯৫৬ সালের শেষে জামায়াত থেকে চাকুরী ছাড়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে অনেক অনুরোধ করে চাকুরী থেকে ইস্তেফা দেন। স্কুলের পক্ষ থেকে বিদায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষক-ছাত্র, বিস্মিত, স্তম্ভিত, মর্মাহত, অশ্রুকাতর, চোখের পানিতে সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।[৬]

মাছিগোট সম্মেলনে যোগদান

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের বাহওয়ালপুরের মাছিগোটে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আট দিনব্যাপী রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য খান সাহেবকে নির্দেশ দেয়া হয়। ফেব্রুয়ারীর ৯ তারিখে সম্মেলনের উদ্দ্যেশ্যে তিনি রওয়ানা হন। চল্লিশ ঘণ্টা ট্রেনে ভ্রমণ করার পর বাহওয়ালপুরের নিকটবর্তী জায়গা ওয়াগা পৌছালেন। আরো ১০/১২ ঘণ্টা ভ্রমণের পর মাছিগোটে সম্মেলন কেন্দ্রে পৌছেন। সেখানে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব অভ্যর্থনা জানালেন। এবং ভেতরে প্রবেশ করে পূর্ব পাকিস্তানের ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা করেন।

খান সাহেব জামায়াত কর্মীদের সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা, টয়লেট, গোসলখানা, অযুখানা, রান্নাবান্না, খানাপিনা পরিবেশন টিপটপ ও সুশৃংখল দেখে মুগ্ধ হন। কোন বিশৃংখলা নেই, অনিয়ম নেই, কারো কোন অভিযোগ নেই, দায়িত্বশীলদের দায়িত্বপালনে কোন অবহেলা নেই, ক্লান্তি নেই। সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রের ও অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বের, সহানুভূতি সহমর্মিতার এ অনুপম চরিত্র।

সম্মেলন চলাকালীন খান সাহেব ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন, খবর পেয়ে প্রফেসর গোলাম আযম সাহেব ডাক্তার নিয়ে আসেন। ডাক্তার ওষুধ দেন তা খেয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে সুস্থ হয়ে উঠেন। এ সম্মেলনে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওঃ মওদূদী আমীর নির্বাচিত হন। কিছুলোক মাওঃ মওদূদীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। সম্মেলনে মাওঃ মওদূদীসহ দায়িত্বশীলদের গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ ছিল। এ ধরনের কর্মসূচী প্রত্যক্ষ করে তিনি মুগ্ধ হন। একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা তিনি এ সম্মেলন থেকে লাভ করেন তা হল ইসলামী আন্দোলনের জন্য একনিষ্ঠতা, এখলাচ খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। যদি এখলাসে ত্রুটি থাকে তাহলে

---

৪. অধ্যাপক গোলাম আযম তৎকালীণ জমায়াতে ইসলামীর রাজশাহী বিভাগীয় আমীর ছিলেন।

৫. এ প্রসংগে খান সাহেব বলেন : "এই শপথের মাধ্যমে আমি আমার জানমাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে দিলাম এবং আল্লাহর খরিদ করা জানমাল তাঁর পথেই ব্যায় করার শপথ নিলাম। এবং সত্যিই সঠিক পথের সন্ধান পেলুম। যে পথের সন্ধান এলমে তাসাউফ দিতে পারেনি। ভাগ্য ভালো নইলে আরো কিছু কাল এলমে তাসাউফের ময়দানে থাকলে বাতিলের সাথে সংগ্রাম করার হিম্মত হারিয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে হুজরায় বসে অর্থহীন তপ জপে জীবন কাটিয়ে দিতুম। জীবনের যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তত্ত্বকথা ইলমে তাসাউফের ময়দানে জানতে পারিনি- এ জিহাদের মযদানে এসে জানতে পারলুম। যে তরিকত, হাকীকত ও মারেফতের ময়দানে এতো দিন ছিলাম তার সবকিছুর সন্ধান পেলুম এ জিহাদের ময়দানে। (আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ, বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা : ১৩৩)

৬. এ প্রসংগে খান সাহেব লিখেছেন, '১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীর পয়লা হপ্তায় ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডাকা হলো আমার ইস্তাফা পত্র বিবেচনার জন্য। তখনো আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল। অতএব আমার ইস্তাফা পত্র মঞ্জুর করা হলো। সংগে সংগে খবরটা ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। দশম শ্রেণীর ফার্স্ট বয় আমার প্রিয় ছাত্র বিনয় কুমার কুন্ড তড়িঘড়ি ইংরেজীতে ফেয়ারওয়েল অ্যাডরেস হাতে লিখে মনোরম বাঁধাই করে আমার বিদয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। শিক্ষক-ছাত্র, বিস্মিত, স্তম্ভিত, মর্মাহত, অশ্রুকাতর। চোখের পানিতে বিদায় নিয়ে বাড়ি এলুম।' (আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ, বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮) পৃষ্ঠা : ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

যত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হোক না কেন আল্লাহ তাকে ইসলামী আন্দোলনে বেশী থাকতে দেন না। সম্মেলনের পর লাহোরে আরো ৪/৫ দিন অবস্থান করেন। মার্চ মাসের চার তারিখ আবার ভারতের ভেতর দিয়ে খান সাহেব বাড়ি ফিরে আসেন।

সম্মেলনে যোগদানের অনুভূতি

মাছিগোটে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে খান সাহেব এক নতুন অনুভূতি লাভ করেন।[৭]

রাজশাহী বিভাগের আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামীর নির্দেশে রাজশাহী বিভাগের আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৮] রাজশাহী শহরে জামায়াতে ইসলামীর অফিস। তিনি নিয়মিত রাজশাহীতে থাকা শুরু করলেন এবং ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততার কারণে মাসে ৮/১০ দিনের বেশী শহরে থাকা হয় না। তিনি সাংগঠনিক কাজে রাজশাহী বিভাগের পাঁচ পাঁচটি জেলায় সফর করতেন। কখনো রেলগাড়িতে, কখনো গরুর গাড়িতে, কখনো সাইকেলে ও পদব্রজে সফর করতেন। ইতোমধ্যে সাতান্ন সাল উত্তরে আটান্ন শুরু হয়েছে।

মাওলানা মওদূদীর পূর্ব পাকিস্তান সফর

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদূদী পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলেন পৃথক নির্বাচনের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এ উদ্দেশ্যেই ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সশস্ত্র গুণ্ডাদল সভাস্থল আক্রমণ করে এবং বহু

---

৭. তিনি (খান সাহেব) তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বর্ণনা করেন, "সারা পাকিস্তান থেকে আট শতাধিক রুকন সম্মেলনে যোগদান করেছেন। রুকন সম্মেলনে যোগদানের এই প্রথম সুযোগ আমার। জামায়াত কর্মীদের সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা, টয়লেট, গোসলখানা, অযুখানা থেকে রান্নাবান্না, খানাপিনা পরিবেশন এবং টিপটপ ও সুশৃংখল যে মনে হলো সব কিছুই যেন বিদ্যুৎ চালিত এক অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের অধীনে। কোন বিশৃংখলা নেই, অনিয়ম নেই, কারো কোন অভিযোগ নেই, অভিযোগের কোন সুযোগ নেই, দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা নেই, ক্লান্তি নেই। সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রের অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বের সহানুভূতি সহমর্মিতার এক অনুপম চিত্র। আগেই বলেছি জামায়াতে ইসলামীর দেশভিত্তিক রুকন সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য জীবনে এই প্রথম পেয়েছি। তাই উৎসাহ-উদ্যম, বহু কিছু জানা ও শেখার পরম আগ্রহ মনকে ব্যাকুল ও অধীর করে তুলছি। সন্ধ্যার পরের অধিবেশন। দেখলুম বক্তাগণ জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর মুখের ওপর তাঁর সমালোচনা করে চলেছেন। মনটা বড্ডো খারাপ হয়ে পড়লো। ভাবলুম একটি মাত্র আদর্শ জামায়াত মনে করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছিলুম। কিন্তু কতিপয় জামায়াত সদস্যের জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার প্রতি বিরূপ সমালোচনা দেখে খুবই ব্যথিত হলুম। দুঃখ, ক্ষোভ ও নৈরাশ্যে মনটা ভেঙ্গে পড়ছিল। কিন্তু অপর দিকে যখন লক্ষ্য করলুম যাঁর মুখের ওপর নির্দ্বিধায় তাঁর সমালোচনার বড়ো বড়ো ইটপাথর ছুড়ে মারা হচ্ছিল, তাঁর নূরানী চেহারার প্রতিক্রিয়ার কোন লেশ দেখতে পাচ্ছিলুম না। তাঁকে দেখছিলুম একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বারি রাশিও ত উচ্ছ্বসিত ও তরংগায়িত হয়। কিন্তু তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে ক্ষোভ, বিরুক্তি ও রাগের কোন সামান্যতম তরঙ্গও নেই। ভাবছিলুম এ কেমন মানুষ। সর্বশ্রেষ্ঠ ও আখেরী নবীর (সা.) অনুকরণে যে জামায়াত, তার নেতৃত্ব শুধু এমন লোকের পক্ষেই সম্ভব। আমার এ ধারণা একটা বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছিল যখন পরবর্তীকালে বহুবার তাঁকে চরম সংকটময় অবস্থায় দেখেছিলুম এমনি ধীর-স্থির ও প্রশান্ত। উত্তাল-মাতাল সিন্ধুর ঘূর্ণাবর্তে পাকা মাঝির মতো নিশ্চিন্তে তাঁর তরণীর হাল ধরে থাকতে দেখেছিলুম। ইসলামী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও অগাধ শ্রদ্ধা জামায়াতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না করে তাঁর প্রতি আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করলো। (আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ , বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮) পৃষ্ঠা :১৩৮-১৩৯।

৮. এ প্রসংগে খান সাহেব বলেন, 'আমি এখন জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী বিভাগের আমীর। অফিস রাজশাহী শহরে। মরহুম এফ আর খান সাহেব তার একখানা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন জামায়াতের জন্য। বাড়িখানা বড়ো বলা যায়।'আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ , বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা : ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নির্মম আঘাতে ধরাশায়ী করে। গণতন্ত্রের নামে এই যে, গুণ্ডামি, ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করার এই যে মানবতাবিরোধী কুটনীতী, মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মৌলিক অধিকারকে এভাবে গলাটিপে হত্যা করা হয় এরই নাম দেয়া হল গণতন্ত্র। আটান্ন সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী গাইবান্ধায় জনসভা। খান সাহেব গাইবান্ধা গিয়ে মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করেন, সেখানে মাওঃ মওদূদী তাঁর স্বভাবসুলভ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পৃথক নির্বাচনের সপক্ষে বলিষ্ঠ ও অকাট্য যুক্তিসহকারে ভাষণ দেন। শ্রোতাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও অদম্য প্রেরণা এবং পৃথক নির্বাচনের সমর্থনে মুহুর্মহ শ্লোগানের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হলো। পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারী রংপুর জনসভা। খান সাহেবসহ মাওলানা তাঁর অন্য সাথীদের নিয়ে ট্রেনে রওয়ানা হলেন। গাড়ী যখন কাউনিয়ায় পৌছাল তখন একজন পুলিশ অফিসার মাওলানাকে সালাম দিয়ে একখানা কাগজ দিয়ে গেলেন। খান সাহেব মাওলানার কাছ থেকে দূরে ছিলেন বিধায় বুঝতে পারলেন না। পরে মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, কাগজখানাতে লেখা আছে শান্তি ভঙ্গের আশংকায় সারা রংপুর শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। মাওলানা মওদূদী রংপুর স্টেশনে গাড়ি থেকে নামতেও পারবেন না। মাওলানা মওদূদী রংপুর স্টেশনে পৌছালেন। প্লাটফরম জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। মাওলানা ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি মুখে এবং অত্যন্ত শান্ত ও মিষ্টিভাষায় বল্লেন, 'আমি আইন মেনে চলতে অভ্যস্থ, আপনারা আইনের শ্রদ্ধা করেন। আল্লাহর মর্জি হলে একবার অবশ্যই আপনাদের খেদমতে হাজির হবো।' সৈয়দপুর পৌছে মাওলানা এবং খান সাহেব ও তাঁর অন্য সাথীরা যোহরের নামাজ আদায় করে খানা খেলেন। আসরের পর জনসভা। ডাকবাংলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একদিকে মাইকে প্রচার করা হল অন্যদিকে মঞ্চ তৈরী করা হলো। বিরাট জনসভা হল। খান সাহেব ভাষণের বাংলা তরজমা করলেন। সৈয়দপুর রাত্রিযাপন করেন। তারপর যথাক্রমে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা শহরগুলোতে জনসভা হয়। পাবনা ব্যতীত অন্য সবগুলোতে তরজমার দায়িত্ব ছিল আব্বাস আলী খান সাহেবের উপর। পাবনার জনসভার পর মাওলানা মওদূদী ঢাকা চলে যান।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

৭ই অক্টোবর ১৯৫৮ সাল, সে সময় খান সাহেব রাজশাহী বিভাগীয় অফিসে অবস্থান করছিলেন। ঠিক এই দিন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লাহোরের এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে বলে তিনি অনুমান করেছিলেন এবং সে জন্য তিনি সরকারের প্রতি কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। ঠিক ঐ দিন খান সাহেবের শাহ মাখদুম মসজিদে কুরআন আলোচনা অর্থাৎ দারসে কুরআন দেয়ার কথা। মাগরিবের পর কুরআনের আলোচনা শুনতে অনেকেই বসে গেলেন। খান সাহেব ঘণ্টাখানেক আলোচনা করে বাসায় ফিরলেন। এশার নামাজ ও খাওয়ার পর রাত ১০টার দিকে খান সাহেব শুয়ে পড়েন। পরদিন ফজরের পর শ্রদ্ধেয় এফ. আর. খান এর কাছ থেকে শুনতে পেলেন আইয়ুব খান[৯] সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেছে।

সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে শাসনতন্ত্র, মন্ত্রিসভা ও পরিষদ বাতিল করেন। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। খান সাহেব এতে হতবাক হলেন। এফ. আর খান সাহেবের পরামর্শে সকালের নাস্তা খেয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নেন। ট্রেনে ছড়ে শান্তাহার হয়ে নিরাপদে বাড়ি পৌছেন। দু'তিন দিন উদ্বিগ্ন অবস্থায় দিন যাপন করেন। তবে গ্রেফতার হননি। জামায়াতের নির্দেশে চাকুরী তো পূর্বেই ছেড়েছেন। এখন জামায়াতের কাজও ত বন্ধ। এখন স্রেফ বেকার বসে থাকা। ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে দিনাজপুর জেলার পাকহিলি হাই স্কুলে হেডমাস্টারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দু'বছর পর আবার শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করেন।

আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র

আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে তাঁর মনের মতন এক শাসনতন্ত্র বানিয়ে নিলেন প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির। গণতন্ত্রকে কবরতো আগেই দেয়া হয়েছে। তবে তার কংকাল জাতির সামনে তুলে ধরার নাম দিলেন 'মৌলিক গণতন্ত্র'[১০](BASIC DEMOCRACY)। শাসনতন্ত্রে ইসলামের নামগন্ধও ছিল না। তবে বাইরে

---

৯. মোহাম্মদ আইয়ুব খান, (ফিল্ড মার্শাল) (১৯০৮-১৯৭৪) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক শাসক। আইয়ুব খান ১৯০৮ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবোটাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের স্যান্ডহার্স্ট রয়্যাল মিলিটারী কলেজ-এ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯২৮ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদান করে পূর্ববঙ্গ প্রদেশে জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং (জি ও সি) নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সাথে যোগসাজশে সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান রহিত করেন। প্রেসিডেন্ট মির্জা কর্তৃক আইয়ুব খান ৮ অক্টোবর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র অল্প কিছু দিন পরই (২৭ অক্টোবর) তিনি ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করেন এবং নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন।

১০. মৌলিক গণতন্ত্র। ১৯৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রবর্তিত একটি স্বল্পকাল স্থায়ী স্থানীয় সরকার পদ্ধতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯' জারি করেন। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ এ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতে এবং তাঁরা একে জেনারেল আইয়ুব খান এবং তাঁর সহযোগী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার একটি সুনিপুণ কৌশল হিসেবেই গণ্য করতো।
প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল (১) ইউনিয়ন পরিষদ (পল্লী এলাকায়) এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি (পৌর এলাকায়), (২) থানা পরিষদ (পূর্ব পাকিস্তানে), তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা পরিষদ, (৪) বিভাগীয় পরিষদ এবং (৫) প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ। একজন চেয়ারম্যান এবং প্রায় ১৫ জন সদস্য নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। এতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্যই থাকতেন

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন মনোনীত বেসরকারি সদস্য, যাঁরা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হতেন। তবে, ১৯৬২ সালের এক সংশোধনী দ্বারা মনোয়ন প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। ফলে পরিষদের সদস্যবৃন্দ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্ব স্ব ইউনিয়নের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে সদস্যদের দ্বারা তাঁদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতেন। এক দিক দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল পূর্বেকার ইউনিয়ন বোর্ডেরই অনুরূপ, তবে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলা হতো মৌলিক গণতন্ত্রী। সারাদেশে সর্বমোট পরিষদের সংখ্যা ছিল ৭৩০০।

সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় স্তরের থানা পরিষদ গঠিত। এ সকল প্রতিনিধি নিজেরা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান। সরকারি সদস্যবৃন্দ দেশ গঠনমূলক কাজে থানার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং এদের সংখ্যা নির্ধারণ করতেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডেপুটি কমিশনারগণ। তবে, সরকারি সদস্যদের সর্বমোট সংখ্যা কোনক্রমেই বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে পারতো না। থানা পরিষদের প্রধান থাকতেন মহকুমা অফিসার (এস ডি ও), যিনি পদাধিকারবলে থানা পরিষদের চেয়ারম্যান হতেন। মহকুমা অফিসারের অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদাধিকারবলে থানা পরিষদের সদস্যের দায়িত্ব পালন করতেন এবং থানা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে থানাকে পরিষদ বলে অভিহিত করা হতো এবং এর সভাপতিত্ব করতেন তেহশিলদার। তখন পাকিস্তানে মোট ৬৫৫টি থানা এবং তেহশিল ছিল। তৃতীয় স্তরের জেলা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। সদস্যদের সংখ্যা ৪০-এর বেশি হতো না। সকল থানা পরিষদের চেয়ারম্যানই সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সদস্য থাকতেন এবং অন্যান্য সরকারি সদস্য উন্নয়ন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন এবং সমান সংখ্যক সদস্য মনোনীত হতেন বেসরকারি সদস্যদের মধ্য থেকে। বেসরকারি সদস্যদের অন্তত অর্ধাংশ মনোনীত হতেন ইউনিয়ন পরিষদ ও শহর কমিটির চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে। ডেপুটি কমিশনার পদাধিকারবলে এ পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন, অন্যদিকে পরিষদের ভাইস- চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তাঁর অর্পিত দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনার পালন করতেন। পাকিস্তানে ৭৪টি জেলা পরিষদ ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর ছিল এ জেলা পরিষদ। এটি ছিল জেলা বার্ডের উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠান। সদস্যসংখ্যার দিক দিয়ে এ পরিষদ ১৯৮৫ সালের অবস্থান থেকে অনেকখানি সরে এসেছে, কেননা তখন শতকরা ২৫ ভাগ সদস্য মনোনীত হতো। চতুর্থ ও শীর্ষ স্তর ছিল বিভাগীয় পরিষদ। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকারবলে এ পরিষদের চেয়ারম্যান থাকতেন। এতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের সদস্য ছিলেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য ছিলেন ৪৫ জন। সরকারি সদস্য ছিলেন বিভাগের অন্তর্গত সকল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সরকারি উন্নয়ন বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ। সর্বমোট বিভাগীয় পরিষদের সংখ্যা ছিল ১৬। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশে একটি প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা ছিল। গঠনবিন্যাসের দিক দিয়ে এটি ছিল বিভাগীয় পরিষদের অনুরূপ। ব্যতিক্রম এই যে, নিয়োজিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হতো। এ পরিষদের বলতে গেলে কোন ক্ষমতাই ছিল না। তবে, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ার পর এ পরিষদ বাতিল হয়ে যায়। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশবলে যে পাঁচটি পরিষদ সৃষ্টি করা হয় তাদের মধ্য থেকে শুধু দুটি পরিষদ অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পরিষদ এবং থানা পরিষদ প্রধানত সমন্বয়মূলক দায়িত্ব পালন করতো। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের কার্যে নিয়োজিত থাকতো, যেমন ইউনিয়নের কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, সমাজ উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্য। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পুলিশ বাহিনীর দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতো এবং তদীয় সালিসি কোর্টের মাধ্যমে ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিস্পত্তি করতো। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ, জমিতে জলসেচখাল তৈরি এবং জলাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বভারও ন্যস্ত ছিল ইউনিয়ন পরিষদের ওপর। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদকে কর ধার্য ও আদায় এবং মূল্য, টোল ও ফি আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় পরিষদ ও দুটি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮০,০০০ সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে। থানা পরিষদ/তেহশিল পরিষদ মূলত একটি সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানমূলক সংগঠন। থানা পরিষদ তার আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও শহর কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় বিধান করতো। থানা পরিষদই চলতি প্রকল্পসমূহ তত্ত্বাবধানসহ ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর কমিটির প্রণীত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় বিধান করতো। থানা/তেহশিল পরিষদ জেলা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতো এবং ঐ পরিষদের নিকট দায়ী থাকতো। জেলা পরিষদ মূলত তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করতো (১) বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, (২) ঐচ্ছিক দায়িত্ব এবং (৩) সমন্বয়মূলক দায়িত্ব। বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলোর মধ্যে ছিল সরকারি রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, সরকারি ফেরী নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন। ঐচ্ছিক দায়িত্বগুলোর বিষয় ছিল শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক কল্যাণ এবং গণপূর্ত।

এছাড়াও জেলা পরিষদের ওপর কৃষি, শিল্প, সমাজ উন্নয়ন, জাতীয় পুনর্গঠনের প্রসার এবং সমবায় উন্নয়নের মত বিশাল কর্মকাণ্ডের দায়িত্বও অর্পিত হয়। জেলার মধ্যে স্থানীয় পরিষদসমূহের সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনও ছিল জেলা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। আশা করা হতো, জেলা পরিষদ জাতি গঠনমূলক বিভাগসমূহের গৃহীত পরিকল্প ও প্রকল্পসমূহ এবং এগুলোর আরও উৎকর্ষ ও উন্নয়ন সাধনের প্রস্তাব দেবে এবং বিভাগীয় পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ প্রস্তাব সম্বলিত সুপারিশ পেশ করবে। চতুর্থ স্তরের

Dhaka University Institutional Repository

যতোটুকু ছিল তারপরও গলাটিপে মারা শুরু করলেন, তিনি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে পারিবারিক আইন জারী করলেন এবং কুরআনের শাশ্বত আইনের ওপর ছুরি চালালেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১৯৬২ এপ্রিল মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আব্বাস আলী খান নিজের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[১১] কোনরকম টাকা-পয়সা খরচ ছাড়াই নির্বাচিত হয়ে যান।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান

১৯৬২ সালের জুনের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য খান সাহেব রাওয়ালপিন্ডি পৌছেন। খান সাহেবের অনেক পুরাতন বন্ধু-বান্ধবও নির্বাচিত হয়ে অধিবেশনে যোগ দিতে আগমন করেন। অধিবেশন বসার আগের রাতে পূর্ব পাকিস্তানী সকল জাতীয়পরিষদ সদস্য বসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তাঁরা কেউ আইয়ুব খানের সহযোগীতা করবেন না যতক্ষণ না পূর্ব পাকিস্তানের সকল দাবী-দাওয়া পূরণ করা হয়েছে। আব্বাস আলী খানসহ সকল জাতীয় পরিষদের সদস্যকে থাকতে দেয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় হাসপাতালের জন্য নির্মিত একটি বিরাট বাড়ীতে। রোগীদের জন্য নির্মিত ছোট ছোট কক্ষে তাদের দু'তিন জন করে থাকতে দেয়া হয়েছে। দিনের বেলা ঘরের বাইরে প্রচণ্ড লু হাওয়া চলে। রাতে ঘরের ভেতরেও ভাবসা গরম। মাথার উপরে বিজলী পাখা চল্লেও সারা রাত আইটাই করতে হতো। কিছুদিন পর ইস্ট পাকিস্তান নামক টিপটপ বিলাসবহুল রেস্ট হাউসে স্থানান্তরিত হলেন। খান সাহেবের রুমমেট হলেন দিনাজপুরের শ্রদ্ধেয় হাসান আলী। মেঝে মোটা কার্পেটে ঢাকা। দরজা-জানালায় মোটা পর্দা। চেয়ার-টেবিল, দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয্যা। হাসপাতাল গৃহে রাতের বেলা পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা আইয়ুব খানের সাথে সহযোগিতা না করার ব্যাপারে যারা একমত হয়েছিলেন, পরের দিন সকালে ফজরের পর খবরের কাগজ হাতে নিয়ে খান সাহেব বিস্মিত হলেন। মুসলিম লীগের অনেক জাদরেল নেতা আইয়ুব মন্ত্রিসভার প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছেন। সামরিক এক নায়কের হাত মজবুত হল।

রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

১৯৬২ সালের পনেরই জুলাই জাতীয় পরিষদে Political Parties Act পাস হয়। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল পূর্ণ গঠনের সুযোগ হয়। আইয়ুব খান কনভেনশন ডেকে নতুন দল গঠন করে নাম দেন 'কনভেনশন মুসলিম লীগ'। খান সাহেব আবার রাজনীতি শুরু করেন। তিনি আর চাকুরীতে যোগদান করেননি।

সংগঠন বিভাগীয় পরিষদ কার্যত একটি অত্যন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এটি ছিল ঐ স্তরের কেবল একটি উপদেষ্টা পরিষদ। মৌলিক গণতন্ত্র স্থানীয় সরকারের ভিত্তি হিসেবে বলবৎ থাকা ছাড়াও জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারকে বৈধতা দানের জন্য রাজনৈতিক ও নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতো। ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য যে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব খানের সপক্ষে রায় দেয়। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিপুল জনসাধারণ মৌলিক গণতন্ত্রীগণ কর্তৃক একচেটিয়াভাবে নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, যার ফলে ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। মৌলিক গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুধু যে আইয়ুব সরকারকে বৈধতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বরং ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের পতনের পর এর বৈধতাও হারিয়ে ফেলে। [শামসুর রহমান বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ০৩,০৪]

১১. এ প্রসংগে খান সাহেব বলেন, 'বাষট্টির এপ্রিলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হলো। নিজের মোটে ইচ্ছে না থাকলেও বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এক রকম জোর করেই নামিয়ে দিলেন নির্বাচনে। বিনা খরচায় নির্বাচিত হয়েই গেলুম। তবে ভাগ্য ভালো কোথাও ব্যালট ডাকাতি হয়নি।' (আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ, বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা : ২২১

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিল উত্থাপন

১৯৬২ সালে কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন[১২] বাতিলের জন্য পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে বিলটি উত্থাপন করার দায়িত্ব খান সাহেবকে দেয়া হয়। তখন আইয়ুব খান (ফিল্ড মার্শাল) দেশের প্রেসিডেন্ট। তিনিই

---

১২. মুসলিম পরিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ উত্তরাধিকার, বিবাহ রেজিস্ট্রি, বহুবিবাহ, তালাক, দেনমোহর ও ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন। এ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য আইন কমিশনের কিছু সুপারিশ কার্যকর করার ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৬১ সালের ৮ নং অধ্যাদেশ নামে পরিচিত। এ অধ্যাদেশে পারিবারিক বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সালিসী কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং প্রতিযোগী পক্ষগণের মধ্য থেকে একজন করে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে। পৌর এলাকায় পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক সালিসী কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। এ অধ্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সকল আইন, প্রথা বা রীতির ওপর এ আইন কার্যকর হবে। এ আইনের ৪ নং ধারায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংশোধন আনা হয়। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে লা-ওয়ারিশ প্রথাকে বাতিল করা হয়। এ আইনে বলা হয়, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বা কন্যার মৃত্যু হলে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হওয়ার সময় ঐ পুত্র বা কন্যার সন্তানাদি যদি জীবিত থাকে, তাহলে ঐ মৃত পুত্র বা কন্যা বণ্টনের সময় জীবিত থাকলে সে যে অংশ পেতো, তার সন্তানাদি সমষ্টিগতভাবে অনুরূপ অংশ পাবে। ৫ নং ধারায় বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ ধারায় বলা হয়, কোন ব্যক্তির একটি বিবাহ বলবৎ থাকা অবস্থায় সালিস পরিষদের পূর্বানুমতি ছাড়া পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না এবং এরূপ অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ সম্পন্ন হলে তা রেজিস্ট্রি করা যাবে না। বিবাহ করতে হলে সালিস পরিষদের অনুমতির জন্য নির্ধারিত ফি দিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করতে হবে এবং আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত বিবাহের কারণ, প্রয়োজনীয়তা এবং এ বিবাহে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সম্মতি আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্র পাওয়ার পর চেয়ারম্যান আবেদনকারী ও তার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে বলবেন এবং এ সালিস পরিষদ যদি মনে করে যে, প্রস্তাবিত বিবাহটি প্রয়োজন ও ন্যায়সঙ্গত তাহলে পরবর্তী বিবাহে অনুমতি প্রদান করতে পারেন। আবেদনপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সালিস পরিষদ তাঁর সিদ্ধান্তের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করবে। কোন পক্ষ নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাকিমের কাছে পুনর্বিচারের আবেদন করতে পারবে এবং মহকুমা হাকিমের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। কোন পুরুষ সালিস পরিষদের অনুমতি ব্যতীত যদি আরও একটি বিবাহ করে, তাহলে তাকে (ক) অবিলম্বে তার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সমস্ত দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধ করা না হলে তা বকেয়া রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাবে; (খ) অভিযোগক্রমে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

বিবাহ রেজিস্ট্রি এ আইনের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইন অনুসারে বিয়ে রেজিস্ট্রির উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিকাহ রেজিস্ট্রার নামে অভিহিত হন। একটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মাত্র নিকাহ রেজিস্ট্রার থাকবেন। এ আইন অমান্যকারীকে তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কাদরাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। বিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফি সরকার কর্তৃক নিধারিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে তাকে যে কোন প্রকারে তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশের একটি নকল স্ত্রীকে পাঠাতে হবে। তালাক ঘোষণার পর তা প্রত্যাহার করা না হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেয়ার দিন থেকে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ হবে না। নোটিশ পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান পক্ষসমূহের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সালিস পরিষদ গঠন করবেন এবং সালিস পরিষদ এ সমঝোতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তালাক ঘোষণার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে ৯০ দিন সময় অথবা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না। এই আইনের পর থেকে তালাক দ্বারা বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটেছে এরূপ স্ত্রী, এটি তৃতীয়বারের বিয়ে বিচ্ছেদ না হয়ে থাকলে, মধ্যবর্তী সময়ে অন্যকোন পুরুষকে বিয়ে না করেই পুনরায় পূর্ব স্বামীকে বিয়ে করতে পারবেন। অর্থাৎ স্বামীকে বিয়ে করার ব্যাপারে অন্য পুরুষকে বিয়ে করার যে বাধ্যবাধকতা ছিল, তা এ আইনে রহিত করা হয়। তালাক কার্যকর করার ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি তালাকের আইন অনুযায়ী কার্যসম্পাদন না করে, সে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কাদরাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ : যে ক্ষেত্রে তালাকের অধিকার স্ত্রীকে যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং স্ত্রী সে অধিকার প্রয়োগ করতে চায়, অথবা যে ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী তালাক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়, সে ক্ষেত্রে তালাকের বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ যথাসম্ভব প্রযেজ্য হবে।

খোরপোষ: কোন স্বামী তার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত খোরপোষ না দিলে, অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সমান খোরপোষ না দিলে, স্ত্রী বা স্ত্রীগণের যে কেউ আইনের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াও স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করতে পারবে। চেয়ারম্যান সালিস পরিষদ গঠন

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও মানবতা বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স বলে জারি করেন। ১৯৬২ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি বিলটি জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। অনেক টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্য দিয়ে বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়।[১৩]

করবেন এবং সালিস পরিষদ স্বামী কর্তৃক খোরপোষ হিসেবে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি সার্টিফিকেট দিতে পারবেন। স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ এই সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে মহকুমা হাকিমের কাছে আপীল করতে পারবেন। মহকুমা হাকিমের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

দেনমোহর: এ আইনে দেনমোহর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে, পূর্বে স্ত্রী বা স্ত্রীগণের দেনমোহর পরিশোধ করা না হয়ে থাকলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ চাহিবামাত্র তাদের দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে। এ আইন পাকিস্তান আমলে আইন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও বলবৎ ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ দেশেও এ আইন বলবৎ রয়েছে।

১৩. খান সাহেব বিল উত্থাপনকালীন সময়ের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "ইংরেজী বাষট্টি সালের কথা। আমি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য। কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিলের জন্যে একটা বিল পেশ করলুম পরিষদে চৌঠা জুলাই তারিখে। আইয়ুব খান (ফিল্ড মার্শাল) দেশের প্রেসিডেন্ট। তাঁরই অর্ডিন্যান্স বলে জারি করা মুসলিম পারিবারিক আইন। একত্রে একাধিক বিবি রাখা একেবারে হারাম, আইনতঃ দণ্ডনীয়। কিন্তু বিনা শাদী-বিয়েতে দশটা রাখুন, কোন বালাই নেই। ষোল বছরের আগে মেয়ে বিয়ে দিলে উভয়কেই একত্রে শ্রীঘরে যেতে হবে। কুরআনের উত্তরাধিকার আইনেও রদবদল করা হয়েছে। এমনি সব উদ্ভট আইন কানুনের যোগফল হলো মুসলিম পারিবারিক আইন। আলেম সমাজ এটাকে ঘোরতর ইসলামবিরোধী বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু তাহলে কি হয়? আইয়ুব খান চেয়েছিলেন ইসলামকে পঞ্চম জর্জের দাড়ির মতন কাটছাঁট করে আধুনিক করতে। আরও চেয়েছিলেন একাধারে রাজনীতি ও ধর্মের ইমাম সাজতে। বুড়ো খালিকুজ্জামান ত তাঁকে আমীরুল মুমেনীন বলেই ফেল্লেন। সে যা হোক, সারা দেশে এ আইনটির বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ হলো ইসলামী জনতার পক্ষ থেকে। বড়ো বড়ো আলেমকে লাহোর লালকেল্লায় আর ঢাকার লাটশালায় ডেকে নিয়ে শাসিয়ে দেয়া হলো। গ্রেফতারও করা হলো কয়েকজনকে। জুন মাসে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে আমার ঘাড়ে পড়লো আইনটি বাতিলের জন্যে একটা বিল পেশ করার দায়িত্ব। তাই করলুম। তেসরা জুলাই আইয়ুব খান আমায় ডাকলেন তাঁর কুঠিতে। একজন মহিলাসহ আরও কয়েকজনকে। বিকালবেলার অগ্নিবর্ষী সূর্যকে গাছপালা আর দালান-কোঠার পেছনে রেখে আমাদেরকে বসতে দেয়া হলো সবুজ ঘাসের মখমলের ওপর পাতানো মূল্যবান সোফায়। এলো কিছু নিমকি, চানাচুর ও গরম চা। মিষ্টির বদলে নিমকির গুরুত্ব হয়তো বা এই ছিল যে নিমক, নিমক হারামির প্রতিষেধক। গরম চায়ের দশগুণ গরম চিল আইয়ুব খানের পাঠানী মেজাজখানা। মেহমান ডেকে এনে তাঁর অপমান করা পাঠানদের আদতের খেলাপ। নতুবা তাঁর মুখে-চোখে যে ধরনের ক্রোধের আগুন জ্বলছিল তার সাথে রিভলভারের গর্জন মোটেই বেমানান হতো না। তবুও আকারে-ইংগীতে কিছুটা শাসিয়ে দিলেন যে আগামীকাল আমার প্রস্তাবিত বিলটি পেশ করে পাঠানোর ইয্যতে যেন আঘাত না হানি! আমন্ত্রিতা আধুনিকা মহিলাটিকেও বেশ উসকিয়ে দেয়া হলো যেন তিনি তাঁর মহিলা বাহিনী রেডী রাখেন আমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার জন্যে। মহিলাটিও জাতীয় পরিষদ সদস্য। খাস পাঠান এবং মর্দান শুগার মিলের অংশীদার। পরদিন চৌঠা জুলাই আইয়ুব হলের (পরিষদ ভবন) সামনে বিরাট মহিলা বাহিনী। সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষিকা ও মহিলা বাহিনী। সরকারী বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের সে বাহিনী। উপরআলার লিখিত অর্ডার পেয়ে ক্লাস বয়কট করে নেমেছে ডিমনস্ট্রেশনে। ইয্যৎ রাখতে হবে আইয়ুব খানের। ইয্যৎ রাখতে হবে তাঁর পরিকল্পিত আধুনিক ইসলামের। তাই মেয়েরা বোরকা ফেলে দিয়ে রাস্তায় নেমেছে। কোন রকম মহিলা বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে ঢুকলুম আইয়ুব হলে, পরিষদ ভবনে। শেষ পর্যন্ত টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্য দিয়ে বিলটি আবার গৃহীত হলো আলোচনার জন্যে। কিন্তু সবচেয়ে টানা-হ্যাঁচড়া হয়েছিল মিঃ মুহাম্মদ আলীকে নিয়ে। বগুড়ার মরহুম মুহাম্মদ আলী। তিনি তখন মিনিস্টার এবং লীডার অব দি হাউস। তাঁর দুই বিবি বর্তমান থাকার কারণে, না ইসলামের দরদে, জানি না, তবে তিনি ছিলেন আমার বিলটির সপক্ষে।

ডিভিশনের ঘন্টা যখন বাজতে শুরু করলো, তখন তিনি বিলের সপক্ষে আইয (Ayes) দরজার দিকে ছুটলেন। তখন তাঁকে খপ করে ধরে ফেল্লেন মন্ত্রীত্রয়-সবুর খান, যুলফিকার আলী ভুট্টু এবং ওয়াহিদুজ্জামান। আর যাবেন কোথায়? অমনি তাঁর অন্য হাতখানা ধরলেন উপজাতীয় দুই যাঁদরেল আর পিন্ডির সাইয়েদ আসগার আলী শাহ। শুরু হলো টাগ অব ওয়ার। টিকেট করে দেখার মতন জিনিস। শেষটায় তিন সাইয়েদ পাঠান মিলে মুহাম্মদ আলীকে হিড্ হিড্ করে টেনে আইয দরজা দিয়ে পার করে নিয়ে গেলেন। এভাবে বিপুল ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হলো। পরে অবিশ্যি তিন বছর ধরে বিলটিকে ঝুলিয়ে রেখে, ভাভা দেখিয়ে, টোপ গিলিয়ে আইয়ুব বাজিমাৎ করলেন। বিলটির প্রসব বেদনায় গলাটিপে মারা হলো। সন্তান প্রসব আর করতে পারলো না। কারণ হয়তো এই যে, তখন পাকিস্তানের মতো অনুন্নত দেশগুলোতে চলছিল গর্ভ নিরোধের প্রচণ্ড অভিযান। পরিষদের বাইরে ছোটোবড়ো শহরগুলোতে পরিবার পরিকল্পনার ক্লিনিকগুলো জেঁকে বসেছিল। এ সবের প্রভাবে বিলটির অ্যাবরশন করাতে গিয়ে তাকে প্রাণে মারা হলো।"(আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ, বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা : ২২৪-২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

খান সাহেবের কুশপুত্তলিকা জ্বালিয়ে তাঁরা মনের ঝাল ঝড়ালেন। আর আইয়ুব খানের মান রাখলেন। হার মানাতে না পারলে বিক্ষোভ আর গালাগালি ছাড়া তৃতীয় হাতিয়ার আর কি আছে? পরিষদ ভবনের ভেতর-বাইর মহিলা বাহিনীর প্রচণ্ড সাঁড়াসি আক্রমণ প্রতিহত করে যখন বিলটি গৃহীত হলো, তখন পরাজিত বাহিনীকে কনসোলেশন প্রাইজ দেবার জন্যে পিন্ডি, লাহোর, করাচীতে আধুনিকাদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ হলো তাঁর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সারা দেশ থেকে অজস্র অভিনন্দনের তার (টেলিগ্রাফ) আসা শুরু হলো। টেলিগ্রাফ পিয়নের কারণে সারারাত ঘুমোতে পারেননি । তাঁরসাথে স্থানীয় লোক ও বন্ধু-বান্ধব দেখা করতে লাগলেন। পাঠান আর পাঞ্জাবীদের কোলাকোলির ঠেলায় অস্থির। কোলাকোলির পর-টি-পার্টি, ডিনার ইত্যাদির পালা শুরু।

আব্বাস আলী খানকে হত্যার ষড়যন্ত্র

১৯৬২ সালের ৭ই জুলাই খান সাহেব তাঁর সাথীদের নিয়ে পেশাওর, তুরখুম, লান্ডি কোটাল, খয়বর, মারী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হন, এ ভ্রমণে তাঁর সাথে ছিলেন মিয়া তোফায়েল মুহাম্মাদ, চৌধুরী গোলাম মোহাম্মাদ, মাওলানা ইউসুফ ও জনাব শামছুর রহমান। শেষের দু'জন খান সাহেবের সহকর্মী এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর তাঁরা পেশাওর স্টেশনে পৌছেন। পাঠানরা উষ্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করে। সে সময় সারাদেশে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চলছিল বলে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। সভা, সমিতি, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ। তবুও ১৫/১৬টা টাংগায় ছড়ে টাংগার মিছিলে পৌছেন পাঠান মেজবানের বাড়ী। রাতে খানাপিনা আর খোশগল্প সেরে ছাদের উপর ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে নাশতা গ্রহণ করার পর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন শহর ভ্রমণ শেষে খান সাহেব ও তাঁর সাথীরা রাত ১১টায় পিন্ডি পৌছেন। তখন ডি এ ভি কলেজ রোড আর লিয়াকত রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা টেক্সির অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় একখানা টেক্সি এসে খান সাহেবকে মাড়িয়ে দ্রুত বেগে পালিয়ে যায়। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। সাথে সাথে তাঁকে সেন্ট্রাল হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে স্থানান্তর করা হয়। তাঁর ডান দিকের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। ডান উরুর ডান পাশটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এদিকে এ ঘটনার পর সারা দেশে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো[১৪]। কোন কোন সাংবাদিক ঘটনার ওপর একটু বাড়িয়ে সংবাদ পরিবেশন করলেন। এ ঘটনাটির পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র, পারিবারিক আইন সমর্থক কিছু চরমপন্থী কর্তৃক মাওলানাকে হত্যার প্রচেষ্টা। পরিষদের স্পিকার মৌলভী তমিজুদ্দীন সাহেব রোজ পরিষদের সার্জেন্ট অ্যাট আর্মসকে পাঠাতেন খান সাহেবের খবর নেয়ার জন্য। ১৫ই জুলাই পরিষদের অধিবেশন শেষ হয়। খান সাহেব তাঁর সাথীদের সাথে ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে দীর্ঘ প্রেসক্রিপশনসহ হাসপাতাল ত্যাগ করেন। নিরাপদে বাড়ি পৌছেন।

---

১৪. এসম্পর্কে তাঁর একমাত্র কন্যা খান জেবুন্নেছা চৌধুরী বলেন, "এম. এন. এ. থাকাকালে জেনারেল আইয়ুব খানের 'ফ্যামিলি ল অর্ডিন্যান্স' বাতিলের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের পক্ষে বিল উত্থাপন করলেন। এতে ইসলামবিরোধী চক্র আব্বাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। রাওয়ালপিন্ডির এক রাস্তার পাশ দিয়ে আব্বা হাঁটছিলেন। সেখানেই তাঁকে গাড়ী চাপা দেয়া হলো। মৃত্যুর ফয়সালাতো মহান রাব্বুল আলামিনের হাতে, তাই তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। কিন্তু হাত ভেঙ্গে গেলো এবং এক সাইড থেতলে গেল। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিলো না। পেপার পেতে ২/৩ দিন লাগতো। টেলিগ্রাম এলো "জেবু আম্মা ভালো আছি।" আমরা একটু অবাক হলাম কেন এই টেলিগ্রাম। পরে সব জানতে পারলাম। আব্বা রাওয়ালপিন্ডি হতে জয়পুরহাট এলেন তখনও হাতে ব্যান্ডেজ আছে। উনাকে জয়পুরহাট রেল স্টেশনে বিরাট সম্বর্ধনা দেয়া হলো। আব্বা দরজার দিকে এগোতেই জড়িয়ে ধরে ভীষণ কেঁদেছিলাম, আজও সে স্মৃতি ভুলিনি। (মৃত্যুহীন প্রাণ : আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ, শতাব্দি প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৯) পৃষ্ঠা নং ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সামরিক শাসক আইয়ুববিরোধী আন্দোলন

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (PDM) গঠন

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাশিয়ার মাধ্যমে তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সাথে পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী চুক্তি[১৫] করায় এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম পার্টি ও পিডিপি এর জনাব নূরুল আমীন পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি PDM[১৬] (Pakistan Democratic Movement) নামে জোটবদ্ধ হয়। এ

---

১৫. তাসখন্দ ঘোষণা : পাক-ভারত যুদ্ধ ২৩ সেপ্টেম্বর বন্ধ হলেও যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, এর মীমাংসার জন্য তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কোসিগিন সে ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে মধ্য-এশিয়ার মুসলিম দেশ উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে (তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিলো) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধবন্দী রয়েছে। যুদ্ধে উভয় পক্ষই অপর দেশের কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছে। যে কাশ্মীর সমস্যা পাক-ভারত বিরোধের মূল কারণ, সে বিষয়ে সমঝোতা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে ১৯৬৬ সালের ৬ থেকে ১০ জানুয়ারি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় যে চুক্তি হয় তা 'তাসখন্দ ঘোষণা' নামে প্রচারিত হয়। এ ঘোষণায় স্বাক্ষরদানের পরপরই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দেই হার্টফেল করে মৃত্যুবরণ করেন।

এ ঘোষণা সম্পর্কে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সকল বিরোধী দল যেসব মন্তব্য করে এর সারকথা হলো, সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাসখন্দে ভারতের কাছে পরাজয় স্বীকার করে এসেছেন।

এ মন্তব্যের যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। কাশ্মীর ইস্যু ১৯৪৮ সাল থেকেই জাতিসংঘের মাধ্যমে মীমাংসার বিষয়। পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব অনুযায়ীই কাশ্মীর দখল নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে জাতিসংঘ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সিদ্ধান্ত দেয়। তাসখন্দ ঘোষণায় ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার কথা উল্লেখ থাকায় কূটনৈতিক দিক দিয়ে ভারতের সাফল্য ও পাকিস্তানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। (অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম ৩য় খণ্ড : পৃষ্ঠা ৫৫)

১৬. **পিডিএম গঠন** : আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলন সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব না হলেও সকল রাজনৈতিক দলই জনগণের ভোটাধিকার বহাল করার দাবিতে সোচ্চার হয়। গোটা পাকিস্তানেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। পূর্ব-পাকিস্তানে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যপ্রচেষ্টা বানচালের জন্য ৬ দফা ফলাও করে প্রচার করলেও ৮ মে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন মনে করে। রাজনৈতিক গরজ বড়ই বালাই। ৬ দফার আন্দোলন আরও জোরদার হলে আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষনেতা গ্রেপ্তার হন। এ অবস্থায় আমেনা বেগমের নেতৃত্বে ৬ দফা আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এ পরিস্থিতিতে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে জনগণের রাজনৈতিক জাগরণের প্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভূত হয়। ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল সাবেক প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রাহমান খানের বাসভবনে ৫টি দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। দলগুলো হলো, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)। উক্ত বৈঠকে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (PDM) নামে রাজনৈতিক জোট কায়েম হয় এবং প্রত্যেক দল থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়।

১. এনডিএফ থেকে সর্বজনাব নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আতাউর রাহমান খান; ২. মুসলিম লীগ থেকে মিয়া মমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা, জনাব তোফাজ্জল আলী ও খাজা খায়রুদ্দীন; ৩. জামায়াতে ইসলামী থেকে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম; ৪. আওয়ামী লীগ থেকে নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান, এডভোকেট আবদুস সালাম খান ও গোলাম মুহাম্মদ খান লুন্দখোর; ৫. নেযামে ইসলাম পার্টি থেকে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, জনাব ফরীদ আহমদ ও এমআর খান।

উক্ত বৈঠকে উপরিউক্ত সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

পিডিএম প্রশ্নে পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগে দ্বিধাবিভক্তি : পিডিএম গঠনের সাথে সাথেই পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের মুকাবিলায় পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগের ২৪ সদস্যবিশিষ্ট পৃথক এডহক কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৬৭ সালের ২৩ আগস্ট এ কমিটির নাম ঘোষণা করে। কমিটির সভাপতি হন মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, সহ-সভাপতি যশোরের এ্যাডভোকেট মশিয়ুর রহমান, সেক্রেটারি রাজশাহীর এডভোকেট মুজীবুর রহমান ও কোষাধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম চৌধুরী। সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম : আবদুস সালাম খান এডভোকেট (ফরিদপুর), মিয়া আবদুর রশীদ (যশোর), আবদুর রাহমান খান (কুমিল্লা), মতিউর রাহমান (রংপুর), রহীমুদ্দীন আহমদ (দিনাজপুর), সাদ

Dhaka University Institutional Repository

জোটের চেয়ারম্যান ছিলেন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান। আব্বাস আলী খান এ জোটের অন্যতম নেতা ছিলেন। ফেব্রুয়ারীতে লাহোরে নেযাম ইসলাম পার্টির প্রেসিডেন্ট চৌধুরী

আহমদ এডভোকেট (কুষ্টিয়া), লকিতুল্লাহ (বরিশাল), মোমিনুদ্দীন আহমদ (খুলনা), জালালউদ্দীন আহমদ (সিলেট), নূরুল হক এডভোকেট (রংপুর), ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (পাবনা), জুলমত আলী খান এডভোকেট (ময়মনসিংহ)।

পিডিএমভুক্ত দলগুলোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, ভারতের মতো সম্প্রসারণবাদী দেশের মুকাবিলায় মুসলিম দেশ হিসাবে মর্যাদার সাথে টিকে থাকতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মযবুত ঐক্য প্রয়োজন। ঐ সব দলের পূর্ব-পাকিস্তানি নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বহাল করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাধান্য একসময় অবশ্যই বহাল হবে। কোন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পৃথক হবার চিন্তা করে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ এলাকাই এ জাতীয় চিন্তা করে থাকে। প্রায় চারদিকে ভারত দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তান আলাদা হলে ভারতের আধিপত্যের শিকার হবার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

আওয়ামী লীগের একাংশ পিডিএমভুক্ত দলসমূহ ৬ দফা দাবিকে রাষ্ট্রীয় সংহতি পরিপন্থী মনে করে। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে পৃথক করার পরিকল্পনায়ই ৬ দফা রচিত বলে ধারণা হয়। তাই এর বিকল্প হিসাবে পিডিএম নিম্নোক্ত ৮ দফা দাবি পেশ করে, যাতে প্রাদেশিক সরকার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারে।

১. শাসনতন্ত্রে নিম্ন বিধানসমূহ ব্যবস্থা থাকবে -।

ক. পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ফেডারেল সরকার; খ. ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য; গ. পূর্ণাঙ্গ মৌলিক অধিকার; ঘ. সংবাদপত্রের অবাধ আজাদি; ঙ. বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।

২. ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ঃ

ক. প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স); খ. বৈদেশিক বিষয়; গ. মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা; ঘ. আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐকমত্যে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

৩. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যস্ত থাকিবে।

৪. উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ১০ বছরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে।

ক. এই সময়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঋণদানসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব-পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ মুদ্রা নিরঙ্কুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হইবে।

খ. উভয় অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকিবে।

গ. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ করিবেন, যাহাতে পূর্বপাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মওজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথাসময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

৫. ক. মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং; খ. আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য; গ. আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ; ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবেন।

৬. সুপ্রিমকোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এককভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে ১০ বছরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হইতে পারে।

৭. প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী সামরিক শক্তি ও সমরসজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যে- ক. পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করিতে হইবে।

খ. দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্বপাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

গ. নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য সংবলিত একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করা হইবে।

৮. এই ঘোষণায় শাসনতন্ত্র শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায়, যাহা অবিলম্বে জারি করা হইবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ৬ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচি ২ হইতে ৭ দফাসমূহকে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে। উপরিউক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তাবয়নের জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। (অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, কামিয়াব প্রকাশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮, ৫৯, ৬০)

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আলী লাহোরস্থ রাজভবনে পিডিএম-এর ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের বৈঠক হয়। শেখ মুজিব ঐ বৈঠকেই প্রথম ৬ দফা দাবী পেশ করেন। অন্য চারদল তা সমর্থন না করায় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পিডিএম থেকে বেরিয়ে আসে। নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা বিরোধী আওয়ামী লীগ গঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন এড. আব্দুস সালাম খান। শেখ মুজিবের ৬ দফার বিকল্প ৮ দফাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলে পিডিএম। শেখ মুজিব তখন জেলে, ৬ দফার আন্দোলন স্তিমিত। তিন বছর পিডিএম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুবের স্বের শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট জনমত সৃষ্টি করে।

এ পরিবেশে মাওলানা ভাসানী ১১ দফার ডাক দিয়ে ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। শেখ মুজিবের ৬ দফাও ঐ ১১ দফার শামিল থাকায় আওয়ামী লীগের শক্তিও ময়দানে সক্রিয় হয়, ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। পুলিশের গুলিতে ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হলে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলনে আরো গতি সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ আরও সক্রিয় হয়।

পিডিএম এর ৮ দফাভিত্তিক আন্দোলন আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেই ছিল। কিন্তু রাজনীতিতে কোন তৃতীয় ধারা সৃষ্টি করা যায়নি। ফলে পিডিএম এর আন্দোলন পেছনে পড়ে গেল।

গণতান্ত্রিক জোট ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (DAC) গঠন

পিডিএমএর সাথে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ, ওয়ালী খানের ন্যাপ ও মুফতি মাহমুদের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম মিলে ৮ দলীয় DAC[১৭] (Democratic Action Commitee) গঠিত হয়। যার কেন্দ্রীয় আহবায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানই ছিলেন। আর পূর্ব পাকিস্তানের আহ্বায়ক ছিলেন খন্দকার মুশতাক আহমদ। আব্বাস আলী খান ও এ কমিটির অন্যতম নেতা ছিলেন এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে খান সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা এবং শেখ মুজিব মন্ত্রী সভার সদস্য ড. মফিজ উদ্দীন চৌধুরী লিখেছেন-

---

১৭. এ কমিটিতে যারা স্বাক্ষর করেন-তারা হলেন

১. জমায়াতে ইসলামী পাকিস্তান - এর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, ২. পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম -এর মাওলানা মুফতি মাহমুদ, ৩. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর জনাব নূরুল আমীন, ৪. পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, ৫. পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-এর নওয়াবযাদা নসারুল্লাহ খান, ৬. পাকিস্তান মুসলিম লীগ-এর মিয়া মমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা, ৭. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফা)-এর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ৮. পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর আমীর হোসেন শাহ।

DAC এর দফা : আট দলীয় জোট গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্যে ঐ বৈঠকেই নিম্নরূপ ৮ দফা দাবিতে সবাই ঐকম্য পোষণ করেন ঃ ১. কেন্দ্রে ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার। ২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। ৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার। ৪. নাগরিক অধিকার পুনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল। বিশেষত বিনাবিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল। ৫. শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি এবং কোর্ট ও প্রাইব্যুনাল সমীপে দায়েরকৃত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার। ৬. ১৪৪ ধারার আওতায় দেওয়া সর্বপ্রকার আদেশ প্রত্যাহার। ৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল। ৮. সংবাদপত্রের উপর আরোপিত যাবতীয় বিধি-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রেস ও পত্রিকা পুনর্বহাল। এভাবে পিডিএম-ভুক্ত ৫ দল ও এর বাইরের ৩ দল মিলে DAC নামে ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠলো। অতঃপর এ নামেই আন্দোলন পরিচালনা করা হলো। DAC-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নওয়াবযাদা নসুল্লাহ খানকেই করা হলো। পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক আহ্বায়ক কে হবে, সে বিষয়ে আলোচনায় দেখা গেলো যে, ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগ বাকি ৭টি দলের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে পদ প্যাওয়ার মতো নির্লজ্জ ভূমিকা কেউ পালন করেনি। এ পদটি আওয়ামী লীগকে না দিলে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ DAC-এ থাকতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ দেখা দিলো। তাই আন্দোলনের স্বার্থে তাদের দাবি সবাই মেনে নিলো। শেখ মুজিব জেলে থাকায় সিনিয়র হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদকে আহ্বায়ক করা হলো।(অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, কামিয়াব প্রকাশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪,৭৫,৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

"আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লাম। আন্দোলনটা এখানে দানা বাঁধছে না। আজকের দিনের মতো ৭২ মোছলমান, ৭৩ ফিরকা। এতসব অবধি ১৯৬৫ সাল নাগাদ 'কপ' 'COP' (Combined Oposition Party) গঠিত হলো এবং তার এক অংশের কর্মস্থল হলো ইন্দিরা রোডের দু'নম্বর বাড়ি। আমার প্রতিবেশী হামিদুল হক চৌধুরীর সু (?) পরামর্শে ২ নম্বর ইন্দিরা রোড 'কপ'কে ছেড়ে দিয়ে ফ্যামিলি শিফট করলাম ৩৪ নম্বর জিন্নাহ এভিনিউর (বর্তমান বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে)। দু'নম্বর ইন্দিরা রোডেই তখন আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন সংস্কার ও বিভক্তির কাজও হয়েছে। শেখ মুজিবুর, আতাউর রহমান খান ঐ বাড়িতে আসতেন এবং একদিন আতাউর রহমানকে ছেড়ে শেখ মুজিব দলবলসহ পশ্চিম দিকে বিশ হাত দূরেই যেখানে নবাব মোশাররফ হোসেন (জলপাইগুড়ি)- এর আমবাগান ছিল, সেখানে আওয়ামী লীগারদের এক অংশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলেন। সেই থেকে আওয়ামী লীগ[১৮] থেকে আতাউর রহমান খান[১৯] বাদ পড়েন। শেখ মুজিব নেতা হন। এই সময় আমি কপ- এর সমর্থক, আওয়ামী লীগের সদস্যও নই। ১৯৬৫ সাল। কপ-এর নমিনি ফাতেমা জিন্না আয়ুব খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আমার এলাকা বগুড়া বিশেষ করে পশ্চিম বগুড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার সাইকেল ব্যবসা তখন তুঙ্গে। শ'খানেক প্রিন্স বাইসাইকেল, ৬ খানা হুন্ডা, মপের ৫০ সিসি আয়ুববিরোধী আন্দোলনের জন্য দিলাম। একটা হুন্ডাতে আমি নিজে চড়ি আমার ব্যাকসিটে আব্বাস আলী খাঁ (পরবর্তীকালে জামায়তে ইসলামির ভারপ্রাপ্ত আমির) একদিন পল্লী অঞ্চলে প্রচারে চলছি, পেছনে আব্বাস খাঁ সাহেব। একটা চষা জমির উপর হন্ডা উঠে গেলো এবং উল্টে গেলো। খাঁ সাহেব নিচের চষা জমিতে, তার উপর হুন্ডা, তার উপরে আমি, ১৫০ পাউন্ড। খাঁ সাহেবকে সেদিন গুরুভার নিতে হয়েছিলো। জয়পুরহাট ক্যাম্পে ফিরে, বিরাট হাসাহাসি।"[২০]

---

১৮. **আওয়ামী লীগ** বাংলাদেশের একটি অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশেমের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক অংশের নেতা ও কর্মীদের এক কনভেনশনে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সহসভাপতি আতাউর রহমান খান, শাখাওয়াত হোসেন ও আলী আহমদ খান; সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক (টাঙ্গাইল); যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান (জেলে অন্তরীণ), খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এ.কে রফিকুল হোসেন; এবং কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খান। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত দলের তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এ দলের রয়েছে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, যুব ও মহিলা ফ্রন্ট।

১৯. **আতাউর রহমান খান** (১৯০৭-১৯৯১) আইনজীবী ও রাজনীতিক। ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত বালিয়া গ্রামে ১৯০৭ সালে তাঁর জন্ম। তিনি ঢাকার পগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২৪), জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ. এ (১৯২৭) এবং ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি. এ (অনার্স) পাস করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল ডিগ্রি (১৯৩৬) লাভ করে তিনি ঢাকা জেলাকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন (১৯৩৭)। আতাউর রহমান ১৯৪২ সালে মুন্সেফ পদে চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু দুবছর পর চাকরি ছেড়ে পুনরায় ওকালতি শুরু করেন (১৯৪৪)।

প্রজা সমিতিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে আতাউর রহমান খানের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে তিনি ঢাকা জেলা প্রজা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি দলের ঢাকা জেলা কমিটির সদস্য এবং মানিকগঞ্জ মহকুমা কমিটির সহসভাপতি ছিলেন। আতাউর রহমান খান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে (১৯৪৯) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি এ দলের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্য হিসেবে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে পুনর্গঠিত কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। আতাউর রহমান খান ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে গঠিত যুক্তফ্রন্টের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন এবং যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

২০. মফিজ চৌধুরী রচনাবলী, পৃষ্ঠা নং ৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ১৯৭০ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ

পাঁচবিবি, খ্যাতলাল নির্বাচনী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

আব্বাস আলী খান ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়পুর হাট পাঁচবিবি আসনে জামায়াত-ই-ইসলামীর প্রার্থী হিসাবে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহন করেন[২১]।

বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দান

১৯৭০ সালের নির্বাচনে খান সাহেবের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 'প্রিয় নেতাকে যেমন দেখেছি' নামক প্রবন্ধে মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম লিখেছেন-"৩২ বছর আগে ১৯৬৭ সালে অবিসাংবাদিত এ নেতার সাথে আমার প্রথম পরিচয় রাজশাহীতে, ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক সেক্রেটারী হিসেবে সফরে গিয়ে। তখন তিনি জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী বিভাগীয় আমীর। তাঁর কাছে আসার সুযোগ হয় বগুড়ায় ১৯৭০ সালে। মহাস্থান গড়ের অনতিদূরে মোকামতলায় একটি জনসভায় মরহুম আবদুল খালেক রহ.-এর সাথে যোগদান উপলক্ষে। সেই জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। বাইরের বক্তা ছিলেন মরহুম আবদুল খালেক রহ. ও আমি। তখন আমি দ্বিতীয়বারের জন্যে ইসলামী ছাত্রসংঘর প্রাদেশিক সভাপতি। নিজামী ভাই তদানীন্তন নিখিল পাক-সভাপতি। লাজুক প্রকৃতির নিজামী ভাই জনসভায় যোগদানকে এড়িয়ে যেতেন বলে '৭০-এর নির্বাচনপূর্ব উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসভায় ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারী (কাইয়েম) মরহুম আবদুল খালেক রহ.-এর সাথে আমাকে যেতে হয়েছিল। এ ধরনের এক বড় জনসভা হয়েছিল জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে। প্রধান বক্তা ছিলেন মরহুম আবদুল খালেক রহ.। সাথে ছিলাম আমি। সভাপতিত্ব করেছিলেন জনাব আব্বাস আলী খান। তখন বয়স তাঁর ষাটের ঘরে। আধা-কাঁচা, আধা-পাকা দাড়ি-চুল। কিন্তু সুঠাম দেহ। কণ্ঠস্বরে তারুণ্যের বলিষ্ঠতা। সভাপতির বক্তৃতা দিলেন। ভাষায় উত্তেজনা নেই, আছে বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা। শব্দ চয়নে অসাধারণ সৌকর্য। ইতিহাস ঐতিহ্যের গভীর শিকড় সন্ধানী হিসেবে বৃটিশ-ভারত মুসলমানদের শিল্প, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সেদিন তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন : 'দ্বিজাতি তত্ত্বই এ ভূখণ্ডের সীমানা, সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের আদর্শের রক্ষাকবচ। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা, সেকুল্যার গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের অসার ও মরীচিকাময় ব্যবস্থার শ্লোগান আমাদের জাতিসত্তা বিনাশে এক মহাব্যাধি বৈ কিছু নয়। সকল অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্যে ইসলামী জীবনব্যবস্থার বাস্তবায়ন ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।' তাঁর এ অমোঘ সত্যের উচ্চারণ আজও যেনো স্মৃতির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সভা শেষে নিয়ে আসলেন তার জয়পুরহাটের বাড়ীতে। নিজের বিরাট দিঘী থেকে ধরা বড় রুই মাছ দিয়ে মন উজাড় করা তাঁর মেহমানদারীর স্মৃতি ভুলবার নয়। পরিবেশন তিনি নিজেই করেছিলেন।"[২২]

---

২১. ৭০-এর নির্বাচনে জয়পুর হাট থেকে কোন দল থেকে মনোনয়ন পেয়েছিল তার একটি তথ্য প্রদত্ত হয়েছে আবুল কাশেম সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট গ্রন্থে' দেশ বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা প্রেক্ষিত জয়পুরহাট : শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে এডভোকেট মোমিন আহমেদ চৌধুরী লিখেছেন।

"..এগিয়ে এলো ১৯৭০ সালের নির্বাচন। আওয়ামী লীগ থেকে জাতীয় পরিষদে জয়পুরহাট পাঁচ বিবি ক্ষেতলাল নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন পেলেন মফিজ চৌধুরী পিএইচডি। আদমদিঘী দুপচাচিয়া থেকে মজিবর রহমান আক্কেলপুরী। প্রাদেশিক পরিষদে জয়পুরহাট পাঁচবিবি আসনে ডাঃ সাইদুর রহমান, ক্ষেতলাল ও দুপচাচিয়া আবুল হাসানাত চৌধুরী। জাতীয় পরিষদে ড. মফিজ চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জামায়াত-ই-ইসলামীর আব্বাস আলী খান। কনভেনশন মুসলিম লীগের আব্দুল আলীম। কাইয়ুম মুসলিম লীগের অধ্যক্ষ মোহসিন আলী দেওয়ান। (মুক্তিযুদ্ধে জয়পুহাট ২৬শে মার্চ ১৯৯৯, জেলা প্রশাসন জয়পুরহাট প্রকাশিত, পৃষ্ঠা নং ২৪)।

২২. মৃত্যুহীন প্রাণ, আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা নং ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মেরিন বায়োলজী' পাঠ্য তালিকাভুক্তকরণ

১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মুত্তালিব মালেকের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হিসেবে আব্বাস আলী খান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনকালে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যান, তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হল শিক্ষামন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মেরিন বায়োলজি'[২৩] পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেন, পরবর্তীতে তা 'মেরিন একাডেমি' তে রূপান্তরিত হয়। সরকারের মন্ত্রী হয়েও তিনি অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি মিন্টু রোডের সরকারী বাসভবনে উঠে সেখান থেকে কার্পেটসহ বিলাসবহুল পণ্য সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন।

তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভন্ন কার্যাবলীর বিবরণ

আব্বাস আলী খান শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জোহরের নামাজ আদায়কে বাধ্যতামূলক করা হয়[২৪]।

১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আব্বাস আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসিন হল পরিদর্শন শেষে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সহশিক্ষাকে ক্ষতিকর ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন এবং আশ্বাস দেন যে, সহশিক্ষাকে বিলোপ করা হবে। আব্বাস আলী খানের ওই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে দৈনিক সংগ্রাম 'সহশিক্ষা বিলোপ হোক' শিরোনামে এক সম্পাদকীয় লেখে।[২৫]

---

২৩. ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট চালু হয়। এ প্রসংগে বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রসায়ন বিভাগ ও গণিত বিভাগ ১৯৬৮ সালে, পরিসংখ্যান বিভাগ ১৯৭০ সালে, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ১৯৭১ সালে, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ ১৯৭৩ সালে, ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি ১৯৭৬ সালে এবং রিসার্চ সেন্টার ফর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালাম এ সেন্টার উদ্বোধন করেন।

২৪. ১৯৭১ সালের দৈনিক সংগ্রামে এ সম্পর্কিত প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় "শিক্ষা বিভাগ ছাত্রদের মনে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের মধ্যে জামাতে নামাজ পড়ার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে জোহরের নামাজ স্ব-স্ব স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে অথবা নিকটবর্তী মসজিদে জামায়াত সহকারে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অবিলম্বে সকল মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী ও সকল শিক্ষক শিক্ষায়িত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে জামায়াতে নামাজে যোগ দিতে হবে। (দৈনিক সংগ্রাম : ৩১ অক্টোবর, ১৯৭১)

২৫. সে সম্পাদকীয়-র অংশবিশেষ

"সম্প্রতি মোহসিন হলে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান এক প্রশ্নোত্তরে জানান সহশিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিকর। ..... পাশ্চাত্য দেশগুলোয় সহশিক্ষা সামাজিক কাঠামোতে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে এবং সেসব দেশে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের বদলে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ প্রকট হয়ে উঠেছে। ..... আমরা নিশ্চয়ই এরূপ জঘন্য সমাজ গড়ে তুলতে রাজি নই। আমরা আজও সঠিক পিতার নিশ্চিত সন্ধান কামনা করি। আমরা আজও চাই না, আমাদের মেয়েদের শতকরা আশিজনের ভ্যানিটি ব্যাগে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বটিকা। ..... মুশকিল হচ্ছে এই পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নয়নে আমরা এতই মুগ্ধ হয়েছি যে, তাদের আত্মিক বিপর্যয়ের কান্না আমাদের কানে পৌঁছাচ্ছে না। এ কারণেই গত দ'যুগেও ইসলামি রাষ্ট্র বলে ঘোষিত পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের শত শত বেসামরিক কর্মচারী, ডাক্তার এবং রেডিও, টিভি-টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগের টেকনিশিয়ানকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। আরো বহু লোককে সেখানে যাবার জন্যে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে একটি অথবা দুটি পদোন্নতির আশ্বাসও দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বদলি যখন করা হচ্ছে তখন সেটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সম্প্রতি একটি আদেশ জারি করেছেন। তাতে যে কোন বেসামরিক সরকারী কর্মচারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যে কোন অংশে বদলী করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তার পটভূমি

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমির বিবরণ দেয়ার পূর্বে ১৯৪০ সালে যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল তার কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ১২ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে শেরে বাংলা ফজলুল হকের পেশকৃত যে প্রস্তাবটি পাস হয়, তা 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। উক্ত প্রস্তাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের থেকে পৃথক একটি জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ভারতের যেসব প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ঐসব এলাকায় মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র কায়েমের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করা হয়। গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে পরিচজালিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দাবি ছিলো যে, ভারতবাসী হিন্দু-মুসলিম এক জাতি এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পর গোটা ভরত একটি বিরাট স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রকাশ করবে। তারা চেয়েছিলো ছলে-বলে-কৌশলে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের প্রভুত্ব কায়েম করতে। মুসলিম লীগ এই চক্রান্ত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য Two Nation Theory (দ্বি-জাতিতত্ত্ব)-এর ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করে। এ থিওরির দাবি হলো, ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে মুসলিমগণ পৃথক এক জাতি, যারা স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করবে। তা না হলে ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্তি পেলেও মুসলমানদেরকে হিন্দুদের অধীনস্থ থাকতে বাধ্য হতে হবে। এটাই লাহোর প্রস্তাবের মর্মকথা।

Two Nation Theory (দ্বি-জাতিতত্ত্ব)-এর ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবীতে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর অদূরদর্শীতা এবং হঠকারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। এদিকে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তার দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভের পরও পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করে। যার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। আব্বাস আলী খান ও তাঁর দল জামায়াতে ইসলামী যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল সংগত কারণে তার পক্ষে ছিলেন। এবং তাঁরা চেয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যেন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচনোত্তর প্রথম বৈঠক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান

১৯৭১ -এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নিয়মিত বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নির্বচনের পর এটাই শূরার প্রথম বৈঠক। সারা পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে এটাই প্রথম নির্বাচন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার ২৪ বছর পর সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এর আগে প্রাদেশিক পর্যায়ে পশ্চিমে ১৯৫০ সালে এবং পূর্বে ১৯৫৪ সালে নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনে জামায়াত

পাকিস্তানের বুক থেকে এ অনৈসলামিক সহশিক্ষার অভিশাপ আমরা দূর করতে পারিনি। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এতদিন পরে একজন মন্ত্রীর মুখে আমরা অন্তত সহশিক্ষা বিলোপের আশ্বাস শুনতে পেলাম। বস্তুত গত দু'যুগ সহশিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সমাজে যেটুকু কুফল সৃষ্টি করেছে তাতেই এ দেশের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। শুধু গত্যন্তর নেই বলেই তাঁরা এ ধ্বংসকারী ব্যবস্থাকে মেনে চলেছেন। তথাপি এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায়ে তাঁরা সোচ্চার হতে ছাড়েননি।"[২৫](দৈনিক সংগ্রাম : ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম-পাকিস্তানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে করেনি। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে প্রথমেই নির্বাচনের পর্যালোচনামূলক আলোচনা হয়।[২৬]

জামায়াতে ইসলামীর দাবি :"ঐ পরিস্থিতিতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কোন রকম ভূমিকা পালনের সযোগ ছিলো না। অন্য কোনো দলের নেতার বিবৃতিও কোন গুরুত্ব বহন করতো না। অবশ্য কর্তব্য মনে করে ভুট্টোর অগণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় সংহতিবিরোধী প্রতিটি বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে জামায়াতে ইসলামী বিবৃতি দিয়েছে।

কিন্তু ৭ মার্চের পরদিন জামায়াতের পক্ষ থেকে ইয়াহইয়া খানের কাছে সঙ্কট নিরসনের একমাত্র উপায় হিসেবে একটি দাবি জানানো প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। দাবিটির সারকথা ছিলো, 'ইয়াহইয়া খান! আপনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিগণকে শাসনতন্ত্র রচনার সুযোগ না দিয়ে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। বর্তমানে আপনার শাসন সম্পূর্ণ অচল। রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানের সামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিতেও আপনি অক্ষম হয়েছেন। আমরা আপনাকে পদত্যাগ করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্ত র করার জোর দাবি জানাচ্ছি। সামরিক শাসনের অবসানের পর গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণের সহযোগিতায় দেশ পরিচালনা করতে দিন। শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব জনগণ তাদের হাতেই তুলে দিয়েছে। পাকিস্তানের অস্তিত্বের স্বার্থে আপনি অবিলম্বে ক্ষমতা ত্যাগ করুন।'

---

২৬. এ প্রসঙ্গে জামায়াতের তৎকলীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম 'জীবনে যা দেখলাম' গ্রন্থে লিখেছেন, "নির্বাচনী ফলাফল থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। মুসলিম জাতীয়তার যে ভিত্তিতে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন দুটো ভূখণ্ড মিলে একটি রাষ্ট্র হয়েছিলো, পাকিস্তানি শাসকরা ঐ ভিত্তিটিই ধ্বংস করে দিয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে এখন বাঙালি জাতীয়তা ঐ শূন্যস্থান দখল করেছে। আমি নিশ্চিত যে, নির্বাচনের ফলে উভয় অঞ্চলে নতুন যে নেতৃত্ব জেগে উঠেছে তারা দু'অঞ্চলকে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেবে না অথবা রাখতে পারবে না।

আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই মাওলানা মওদূদী সভাপতির আসন থেকে মন্তব্য করলেন, 'পশ্চিম-পাকিস্তানও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিভক্ত হয়ে গেলো। পাঞ্জাব ও সিন্ধু একদিকে, আর সীমান্ত ও বেলুচিস্তান আর একদিকে।' এ কথা বলার পর মাওলানাকে আমি বললাম, 'পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে একসাথে থাকায় তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া মোটেই সহজ নয়।'

মাওলানা প্রশ্ন করলেন, 'এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর করণীয় কিছু আছে কিনা?'

জওয়াবে আমি বললাম, 'যদি জাতীয় সংসদে জামায়াতের অন্তত ১০ সদস্যের একটি পার্লামেন্টারি পার্টি গঠন করা সম্ভব হতো তাহলে বিচ্ছিন্নতা রোধ করার উদ্দেশ্যে কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ পাওয়া যেতো। এ পরিস্থিতে মজলিসে শূরার কাছে আমার পরামর্শ এই যে, যদি রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবার কার্যক্রম শুরু করে তাহলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই। জামায়াতের আসল যে উদ্দেশ্য, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সে উদ্দেশ্যে যা করণীয় তা করতে পারবে। আমি আরও অগ্রসর হয়ে বললাম, 'পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিমের সাথে যুক্ত থাকবে না পৃথক হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হলে এর পূর্ণ এখতিয়ার জামায়াতের পূর্ব-পাকিস্তান শাখাকে দেয়া হোক। এ বিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান শাখা সর্বসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্ত নিতে চায়, তা কেন্দ্রীয় জামায়াত যেন অনুমোদন করে। ওখানকার সার্বিক পরিস্থিতি বাইরে থেকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।'

আমার এ প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত প্রকাশের জন্য মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মাওলানার অনুমতি চাইলে। অনুমতি পেয়ে এ প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সম্ভাব্য যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করে খুবই ধীরস্থিরভাবে আলোচনা হলো। আমার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে কিছুটা আবেগ প্রকাশ পেলেও তাঁরা কেউ আবেগ তাড়িত হননি। তাঁরা আমার আন্তরিকতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

(অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড, কামিয়াব প্রকাশন- ২০০২-২০০৪, পৃষ্ঠা-১১৮)।

Dhaka University Institutional Repository

তখনো আইনগতভাবে সামরিক শাসন চালু থাকায় পত্রিকায় জামায়াতের বক্তব্য এমন কঠোর ভাষায় প্রকাশিত হতে পারেনি। তবে আমাদের সান্ত্বনা যে, আমরা দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি।"[২৭]

৩ মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। অনেক বিলম্বে হলে ও শেষ পর্যন্ত '৭১ -এর ৩মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশন বসবার ঘোষণায় ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা স্বস্তির ভাব লক্ষ করা গেলো। কিন্তু ভুট্টো এ ঘোষণার চরম বিরোধিতা করেন[২৮]।

গণপরিষদের অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণা

১ মার্চ বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর দাবি মেনে নিয়ে বৈঠক মুলতবী করে দেন। এ ব্যাপারে মেজরিটি পার্টির নেতা শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করা হয়নি। পরবর্তী কোন তারিখ ঘোষণা করাও জরুরি বিবেচনা করা হলো না।

ঢাকা অধিবেশন মুলতবি করার প্রতিক্রিয়া

গণপরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করার সাথে সাথে এ দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। "১মার্চ দুপুর একটায় রেডিওতে অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণার সাথে সাথে ঢাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাক স্টেডিয়ামের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ বর্জন করে দর্শকরা মিছিলে যোগদান করে। হাইকোর্ট বার এবং জেলা বার এসোসিয়েশন প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে রাজপথে বের হয়ে আসে। সিনেমা হলসমূহ বন্ধ হয়ে যায় এবং দর্শকরা মিছিলের আকারে বের হয়। শিল্প এলাকা থেকে শ্রমিকরা দলে দলে মিছিল সহকারে ঢাকা শহরমুখী হয়।

ঐ সময় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ পার্লমেন্টারি পার্টির সভা চলছিলো। সকল বিক্ষোভ মিছিলের স্রোত হোটেল পূর্বাণীর দিকে যেতে থাকে। মিছিলকারীদের একই শ্লোগান ছিলো, 'পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা কর।'

বিদ্রোহী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেন। ১ মার্চ সারাদিন মিছিলে মিছিলে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি সকল অফিস থেকে কর্মচারীরা বের হয়ে আসে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। এসব মিছিল পল্টন ময়দানে সমবেত হলে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে গণ-আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় এবং পরদিন ২ মার্চ হরতাল সফল করার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।"[২৯]

---

২৭. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড, কামিয়াব প্রকাশন-২০০২-২০০৪, পৃষ্ঠা-১২৩, ১২৪।

২৮. "ভুট্টোর আপত্তি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের ১৩ ফেব্রুয়ারির সরকারি ঘোষণায় ৩ মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের কর্মসূচি বহাল রাখা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'সংখ্যাগুরু দল আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে বা গোপনে আমাদেরকে কিছুটা কনসেশনের প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত পিপলস পার্টি ঢাকায় ৩ মার্চ আহূত অধিবেশনে যোগ দেবে না। আওয়ামী লীগের রচিত সংবিধানে সম্মতি দেবার জন্য আমার পার্টির ঢাকা যাওয়া ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়।' ভুট্টো আবারো বলেন, 'যেহেতু আওয়ামী লীগ সংখ্যাগুরু, সেহেতু সে পার্টির সংসদে যোগদান অর্থহীন। সেখানে আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে রচিত সংবিধান অনুমোদন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না। অতএব ঢাকার এ অধিবেশন কসাইখানা ছাড়া আর কিছুই নয়।' ২৮ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভুট্টো ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত গণপরিষদ বৈঠক মুলতবী করার দাবি জানান। (অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড, কামিয়াব প্রকাশন- ২০০২-২০০৪, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৯)।

২৯. অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

২ মার্চ ঢাকায় হরতাল

১ মার্চ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা শুনবার সাথে সাথে সর্বমহলে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ফলে ২মার্চ ঢাকায় হরতাল সর্বাত্মক ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো।

ঐ দিনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) আ. স. ম. আব্দুর রব সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন[৩০]।

৩ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল

৩ মার্চ সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। যার ফলে ইয়াহইয়া খান ঐ দিনই জাতীয় সংসদে নির্বাচিত দলসমূহের নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ জানান। "৩ মার্চ বিকালে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিব অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত কর ও খাজনা দান বন্ধ ঘোষণা করেন। তিনি সেখানে তিনটি দাবি উত্থাপন করেন ১. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ২. সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। ৩. জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।"[৩১]

৭ মার্চ রেসকোর্সে শেখ মুজিব

"পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ রেসেকোর্স ময়দানে এক মহাসমাবেশে হয়। মঞ্চে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশ উক্ত সমাবেশে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ সকল মহলের লোকই বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়। শেখ সাহেব সেই জনসমুদ্রে ২৫ মার্চ আহূত গণপরিষদে অধিবেশনে যোগদান প্রসঙ্গে এমন চারটি শর্ত আরোপ করেন, যা পূরণ না হবারই কথা। অর্থাৎ শেখ মুজিব এ বৈঠকে যোগদান না করার পরোক্ষ ঘোষণা দিলেন। শর্ত ৪টি নিম্নরূপ :

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।
৩. এ পর্যন্তকার হত্যার তদন্ত করতে হবে।
৪. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ সমাবেশেই শেখ মুজিবের প্রখ্যাত ভাষণের শেষ উচ্চারণ ছিলো, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান।' সমাবেশে তিনি পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেননি। তবে ঐ দিনই এক বিবৃতিতে পরবর্তী এক সপ্তাহের এক দীর্ঘ কর্মসূচি নির্দেশ করেন, যার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. খাজনা ও কর দেওয়া বন্ধ থাকবে।
২. সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও সকল আদালত হরতাল পালন করবে।
৩. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৪. স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন উপায়ে পাকিস্তানে টাকা পাঠানো বন্ধ থাকবে।

---

৩০. জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী রচিত 'রাজনীতির তিনকাল' নামক পুস্তকে লিখেছেন "৩ মার্চ পল্টন ময়দানের ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ছাত্রলীগ নেতা শিব নারায়ণ দাস অঙ্কিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকা (মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলার পতাকা যা ঈষৎ সংশোধিত হয়ে বর্তমানে দেশের পতাকা) প্রদর্শিত হয়। এ জনসভায় তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। এর আগের দিন ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতালায় ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি আ. স. ম. আব্দুর রব সর্বপ্রথম স্বাধীনতার এই পতাকা উত্তোলন করেন।(মিজানুর রহমান চৌধুরী, রাজনীতির তিনকাল)

৩১. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড, কামিয়াব প্রকাশন- ২০০২-২০০৪, পৃষ্ঠা-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

৫. প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।

বলাবাহুল্য, পূর্ব-পাকিস্তানে ইয়াহইয়া খানের শাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। বেসরকারিভাবে শেখ মুজিবের শাসনই চলতে থাকে।"[৩২]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আব্বাস আলী খান

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অদুরদর্শিতা আর হটকারিতার কারণে পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। এদিকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়। জামায়াতে ইসলামী শেখ মুজিবের এই ঘোষণার বিরোধীতা করে। এ বিষয়ে আরো গভীরভাবে জানতে হলে ইতিহাসের একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে।

এ সম্পর্কে আবুল আসাদের 'কালো পঁচিশের আগে ও পরে' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করছি- "পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু হয়। বাংলা ভাষায় তাদের আন্দোলনের সাহিত্যও তখন খুব সীমিত ছিলো। তাই পঞ্চাশের শেষ পর্যন্তও জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের কোন শক্তিশালী সংগঠনও হয়ে দাঁড়ায়নি। ষাটের দশকে এসে তা ক্রমশ বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই সাথে স্বৈরাচারবিরোধী ও গণতান্ত্রিক সকল আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীকে সক্রিয় দেখা যায়। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খানের একনায়কতন্ত্র প্রতিরোধের জন্যে ১৯৬৪ সালের ২০ জুলাই যে সম্মিলিত বিরোধী দল COP[৩৩] (Combined Opposition Party) গঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী তার শক্তিশালী শরিক দল ছিলো, যদিও জামায়াতে ইসলামী তখন নিষিদ্ধ ঘোষিত। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মাঠ থেকে আওয়ামী লীগ যখন উৎখাত প্রায়, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 'পিডিএম'[৩৪] জামায়াতে ইসলামী সক্রিয় অংশীদার ছিলো। পিডিএম-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা স্বনামধন্য আইনজীবী জনাব আব্দুস সালাম খান এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম। তারপর গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ১৯৬৯ সালের শুরুতে গণ-আন্দোলনে পরিণত হওয়ার মতো ক্রান্তিলগ্নে পৌছাল, তখন সমগ্র দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন পরিচালনার তাগিদে ৭ ও ৮ জানুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী বৈঠকে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান ওলামায়ে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (ছয় দফা), নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পিডিএম পন্থি)-এর সমন্বয়ে গঠিত হলো ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি 'DAC[৩৫] জামায়াতে ইসলামী এ আন্দোলনেও অত্যন্ত সক্রিয় ছিলো। কিন্তু যে আন্দোলন আওয়ামী লীগকে

---

৩২. অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১২২।

৩৩. 'মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার সংকল্পে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে ২০ জুলাই (১৯৬৪) চার দিবসব্যাপী বৈঠকে নয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দল Combined Opposition Party গঠন করেন।' (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, পৃষ্ঠা : ৩৪৫)।

৩৪. ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল সাবেক প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রাহমান খানের বাসভবনে ৫টি দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। দলগুলো হলো, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)। উক্ত বৈঠকে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (PDM) নামে রাজনৈতিক জোট কায়েম হয় এবং প্রত্যেক দল থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়।

৩৫. ঢাকায় DAC গঠন : জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি মুফতী মাহমুদ ও ন্যাপের সেক্রেটারি জেনারেল এডভোকেট মাহমুদ আলী কাসূরী ঢাকায় এলেন। একই সময়ে পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, জামায়াতে

Dhaka University Institutional Repository

ঘর থেকে এবং জেলখানা থেকে বের করে আনলো, আওয়ামী লীগ বের হয়ে আসার পর সেই আন্দোলনের এবং আন্দোলনকারীদের পিঠে ছুরিকাঘাত করলো। প্রথম ঘটনা ঘটলো পল্টনে ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে। একদিন ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটির জনসভায় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ছাড়া আর কোন দলকে বক্তৃতা করতে দেয়া হলো না। এ ঘটনার পনুরাবৃত্তি ঘটতে থাকলো নানা স্থানে। 'পার হলে পাটনি পাটনি শালা' বলে একটা প্রবাদ আছে, আওয়ামী লীগ এ আচরণই করলো। শেখ মুজিব জেল ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হবার পর এবং ইসলামাবাদের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স থেকে ফিরে আসার পর শুধু 'ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটির'র সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করলেন না, নিজে হিরো সাজার জন্যে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত কদর্যভাবে চিত্রিত করলেন। আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র ফ্রন্টের অগণতান্ত্রিক ও সহিংস আচরণের ফলে গণতান্ত্রিক আন্দেলনের অন্যান্য দলের মতো জামায়াতে ইসলামীর পক্ষেও মাঠে থাকা কঠিন হয়ে পড়লো।

১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পদত্যাগ করলেন। এলেন ইয়াহিয়া খান। তিনি ৫ দফা লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের ভিত্তিতে নির্বাচন দিলেন। সব দল লিগ্যাস ফ্রেম ওয়ার্ক মেনে নেয়ার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন মহলের ষড়যন্ত্র এবং লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক ও ছয় দফার মধ্যে সংঘাতের কারণে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলো না। জামায়াতে ইসলামী সর্বাবস্থায় আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে কথা বলেছে। অসহযোগ আন্দোলনের গোটা সময়ে জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে তাদের যে নীতি পরিস্কার হয়ে যায় তাহলো:

ক. তারা পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও সংহতির পক্ষে

খ. জনগণের রায় আওয়ামী লীগের পক্ষে গেছে, সুতরাং সরকার গঠন করা তার অধিকার। বিনা শর্তে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া উচিত।

জামায়াতে ইসলামীর এ নীতি তার আদর্শ ও দলের নীতিমালার সাথে সংগতিশীল। আওয়ামী লীগের ভারত নীতি, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আদর্শ এবং একনায়কসুলভ তার স্বার্থপরতা সম্পর্কে প্রবল বিরোধী মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক বিধির কারণেই জামায়াতে আওয়ামী লীগের হাতে বিনা শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর সমর্থন করেছে। কিন্তু ২৫ মার্চের (১৯৭১) পর আওয়ামী লীগ যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করলো জামায়াতে ইসলামী তাকে সমর্থন করলো না।"[৩৬]

কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও প্রকৃত ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিরা অসহায়ের মত এ গণহত্যার নৃশংস দৃশ্যগুলো দেখতে রাজী ছিলেন না। তারা চেষ্টা করেছিলেন অসহায় নিপীড়িত আর মজলুমদের বাঁচাতে। আজ ইতিহাস বিকৃত করে একাত্তরের গণহত্যার জন্য জামায়াত নেতৃবৃন্দকে দায়ী করা হয়। কিন্তু একদিন ইতিহাসকে সত্য করে লেখা হবে। সেদিন এই সব আদর্শবান মানুষদের সত্যিকারের ভূমিকা সম্পর্কে মানুষ অবহিত হবে। একাত্তরের এই জঘন্য গণহত্যার প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে আব্বাস আলী খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আব্বাস আলী খান ছিলেন মানব দরদী এবং মজলুমের পক্ষে।

ইসলামী পাকিস্তানের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া মমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান ঢাকায় পৌঁছালেন। ১৯৬৯ সালের ৭ ও ৮ জানুয়ারী জনাব নূরুল আমীনের বাড়িতে ৮ দলীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠকে Democratic Action Commitee (DAC) (গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি) নামে ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয়।

৩৬. আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, পৃ: ২২৭, ২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ডা. কাজী মোঃ নজরুল ইসলামের 'শহীদ বুদ্ধিজীবি ডা.আবুল কাশেম' শীর্ষক স্মৃতিকথা মূলক প্রবন্ধে[৩৭] এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

একাত্তরের এ সব বিতর্কিত বিষয়গুলোকে গোপন না রেখে ইতিহাসের গলিঘচি থেকেই সত্যগুলোকে উদ্ধার করে নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা দরকার। আব্বাস আলী খান ছিলেন মানব দরদী এবং মজলুমের পক্ষে। উপরোক্ত স্মৃতিকথা মূলক প্রবন্ধটি আমাদের তাই ইংগিত দেয়।

স্বাধীনতা-উত্তর কারাগারে আব্বাস আলী খান

১৯৭১ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর খান সাহেব ও তাঁর দশজন সাথী ফ্যামেলিসহ ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে উঠেন। কেননা এটাকে রেডক্রসের নিউট্রাল জোন নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯ শে ডিসেম্বর

---

৩৭. "মুক্তি সংগ্রাম শুরু হবার সময় হতে ২০ শে এপ্রিল পর্যন্ত শহীদ ডা. আবুল কাশেম জয়পুরহাটেই ছিলেন। কিন্তু ২০ শে এপ্রিল মঙ্গলবার মুক্তিযোদ্ধারা আব্দুল আলীমকে ধরার জন্য তার বাড়ী ঘিরে ফেলে। আধাঘণ্টা পর উক্ত বাহিনী বিশেষ কাজে পাঁচবিবিতে চলে যায়। সংবাদ পেয়ে সোটাহার, কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া ও হানাইল হতে বহু লোক লাঠিসোটা নিয়ে বাজারে আসে এবং আঃ আলীমকে নিয়ে গিয়ে সোটাহারে লুকিয়ে রাখে। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধারা আলীম সাহেবকে না পেয়ে ভারতে চলে যায়। আব্দুল আলীমকে ছিনতাই করে নিয়ে যাবার সময় মুক্তির গুলিতে তিনজন ছিনতাইকারী মারা যায়।

এই ঘটনার পর তিনি চিকিৎসালয় হতে বাড়ী চলে যান। আমাকে ডেকে শুধু বলে যান, 'জয়পুরহাটে মুক্তি দ্বারা হামলা হয়েছে। ২/১ দিনের মধ্যে জয়পুরহাটে পাক আর্মি আসবে। আমি জামালপুর ছোট জামাইবাড়ী গেলাম। তুমি সবাইকে নিয়ে সেখানে চলে এসো।' আমরা বেলা ৩.০০টার মধ্যে সবাইকে নিয়ে জামালপুর আমার ছোট ভগ্নিপতি সরদার মকবুল হোসেনের বাড়ীতে পৌছি।

জামালপুর এবং অন্যান্য স্থানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি জয়পুরহাটে ফিরে আসেন। আব্দুল আলীম সাহেবের কথায় এসে বাবা ভুল করেছিলেন। ২২ শে জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধায় একটি গরুর গাড়ীতে করে আমরা বাড়ীর দিকে রওয়ানা হই এবং রাত্রী ৮টার দিকে বাড়ী হতে কিছু দূরে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ী পৌঁছাই। ২৩ শে জুলাই/৭১ তিনি তাঁর নতুন বাড়ীতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সমস্ত গাছ-গাছালী দেখছিলেন। আমি গিয়ে তাঁকে বাড়ী ফেরার জন্য অনুরোধ করে জয়পুরহাট চলে আসি। ২৪ শে জুলাই, রোজ শনিবার দিবাগত রাত্রে তিনি খাওয়া শেষ করে তাঁর নিজের ঘরে ঘুমাতে গেলেন। ঠিক রাত্রি ৪.০০টার দিকে একজন পাকিস্তানী সুবেদার কিছু বিহারী রাজাকার ও বাঙ্গালী রাজাকার নিয়ে আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। প্রথমে তারা 'ডাক্তার সাহেব' বলে ডাকতে থাকে। আমি গিয়ে দরজা খুলে দিলে তারা আমাকে হাত তুলে দাঁড়াতে বলে এবং বাড়ীর ভিতরে রাজাকারসহ প্রবেশ করে। তখন রাজাকার ক্যাপ্টেন ছিল মৃত ফজলুর রহমান। সে আমাকে চিনতো। সে পাশে ডেকে নিয়ে আমাকে বলে যে, তার জানতো না যে, বাবাকে ধরা হবে এবং আমাদের বাড়ী রেইড করবে। আমাকে উপদেশ দিল : 'উপায় নেই আপনি বাবাকে ধরে দিয়ে, তাড়াতাড়ি আলিম সাহেবের নিকট যান।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এই কাজ করল? সে আমাকে উত্তরে বলেছে, আপনাদের গ্রামের খলিলুর রহমান পিতা মৃত জছিম উদ্দিন, নিজাম উদ্দিন পিতা আছের মন্ডল, মান্নান পিতা বাহার উদ্দিন এবং মোমতাজ পিতা উত্তম আলী এরা সবাই সুবেদার সাহেবের কাছে জয়পুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে যায় এবং বলে মুক্তির কমান্ডার ডাক্তার আবুল কাশেম বাড়ী এসেছে। তখনও পাক আর্মি বিশ্বাস করেনি। তারপর উপরোউক্ত রাজাকারগণ তেঘরপুলে ফিরে আসে। একটু পরে একটি ফাঁকা গুলি করে। তারপর পুনরায় স্টেশনে সুবেদার সাহেবের কাছে গিয়ে বলে মুক্তি কমান্ডার ডা. আবুল কাশেম বাড়ী এসেছে তাকে ধরতে হবে। সুবেদার সাহেব পীস কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম সাহেবের নিকট যায় ও আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে। রাজাকার ক্যাপ্টেন এর মুখে কথাগুলো শুনার পর আমি বাবাকে ডাক দিই। বাবাকে সবিস্তারে সমস্ত অবগত করার পর তিনি একটি আসমানী রঙ্গের ফুলশার্ট গায়ে দিয়ে, জুতা পায়ে দিয়ে, ঘর থেকে বের হন। দরজায় এসে শুধু একবার আমার মা এবং তার প্রাণপ্রিয় নাতী জয়কে একবার দেখে, সুবেদার সাহেবকে বললেন, চলেন, কোথায় যেতে হবে। সুবেদার সাহেব তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন। আমরা ফজর নামাজ আদায় করে পীস কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম সাহেবের কাছে যাই। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার বড় আব্বা কাজী ওসমান গণি সাহেব, আব্দুল আলীম সাহেবের হাত ধরে কান্নাকাটি করলেন, আঃ আলীম সাহেবের কথা ছিল, ছিড়ে দেবে। দিনটি ছিল ২৫ শে জুলাই রবিবার। বাবা তখনও জয়পুরহাটে স্টেশনে বন্দী অবস্থায়। জনাব আব্বাস আলী খান ও মৌলানা তাহের সাহেব বহু চেষ্টা করেও বাবাকে ছাড়াতে পারেনি। ... পরদিন ২৬ শে জুলাই ১৯৭১ মৌলানা তোফাজ্জল এবং বহুলোক বাবাকে ছেড়ে দেবার জন্য সুপারিশ করায় সাময়িকভাবে ছেড়ে দেয় এবং মাংস-রুটি খাবার দেয়। সন্ধার আগে কয়েকজন মুসলিম লীগার সেখানে গিয়ে মেজর সাহেবকে বলে যে, ডা. সাহেবকে ছাড়লে ভীষণ ক্ষতি হবে। এরপর বাবাকে আবার বন্দী করে এবং কিসমত নামের এক লোকের হাতে কবর খনন করার পর ২৬ জুলাই মাগরীবের আগে তাকে গুলি করে হত্যা করে। তার লাশ নিয়ে এসে আমরা পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করি। জয়পুরহাটের কেন্দ্রবিন্দুতে যে মাঠটি আছে তা তাঁর নামে 'শহীদ ডা. আবুল কাশেম ময়দান' রাখা হয়। মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট : আবুল কাশেম সম্পাদিত পৃষ্ঠা : ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

রাত ৪টায় ইন্টার কন্টিনেন্টাল থেকে সকলের অলক্ষ্যে তাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তর করা হয়। দেড় মাস ক্যান্টনমেন্টে অতিবাহিত করেন। ১৯৭২ সালের ৩১ শে জানুয়ারী রাত ১২টায় আব্বাস আলী খানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসা হয়। প্রথম তাঁকে ডেপুটি জেলারের কামরায় বসতে দেয়া হয়। ঘণ্টাখানেক পর দোতলার একটি পৃথক সেলে তাকে লকআপ করা হয়। তিনি মোট ৬৭৯ ছ'শ উনআশি দিন কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে বন্দী ছিলেন[৩৮]। কারাগারে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, "যিন্দানখানার বন্দী

---

৩৮. খান সাহেব তাঁকে গ্রেফতার সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- "দুর্ভাগ্যই বলুন আর সৌভাগ্যই বলুন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ছ'শ উনআশি দিন কাটিয়েছিলুম। এটাকে আমি আলবৎ সৌভাগ্য বলব। সুধীজন তা অবশ্যি বুঝে ফেলবেন। বাহাত্তরের একত্রিশে জানুয়ারী রাত বারোটায় জেলখানার ভেতরে নিয়ে আমাদেরকে বসতে দেয়া হলো. ডেপুটি জেলারের কামরায়। ঘণ্টাখানেক পর একটি দোতলার পৃথক পৃথক সেলে আমাদেরকে লকআপ করা হলো। একাত্তরের চৌদ্দই ডিসেম্বর আমরা দশজন ফ্যামেলিসহ ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে উঠলুম। এটাকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের নিউট্রাল জোন (নিরপেক্ষ এলাকা) ঘোষণা করা হয়েছিল কিছুদিন আগে। সারা দেশে তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। ঢাকা পতনোন্মুখ। উনিশে ডিসেম্বর রাত চারটায় ইন্টারকন থেকে সকলের অলক্ষ্যে আমাদেরকে স্থানান্তরিত করা হলো ক্যান্টনমেন্টে। পাক হামলায় ঢাকাবাসীদের এক প্রাণান্তকর অবস্থা। ষোলই ডিসেম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের হোটেল ঘেরাও করা হলো। ঘেরাওকারীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলুম আমরা। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঘেরাওকারীদের মুখে মুহুর্মুহু ধ্বনি হচ্ছিল, 'গভর্নর ডা. মালেক ও তার মন্ত্রীদের মুন্ডু চাই।' জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করে মৃত্যুর জন্যে তৈরী হয়ে রইলুম। বিবি বাচ্চা সবারই একই অবস্থা। অতএব কারো জন্যে কারো দুঃখ নেই। একই পথের যাত্রী সকলেই। রেডক্রসের দায়িত্বশীলগণ অনুরোধ উপরোধ করে রক্ত পাগল ঘেরাওকারীদেরকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। এদিকে অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁদেরই অনুরোধে দুটি ট্যাংকসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল এসে ঘেরাওকারীদেরকে ছত্রভংগ করে দেয়। আমরা এ যাত্রা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলেও নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগলুম। কারণ ইন্টারকনের ডাইনিং হলে খেতে বসে দেখতুম কাঁধে স্টেনগান আর কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে দু'চারজন এসে খেতে বসেছে আর কটমটিয়ে লাল চোখ দিয়ে তাকাচ্ছে চারদিকে। ভয়ে ত গায়ের রক্ত হিম হবারই কথা। আমাদের দু'জন সাথী বেগতিক দেখে একদিন রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে হোটেল থেকে কেটে পড়লেন। শেষটায় ঠিক হলো আমাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তার জন্যে সেনাবাহিনীর অফিসারদের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলি আমাদেরকে দেয়া হলো ফ্যামিলিসহ থাকার জন্যে। প্রথম দু'দিন ত রেডক্রস আমাদের মেহমানদারী করলো। চাদর-বালিশ, কম্বল, হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন মায় বালতি-বদনা সব কিছুই সাপ্লাই করলো রেডক্রস। আমাদের সুখ সুবিধের জন্যে রেডক্রসের কর্মচারীগণ ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্ত ও তৎপর। দুদিন পর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে রেশন দেয়া শুরু হলো। চাল-ডাল, ঘি, আটা-ময়দা, চা-চিনি, তরিতরকারী পেতে লাগলুম ঠিক ঠাক। মাছ-মুরগী আন্ডা কিনতেও পাওয়া যেত। গেরস্থ যেমন জবায়ের আগে তার খাসি-মোরগ খাইয়ে দাইয়ে মোটা- তাজা করে, হয়তো বা আমাদেরকেও তেমন ধার করা হচ্ছিল। একসময়ে আমাদেরকে জানানো হলো আমরা যুদ্ধবন্দী এবং আমাদেরকে যেতে হবে ভারতে। ইচ্ছা করলে ফ্যামিলিসহ যেতে পারব। তার জন্যেও তৈরী হলুম। যাই হোক দেড় মাস কাটালুম ক্যান্টনমেন্টে। বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রেডিওর পালিশ করা খবরগুলো শুধু শুনতে পেতুম। হঠাৎ বাহাত্তরের একত্রিশে জানুয়ারী রাত দশটার পর আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ডেকে নেয়া হলো ডাঃ মালেকের কুঠীতে। সেখানে বসেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনৈক ব্রিগেডিয়ার এবং ঢাকার এস.পি। ব্রিগেডিয়ার জানালেন আমরা আর যুদ্ধবন্দী নই। আমাদেরকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছেন। ঢাকার এস. পি চট করে বল্লেন তিনি আমাদেরকে এক্ষুণি নিয়ে যাবেন জেলে। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আমাদেরকে আর ঘরে ফিরে যেতে দেয়া হলো না। প্রত্যেকের ঘরে ছেলেপুলে মায়ের কোলে নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। পুরুষ মানুষ বলতে কারো ঘরে কেউ নেই। আমাদেরকে যেন টোপ দিয়ে ডেকে এনে বেঁধে ফেলা হলো। এমনটি অতীতে কাউকে করা হয়েছে বলে জানা নেই। নিজ নিজ বাসায় না ফিরেই ক্যান্টানমেন্ট থেকে শেষ বিদায় নিলুম। বুঝতেই পারেন আমাদের মনের অবস্থা। নিশীথ রাতে যাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় অসহায় ও অভিভাবকহীন করে ফেলে এলুম তাদের অবস্থা কি হয়েছিল তাও বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। আমরা তাদেরকে পুরাপুরি দুনিয়ার মালিক প্রভুর উপরে সোপর্দ করলুম। অবশ্যি পরদিন রেডক্রস জানতে পেরে সবাইকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ী পৌছিয়ে দিল। আমরা তিন চারদিন পর তা জানতে পেরে আল্লাহর দরগায় শুকরিয়ায় মাথা নত করলুম। কথায় বলে জেলের ভেতর জেল, তার নাম সেল। এমনি এক সংকীর্ণ সেলে দিন কাটাতে লাগলুম। অবশ্যি ন'মাস পর প্রমোশন পেয়েছিলুম। অর্থাৎ একটি বৃহৎ হল ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছিলুম যেখানে একত্রে পনেরো ষোল জন্য হৈ-হল্লা করে থাকা যেতো। যাহোক, প্রথম প্রথম ক'মাস ত আমাদেরকে না কোন সংবাদপত্র দেয়া হতো, আর না জেল লাইব্রেরীর বইপুস্তক। এ একেবারে দুনিয়ার বাইরের এক জগত। কবর বল্লেও চলে। কবরবাসীদের দেখা হবে মনকির-নকিরের সাথে। হাদীস-কালামের কথা। এখানেও দুবেলা দুজন মনকির-নকীর আসতো। রাতের আঁধারে আসতো ঘনো ঘনো। অর্থাৎ কিনা দুঘন্টা পর পর একজন। প্রথম প্রথম ত তাদের সাথে খায়-খাতির ও দুস্তি-মহব্বত জমে উঠতে পারেনি। তাতে করে জীবনটা ছিল একেবারে নিঃসংগ, নিরানন্দ ও মনটা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

জীবন। আমার জীবন সায়াহ্নের এ দিনগুলোতে শুধু অবসর আর অবসর। কোলাহল-মুখর ধরনীর হৈ-হল্লা আর কর্মব্যস্ততার বাইরের এক জীবন। এখানে না আছে কোন কাজের তাড়া, আর না আছে কোন কিছুর পরিকল্পনা ও কর্মসূচী। না আছে পরিকল্পিত কাজ সমাধা করার দুর্বার সংকল্প। না আছে সফলতার আশা আনন্দ অথবা অসাফল্যের আশংকা ও নিরানন্দ। বিবি বাচ্চার অথবা নিজের খোরাক-পোষাক জোগাবার এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটাবার নেই কোন উদ্বেগ কোন চিন্তা-ভাবনা। হর রোজ নাশতা আসে, চা আসে। খানা আসে। ভালো কি মন্দ, বেশী কি কম, কোন-ফিকির না করেই খাই। চিন্তা-ফিকির করেই বা লাভ কি? দু'দিন আগে এক কাটখোট্টা ডি এস.পি এসেছিলেন তাঁর দল-বল নিয়ে ইন্টাররোগেশন করতে। বড়ো অভদ্র ব্যবহার করলেন। মনে করেছিলেন বিচারাধীন আসামী তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। আর করবে বাঁচার জন্যে কাকুতি-মিনতি। তার উল্টোটা দেখে হলেন অগ্নিশর্মা। রেগে-মেগে বল্লেন, 'ফাঁসী ত আপনার হবেই।' বললুম 'জীবন-মরণের ঠিকাদারি কবে থেকে পেলেন জানি না। জীবন-মরণের ফয়সালা ত নিরংকুশভাবে একজনের হাতে এবং সে ফয়সালা এ যমীনের কোথাও হয় না হয় আসমানে। তিনি যদি সে ফয়সালা করে থাকেন, ভালো কথা। তার জন্যে মনেপ্রাণে প্রস্তুত আছি এবং সন্তুষ্টচিত্তে।' রাগে ভদ্রলোকের ঠোঁট কাঁপছিল দেখলুম। আরও দেখলুম ভদ্রলোকের ওষ্ঠ প্রদেশে ও তার সীমান্তের বাইরে যমীন শ্বেত বর্ণ ধারণ করেছে। যাকে বলে ধবলকুষ্ঠ।"[৩৯]

চিন্তাভাবনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ঘূর্ণাবার্তা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মন দুর্বল হয়ে পড়েনি ক্ষণিকের জন্যে।" (আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ ,বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা : ৫-৮)

৩৯. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ (বই কিতাব প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮) পৃষ্ঠা : ৯,১০

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক জীবন

বাংলাদেশভিত্তিক : (১৯৭২-১৯৯৯)

অষ্টম : স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক তৎপরতা

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ

জামায়াতে ইসলামী ইকামতে দ্বীনের সংগঠন। কোন অবস্থায়ই এ কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ এ কাজ করা ফরজ। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পূর্ণ গঠনের প্রচেষ্টা শুর হয়। এ সময় প্রথম আমীর নির্বাচিত হন আবদুল জব্বার, ১৯৭৩ সালে আমীর হন মাস্টার শফিকুল্লাহ। ১৯৭৪ সালে আমীর হন আবদুল খালেক, ১৯৭৪ সালে ভারপ্রাপ্ত আমীর হন সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী, ১৯৭৫ সালে আবদুর রহীম, ১৯৭৮ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম। ১৯৭৯ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত বাধা থাকায় জামায়াতে ইসলামীর নামে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা সম্ভব হয়নি। সে সময় জামায়াত নেতৃবৃন্দ নিজের জীবন বাজী রেখে সংগঠনের কাজ আঞ্জাম দেন। আব্বাস আলী খান তখন নাখালপাড়ায় একটি ছোট্ট বাসায় থাকতেন এবং জীবন বাজী নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের কাজ করে যান।[৪০]

প্রেসিডেন্ট জিয়ারউর রহমানের মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব

১৯৭৫ সালে এক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। সংবিধানে মহান আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম যোগ করেন। সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অবাধে করার অনুমোতি পেয়ে তখন জামায়াতে ইসলামীও প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আব্বাস আলী খানকে তার মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য পরপর দু'বার আমন্ত্রণ জানান। খান সাহেবের পক্ষ থেকে সরাসরি এ প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়া হয়। তিনি বলতেন যে, "শুধুমাত্র বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম যোগ করলেই সব ইসলামী হয়ে যায় না আল্লাহর রঙে রঙিন একদল সাচ্ছা ঈমানদার লোকের দল ছাড়া ইসলামী হুকুমাত গড়া সম্ভব নয়।"[৪১]

ঢাকা মহানগরীতে সাংগঠনিক তৎপরতা

১৯৭৮ সালে জামায়াতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব খান সাহেব প্রায় এক বছর ঢাকা মহানগরীতে সাধারণ রুকন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন ঢাকা মহানগরী আমীরের দায়িত্ব পালন করছিলেন সংগঠনের বর্তমান আমীর মাও. মতিউর রহমান নিজামী। এ সময় তিনি আনুগত্যের এক অনন্য নজির স্থাপন করেন[৪২]।

---

৪০. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক কার্যক্রমে খান সাহেবের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে খান সাহেবের বড় নাতিন জামাই ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম 'স্মৃতিতে অম্লান আব্বাস আলী খান' এক স্মৃতি চারণমূলক প্রবন্ধে লিখেছেন ' বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রাথমিক অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ ছিলো না। তাই তো নানাজীকে জীবনের বাজি নিয়ে সংগঠনের কাজ করতে দেখেছি। সংগঠনের অন্যান্য নেতারাও নানাজির সাথে নিরলস কাজ করেছেন। তখন নানাজী নাখালপাড়ার ছোট্ট বাসায় আমাদের সাথে থাকতেন।' (মৃত্যুহীন প্রাণ : আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ ,শতাব্দী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা নং ১৫৮)

৪১. ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম 'স্মৃতিতে অম্লান আব্বাস আলী খান' মৃত্যুহীন প্রাণ : আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ , শতাব্দি প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা নং ১৫৮।

৪২. এ প্রসংগে মাও. নিজামী তাঁর একটি প্রবন্ধে (ইসলামী আন্দোলনের মহান শিক্ষক) উল্লেখ করেছেন। "স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মরহুম আব্বাস আলী খান বিবেচিত হন অন্যতম সর্বজন শ্রদ্ধেয় কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁকে কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে ঢাকা শহরের সংগঠনে কাজ করতে হয় প্রায় এক বছর সাধারণ রুকন হিসেবে। ১৯৭৮ সালের এই ঘটনা আমার মতো অনেকের সাংগঠনিক জীবনের বিশেষ শিক্ষণীয় এবং স্মরণীয় ঘটনা। মরহুম আব্বাস আলী খান উক্ত শহরের একজন রুকন এবং

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু করার ক্ষেত্রে খান সাহেবের ভূমিকা

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যে সংবিধান প্রবর্তন করেন তাতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারেনি।

১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬, ২৭ মে ঢাকার হোটেল ইডেনে আয়োজিত এক রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে[৪৩]। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকার রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল ঘোষণার ফলেই জামায়াতে ইসলামী বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে এ দেশে নতুনভাবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করার সুযোগ পায়। হোটেল ইডেনের সম্মেলনে আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর ও জনাব শামছুর রহমানকে সেক্রেটারী জেনারেল করে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু হয়। প্রকাশ্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে খান সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন[৪৪]।

ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৭৯ থেকে ২০০০ পর্যন্ত একুশ বছরে জামায়াতের আমীর পদে ৭ বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবারই অধ্যাপক গোলাম আযমকে আমীর নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীরের বোঝা বহন করতে হয়। একটানা ১৫ বছর জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরাট দায়িত্ব খান সাহেব অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পালন করেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে তিনি যে সব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল -

---

মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে বিনা দ্বিধায় সংগঠনের আনুগত্যের যে নজীর স্থাপন করেন তা সত্যিই বিরল। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নেক বান্দার এই নিষ্ঠা ও ইখলাসের পুরস্কার স্বরূপ যে মর্যাদা তাকে দুনিয়ায় দিয়েছে, আখেরাতেও যেনো সেভাবে বরং তার চেয়ে আরো উত্তমভাবে পুরস্কৃত করেন (আমীন)।(মাও.মতিউর রহমান নিজামী, 'ইসলামী আন্দোলনের মহান শিক্ষক', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩৫)।

৪৩. এ সম্পর্কে জামায়াতের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "১৯৭৯ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত বাধা থাকায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নামে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা সম্ভব হয়নি। আইনগত বাধা অপসারিত হলে মে মাসে জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে ইডেন হোটেলের রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করে। (অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খণ্ড, কামিয়াব প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৬৬)।

৪৪. "বাংলাদেশের বিশেষ প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামী নামে প্রকাশ্যে ময়দানে কাজ শুরুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা আব্বাস আলী খানকে বিশেষ খেদমত, বিশেষ অবদান ও ভূমিকা পালনের জন্য কবুল করেছেন। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে জনতার ময়দানে জামায়াতের পতাকা তাঁকেই বহন করতে হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় মাঠে-ময়দানে আলোচনার টেবিলে সর্বত্র তিনি নিষ্ঠার সাথে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বয়স অনুপাতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ধৈর্য, সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, জনসভায়, সুধী সমাবেশে, কর্মী সম্মেলনে, ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, কর্ম পরিষদ ও মজলিসে শূরার অধিবেশনে সর্বত্র ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যময় কর্মনীতির আলোকে তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালন আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের জন্যে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। (মাও. মতিউর রহমান নিজামী, 'ইসলামী আন্দোলনের মহান শিক্ষক', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবী ঘোষণা

আব্বাস আলী খান ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগরীর রমনা গ্রীনে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইসলামী বিপ্লবের সাতদফা গণদাবী ঘোষণা করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবী

"৫৭০ খৃস্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সা. বিশ্বের রহমত স্বরূপ দুনিয়ায় আগমন করেন। আল্লাহ পাকের প্রত্যক্ষ বাণী দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি এমন এক মহান আদর্শিক বিপ্লব সাধন করেন, যা দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির চিরস্থায়ী পদ প্রদর্শক। রাসূলুল্লাহর সে বিপ্লব ছিল নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের বিপ্লব, উন্নততম মানব চরিত্র সৃষ্টি করে সত্যিকার জনদরদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থ খতম করে বঞ্চিত মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় অধিকার কায়েমের বিপ্লব-এককথায় মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবীর নেতৃত্বের ভিত্তিতে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের মহা বিপ্লব।

রাসূলুল্লাহ সা. আজ কালকার নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিংস্র পন্থায় বিপ্লবের পথ দেখাননি। ঈমান, ইলম ও আমলের এক বিস্ময়কর আন্দোলনের মাধ্যমে চরিত্র, ধৈর্য ও ত্যাগের অস্ত্র দ্বারা তিনি ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করেন। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পর যখন কায়েমী স্বার্থবাদীরা ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ চালায় একমাত্র তখনই তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। তাঁর আন্দোলনের সংগ্রাম যুগের ১৩ বছরে তিনি কখনও শক্তি প্রয়োগ করে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেননি।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৪০১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সেই বিশ্ব নবীর আদর্শকে অনুসরণ করেই ইসলামী বিপ্লবের ডাক দিচ্ছে। এ মহান বিপ্লব বাংলাদেশকে কোরআন ও সুন্নাহর চিরস্থায়ী আদর্শের ভিত্তিতে এমন এক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, যার বিস্তারিত ধারণা জামায়াতে ইসলামীর ম্যানিফেস্টোতে সুস্পষ্ট। ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা[৪৫]

---

৪৫. **ইসলামী বিপ্লবের ৭-দফা গণদাবী**

'১. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে-।

ক. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে।

খ. কুরআন সুন্নাহর আইন জারী করতে হবে।

গ. প্রচলিত আইনকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

ঘ. মুসলিম ও অমুসলিম সকলের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচার করতে হবে।

২. ঈমানদার ও যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবে-।

ক. খোদাবিমুখ ও অসৎ লোকদের নেতৃত্ব খতম করতে হবে।

খ. সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে শাসন ক্ষমতা দিতে হবে।

গ. পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার নির্ধারণ করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের আযাদীর হেফাজাত করতে হবে-।

ক. জনমনে জাতীয়তার ইসলামী চেতনা জাগাতে হবে।

খ. রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র সম্মত বানাতে হবে।

গ. মৌলিক মানবাধিকার বহাল করতে হবে।

ঘ. যাবতীয় অসম চুক্তি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. মুসলিম জাহানের ঐক্য প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ ম্যানিফেস্টোরই সার সংক্ষেপ। এ ৭টি প্রধান দফায় জনগণের সমস্যাবলীর সমাধানের বলিষ্ঠ ইংগিত রয়েছে।"[৪৬]

---

৪. আইনশৃংখলা পূর্ণরূপে চালু করতে হবে-

ক. জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করতে হবে।

খ. সমাজ বিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

গ. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে।

৫. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে-।

ক. সরকারকে ভাত-কাপড় বাসস্থানসহ মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে।

খ. জনশক্তিকে দক্ষ বানিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

গ. মানুষের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে।

ঘ. পরিবার পরিকল্পনার নামে ঈমান ও চরিত্রধ্বংসী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

ঙ. সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, শোষণ ও দুর্নীতিসহ যাবতীয় জুলুম খতম করতে হবে।

৬. ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে হবে-।

ক. সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

খ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপন করতে হবে।

গ. মাদরাসা শিক্ষার যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে।

ঘ. শুক্রবারকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা চালু করতে হবে।

ঙ. অপসংস্কৃতি বন্ধ করে ইসলামী সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

৭. কোরআন-হাদীস মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করতে হবে-।

ক. মহিলাদেরকে ইসলাম সম্মত মর্যাদা দিতে হবে।

খ. মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

গ. মহিলাদের পৃথক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. মহিলাদের নৈতিক অধঃপতনের ষড়যন্ত্র রোধ করতে হবে।

৭ দফা গণ-দাবীর ৩ (খ) দফার ব্যাখ্যা

১. বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকতে পারবেন না এবং নির্বাচনেও প্রার্থী হতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কোন কারণে প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হলে নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় সংসদ অবশিষ্ট সময়ের জন্য একজন ভাইস পেসিডেন্ট নির্বাচন।

২. শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্ব প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ হাতে ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকবে না। অবশ্য সরকারকে উপদেশ (এডভাইস) দেবার অধিকার তাঁর থাকবে। প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের মধ্যে কোন বিষয়ে মত-বিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিমকোর্ট সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করবে।

৩. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করবেন।

৪. সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করতে পারবেন না।

৫. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩ মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারে হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবেন এবং এর পরপরই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। (অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা-৯)

[৪৬] অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা-৯।

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ : কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলন

প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ মজলুম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা আব্বাস আলী খান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরধা। পাকিস্তান আমলে তিনি (১৯৬২-৬৯) স্বৈরাচারী সামরিক শাসক আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। বাংলাদেশ আমলে (১৯৮২-৯০) স্বৈরাচারী সামরিক শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলনে প্রথম কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ উত্থাপন করে। এ কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনে আব্বাস আলী খানের কি ভূমিকা ছিল তা জানতে হলে প্রথমে এ আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল -

১৯৮০ সালে জামায়াত ঘোষিত ফর্মুলা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ ঢাকার রমনা রেস্তোঁরায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি উপস্থাপন করে। "জামায়াতে ইসলামী দেশের বর্তমান অবস্থাকে অস্বস্তিকর এবং শাসন ব্যবস্থাকে 'ডিক্টেটর-শীফ' বলিয়া অভিহিত করিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে এক-নায়কত্বের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য ৫ দফা দাবী পেশ করে। এই সকল দাবীর মধ্যে রহিয়াছে দেশের রাষ্ট্রপতি কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকিতে পারিবেন না এবং প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন, কিন্তু দেশ শাসনের কর্তত্ব রাষ্ট্রপতির থাকিবে না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই সরকার গঠনের প্রকৃত অধিকার থাকিবে। জাতীয় নির্বাচনের তিন মাস আগে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিতে হইবে এবং এই সময় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করিবে, ইত্যাদি।"[৪৭]... এসব দাবীকে নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে জামায়াত আখ্যায়িত করে।[৪৮]

---

৪৭. দৈনিক সংবাদ, ৮ই ডিসেম্বার ১৯৮০।

৪৮. একই তারিখে অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বর 'দৈনিক সংগ্রামে' খবরটি সবিস্তারে প্রকাশ পায়। এতে বলা হয় : 'জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হইতে ৫ দফা দাবীর আকারে একটি নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতি ঘোষণা করা হইয়াছে। এই নতুন পদ্ধতি ঘোষণাকালে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান উল্লেখ করেন যে,

১. বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্র প্রধান থাকাকালে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকিতে পারিবেন না।

২. শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্ব প্রেসিডেন্ট এর নিরপেক্ষ হাতে ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকিবেন না। অবশ্য সরকারের উপদেশ দেয়ার অধিকার তাঁহার থাকিবে। প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের মধ্যে অথবা প্রেসিডেন্ট ও সরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রীম কোর্ট তাহার চূড়ান্ত ফয়সালা করিবে।

৩. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই সরকার গঠনের প্রকৃত অধিকার ন্যস্ত থাকিবে এবং জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করিবেন।

৪. সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। এবং

৫. জাতীয় নির্বাচনের তিন মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিতে হইবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্ত রিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করিবেন। নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন।

উপরোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপনকালে প্রাসংগিক যুক্তি ও মন্তব্য পেশ করিয়া জামায়াত নেতা জনাব আব্বাস আলী খান উল্লেখ করেন-

ক. রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখিয়া দেশে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং ডিক্টেটরশীপের প্রতিরোধ, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও গৃহযুদ্ধ অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের আশংকা দূর করিবার লক্ষ্যেই জামায়াতের পক্ষ হইতে এই ৫ দফা পেশ করা হইতেছে।

খ. আমেরিকার প্রেসিডেনসিয়াল সিস্টেম যেমন বাংলাদেশের জন্য উপযোগী নয়, তেমনি বৃটেনের পার্লামেন্টারী পদ্ধতি হুবহু অনুসরণযোগ্য নয়। বাংলাদেশকে অবশ্যই তাহার নিজস্ব রাজনৈতিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩ সালে প্রকাশ্য জনসভায় কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা প্রকাশ

এরশাদ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন না করে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্ব প্রথম জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে কেয়ারটেকার সরকার এর রূপরেখা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় ২০ শে নভেম্বর ১৯৮৩। ঐদিন বায়তুল মোকাররাম মসজিদের দক্ষিণ গেটে আয়োজিত এক গণজমায়েতে জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান কর্তৃক এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান[৪৯]। এর পর হতে জামায়াত কেয়ারটেকার ইস্যুটি নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকে।

গ. বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রেসিডেনসিয়াল বা পার্লামেন্টারী কোনটিই নয়। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হিসাবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক একই হাতে সর্বময় ক্ষমতা ব্যবহার কোনক্রমেই সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহায়ক হইতে পারে না।

ঘ. তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক ডিক্টেটরই প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের পক্ষপাতি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন ডিক্টেটর একই সংগে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের ক্ষমতা নিজের মধ্যে কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে চায়। অথচ শাসনতন্ত্রের একজন বলিষ্ঠ অভিভাবক ছাড়া পার্লামেন্টারী সিস্টেম কার্যকর হইতেই পারে না।

ঙ. একমাত্র জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাহাতে জনগণের কর্তৃত্ব অবশ্যই নিশ্চিত হইবে এবং কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষেই ডিক্টেটর সাজিয়া বসিবার সুযোগ থাকিবে না। (বর্তমান সরকার কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির ফল নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা এমন এক সরকার, যাহা এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত এবং ক্ষমতাসীন দল, পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভা তাঁহারই সৃষ্টি)।

চ. দেশের গোটা ব্যবস্থাই একজনমাত্র মরণশীল ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে সেই ব্যক্তি ক্ষমতাচ্যুত হইলে বর্তমান গোটা ব্যবস্থা ভাংগিয়া পড়িবে এবং দেশ হয় গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইবে নয়তো আরেকটি সামরিক শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে।

ছ. কোন দেশপ্রেমিকই তাঁর প্রিয় দেশকে এই ধরণের অরাজক পরিস্থিতির সম্মুখিন দেখিতে রাজী হইতে পারে না। এমতাবস্থায় জামায়াত বাংলাদেশর উপযোগী রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করা তাহার পবিত্র কর্তব্য মনে করিতেছে।' (দৈনিক সংগ্রাম, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮০)

429889

৪৯. উক্ত গণজমায়েতে ভাষণদানকালে আব্বাস আলী খান বলেন, 'সংসদ নির্বাচনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জাতি কিছুতেই মানবে না।' প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ সাহেব প্রচলিত আইন, এমনকি নিজের প্রবর্তিত সামরিক আইন, এমনকি নিজের প্রবর্তিত সামরিক আইনবিধি লংঘন করে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করে জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চ হতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরূপ সমালোচনা ও দোষারোপ করে গোটা জাতিকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ শাসনের জন্য জনগণকে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার না দিলে তার পরিণামে যদি গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়, তা হলে দেশ বৈদেশিক হামলার সম্মুখীন হইবে।

জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর বলেন, 'ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে গোটা জাতির দাবী মেনে নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী যদি ব্যারাকে ফিরে যান, তা হলে গুটিকয়েক উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার অভ্যুত্থান ঘটাতে আর উদ্যোগী হবে না। তিনি বলেন, 'সামরিক বাহিনীর স্থলে শূন্যতা পূরণে স্বল্পদিনের জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে কেয়ারটেকার সরকার হিসেবে তিনি জাতীয় সংসদের নির্বাচন দিবেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করবেন। অতএব শূন্যতা সৃষ্টির কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।'

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতে ইসলামী আত্মনিয়োগ করেছে। সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় গণতন্ত্র কিছুক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলে বন্দুকের নলেই তা নস্যাৎ করা হয়। সামরিক শাসনের মাধ্যমে গণতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। তাই সারাদেশ সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং মুলতবী সংবিধান বহালের আওয়াজ উঠছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নিকট কেয়ারটেকার সরকারের দাবী উত্থাপন

২৪ শে মার্চ ১৯৮২ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত বিএনপি সরকারের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নিকট হইতে ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসন নিযুক্ত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার নামে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করায় এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এ অবস্থা অনুধাবন করে এরশাদ ১লা এপ্রিল, ১৯৮৩ হতে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন এবং ১৪ই নভেম্বর সামরিক সরকার প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর হতে পুর্বারোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার প্রেক্ষিতে ২৮শে নভেম্বর ১৯৮৩ রাত্রে এক রেডিও টেলিভিশনে ভাষণে সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশব্যাপী পুনরায় সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে বাদ দিয়ে এরশাদ স্বয়ং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে সামরিক সরকার ৭ই জানুয়ারী ১৯৮৪ পুনরায় দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে এবং এরশাদ রাজনৈতিক দলগুলির সহিত সংলাপের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সংলাপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের ৭৫টি রাজনৈতিক দলের ৩৬০ জন নেতা ১৯৮৪ সনের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গভবনে এরশাদের সহিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ২৪ শে মার্চ এরশাদ সরকার দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত সংলাপ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা পুনঃ ব্যক্ত করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ ৯ই এপ্রিল ও ২০শে এপ্রিল ১৯৮৪ প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহিত বঙ্গভবনে সংলাপে বসেন। এই দুই বৈঠকের মধ্যবর্তী সময়ে ১২ই এপ্রিল বেগম জিয়া বঙ্গভবনে গিয়ে এরশাদের সহিত একান্ত বৈঠক করেন। ১০ই এপ্রিল বঙ্গভবনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সহিত প্রেসিডেন্ট এরশাদের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই এপ্রিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোটের ৩৮ জন নেতা বঙ্গভবনে এরশাদের সহিত প্রায় ৩ ঘণ্টা সংলাপ করেন। ৯ই এপ্রিল সংলাপ শুরুর কয়েকদিন পূর্বে অধ্যাপক গোলাম আযম দেশের রাজনৈতিক সংকট বিশ্লেষণ করে তা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক দলগুলির বিবেচনার জন্য বিবৃতি আকারে একটি বাস্তবমুখী প্রস্তাব পেশ করেন। ৬ই এপ্রিল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ঐ বিবৃতি গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই জামায়াতে ইসলামী এরশাদের সহিত সংলাপে পেশ করার উদ্দেশ্যে বক্তব্য তৈরী করে। ১০ই এপ্রিল জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াত কর্ম পরিষদের ৭ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকার গঠন। এই বিষয়ে জামায়াতের পক্ষ হতে দুইটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়[৫০]।

---

৫০. ১. সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবীটি মানা সত্ত্বেও সরকার যদি অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ সরকার গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তা হলে সংলাপের পরেও সংকট নিরসন হবে না।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায় না। এমন একটি সরকার হতেই নির্বাচন আশা করা যায়, যে সরকারের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীগণ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা নেতা থাকবেন না এবং সরকারী পদে থাকা কালে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না ।

২. আমরা নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে যে অরাজনৈতিক সরকার গঠনের দাবী করছি, এর জন্য দুইটি বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে।

ক. সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হলে তিনি অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন, অথবা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালে জামায়াত ঘোষিত রূপরেখা

১৯শে নভেম্বর, ১৯৯০ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট ঐক্যমতের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশ হতে কেয়ারটেকার সরকারের প্রায় অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হতে, জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট গুলিস্তান চত্বর হতে, ৫ দলীয় জোট জাসদ-বাসদ কার্যালয়ের সামনে এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সমাবেশ হতে কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে।[৫১]

খ. প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিজেও অরাজনৈতিক সরকারের নেতৃত্ব দিতে পারে। এ অবস্থায় সরকারকে অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ মর্যাদায় উন্নীত হতে হবে-

১. তিনি রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না মর্মে ঘোষণা দিতে হবে।

২. তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৩. তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্য রাজনৈতিক দলের সহিত কোন রকম সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

৫১. ক. সংবিধানের ৭২ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট বর্তমান জাতীয় সংসদ (১৯৮৮ সনে নির্বাচিত ৪র্থ সংসদ) বাতিল ঘোষণা করবেন এবং সংবিধান ৫৮ (৫) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিবেন।

খ. সংবিধানের ৫১ (৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করবেন।

গ. প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৫৫ (১) ধারা অনুযায়ী এমন একজন আইন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন যিনি আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হবেন।

ঘ. সংবিধানের ৫১ (৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রেসিডেন্ট পদ হইতে পদত্যাগ করবেন।

ঙ. ৫১ (৩) ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট এর পদত্যাগের সাথে সাথেই সংবিধানের ৫৫ (১) ধারা অনুযায়ী নবনিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাযভার গ্রহণ করবেন।

চ. ৫৮ ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আন্দোলনরত দলসমূহের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করিবেন।

ছ. অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং কেয়ারটেকার সরকারের সদস্যবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

জ. সংবিধানের ১১৮ (১) ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

ঝ. সংবিধানের ১২৩ (৩) (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ বাতিল হবার দিন হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ঞ. নব নির্বাচিত সংসদই দেশের ভবিষ্যৎ সরকার পদ্ধতি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকবে, না সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে তা নির্ধারণ করবেন।

জামায়াতের দেওয়া এই ফর্মুলা অন্যান্য দল ও জোট গ্রহণ করায় পরবর্তীতে এক গণ-অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বেলা পৌনে তিনটায় মাত্র ১০ মিনিটের এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য হলেন জনাব শামসুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। সরকারপক্ষের জেনারেল এরশাদ, প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও অন্যন মন্ত্রীগণ।

Dhaka University Institutional Repository

দশম পরিচ্ছেদ : সামরিক শাসক এরশাদবিরোধী আন্দোলন

এরশাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে লাগল। জামায়াতে ইসলামীই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে যে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বহাল করার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। ১৫ দলীয় জোটের সাথে পাল্লা দিয়ে ৭ দলীয় জোট ময়দানে তৎপর ছিল। ১৫ দলীয় জোট ১১ দফা দাবি ও ৭ দলীয় জোট ৫ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনের সূচনা করে। এ আন্দোলন কোন উত্তাপই সৃষ্টি করতে পারবে না বলে জামায়াত উপলব্ধি করল। সকল দলের একমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করার কোন পরিবেশ ছিল না। তাই জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে। এ উদ্দেশ্যে উভয় জোটের সাথে যোগাযোগের জন্য ঢাকা মহানগর আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন সর্বজনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা ও এডভোকেট শেখ আনসার আলী এডভোকেট ।

এরশাদ সরকারের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংলাপ

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক দল সামরিক সরকারে বিরুদ্ধে শুরু থেকে গণতন্ত্র তথা জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। এর অংশ হিসাবে তৎকালীন সামরিক শাসক এরশাদ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের আয়োজন করতে বাধ্য হয়। এরশাদ সরকারের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংলাপে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ১৯৮৪ সালের ১০ এপ্রিল সকাল ১০টায় ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর সাত সদস্যবিশিষ্টি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে সরকারের সাথে সংলাপের উদ্দেশ্যে বৈঠকে মিলিত হয়[৫২]।

জাতীয় প্রেসক্লাবে জামায়াতের প্রতিনিধি দল

সংলাপ থেকে বিদায় হওয়ার পর জামায়াত নেতৃবৃন্দ বঙ্গভবন থেকে সরাসরি জাতীয় প্রেসক্লাবে উপস্থিত হন। তারা সাংবাদিকগণের নিকট জামায়াতের পক্ষ থেকে সংলাপের সময় সরকারের কাছে যে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন, এর কপি বিলি করে দেন, যাতে জনগণ জানতে পারে যে, সংলাপে জামায়াতের বক্তব্য কি ছিল।

১১ এপ্রিল জামায়াতের সাথে মন্ত্রীদের বৈঠক

এরশাদের সাথে সংলাপের পরদিন তিনজন মন্ত্রীর সাথে জামায়াতের তিন নেতা সাক্ষাৎ করেন[৫৩]।

---

৫২. প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য হলেন জনাব শামসুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। সরকারপক্ষের জেনারেল এরশাদ, প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও অন্য মন্ত্রীগণ।

৫৩. এ প্রসংগে জামায়াতের বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ লিখেছেন "আমাদের সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠক হয় মন্ত্রী পর্যায়ের। সেখানে আমরা মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আমাদের মূল বক্তব্য বাদ দিয়ে শুধু অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিষয়টিকে এমনভাবে প্রচার করলেন কেন? তারা এর কোনো সদুত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। তখন আমরা বললাম, এরা যেহেতু প্রচার করেই ফেলেছেন তাই এ ব্যাপারে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সাথে সংলাপ চলতে পারে না। মন্ত্রীগণ এ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১৯৮৬ সালে খান সাহেব ঢাকা- ৬ আসন থেকে দাড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৫৪]

সাতাশির বন্যাদুর্গতদের পাশে আব্বাস আলী খান

উনিশ শ সাতাশি ও আটাশি সালের বন্যায় এদেশের অধিকাংশ স্থান প্লাবিত হলে তিনি ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগ নিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ান, রিলিফ বিতরণ করেন। এসব ভয়বহ দুর্যোগে তাঁর সাহায্য ও ত্রাণ বিতরণের নজীর ছিল অনুপম দৃষ্টান্ত।

৯০-এর গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দান

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এবং ৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানে আব্বাস আলী খান সাহেব এ দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন। এ সময় এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গণ আন্দোলনে রূপ নেয় তাঁর নেতৃত্বে এ আন্দোলন আরো বেগবান হয়। ফলে স্বৈরাচারের পতন ত্বরান্বিত হয়।

ব্যাপারে তাদের অসহায়ত্বের কথা জানিয়ে বললেন, 'রাষ্ট্রপতির সাথেই আপনাদের বৈঠক হওয়া উচিত।' এরপর প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপ অনুষ্ঠত হয়। সেই বৈঠকে আমরা সরকারে আপত্তিকর ভূমিকার কথা তুলে ধরলাম। আমরা বললাম, 'অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না। এ অবস্থা আপনারাই সৃষ্টি করেছেন, আমার নই।' সরকার বেকায়দায় পড়ল এরশাদ সাহেব বললেন, বিষয়টি আমরা পরে বিবেচনা করব। এরপর আলোচনা শুরু হলো। আমরা পুনরায় কেয়ারটেকার সরকারের মাধ্যমে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনই একমাত্র সমাধান বলে জোরালো ভাষায় জানিয়ে দিলাম। সাথে সাথে সরকারের মতামতও জানতে চাইলাম। সরকার যা বলল, তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জনগণের এ দাবী মেনে নিতে সরকার প্রস্তুত নয়। (বাংলাদেশের রাজনেতিক আন্দোলন, পৃষ্ঠা, ২৭)

৫৪. ১৯৮৬ সাল। চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে দাড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে জননেতা জনাব আব্বাস আলী খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। অন্য প্রার্থীদের মধ্যে জাতীয় পার্টির জনাব আব্দুর রহিম এবং আওয়ামী লীগের জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু ছিলেন অন্যতম। ঢাকা মহানগরীর একটি মাত্র আসনে নির্বাচন করায় মহানগরী জামায়াতের সকল জনশক্তিকে জনাব খানের নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনার জন্য নিয়োজত করা হয়। স্বৈরাচারী শাসকের শাসনে অতিষ্ঠ জনগণ খান সাহেবের মত সৎ, যোগ্য এবং অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানকে বিপুলভাবে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য স্বৈরাচারী সরকারের প্রার্থীর সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী ভোট কেন্দ্রগুলো দখল করে নেয়ায় ভোটাররা তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেননি বা ব্যক্ত করতে দেয়া হয়নি। নির্বাচনে বয়োবৃদ্ধ নেতা সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত অবধি ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিজের আদর্শের কথা বলতেন এবং ভোটের মত পবিত্র আমানতটি সৎ পাত্রে দান করার আহ্বান জানাতেন।

একদিন গোরান ও খিলগাঁও এলাকায় খান সাহেব অন্যান্য দিনের মতো সকাল থেকে সকলকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে ক্যাম্পেইন করলেন। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসায় এবং বিরাট এলাকা দ্রুত কভার করার লক্ষ্যে নামায ও দুপুরে খাওয়ার জন্য সামান্য বিরতি দিয়ে তিনটায় জামায়াত কেন্দ্রীয় অফিসে আবার একত্রিত হবার কথা বলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সকলকে বিদায় দিলেন। উপর্যুপরি রাতদিন পরিশ্রমের ফলে সবাই ক্লান্ত। বেলা তিনটায় পুনরায় বের হবার সময় নির্ধারিত হবার পরও সকলে ধারণা করেছিলেন আছরের আগে আর সম্ভবতঃ খান সাহেব বের হবেন না। কারণ সকালের দিকে তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। নামায ও খাবার পর আল্লাহর মেহেরবাণীতে নিজ শরীরের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে আমি বাসা থেকে তিনটার মধ্যে কেন্দ্রীয় অফিসে চলে এলাম। এসে দেখি আমার আগেই খান সাহেব হাজির। আমি উনাকে দেখে সালাম দিতেই গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনটা তো বেজে গেছে লোকজন কোথায়? উনার প্রশ্নে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে না দেখে আমতা আমতা করতে লাগলাম। পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'যাদের সময় জ্ঞান নেই তাদের দিয়ে আর যাই হোক, ইসলামী বিপ্লবের কাজ হবে না।'
(আমিনুর রহমান মুহাম্মাদ মনির, 'আব্বাস আলী খানের সময়ানুবর্তিতা' মৃত্যুহীন প্রাণ পৃষ্ঠা : ১৯২)

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ পরিচ্ছেদ : ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন[৫৫]। এই সময় জামায়াত প্রার্থীদের পক্ষে তিনি বাংলাদেশের সকল নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনী জনসভায় যোগদান করেন এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন করতে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন।

জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ

১৯৯১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান তিনি যে ভাষণ[৫৬] দিয়েছিলেন তা ছিল একটি রাষ্ট্র নায়কোচিত ভাষণ। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সাধারণ নাগরিক অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষের কাছে তা ছিল অতি প্রশংসনীয়।

আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন

১৯৯২ সাল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছর এদেশের ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে রোধ করার জন্য এক জঘণ্য খেলায় মেতে ওঠে। তারা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তথাকথিত গণ-আদালত গঠন করে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে এক জনবিচ্ছিন্ন আন্দোলন শুরু করলে সরকার বাধ্য হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে। ফলে তাঁর মুক্তির দাবীতে সারাদেশে এক বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। অধ্যাপক গোলাম আযমের এই মুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বর্ষীয়ান জননেতা আব্বাস আলী খান। সে সময় তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্বও পালন করেন।

মেয়রপ্রার্থী এটিএম আজহারুল ইসলাম-এর সমর্থনে ব্যাপক গণসংযোগ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন[৫৭] নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মনোনীত মেয়র প্রার্থী জনাব এটিএম আজহারুল ইসলামের সমর্থনে ২৫ জানুয়ারী ১৯৯৪ দয়াগঞ্জ স্বামীবাগে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনী সমাবেশে

---

৫৫. ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে জয়পুর হাট এবং ঢাকা ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ সম্পর্কে তদানীন্তন জমায়াত অফিস সেক্রেটারি অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম লিখেছেন, 'আমি ৯১ সালে মুহতারাম খান সাহেবের নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়েছিলাম । সে সময়ে জয়পুরহাটে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে দেখেছি তাঁর প্রতি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তাঁকে নিয়ে হাটে-বাজারে নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়েছি, মানুষকে দেখেছি দোকানপাট, বেচাকেনা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে, তাঁকে সালাম দিতে, তাঁর সাথে দু'হাত মিলাতে। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। (অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, মৃত্যুহীন প্রাণ 'আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ', পৃষ্ঠা : ১২৫-১২৬)

৫৬. আইনশৃংখলা রক্ষার গুরুত্ব , জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী উদ্দেশ্য, সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইসলামী আইন জারির মূলনীতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতি গঠনের উপযোগী করে গড়ে তোলা, সাংস্কৃতিক অংগনের পুনর্গঠন, সুবিচারমুলক অর্থনীতি চালু করা, ভূমি ব্যবস্থার পুনবিন্যাস, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পল্লী উন্নয়ন,মহিলাদের ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অমুসলিম নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন।

৫৭. ঢাকা সিটি করপোরেশন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ঢাকা নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। শহরটির মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে অবশ্য এর স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার কোন হেরফের হয়নি। এই শহরের স্থানীয় শাসন আগেও যেমন একটি মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পরিচালিত হতো, প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার পরও সেই একই ব্যবস্থা অনুসৃত হতে থাকে। ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত মিউনিসিপ্যাল শাসনব্যবস্থা ঢাকার মতো একটা শহরের স্থানীয় শাসন পরিচালনার জন্য যথেষ্টই ছিল, কারণ ঢাকা ছিল তখন একটি ছোট্ট ডিভিশনাল কেন্দ্র মাত্র। তখন শহরটির পরিব্যাপ্তি ছিল ২০.৭২ বর্গ কিমি এবং এর জনসংখ্যা ছিল ৫২,০০০-এর কাছাকাছি। ১৮৬৪ সালের অপঃ ওওও মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত এই মিউনিসিপ্যালিটির ওপর এই ছোট্ট শহরের স্বল্পসংখ্যক নাগরিককে

Dhaka University Institutional Repository

সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান বক্তব্য রাখেন। সূত্রাপুর থানা নাজেম জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ রইসুদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন, জামায়াত মনোনীত মেয়র পদ প্রার্থী এটিএম আজহারুল ইসলাম। ওয়ার্ড নাজেম মুখলেছুর রহমান। জনাব আব্বাস আলী খান জনসভায় সৎ ও যোগ্য লোককে মেয়র নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনাদের ভোটাধিকার নিয়ে যদি সৎ ও খোদাভীরু লোক নির্বাচিত হয় তাহলে সমাজ ও দশের মঙ্গল হবে। আর যদি দুর্নীতিবাজ, লুটেরা ও দুস্কৃতিকারী নির্বাচিত হয় তাহলে সমাজে দুস্কৃতি, অনাচার ও সন্ত্রাসের বিস্তৃতি ঘটবে। এর জন্য ভোট দাতাদের ও দুরাচারী ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার জন্য দায়ী হতে হবে'।

তিনি বলেন, 'স্বৈরাচারী শাসনামলে নির্বাচনের ইন্সটিটিউশনগুলো যখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তখন জামায়াতের পক্ষ থেকে সংলাপ অনুষ্ঠানে আমরা প্রথম কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়েছিলাম। এ দাবীই পরে গণদাবীতে পরিণত হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯১ সালের নির্বাচন তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ হয়েছিল। জনাব খানসাহেব বলেন বর্তমান নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করছে। এজন্য কমিশন কিছু নীতিমালাও প্রণয়ন করেছে। সেই নীতিমালা প্রথম এবং সবচেয়ে বেশী ভঙ্গ করেছে সরকারী দল। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নীতিমালা লংঘন করে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের অনেক সদস্য। সরকারী গাড়ী পদমর্যাদা ব্যবহার করে ভোটের জন্য প্রভাব বিস্তার করেছে। জামায়াত নেতা বলেন, পরকালের জবাবদিহি করার ভয় যাদের থাকে তারাই জনগণের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এই ধরনের অনুভূতি ছাড়া লোক যোগ্য হলেও সততার অভাবের কারণে জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে বেশী তৎপর হয়'। জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীর ঢাকাকে[৫৮] বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, 'রাজধানী ঢাকার অবস্থা আজ জনগণকে হতাশ করেছে। এখানে বিদ্যুৎ আসে আর যায়। গ্যাসের প্রবাহ ঠিক থাকে না। ড্রেনের দুর্গন্ধে পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। জলাবদ্ধতা শহরের মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নেই। এ অবস্থার অবসান করে এটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও সন্ত্রাসমুক্ত রাজধানীর জন্য আজহারুল ইসলামই একমাত্র সৎ

পৌরসেবা প্রদান করার দায়িত্ব বর্তায়। এই সেবার অন্তর্গত ছিল রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য পৌরসভা করারোপ করতে পারত এবং সময় সময় সরকারি অনুদান লাভ করত।
যদিও পরবর্তী সময়ে শহরটির বিস্তৃতি ঘটে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; তথাপি ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের এদেশ ছেড়ে যাওয়ার এবং এটি একটি নতুন প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভের পরই শুধু এর ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭ সালে এই শহরের আয়তন সম্প্রসারিত হয়ে প্রায় ৩১.০৮ বর্গ কিমি-এ দাঁড়ায় এবং জনসংখ্যা হয় প্রায় ২,৫০,০০০। অতঃপর ঢাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, শিল্প সংক্রান্ত, শিক্ষা বিষয়ক এবং এমনকি সামরিক গুরুত্ব এতটাই বেড়ে যায় যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিরি সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এর স্থানীয় শাসনের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশ্য এই পরিবর্তন রাতারাতি ঘটেনি, বরং দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থার কারণে এই পরিবর্তন হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

৫৮. **ঢাকা** বাংলাদেশের রাজধানী, যার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রাক্-মুসলিম আমলে ঢাকার অস্তিত্ব সুনির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ। তবে সুলতানি আমলের এটি একটি নগর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং মুগল আমলে প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পাওয়ার পর এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মুগল-পূর্ব যুগে কিছু গুরুত্ব ধারণ করলেও শহরটি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে মুগল যুগে। ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু জানা যায় না। এ সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ : (ক) এক সময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ (*বুটি ফ্রনডোসা*) ছিল; (খ) গুপ্ত অবস্থায় থাকা দুর্গা দেবীকে (*ঢাক্য-ঈশ্বরী*) এ স্থানে পাওয়া যায়; (গ) রাজধানী উদ্বোধনের দিনে ইসলাম খানের নির্দেশে এখানে ঢাক অর্থাৎ ড্রাম বাজানো হয়েছিল; (ঘ) 'ঢাকা ভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল; (ঙ) *রাজতরঙ্গিণী*-তে ঢাক্কা শব্দটি 'পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে অথবা এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লিখিত সমুদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হলো ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্য ও খোদাভীরু প্রার্থী। জনাব আজহারকে নির্বাচিত করে ভোটের আমানতের সঠিক ব্যবহারের জন্য তিনি ঢাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান'।

২৮ জানুয়ারী ১৯৯৪ ঢাকায় শাপলা চত্বরে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জামায়াতের মনোনীত মেয়র পদ প্রার্থী এটিএম আজহারুল ইসলামের সমর্থনে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মেয়র প্রার্থী জনাব এটিএম আজহারুল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেন সিনিয়র নায়েবে আমীর ও বর্ষীয়ান জননেতা আব্বাস আলী খান ও জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জনাব খান উক্ত জনসভায় ঢাকা মাহানগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন গত ২২ বছরের ক্ষমতায় বসে ৩টি দল জাতির ভাগ্য উন্নয়নে কিছুই করেননি। তাঁরা শুধু নিজেদের জন্যই গড়েছেন। দেশ জাতি ও মহানগরবাসীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এবার বিকল্প শক্তি বেছে নিন। অতীতের ক্ষমতাসীন ব্যর্থ এ দলকে প্রত্যাখ্যান করে সৎ যোগ্য, খোদাভীরু প্রার্থী এটিএম আজহারকে ভোট দিন।[৫৯]

---

৫৯. পবিত্র কালামে পাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভা শুরু হবার আগে থেকেই সমাবেশ স্থলে ঢাকা মহানগরের চারিদিক হতে অসংখ্য মিছিল এসে ভরে যায়। জনসভা শুরু হবার পরও হাজার হাজার লোক চেয়ার প্রতীকে প্লেকার্ডে পোস্টার নিয়ে জনসভায় সমবেত হতে থাকে। আছরের নামাযের বিরতির পর যখন জনসভা পুনরায় শুরু হয় তখন শাপলা চত্বর থেকে জনতা ব্যাংকের সদর দফতর পর্যন্ত বিশাল এলাকার তিল ধরনের ঠাঁই ছিল না। রাস্তার দুপাশের ভবনগুলোর ছাদে দাঁড়িয়েও শত শত মানুষকে জনসভায় বক্তব্য শুনতে দেখা যায়। জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীর ও বর্ষীয়ান জননেতা আব্বাস আলী খান জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা ছিলেন যথাক্রমে দলের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদপ্রার্থী জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী নোরেল জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ও জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান। কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা, মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারী এডভোকেট জসীম উদ্দিন সরকার, সহকারী সেক্রেটারী সাইফুল আলম খান মিলন ও ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহের। জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের বিগত ২২ বছরে অনুষ্ঠিত ৫ বারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এ তিনটি দল ক্ষমতায় এসে জাতির ভাগ্য উন্নয়ন করেনি নিজেদের ভাগ্যই শুধু তাঁরা গড়েছেন। তাঁদের অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। এবারের মেয়র নির্বাচনে এ ব্যর্থ দলকে আর সমর্থন করা যায় না। ঢাকার বিভিন্ন দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন ঢাকা হলো বাংলাদেশের রাজধানী। এটি হওয়া উচিত ছিল একটি আদর্শ মহানগরী। কিন্তু এ দলের শাসনের কল্যাণে ঢাকার অলি-গলিতে গেলে দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়। এক পশলা বৃষ্টি নামলে রাজপথে হাঁটু পানি জমে। এই পানিতে শহরের মল, মূত্র ও আবর্জনা একাকার হয়ে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করে। শহরের অলিগলি খানা খন্দকে সারা বছর ভরা থাকে। ম্যানহোল থাকে ঢাকনা শূন্য। মশার জ্বালায় জনজীবন বিপর্যস্ত। যানজটে রাস্তাঘাট চলাচল করা যায় না। বিদ্যুতের আসা-যাওয়া নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, অতীতের ক্ষমতাসীন ও দল মিলে আসলে এক। এদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন। শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাবার জন্য তাদের নাম ভিন্ন। এ কারণে শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের মন্ত্রিসভায়ও একই ব্যক্তিদের দেখা গেছে। তিনি কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে বলেন, ক্ষমতাসীনদের অধীনে অনুষ্ঠিত অতীতের কোন নির্বাচনই নিরপেক্ষ হয়নি। ভবিষ্যতেও যে হবে না- এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। এরশাদের আমলের লুটপাট ও ভোটার বিহীন নির্বাচনের কারণে জামায়াত কেয়ারটেকার সরকার দাবী জানিয়েছিল। এই কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে '৯১-এর নির্বাচনই তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ হয়েছিল। বর্ষীয়ান জননেতা বলেন, '৯১-এর নির্বাচনের পর বিএনপি ক্ষমতায় আসে। দেশবাসী আশা করেছিল বিএনপি অন্তত দেশ বিক্রি করবে না। ইসলামী মূল্যবোধকে লালন করবে। কিন্তু জনগণের সে আশা ভেঙ্গে গেছে। বিএনপির আমলে ইসলামের ওপর যত আঘাত এসেছে এতটা অতীতে কোন সময় আসেনি। এই ৩ বছরে বিএনপি নিজেকে মুসলিম জাতিসত্তার শত্রু বলে প্রমাণিত করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীর সামনেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিনিধিরা '৪৭ পূর্ব অভিন্ন ভারতে ফিরে যাবার কথা বলেছেন। কোন নেত্রীই এর প্রতিবাদ করেননি। বুদ্ধিজীবী নামধারী কয়েক ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে যা খুশী, তা বলে যাচ্ছে। আর সরকার বলছে এটি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। রাস্তার কোন মানুষকে থাপ্পর মেরে কেউ যদি বলে এটি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার, তাকে কি মেনে নেয়া যায়? জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীর বিএনপির ইসলামবিরোধী তৎপরতার বর্ণনা দিয়ে আরো বলেন, এ সরকার ইসলামের চিহ্নিত শত্রু কাদিয়ানীদের পক্ষে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৩৫ সালে সারা বিশ্বের আলেমরা একযোগে ভণ্ড নবুয়তের দাবীদার কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে ফতোয়া দিয়েছে। সেই কাদিয়ানীবিরোধী কাবা শরীফের ইসলামকে যোগ দেয়নি। বিএনপি সরকারই অধ্যাপক গোলাম আযমকে পবিত্র রমজান মাসে এতেকাফ থেকে বঞ্চিত করে জেলখানায় নিয়ে গেছে। এ সরকারের পক্ষ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

জয়পুরহাটে তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী ঈদগা ময়দানে ভাষণ দান

জনাব আব্বাস আলী খান জয়পুরহাটের ঈদগা ময়দানের এক ভাবণ দান করেন। তিনি বলেন 'ঈদের নামায মুসলমানরাই পড়তে আসে। মুসলমান তারাই যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানে এবং হযরত মুহাম্মদ সা. কে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে শুধু বিশ্বাসই করে না বরং তাঁকে দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে বেশী অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। বর্তমানে এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান নবীর বিরুদ্ধে কথা তুলেছে। এ অবস্থায় যদি আমরা চুপ করে বসে থাকি তাহলে তা হবে স্পষ্ট মোনাফেকী। নবীর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য হযরত নূহ আ. এর পুত্র কেনানও রক্ষা পায়নি। মানুষ আদিতে কখনো অসভ্য ছিল না। বরং সুসভ্য শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ মানুষ হিসেবে আল্লাহ হযরত আদম আ. কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তার পরবর্তীতে মানুষ কখনও সভ্য কখনো অসভ্য হয়েছে। আল্লাহ হযরত আদম আ. কে সুশিক্ষিত মানুষ হিসেবে প্রেরণ করার পরেও তাকে আইন প্রণয়নের এখতিয়ার দেননি এজন্য যে নিজেদের ব্যাপারে আইন প্রণয়নে স্বার্থপরতা আসতে পারে। সুতরাং একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মানব রচিত আইনে কোন দিন সমাজে শান্তি আসতে পারে না। ক্ষমতাসীন সরকারের ছত্র ছায়ায় ইসলাম আল্লাহ ও নবীর বিরুদ্ধে এক প্রেরীত লেখকরা তাদের ধ্বংসাত্মক লেখা চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ ও চাপ থাকা সত্ত্বেও এ সরকার কুসাহিত্যিকদের ও কুবুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রণে না এনে বরং নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।'

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের ঐতিহাসিক রায় উপলক্ষে শোকরানা সমাবেশে ভাষণ

২১ জুন ১৯৯৪ অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের সর্বসম্মত রায় হয়। এ উপলক্ষে ২২ জুন ১৯৯৪ বৃহস্পতিবার বিকেলে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে আয়োজিত শোকরানা সমাবেশে জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খানও বক্তব্য রাখেন।[৬০]

ইসলামের পক্ষে কোন কিছু আশা করা অর্থহীন। তিনি বিধি লংঘনের জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করে বলেন, যে সরকার নিজেরা আইন লংঘন করে তাদের আইন ঠিকমত মানা হবে তার আশা করা যায় না। পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে শবে বরাতের রাতে আতশবাজি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সরকারই যেখানে সাফ গেমসে ৬৫ লাখ টাকা ব্যয় করে আতশবাজি করেছে, সেখানে এই নিষেধাজ্ঞা কে মান্য করবে? জনাব আব্বাস আলী খান ভোটের অধিকারকে পবিত্র আমানত হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এই আমানতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে তা দুর্ভাগ্য ডেকে নিয়ে আসবে। তিনি বলেন ইসলাম একদিন বিশ্বব্যাপী বিজয়ী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। পশ্চিমা সভ্যতার মরণ যন্ত্রণা এখন শুরু হয়ে গেছে। অসভ্যতার মৃত্যু ঘটবে। এর পরবর্তী বিশ্ব হবে ইসলামের বিশ্ব। সেই ইসলামী দুনিয়ার সূচনা হতে খুব বেশী দেরী নেই।

জনাব খান মেয়র পদপ্রার্থী জনাব এটিএম আজহারের হাত উঠিয়ে ধরে বলেন, আজহারুল ইসলাম একদিকে যেমন উচ্চ শিক্ষিত ও ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী একই সাথে প্রশাসক যোগ্যতাও রয়েছে। সৎ, যোগ্য, ঈমানদার এই মেয়র প্রার্থীর পক্ষে কি আপনার রায় দিতে রাজী আছেন? জনসমুদ্রের অর্ধ লাখ মানুষ দুহাত উঠিয়ে চেয়ারের পক্ষে তখন বিজয়ী শ্লোগানের মাধ্যমে তাঁদের সম্মতি জানান।

৬০. জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম দীর্ঘ ২৩ বছর নাগরিকত্ব বিহীন অবস্থায় জীবনযাপন করেছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত দেশের ১২ কোটি মানুষের মতো জন্মগত নাগরিকত্ব বহালের ঘোষণা করেছে। ৪ জন বিচারপতির সর্বসম্মতক্রমে এই রায় ঘোষণা বিচার বিভাগের ইতিহাসে নজীর বিহীন। তিনি বলেন, আজ এমন এক সময় এ রায় ঘোষিত হয়েছে যখন মুসলিম বিশ্ব এক চরম সংকটকাল অতিক্রম করছে। ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরেক শক্তি আজ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রের দাবার ঘুঁটি হিসেবে এদেশের কিছু লোকও ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা প্রকাশ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশকে একাকার করার কথা বলছে। জনাব খান বলেন, দেশদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে আজ দেশে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত খোদাদ্রোহী ও দেশদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের আওয়াজ উঠেছে। জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীর বলেন, মুসলিম জাতিসত্তার এই সন্ধিক্ষণে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযমকে আল্লাহ বেছে নিয়েছেন বলেই হয়তো আজ এ রায় হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তাকে যেন তিনি এ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দেন। জনাব আব্বাস আলী খান এক যুগব্যাপী জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

কেয়ারটেকার সরকার দাবী দিবসের কর্মসূচী পালন

জয়পুরহাট জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে দাবী দিবসের এক সমাবেশে সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান কেয়ারটেকার সরকারের দাবী ব্যাক্ত করেন। জয়পুরহাট শহর জামায়াতের আমীর সরদার আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আরো বক্তৃতা করেন, জয়পুরহাট জেলা জামায়াতের আমীর জনাব আতাউর রহমান, জেলা সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ প্রমুখ।

পাঁচবিবি থানা জামায়াতের সুধী সমাবেশ বক্তব্য প্রদান

২১ জুলাই ১৯৯৪ জনাব খান পাঁচবিবি থানা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত স্থানীয় ফিছকার ঘাটে এক সুধী সমাবেশে ভাষণ দান করেন। থানা আমীর জনাব তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আমীর জনাব আতাউর রহমান, সেক্রেটারী মাওলানা আ.ওয়াদুদ, জনাব এমদাদুল হক ও মাওলানা আব্দুস সালাম।

ধর্মদ্রোহীদের শাস্তিদানের দাবীতে ঢাকা মহানগরীর জামায়াতের সমাবেশ

ধর্মদ্রোহীদের শাস্তিদান, ব্লাসফেমী আইন[৬১] পাস, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ও এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধের দাবীতে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমের এক বিশাল সমাবেশে ২৯ জুলাই ১৯৯৪ শুক্রবার প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক গোলাম আযম। অন্যান্যের মধ্যে সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ও বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "ইসলাম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলে খৃস্টান ও ইহুদীদের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে মনে করে তারা ইসলামের বিরোধিতা করছে। এ জন্যই তারা বিশ্ব থেকে ইসলামকে নির্মূল করার অভিযান শুরু করেছে। বাংলাদেশকে তারা বেছে নিয়েছে কারণ এখানে ক্ষমতায় আছে দুর্বল ও আদর্শহীন সরকার। এ সরকার বিদেশী সরকারের ওপর নির্ভরশীল বলে তাদের ছত্র ছায়ায় ইসলাম বিরোধী শক্তি ও দেশদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, একজন মহিলা '৪৭ সালের সীমানা মুছে দিতে চায়। তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কোথায় থাকে। এ সাহস সে কেথায় পায়। তিনি বলেন, ইসলামকে এদেশ থেকে বিদায় করা হলে কিছুতেই স্বাধীনতা রাখা যাবে না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণ ও নির্বাচন-পরবর্তী তৎপরতা

১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের একজন প্রার্থী হিসেবে আব্বাস আলী খান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন[৬২]। এটি ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

চারদলীয় জোট গঠনে আব্বাস আলী খানের ভূমিকা

চারদলীয় জোট গঠনে আব্বাস আলী খানের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী-বাকশালী সরকারকে হটিয়ে একটি ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন সরকার কায়েমের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে চার দলীয় জোট গঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এই জোটের নেতৃত্বে থাকলেও জামায়াতে

অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে থাকা সত্ত্বেও অবিচারমূলক আইনে তাঁর ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করায় আমি 'কুব্জ দেহে নুব্জ পৃষ্ঠ' হয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। আমার মনে হচ্ছে আমি ভারমুক্ত হয়েছি। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার শহীদী তামান্নার জন্য যাতে জীবন বিলিয়ে দিতে পারি তার তৌফিক যেন পরম করুণাময় দান করে। এ জন্য দোয়া করবেন।"

৬১. ব্লাসফেমী আইন, ধর্মদ্রোহীদের শাস্তির জন্য যে আইন

৬২. খান সাহেব ১৯৯৬ সনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়পুরহাট ১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন বি.এন.পি এর গোলাম রব্বানী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল আলীম।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামীর ভূমিকা অপরিসীম। আব্বাস আলী খান বার বার উপলব্ধি করতেন যদি চারদলীয় জোট গঠন না হয় তাহলে এদেশে ইসলামী শক্তিরপক্ষে ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। পরবর্তীতে আওয়ামী সরকারে ভরাডুবির মধ্য দিয়ে এই জোটই সরকার গঠন করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : আব্বাস আলী খানের জীবনের সর্বশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচী

আব্বাস আলী খানের জীবনের সর্বশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচী, ১৯৯৯ সালের ১৫ জুলাই উল্লাপাড়ায় অনুষ্ঠিত জামায়াতের কর্মী সম্মেলন। অসুস্থ শরীর নিয়ে জনাব খান সাহেব তাঁর জীবনের শেষ জামায়াত কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন[৬৩]। সে দিন তিনি ইসলামী আন্দোলনের সবটুকু অভিজ্ঞতা, সবটুকু পুঁজি যেন কর্মীদেরকে উজাড় করে দিয়ে গেছেন।

---

৬৩. "১৯৯৯ সালের ১৫ জুলাই উল্লাপাড়ায় অসুস্থ শরীর নিয়ে জনাব আব্বাস আলী খান তাঁর জীবনের শেষ জামায়াত কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম খান আমাকে বলেছেন যে, তাঁর এই ভাষণ ছিল অভূতপূর্ব। ইসলামী আন্দোলনের সবটুকু অভিজ্ঞতা, সবটুকু পুঁজি যেন তিনি কর্মীদেরকে উজাড় করে দিয়ে গেছেন। জামায়াত প্রতিষ্ঠার পটভূমি, এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ও আমাদের করণীয়, মরহুম মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা সবকিছু তিনি অন্তর থেকে নিংড়িয়ে ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছেন। তার মন তার অজান্তেই হয়তোবা জানতো যে এটাই তার শেষ ভাষণ। এতকিছু বলার পরও তিনি রফিকুল ইসলাম খানকে বলেছিলেন যে আরো কয়েকটি কথা বলার ছিল কিন্তু সে কথা আর বলা হয়নি। 'আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তিই হলো মু'মিন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য' মরহুম আব্বাস আলী খানের ভাষণের নির্যাস ছিল এটাই। কেউ কেউ বলেন তার কাছে ইলহাম হতো। তাইতো আজ দেখি সুদীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সম্মেলনে জীবনের শেষ ভাষণে মরহুম জনাব আব্বাস আলী খানের অন্তরের সবটুকু 'সঞ্চিত ধন' ধ্যান, ধারণা ও অভিজ্ঞতা বর্তমান এবং অনাগত কালের ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তথা মানুষের জন্য হেদায়েত স্বরূপ রেখে গেলেন। (অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, স্মৃতির পাতায় আব্বাস আলী খান)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়-সাহিত্য সাধনা

আব্বাস আলী খানের লেখালেখির সূচনা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ প্রতিথযশা সাহিত্যিক, অনুবাদক, বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা আব্বাস আলী খান ইসলামী শিক্ষা, জ্ঞান ও গবেষণা এবং আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সাথে সাথে আরবী ফার্সি ভাষাও জানতেন। তিনি বহু বই অনুবাদ করেছেন, এছাড়া ইসলামের উপর প্রায় অর্ধশত মৌলিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন আমৃত্যু। তিনি ছিলেন অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন পলিফিক রাইটার এবং জাত গবেষক। সাংগঠনিক, রাজনৈতিক জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। অবসর সময়ে দেখাযেত তিনি হয় বই পড়ছেন, না হয় লিখছেন। তিনি অর্থহীন গল্প, গুজব ও কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করতেন না। পাঠকের কাছে কোন বক্তব্য উপভোগ্য আকারে পেশ করার যে যোগ্যতা তাঁর ছিল তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আব্বাস আলী খান যে একজন প্রতিভাবান লেখক ছিলেন এবং তার লেখায় যে ইসলামী ভাবধারা বিদ্যমান ছিল, তা জানতে হলে প্রথমে আমাদের তাঁর লেখালেখির সূচনা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১৯৩৪ সালের কথা তখন আব্বাস আলী খান রংপুর কারমাইকেল কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। ক্লাস চলাকালে বিরতির সময় তিনি কখনো কখনো খবরের কাগজ পড়তেন। তখন দৈনিক হানাফী নামে একটি দৈনিক কাগজ ছিল। একদিন তার মধ্যে আকবর ও আওরঙ্গজেব সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয় এ প্রবন্ধ পড়ে তিনি উৎসাহিত হয়ে তাঁদের জীবনীর ওপর গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। রংপুর কলেজ লাইব্রেরীতে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করে আকবর ও আওরঙ্গজেব এর ওপর ইংরেজীতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। এবং তা কলেজের মাসিক ম্যাগাজিনে ছাপানো হয়[১]।

---

[১] এ সম্পর্কে আব্বাস আলী খান তাঁর স্মৃতি সাগরের ঢেউ গ্রন্থে লিখেছেন "আমি তখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, রংপুর কারমাইকেল কলেজে। হাঁ বলতে ভুলে গেছি আই. এ. প্রথম বিভাগেই পাস করি এবং ভালো রেজাল্টের জন্যে মুহসীন স্টাইপেন্ড পেয়েছিলাম।

ক্লাস চলাকালে বিরতির সময় কখনও কখনও খবরের কাগজ উল্টেপাল্টে দেখতাম। ১৯৩৪ সালের কথা। তখন দৈনিক হানাফী নামে একটি দৈনিক কাগজ ছিল। তৎকালীন প্রখ্যাত আলেম, পীর ও ওয়ায়েজ মওলানা রুহুল আমীন ছিলেন এটির সম্পাদক। রংপুর কলেজে সে কাগজখানা নেয়া হতো। মুসলমানদের এবং মোল্লা-মৌলভীর সম্পাদিত বলে কাগজখানা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। একদিন তার মধ্যে একটা প্রবন্ধ পড়লাম। আমরা আকবর ও আওরঙ্গজেবকে যেভাবে ইতিহাসে পড়েছি তার বিপরীত কথা লেখা হয়েছে সে প্রবন্ধে। অর্থাৎ তাদের সঠিক জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র, তাই আমার কৌতূহল জাগলো। রংপুর কলেজে লাইব্রেরী ছিল খুবই সমৃদ্ধ। বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্রের জন্যে এক বিপুল ভান্ডার । সেখান থেকে 'আকবর নামা', 'মায়াসিরে আলমগিরী', 'খাফিখান', 'ফেরেশ্‌তা' প্রভৃতি প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থগুলো পড়াশোনা শুরু করলাম। সব ইংরেজীতে অনুবাদ করা। লিখলাম ইংরেজিতেই।

কলেজের মাসিক ম্যাগাজিনটা নিয়মিত বেরুতো। লিটারারী সোসাইটি নামে কলেজে একটা সংস্থাও ছিল। ম্যাগাজিনের সম্পাদক এবং সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক বাবু অমূল্য ধন মুখার্জি, এম. এ. পি. আর. এস. [প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার]। প্রবন্ধখানা অমূল্য বাবুকে দিয়ে বল্লাম, স্যার আপনি পড়ে অ্যাপ্রুভ্ করলে ম্যাগাজিনে ছাপাবার আগে তা সোসাইটির মিটিংএ পড়ে শুনাব। তিনি প্রবন্ধটি উল্টেপাল্টে দেখে বল্লেন, ওহে তুমি ত দেখছি বেশ কিছু নতুন কথা লিখেছ। ইতিহাসের অধ্যাপকদের একটুখানি দেখাতে হবে। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন-বাবু হরেন্দ্র চন্দ্র চন্দ ও বাবু জিতেন্দ্র মোহন

Dhaka University Institutional Repository

খান সাহেবের সাহিত্য চর্চা ও লেখালেখির সূচনালগ্নের ব্যাপারে তাঁর একমাত্র কন্যা খান জেবউন নেসা চৌধুরী লিখেছেন "সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি কখনো পড়া এবং লেখা কোনটিই ত্যাগ করেননি। রংপুর কলেজে যখন তিনি পড়াশোনা করছেন তখন তিনি ২০ বছরের এক তরুন। কারমাইকেল কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিনে ইংরেজীতে নিবন্ধ লিখে তাঁর শিক্ষানুরাগ এবং ইতিহাস প্রিয়তার স্বাক্ষর রাখেন। Akbar & Aurangazeb এ শিরোনামে মুগল সাম্রাজ্যের দুই রাষ্ট্রনায়কের তুলনামূলক চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ ধর্মী নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। তাঁর সর্বশেষ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় মাসিক পৃথিবীতে ১৯৯৯ এর জুন সংখ্যায়। ১৯৪৮-৫০ এর মধ্যেও তিনি বেশ কিছু নিবন্ধ রচনা করেন। এসবের মধ্যে কুরআনের আলো, তালিমে তরিকত, সুফি সাহেবের জীবনী ইত্যাদি।"[২]

আব্বাস আলী খানের লেখায় ইসলামী ভাবধারা

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলীফা[৩]। খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রবুবিয়ত, রিসালতের প্রচার-প্রসার এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত থাকাই একজন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আব্বাস আলী খান সে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তিনি বলতেন লিখতেন এবং গবেষণা করতেন। ইসলামী আদর্শকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার জন্য তিনি তাঁর বলিষ্ঠ লেখনি প্রতিভা দিয়ে বহু ইসলামী সাহিত্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর তাঁর লেখনী মানুষকে যুগ যুগ ধরে আল্লাহর দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর জীবনের প্রথম লেখা থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত প্রতিটি লেখা ছিল ইসলামী ভাবধারায় পরিপূর্ণ। তাঁর কয়েকটি রচনার শিরোনাম উল্লেখ করলে আমরা সহজে ধারণা করতে পারবো লেখাগুলো কতটুকু ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন ছিল।

১. মৃত্যু যবনিকার ওপারে।
২. ঈমানের দাবী।
৩. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্ধ।
৪. ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবি।
৫. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান।

দে। অমূল্য বাবু প্রথমে জিতেন বাবুকে পড়তে দিলেন। জিতেন বাবু কিন্তু তাঁর পেপারে আমাকে সর্বোচ্চ মার্ক দিতেন। যাহোক তিনি প্রবন্ধটি পড়ার পর মার্জিনে লিখে দিলেন- This is abuse of history. অমূল্য বাবু হয়তো ভেবেছিলেন হরেন বাবুও তাই বলবেন। আর দু'জন শিক্ষকের মন্তব্য একইরকম হলে প্রবন্ধটা নাকচ করতে সুবিধা হবে। তিনি তাই হরেন বাবুকেও পড়তে দিলেন। একজন মুসলমান ছাত্রের সপক্ষে এবং আপন স্বধর্মীর বিপক্ষে মন্তব্য করতে তিনি মোটেই দ্বিধাবোধ করলেন না। তিনি নির্ভয়ে সত্য কথাটাই বল্লেন। তিনি জিতেন বাবুর মন্তব্যের নিচে লেখলেন- This is real history. অমূল্য বাবু আমার প্রবন্ধকে অ্যাপ্রুভ করলেন। যথারীতি তা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হলো। ('আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ, বই প্রিকাশনী, ১৯৭৬, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৪)।

২. খান জেবউন নেসা চৌধুরী, আমার আব্বা : কিছু স্মৃতি কিছু কথা, স্মারক ২০০৫, জয়পুরহাট সংস্কৃতি কেন্দ্র।

৩.হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর মতে খলীফা বলতে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। আল্লামা বায়যাবী বলেন, খলীফা দ্বারা কেবল আদম আ. কে বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাযী র. বলেন, গোটা মানব জাতিই আল্লাহর খলীফা। আল্লামা যামাখশরী র. বলেন খলীফা দ্বারা আদম আ. ও তাঁর বংশধরকে বুঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তার রচিত গ্রন্থের ওপর রিভিউ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনার আশা রাখি।

সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ ও গ্রন্থ রচনা শুরু

'আব্বাস আলী খান সরকারী চাকুরী ছেড়ে বাড়ী আসলেন, বাড়ী আসার পর তাঁর শ্বশুর ফুরফুরার পীর সাহেবের অন্যতম খলীফা সায়েম উদ্দিন আহমেদ সাহেব তাঁকে নিয়ে পীরের দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যশোরের এনায়েতপুরে গিয়ে তাঁরা তৎকালীন গদ্দিনশীন পীর মাওঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। 'আব্বাস আলী খান তাঁর হাতে মুরীদ হলেন। পীর সাহেবের বিশেষ দাওয়াতে খান সাহেব ইসালে সওয়াব মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে কোলকাতা হয়ে একা ফুরফুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পীর সাহেব খান সাহেব কে দেখে খুশী হন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর দরবার শরীফে মাওঃ ফারুকী[৪] সাহেবের কামরায় থাকার ব্যবস্থা করেন । খান সাহেব অত্যন্ত ভালভাবে দরবার শরীফে দিন যাপন করেন। ইতোমধ্যে ফারুকী সাহেব তাঁর হাতে দুটি বই দিলেন। (১) আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (২) হিযবুল্লাহ, প্রথমটির বাংলা তরজমার অনুরোধ জানালেন তাঁকে এবং ২য়টি দিতে বল্লেন ড. শহীদুল্লাহকে। পরবর্তীতে বইখানির অনুবাদ না করে ভাব অবলম্বনে বাংলা ও ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখেন যা মাসিক 'মুহাম্মাদী' ও সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা 'মুসলিম' এ প্রকাশিত হয়।

মাওঃ আবুল কালাম আযাদের বইপড়ে তাঁর ইসলাম সম্পর্কে জানার তৃষ্ণা জাগল তাই উর্দুতে বিভিন্ন বইপুস্তক কিনে পড়শোনা শুরু করেন। এসময় তিনি কোরআনের আলো নামে একখানা পুস্তক লিখেন। এটাই তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা। এভাবে তাঁর সাহিত্য সাধনা ও গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়। পরের বছর আরও তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তার একটি কোলকাতা এবং বাকি দু'খানা বগুড়ায় ছাপা হয়।[৫]

---

৪. মাওঃ আব্দুল ওয়াহেদ ফারুকী হুগলী মোল্লা শিমলার একজন প্রসিদ্ধ আলেম।

৫. এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"এলমে তাসাওউফের ময়দানে কতোখানি তরক্কি করেছলুম না করেছিলুম জানি না। তবে মাওলানা আযাদের বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যে বিরাট তৃষ্ণা জাগলো। উর্দূ মোটামুটি জানা ছিল। তাই উর্দূতে বিভিন্ন বইপুস্তক কিনে পড়াশোনা শুরু করলুম। ঘনো ঘনো পীর সায়েবের দরবারেও যাই। তিনি সবকের ওপরে সবক দেন। এ সময়ে 'কোরআনের আলো' নামে একখানা পুস্তক লিখি। তখন কোলকাতায় অবাধ যাতায়াত ছিল। মাসিক সওগাতের নাসিরুদ্দিন সায়েবকে দিলুম বইখানা তাঁর প্রেস থেকে ছাপতে। শ্রদ্ধেয় বন্ধু নাসিরুদ্দিন সায়েব আমাকে একটা তত্ত্বকথা শুনিয়ে দিলেন। বল্লেন, 'চাকুরী ছেড়ে শেষটায় সাহিত্যে হাত দিয়েছেন না খেয়ে মরার জন্যে?' এটা ঠিক যে, যার অঢেল পয়সা আছে, তারই বই লেখা সাজে। প্রচারের জোরে বাজার তৈরী হয়। কালে কুৎসিত মেয়ের যেমন ধারা টাকার জোরে বর জোটে, তেমন ধারা আজে-বাজে বইয়ের খদ্দের জোটে। প্রচারের জোরে বইপুস্তকের বাজার তৈরি হয়। তবে তার সিংহভাগটা যায় প্রকাশকের পকেটে। কিন্তু দরিদ্র সাহিত্যসেবীদের ভাগ্যে জোটে আদা কাঁচ কলা। তাই সাহিত্য সাধনা করতে গিয়ে অতীতে যে ক'জন দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে পটল তুলেছেন এবং এখনো তুলছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁদের লেখার শৈলমালা নিয়ে প্রকাশকের দল লাল হয়েছেন। দুতলা, তেতলা বাড়ি করেছেন। আর কলা দেখিয়েছেন লেখককে। তবুও কিন্তু নাসিরুদ্দিন সায়েব নিরাশ করলেন না। বরঞ্চ অত্যন্ত উদারতার সাথে আমার ' কোরআনের আলো' এক হাজার ছাপিয়ে দিলেন। শুধু তাই না, কাগজের দাম ও ছাপা খরচ পর্যন্ত নিলেন না। তার জন্যে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম। কারণ এতে আমার হাতে খড়ি হলো।

মরহুম ফজলুল হক সায়েবের সংগে চাকুরী করাকালীন নাসিরুদ্দীন সায়েবের সংগে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ঔদার্য ও সাহায্য সহানুভূতি তারই বাস্তব নিদর্শন। পরের বছর আরও তিনখানা বই লিখলুম, যার একখানা কোলকাতা এবং বাকি দুখানা বগুড়ায় ছাপা হলো। এভাবে লেখা ও পড়াশোনায় মন দিলুম।"('আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১০৭-১০৯)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্বাস আলী খানের রচনাবলী একটি : সমীক্ষা

আব্বাস আলী খান শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রচুর পড়শোনা করতেন এবং সময়-সুযোগ থাকলেই তাঁর লেখনী দ্বারা তিনি দেশ ও জাতিকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি আজীবন গবেষণাকর্মে রত ছিলেন। এজন্য তিনি ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী[৬] প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৭৯ সাল থেকে আমৃত্যু খান সাহেব একাডেমীর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের ইসলামী চিন্তাবিদ, তাঁর রচনাবলী এর প্রমাণ বহন করে। ইসলামের ওপর অনেক গ্রন্থই তিনি রচনা করেছেন। অনুবাদ করেছেন বহু গ্রন্থ। তিনি ছিলেন একজন বড় ইতিহাসবিদ। তাঁর রচিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' ইতিহাসের ছাত্র শিক্ষকদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর একমাত্র কন্যা খান জেবুন্নেসা চৌধুরীর মতে আব্বাস আলী খান সাহেবের রচিত এবং অনূদিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় ৪০টি। তাঁর তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

আব্বাস আলী খান রচিত গ্রন্থাবলী

১. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২. জামায়াতে ইসলামীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
৪. মাওলানা মওদূদী : একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন
৫. আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী
৬. মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
৭. মৃত্যু যবনিকার ওপারে
৮. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সংক্ষিপ্ত মান
৯. ঈমানের দাবী
১০. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব
১১. একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ : তার থেকে বাঁচার উপায়
১২. ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব
১৩. সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক
১৪. Muslim Ummah
১৫. স্মৃতি সাগরের ঢেউ

---

৬. ১৯৭৯ সালে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাস আলী খান প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমৃত্যু এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। অত্র একাডেমীর একজিকিউটিভ কমিটি হল ঃ

১.	আব্বাস আলী খান	সভাপতি
২.	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	সহ সভাপতি
৩.	জনাব আব্দুস শহীদ নাসীম	পরিচালক
৪.	প্রফেসর এ. কে. এম নাজির আহমাদ	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ কামারুজ্জামান	সদস্য
৬.	জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা	সদস্য
৭.	অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুর রব	সদস্য
৮.	ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বিদেশে পঞ্চাশ দিন
১৭. যুক্তরাজ্যে একুশ দিন
১৮. বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী
১৯. ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবি
২০. দেশের বাইরে কিছুদিন
২১. কুরআনের আলো
২২. সুফী সাহেবের জীবনী
২৩. পাক কালিমা
২৪. তা'লিমে তরিকত
২৫. তরী হলো পার

তাঁর অনূদিত গ্রন্থাবলী

১. পর্দা ও ইসলাম	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. সীরাতে সরওয়ারে আলম (২-৫ খণ্ড)	ঐ
৩. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং (সহ-অনুবাদ)	ঐ
৪. বিকালের আসর	ঐ
৫. আদর্শ মানব	ঐ
৬. ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার	ঐ
৭. জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি	ঐ
৮. ইসলামী অর্থনীতি (সহ-অনুবাদ)	ঐ
৯. ইসরা ও মিরাজের মর্মকথা	ঐ
১০. মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী	ঐ
১১. একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার	ঐ
১২. পর্দার বিধান	ঐ
১৩. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ	মাওলানা সদরুদ্দিন ইসলাহী
১৪. আসান ফিকহ (১-২ খণ্ড)	মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী
১৫. তাসাউফ ও মাওলানা মওদূদী	মাওলানা আবু মনযুর শায়খ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর লেখনী প্রতিভা সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত

বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি আল মাহমুদ

তিনি ছিলেন একজন লেখক এবং অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষক। তা ছাড়া বিভাগ পূর্বকাল থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সাথে ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত ব্যক্তি। সে কারণে তাঁর ইতিহাস জ্ঞান এতোটাই পরিচ্ছন্ন ছিল যে, তিনি অবলীলায় রচনা করতে পেরেছেন "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" নামক এক বৃহদাকার পুস্তক। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রতিভা ও লেখক ক্ষমতার যে পরিচয় আমরা অনুভব করতাম, তা বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ ও সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনেই আর কারো মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনাব আব্বাস আলী খানের "স্মৃতি সাগরের ঢেউ" বইখানি পড়ে এর অন্তর্নিহিত সাহিত্য রসে আপ্লুত হলাম। আমার ধারণা ছিল একজন রাজনৈতিক নেতার আত্মস্মৃতি স্বভাবতই জটিল রাজনৈতিক ঘটনায় ভরপুর থাকবে। কিন্তু পড়তে গিয়ে এক ধরনের উপন্যাসের গুণ আমাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ, বক্তব্য ঋজু ও উপস্থাপনা নির্ভীক। এ বই আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন-বোধে পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল আসাদ

খান সাহেব ছিলেন ব্যস্ত রাজনীতিক। এর মধ্যেও তিনি লেখা পাঠাতেন ছাপার জন্যে। ছদ্মনামে ছাপা হতো। তাঁর লেখা ছিলো সুযোগ মতো নয়, প্রয়োজন অনুসারে। আমি দেখেছি, এমন সব ইস্যু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, যা অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়তো না। আর এমন সব কথা তিনি লিখতেন, যা অন্য কেউ লিখতনা এভাবে। মনে পড়ছে তাঁর সর্বশেষ লেখার কথা। বিষয়টা ছিল শাসক দলের এক জুলুমের ঘটনা। যে জুলুম, যে অনাচার কোনো মানুষের সহনীয় বিষয় ছিলো না। এ বিষয়ের ওপর অনেকেই লেখেছেন, নানাভাবে মন্ত ব্য করেছেন। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, অন্য কারও লেখায় তা আমি পাইনি। তাঁর সে লেখার সর্বশেষ অনুচ্ছেদ ছিলো, "এ সরকার তো এই অপরাধীদের কোনো বিচার করবে না। থানায় এ সবের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যাবে না। কারণ অপরাধীগণ সরকারী দলের লোক ও সরকার সমর্থক। কিন্তু খোদার আদালতে তো মামলা দায়ের হয়ে গেছে। হতভাগা হতভাগিনীদের বুকফাটা হাহাকার, আর্তনাদ বিফলে যাবে না।" খান সাহেব ভালো কথাসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' এবং ভ্রমণ কাহিনী 'বিদেশে পঞ্চাশ দিন' ও 'যুক্তরাজ্যে একুশ দিন' কথা সাহিত্যে তাঁর প্রতিভার প্রমাণ বহন করবে। তিনি গল্প-উপন্যাস লেখেননি বটে, কিন্তু তাঁর স্মৃতিকথা 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' এ উপন্যাসের সবকিছুই আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাহিত্য চর্চায় তিনি সময় দিতে পারলে একজন ভালো উপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হতে পারতেন। দেখতে তিনি ছিলেন খুবই গম্ভীর, কিন্তু কথা ও আলোচনাকালে তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, দিল খোলা। কথায় নির্দোষ রস সৃষ্টি ছিলো তাঁর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যাঁরা তাঁর 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' ও ভ্রমণকাহিনীগুলো পড়েছেন তাঁরা সকলেই এটা উপলব্ধি করেছেন।"

বিশিষ্ট কবি ও গবেষক মোশাররফ হোসেন খান

'আব্বাস আলী খানের সাহিত্য রুচি, অভিজ্ঞান এবং পাঠের যে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলকানি দিয়ে উঠতো, তাঁর সেই আলোকিত আভায় প্রায়শই চমকে উঠতাম। তাঁর পাণ্ডিত্য, ভাষা আর লেখার আধুনিকতম কৌশল ও কারুকাজে আপ্লুত না হয়ে পারিনি।

অসম্ভব পরিশ্রম, ধৈর্য এবং একাগ্রতার সমবায়ে গড়ে ওঠা 'বাংলার মুসলানদের ইতিহাস' তাঁর সাহিত্য জীবনের এক অসামান্য চূড়া স্পর্শী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি কেবল আজকের দিনের জন্য নয়, আগামী শতকের জন্যও সমান দরকারি গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি ইতিহাসের কেবল বহিরাঙ্গকেই ধারণ করেননি-

Dhaka University Institutional Repository

স্পর্শ করেছেন তার অন্তর্গত দেয়ালকেও। এখানেই গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। আর এ কারণেই গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই গৃহীত এবং নন্দিত হয়ে ওঠে ব্যাপকভাবে। তারপরও তো থেমে থাকেননি তিনি। মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী'তে নিয়মিত লিখেছেন, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- 'নওমুসলিমের কথা' 'পৃথিবী'তে তাঁর সর্বশেষ লেখা প্রকাশিক হয়েছে জুন, ১৯৯৯ সংখ্যায়। তখন তাঁর বয়স (১৯১৪-১৯৯৯) পঁচাশি বছর স্পর্শ করেছে। কিন্তু না, বয়সের সেই স্বাক্ষরের এতটুকুও ছায়া পড়েনি তাঁর হাতের লেখায় কিংবা বিষয়গত বিন্যাসে। এতটুকুও বদলায়নি তাঁর প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েনি তাঁর শব্দ কিংবা বাক্যের গঠন। সকল কিছু তেমনি আধুনিক ছিলো। আধুনিক ছিলো তাঁর উপস্থাপনা কৌশলও। পঁচাশি বছর বয়সেও যে আমাদের এই দেশের ক্ষীণ কায়া শরীরের মানুষের ভেতর এমন উজ্জীবিত তরুণ প্রাণ থাকতে পারে, তাঁকে না দেখলে, তাঁর সদ্য লেখার সাথে পরিচিত না হলে বুঝাই যেতো না।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশে পঞ্চাশ দিন

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ 'আব্বাস আলী খান সাহিত্যিক হিসেবেও সমভাবে পরিচিত। তিনি ইসলামের নানান বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা। 'বিদেশে পঞ্চাশ দিন' বইটি খান সাহেবের ভ্রমনবিষয়ক একটি মৌলিক রচনা। বইটির মাঝে ভ্রমণ কাহিনী বিবৃত করার মাধ্যমে তিনি ঘুণেধরা পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থার রূপ বর্ণনা করার পাশাপাশি সাধারণ ও শিক্ষিত বিত্তশালী মানুষের ইসলামের প্রতি যে অদম্য আকর্ষণ, তা বর্ণনা করেছেন। লেখক 'আব্বাস আলী খান আগস্টের ৮ থেকে সেপ্টেম্বরের ২৬ পর্যন্ত মোট পঞ্চাশ দিন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা ও ফ্রান্স সফর করেছেন। সে সফরের বর্ণনাই এসেছে 'বিদেশে পঞ্চাশ দিন' গ্রন্থে। ৯৫ পৃষ্ঠায় রচিত এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন লায়লা নাসরীন চৌধুরী, শৌমী প্রকাশনী, নয়াটোলা, ঢাকা। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন ইব্রাহীম মণ্ডল। মুদ্রণ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস। বিদেশে পঞ্চাশ দিন গ্রন্থটিতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখক আব্বাস আলী খান নিম্নোক্ত শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে তাঁর সফরের ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা করেছেন, **সম্মেলনে দাওয়াত :** কেনেডি বিমান বন্দরে, ম্যারিনা অজিলভা, রোড আইল্যান্ড যাত্রা, সম্মেলনে ভাষণ, রাতে ডিনার; লন্ডন যাত্রা; **আমেরিকায় দ্বিতীয়বার :** ওয়াশিংটন যাত্রা, একটি ঘটনা, সম্বর্ধনা সভা; প্রবাসী প্রকৌশলীদের প্রদত্ত সম্বর্ধনা, **সন্ধ্যার কর্মসূচী :** ন্যাশনাল এয়ার স্পেস মিউজিয়ম, ভয়েস অব আমেরিকা, জেফার্সন মেমোরিয়াল, ইহুদীদের সম্পর্কে আমেরিকার মনিষীগণ, **ক্যানাডায় কয়েকদিনস :** নিয়াগারা ফলস, একজোড়া মানুষ, **আমেরিকায় তৃতীয়বার :** হেনরী ফোর্ড মেমোরিয়াল, **ক্যানাডায় দ্বিতীয়বার :** কইমাছ, ইনসমনিয়া, বিদায় কথাটি, ক্যানাডার কথা, নিউইয়র্কে গণসম্বর্ধনা, ডাঃ রাও-এর চেম্বারে, মুন্নীদের বাসায়, **শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর :** নিইউয়র্কে কাঁঠাল, লন্ডনের যাত্রী, **প্যারিসে দেড় দিন :** আইফেল টাওয়ার, প্যারিসের কেন্দ্রীয় মসজিদে, আলীজাহ মুহাম্মদ : মুহাম্মাদ আলী ক্লে। লেখকের পাশ্চাত্যে ভ্রমণের পঞ্চাশ দিনের প্রায় অর্ধেক সময় কেটেছে আমেরিকায়। তাই বইটিতে আমেরিকার বর্ণনাই তুলনামূলক বেশি এসেছে। লেখকের এই ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থস্থ হওয়ার পূর্বে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অবশেষে পাঠকবর্গের অভিলাষে এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। লেখক ভূমিকার মাঝে এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন- "ইসলামের অগ্রযাত্রা ও বিজয় কামনা করেন এবং বিশেষ করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যারা সংগ্রামরত। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আশা করি তাদেরকে আনন্দ ও ইসলামী প্রেরণা দান করবে। আর তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।"[৭] লেখক আমেরিকা সম্পর্কে ভূমিকার মাঝেই একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অন্য রাষ্ট্রগুলোর বর্ণনা ভেতরের লেখায় বিধৃত হয়েছে। আমেরিকার পরিচয়ে লেখকের লেখায় যা বেরিয়ে এসেছে তা হলো- "আমেরিকা শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়েই উন্নত নয়। বরঞ্চ একটা অত্যন্ত ধনী ও স্বাধীন দেশ। স্বাধীনভাবে সবকিছু করার ও বলার সুযোগ এখানে আছে এবং আছে নির্বিঘ্নে জীবন উপভোগ করার সকল উপায়-উপকরণ। তাই যুব সমাজের মোহ মস্কো পিকিং বেজিং থেকে ওয়াশিংটনের প্রতি ঢের বেশি।"[৮]

লেখকের লেখায় আমেরিকা সম্পর্কে যে তথ্যগুলো এসেছে তা হলো- ছোটো-বড়ো পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের সমন্বেয়ে গঠিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। বৃটেন থেকে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তখন তার তেরটি রাষ্ট্র ছিল। এসব রাষ্ট্র ১৭৮৯ সালে এক নতুন সংবিধানের মাধ্যমে একটি ফেডারেল ইউনিয়নের অধীন হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন আমেরিকায় রাষ্ট্র সংখ্যা পঞ্চাশ। সর্বশেষ দু'টি রাষ্ট্র

---

৭. আব্বাস আলী খান, বিদেশে পঞ্চাশ দিন শৌমি প্রকাশনী, নয়াটোলা, ঢাকা। ২য় সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৯৭। পৃষ্ঠা : ০৬

৮. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা : ০৩

Dhaka University Institutional Repository

আলাসকা ও হাওয়াই ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। স্থলভাগের মধ্যে চাষাবাদ হয় এমন জমির পরিমাণ শতকরা ১৯ ভাগ। বনাঞ্চল ৩২ ভাগ, চারণভূমি ২৭ ভাগ এবং শহরাঞ্চল, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি ও অন্যান্য ২২ ভাগ। দেশটির মোট আয়তন ৯৩৭২৬১৪ বর্গকিলোমিটার।

আমেরিকা নদ-নদী ও হ্রদের দেশ। একমাত্র মিনেশোটা রাষ্ট্রে রয়েছে দশ হাজার হ্রদ। দুনিয়ার তৃতীয় দীর্ঘতম নদী আমেরিকায় মিসিসিপি। তার দৈর্ঘ্য ৫৯৬৭ কিমি। লোকসংখ্যা প্রায় চব্বিশ কোটি। তার মধ্যে নারী শতকরা ৫১.৪ এবং পুরুষ ৪৮.৬। শ্বেতাংগ লোকের সংখ্যা ৭৮.৪ ভাগ এবং কৃষ্ণাংগ ১২.০। খৃস্টান প্রোটেস্ট্যান্ট ৭৮ মিলিয়ন। ক্যাথলিক ৫২ মিলিয়ন, ইহুদী ৪ মিলিয়ন এবং অন্যান্য ৭ মিলিয়ন। তার মধ্যে ৬ মিলিয়ন মুসলমান। বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৯৯.৫। আল্লাহ তায়ালা দেশটিকে অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া ও আলাসকায় প্রচুর স্বর্ণ ও নিভাদায় রৌপ্য পাওয়া যায়। স্বর্ণ থেকে বছরে যে অর্থ উপার্জিত হয় (৭৪ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার) তার চেয়ে ঢের বেশি পাওয়া যায় পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সীসা, লোহা, সিমেন্ট, পাথর প্রভৃতি থেকে। উপরন্তু এ একটি কৃষি প্রধান দেশ। যদিও সম্পদের বৃহত্তর অংশ অর্জিত হয় প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে, কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ জমির উৎপন্ন দ্রব্যাদি ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে এবং ল্যাটিন আমেরিকায় রপ্তানী করা হয়। দুনিয়ার উৎপন্ন সোয়াবিন ও ভুট্টা শস্যের অর্ধেক এবং তুলা, গম, তামাক ও তৈল বীজের শতকরা ১০ থেকে ২৫ ভাগ আমেরিকায় উৎপন্ন হয়।

শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এবং যুদ্ধের জন্য আধুনিক অস্ত্র নির্মাণেও আমেরিকা সর্বাগ্রে রয়েছে।

বস্তুগত দিক দিয়ে আমেরিকা অতি উন্নত, সমৃদ্ধশীল এবং দুনিয়ার ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী একটি দেশ। কিন্তু বিশ্ব মানবতার কল্যাণে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে মজলুম মানবতার হাহাকার দূরীকরণে অন্যায় অবিচারের স্থলে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা বলতে গেলে শূন্যের কোটায়। উপরন্তু তাকে অন্যায় অবিচারের প্রশ্রয়দাতা হিসেবেও অভিযুক্ত করা হয়। পক্ষপাতিত্ব, নিষ্ঠুরতা এবং দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রমাণ হিসেবে লেখক উল্লেখ করেন যে, "হিরোসিমা নাগাসাকিতে আনবিক বোমা বর্ষণের চেয়ে অধিক নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে? আমেরিকা তাও করেছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিকলাংগ হয়েছে এবং কয়েক লক্ষ মানুষ বহুদিন ধরে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। তারপর ইসরাইলকে তুষ্ট করার জন্যে ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা যে ভূমিকা পালন করছে, যার পরিণামে অগণিত ফিলিস্তিনীকে তাদের পৈত্রিক আবাস ভূমি থেকে বিতাড়িত করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনে নারী-শিশু নির্বিশেষে মুসলমানদের ওপর যে অমানুষিক নিষ্পেষণ চালানো হচ্ছে তার দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি আমেরিকার।[৯] ইহুদী সম্প্রদায় ৪ মিলিয়ন হলেও তাদের খবরদারি পুরো আমেরিকা জুড়ে। মার্কিনীদের ইহুদীপ্রীতি তুলে লেখক বলেন, "ইহুদী অথবা ইসরাইলের সামান্যতম স্বার্থে কোন আঁচ লাগে এমন কিছু করতে আমেরিকা রাজী নয়। খৃস্ট জগতের এ কথা অজানা নেই যে, ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সকল অইহুদী পশু, বর্বর ও নিধনযোগ্য। আধুনিক যুদ্ধে নিষ্ঠুরতম আচরণের পরিকল্পনা ইহুদীমস্তিষ্ক প্রসূত। আমেরিকা ইহুদীদের অর্থনৈতিক গোলামীর শৃংখল

---

[৯] আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা :৫

Dhaka University Institutional Repository

হয়তো একদিন ছিন্ন করতে পারবে, যখন ইহুদীদের মুখোশ খুলে যাবে। তখন হয়তো তাদেরকে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হতে হবে- যেমন তারা হয়েছিল জার্মানী থেকে।"[১০]

লেখক আমেরিকায় নৈতিক স্খলনের একটি বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন "আমেরিকা একটি ধনাঢ্য ও উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বেকারত্ব সেখানে প্রকট এবং গৃহহীনদের সংখ্যা বেড়ে চলছে। তবে আমেরিকাবাসীর সবচেয়ে বড় সংকট তাদের নৈতিক অবক্ষয়। সমকামিতাসহ চরম যৌন অনাচার, মাদকাসক্তি এবং এইডসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি জাতিসত্তাকে ঘুণের মতো খেয়ে ফেলছে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ত আন্তর্জাতিক মাদক প্রভুদের (International Drug Lords) বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং তার জন্যে ৭.৯ মিলিয়ন ডলার অর্থ বরাদ্ধ করেছেন। যৌন অনাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। বরঞ্চ সমকামিতাকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে, যা এইডস ব্যধির প্রধান কারণ।"[১১]

সম্মেলনে দাওয়াত

"জুন মাসের দশ তারিখ। রাত সাড়ে দশটা। ঘুমোবার আয়োজন করছি। এমন সময় ড্রইংরুমে টিলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল। রিসিভার উঠাতেই ওপার থেকে সুস্পষ্ট গলার আওয়াজ ভেসে এলো- আসসালামু আলাইকুম, আবুল কাসেম বলছি; ওয়াশিংটন থেকে। চিনতে পেরেছন ত?

বল্লাম- আলবৎ চিনেছি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডক্টর আবুল কাসেম ত?

জি হ্যাঁ।

বলুন, কি খেদমত।

আমাদের সম্মেলনে আপনাকে দাওয়াত করা হয়েছে। আসতে হবে কিন্তু।

কবে? আমার কিন্তু লন্ডনেও দাওয়াত আছে। ক্লাস করবে না ত?"[১২]

এভাবেই পরিপূর্ণ সাহিত্যের ঢঙে লেখক শুরু করেছেন তার ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থ বিদেশে পঞ্চাশ দিন। Islamic Circle of North America'র বার্ষিক সম্মেলনে দাওয়াত পেয়ে জনাব আব্বাস আলী খান আমেরিকায় Multiple Visa (বার বার যাতায়াতের ভিসা) এবং ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের দাওয়াতে অংশগ্রহণের জন্য বৃটেনের দু'বারের ভিসা নিয়ে ক্যানাডায় ভিসার আশ্বাস নিয়ে ৭ ই আগস্ট রাত বারোটায় বাংলাদেশ বিমানে লন্ডন হয়ে নিউইয়র্কের পথে রওনা হলেন। আমেরিকায় ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার হিসেবে লন্ডনের টাইম সকাল সাড়ে সাতটায় বিমান হিথ্রো বিমানবন্দরে বিমান ল্যান্ড করে। সে সময়টুকুতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনেকেই মরহুম খান সাহেব ও তাঁর সাথের সহযাত্রী দৈনিক সংগ্রামের তৎকালীণ নির্বাহী সম্পাদক জনাব কামারুজ্জামানের সাথে অনেইে সাক্ষাতে আসল। সাক্ষাৎ শেষে TWA এর বিমানে উঠে সাড়ে সাত ঘণ্টায় আটলান্টিক পার হয়ে নিউইয়র্ক টাইম বিকেল সাড়ে তিনটায় খান সাহেব আমেরিকা পৌছালেন। সেখানে সর্ববৃহৎ কেনেডি বিমান বন্দরে বসে তিনি পাশ্চাত্যের ভোগবাদি জীবনের একটি বর্ণনা দেন এভাবে-"আমরা যখন সর্ববৃহৎ কেনেডি বিমান বন্দরে। প্রতি মিনিটে একাধিক বিমান ওঠানামা করছে।

---

১০. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা : ৫
১১. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা : ৫
১২. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা : ৯

Dhaka University Institutional Repository

অ্যারাইভাল ডিপার্টার লাউঞ্জে ও করিডোরগুলো মানুষে গিজ গিজ করছে। কেউ নামছে, কেউ উঠছে। অধিকাংশ যাত্রী মহিলা-তরুণী ও যুবতী বেশীর ভাগ।

একটি মাত্র চিহ্ন ছাড়া তাদের মহিলা মনে করা কঠিন। মাথার চুল পরুষের মতো ছোটো করে ছাঁটা। পরনে প্যান্ট অথবা হাফ প্যান্ট। গায়ে শার্ট অথবা নামমাত্র কাপড়ের আবরণ। কালো মেয়েগুলোত আরো বেশি ন্যাংটা। এরা নারীত্বকে বর্জন করতে গিয়ে নারী-পুরুষের কঠিন বোঝা ঘাড়ে নিয়েছে। ঘরের বাইরে পুরুষের মতোই কঠিন পরিশ্রম করে জীবনমান উন্নয়নের প্রতিযোগিতায়। যদিও পারিশ্রমিক তাদের পুরুষের চেয়ে কম। বড়ো বড়ো দোকানের প্রায় সকল কর্মচারী মহিলা সব বয়সের। এতে করে মালিকের ব্যয়ভার কমে। কালো মেয়েদের পারিশ্রমিক আরও কম। এতো হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরও তাদের গর্ভধারণের বিরাট ঝুঁকিও নিতে হয়। বিয়ের আগেই তারা সন্তানের মা হয়। অতি নগণ্যসংখ্যক ব্যতিক্রম থাকতেও পারে, আছেও হয়তো।

যৌন চর্চা তাদের স্কুলজীবন থেকেই শুরু হয়। মেয়েদের একাধিক বয়ফ্রেন্ড থাকে এবং ছেলেদের একাধিক গার্লসফ্রেন্ড থাকে। মুখ্য উদ্দেশ্য যৌন চর্চা। পাশ্চাত্যের সমাজে তা দূষণীয় নয় মোটেও।"[১৩]

আমেরিকার কিংস্টোনে ৩ দিনব্যাপী ICNA-এর সম্মেলনের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল- 'Linking Islam with America'- আমেরিকার সাথে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপন অর্থাৎ আমেরিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার। এ বিষয়ে আলোচনায় আব্বাস আলী খানের বিষয় ছিল নবী মুহাম্মাদ সা. কিভাবে বিশ্ব জয় করার পর অন্যরা (পরবর্তীকালে) কি করলেন? আলোচনায় খান সাহেব যা বলেছেন সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বললাম বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও উত্থান সুদীর্ঘ ৫৬২ বছর বাংলাদেশে মুসলিম শাসন-এ অঞ্চলটির ক্রমশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হওয়া, এ দেশের মুসলিমদের মধ্যে হরহামেশা ইসলামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। হাজার হাজার মুসলমানের সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর তাহরিকে মোজাহেদীনে যোগদান করে ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা প্রভৃতি বিষয় এ কথারই প্রমাণ যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনশক্তি ইসলামী শাসন ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি। আমার বক্তব্যে আরও বললাম, দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্যে মুসলিম যুবসমাজের উচিত ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র সমৃদ্ধ হয়ে প্রজ্ঞা, মেধা, সহনশীলতা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করা। অতঃপর আমি বাংলাদেশের মুসলমানদের সংগ্রাম-ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলি,আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এ দেশের জনগণের আছে। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠার তীব্র আস্থা তাদের রয়েছে। জনগণ এ জন্য তাদের আপোসহীন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।"[১৪] তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে আলোচনা রাখেন সাইফুর রহমান হালিমী ও আহমদ আল কাদী, ইন্তিফাহাদাহ বক্তা মুহাম্মাদ আকরাম আব্দুল হারিস, সুদানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসান তোরাবী, খুররম মুরাদ, ভারতের ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকি, জার্মানির আহমদ তন ডেনভার, যুক্তরাষ্ট্রের মালিক মুজাহিদ, মামুন এজাজী, হুসেন পাশা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

---

১৩. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ১২

১৪. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ১৮

Dhaka University Institutional Repository

লন্ডন যাত্রা

১৮, ১৯, ২০ আগস্ট ইসলামিক ফোরামের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য 'আব্বাস আলী খান রওনা দেন লন্ডনে। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইস্ট লন্ডনে-১৮৫ হোয়াইট চ্যাপেল রোডে। ১৯ তারিখের প্রশিক্ষণমূলক অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল 'দুনিয়া আখেরাতের কর্মক্ষেত্র'।

এ বিষয়ের আলোচনা রাখতে গিয়ে খান সাহেব বলেন, "মৃত্যুর পরে অনিবার্যরূপে যে চিরন্তন জীবন রয়েছে তার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে এ দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবন। এখানে যে বীজ বপন করা হবে, মৃত্যুর পরের জীবনে সে বীজেরই ফসল ভোগ করতে হবে। তাই এ জীবনের কর্মের ওপরই পরকালীন জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।

যে সব জিনিসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে একজনকে মুসলিম বা মুসলমান বলা যেতে পারে তার মধ্যে একটি আখেরাত যা মৃত্যুর পরের জীবন। এ জীবনকে সুখী ও সুন্দর করতে হলে দুনিয়ার জীবনে হর-হামেশা আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলতে হবে। পরকালীন জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে যারা সুখী ও সুন্দর করতে চায় দুনিয়ার জীবনে তাদের চরিত্র ও আচরণ এক ধরনের হবে। যারা তা বিশ্বাস করে না তাদের চরিত্র হবে অন্য ধরনের।"[১৫]

আমেরিকায় দ্বিতীয়বার

২৬ আগস্ট আব্বাস আলী খান পুনঃ আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দেন। সেখানে পৌছে ইন্টারন্যাশনাল মলে তাবীর রেস্তোঁরায় বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে খান সাহেব বলেন- "পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত পথ পরিহার করে শান্তি ও নিরাপত্তার সমাজ গঠন কিছুতেই সম্ভব নয়। গোটা মানব জাতি আজ শান্তি ও নিরাপত্তার অন্বেষায় অধীর। আল্লাহর আইন নবীর পথ নির্দেশনা এবং সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই মানবজাতির মুক্তি সম্ভব। তাহলেই সমাজে পূর্ণ শান্তি ফিরে আসবে। তারপর মুসলিম জাতির এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের সমস্যা ও সংকট উত্তরণে ইসলামী আন্দোলনের আবশ্যকতা বর্ণনা করে বলি যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রাম করছে। ইসলামী আদর্শ ও কর্মসূচি এবং সৎকর্মী বাহিনীর অভাবে ক্ষমতাসীন সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।"[১৬]

এরপর খান সাহেবকে ২৮ শে আগস্ট সংবর্ধনা প্রদান করে আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্সের কর্মকর্তাগণ। এরপর সন্ধ্যায় মসজিদে মুহাম্মদিতে সেমিনারে আলোচনা রাখেন। সেমিনারে বিষয়বস্তু ছিল, 'ইসলাম ও সমাজ বিপ্লব'। এরপর লেখক আমেরিকা এবং বৃটেনে ইহুদীদের অপপ্রভাব বর্ণনা করেন। এবং আমেরিকা এবং বৃটেনের জনগণ এবং সরকারকে ইহুদী আগ্রাসন বুঝে উঠার আহ্বান জানান। ইহুদী সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষীদের নেতিবাচক মন্তব্যও তুলে ধরেছেন।

---

১৫. আব্বাস আলী খান প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ২৩
১৬. আব্বাস আলী খান প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ৩১

Dhaka University Institutional Repository

ক্যানাডায় কয়েক দিন

মাসের শেষ দিন তথা ৩১ শে আগস্ট 'আব্বাস আলী খান ক্যানাডায় টরন্টো বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। ICNA এর ক্যানাডা জোনের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে খান সাহেব আলোচনা রাখেন। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল, 'জিহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা'। খান সাহেব এ ব্যাপারে রাসূল-সাহাবীদের এবং পূর্বপর নবীগণের উপমা তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে শাসকদেরকে জিহাদের পথের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তিনি দাঁড় করান।

বেলা ৩ টায় মহিলাদের সমাবেশে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা রাখেন এবং তাদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন। দ্বিতীয় দিনে রাতের অধিবেশনে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ওপর খান সাহেব আলোকপাত করেন। ৩ দিনব্যাপী সম্মেলন শেষ হলে খান সাহেব প্রকৃতির রহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। পৌঁছে যান নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে। সেখানে তিনি বিশ্ব স্রষ্টার অপার সৃষ্টি সৌন্দর্য অবলোকন করেন। সেখানের সৌন্দর্য বর্ণনার পরে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। এভাবে "একজোড়া মানুষ কোথা থেকে এলেন। স্বামী-স্ত্রী অবশ্যই হবেন। সাথে ৩/৪ বছরের একটি শিশুও। মহিলাটি তার স্বামী ও সন্তানকে রেখে সম্ভবতঃ ওয়াশরুমে গেলেন। ভদ্রলোক আমার পাশে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন। আমার পরনে প্যান্ট-শার্ট। শার্টের বুক পকেটে আরবিতে 'আল্লাহ' লেখা সোনালি রঙের একটা চাকতি সেফটিফিন দিয়ে লাগানো আছে। ভদ্রলোকের দৃষ্টি তার ওপরেই নিবদ্ধ হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল যেন কিছু বলবেন। কিন্তু বলতে পারছেন না।

এমন সময় আমার সাথীরা সব এসে গেলেন। আমি অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? বল্লেন, আপনার বুকে আঁটানো 'আল্লাহ' নেমপ্লেট দেখছি।

বল্লাম, আপনি মুসলমান?

বল্লেন, জি হ্যাঁ।

তখন আমাদের সকলেরই একটা স্বর্গীয় আনন্দে বুক ভরে গেল। মনে হলো প্রাণভরে কোলাকুলি করি। তবে আমাদের সাথী কোরবান আলী চৌধুরী ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। ভদ্রলোকের বাড়ি দক্ষিণ কোরিয়া। ক্যানাডায় চাকরী করেন। নাম মুহাম্মাদ ইউনুস।

ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ভাষা, বর্ণ ও পার্থিব জাতিগত পার্থক্য দূরে নিক্ষেপ করে আমাদেরকে একে অপরের হৃদয়ের কাছে টেনে আনলো।"[১৭]

আমেরিকায় তৃতীয়বার

আব্বাস আলী খান ক্যানাডা থেকে পুনরায় ফিরে আসেন আমেরিকায়। সেখানে ৪ঠা সেপ্টেম্বর একাধিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রথমে বেলা দশটায় কুরবান সানী চৌধুরীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশীদের এক সমাবেশে তিনি আলোচনা রাখেন এবং মুসলমানদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য দেন।

পরে ইসলামিক সোসাইটি ফর নর্থ আমেরিকা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডিয়ারবন মসজিদে বাদ যোহর তিন শতাধিক মুসল্লীর সামনে একামতে দ্বীনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা রাখেন। সন্ধ্যায় মায়ায বিন জাবাল

---

১৭. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

নামক মসজিদে মাগরিব নামায শেষে এক জনাকীর্ণ সমাবেশে ইসলামী আন্দোলনের ওপর দীর্ঘভাষণ প্রদান করেন জনাব খান সাহেব। খান সাহেবের ইংরেজি বক্তৃতা জনৈক আরব ইঞ্জিনিয়ার আবু নাসের আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। ৫ সেপ্টেম্বর আমেরিকান মুসলিম বেকাসেন্টারে সেমিনারে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ওপর আলোচনা রাখেন খান সাহেব। এ সম্পর্কে তিনি বলেন- " মানবজাতির প্রতি স্রষ্টার সবচেয়ে বড়ো দান ইসলাম। এই ইসলাম আমাদের পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।"[১৮]

তার আলোচনায় আমেরিকায় মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের ও ভ্রাতৃত্ববোধের আবশ্যকতা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে লেখক দ্বিতীয়বার ক্যানাডায় পৌছেন। ক্যানাডায় পুনঃ নানান সেমিনারে আলোচনা রাখেন। ক্যানাডার পরিচয় তুলে ধরে লেখক বলেন, "ক্যানাডাবাসীর পারিবারিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে ভিন্নতর নয়। এখানে ফরাসীদের সংখ্যা শতকরা ২৬.৭ ইংরেজদের ২৫.৪ এবং আদিবাসীদের ১.৭। রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা ২৬.৫। প্রোটেসটেন্ট ৪১.২ ইহুদী ১.২ অখৃস্টান, অইহুদী ১.৩।"[১৯] লেখক পুনঃ আমেরিকার বিভিন্ন আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে আলোচনা রাখেন। এরপর প্যারিসে দেড়দিন অবস্থানের উদ্দেশে বাইশে সেপ্টেম্বর প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দেন। প্যারিসে সফিউল্লাহ নামে জনৈক বাংলাদেশী প্রবাসীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। লন্ডনে রওনার পূর্বে রাত ৯ টায় ইসলামী ফোরাম ইউরোপের উদ্যোগে বাংলাদেশী নাগরিকদের এক সমাবেশে জনাব খান সাহেব ও তার সফরসঙ্গী জনাব কামারুজ্জামান আলোচনা পেশ করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বেলা ৩ টায় জনাব খান সাহেব লন্ডন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌছেন এবং বিকেল ৫টায় লন্ডনে অবস্থিত রাবেতায়ে আলমে ইসলামী মক্কা'র অভিটোরিয়ামে দাওয়াতুল ইসলামের উদ্যোগে এক সেমিনারে ভাষণ দান করেন। সেখানে তিনি বৃটেনে অবস্থানরত মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা রাখেন। অবশেষে ছাব্বিশ তারিখে বিকেলের ফ্লাইটে বাংলাদেশ বিমানে চড়ে পঞ্চাশ দিনের কর্মব্যস্ত আনন্দানুভূতির সফর শেষে ঢাকায় ফিরে আসেন।

মৃত্যু যবনিকার ওপারে

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তিনি নশ্বর এ পৃথিবীকে অবিনশ্বর আখেরাতের প্রথম ধাপ হিসেবেই মনে করতেন। তিনি বাস্তব জীবনে যেমন আল্লাহ রাসূল ও পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন লেখনীর মাধ্যমেও তেমনি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সপক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। মৃত্যু যবনিকার ওপারে তাঁর তেমনি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থে লেখক আব্বাস আলী খান পরকালের অনিবার্যতা কুরআন-হাদিসের আলোকে চিত্রিত করেছেন।

মানুষ মরণশীল। জন্ম-মৃত্যু মানবজীবনের একই মুদ্রার এপীঠ আর ওপীঠ। মানুষের পক্ষে মৃত্যুকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। মৃত্যুর হাতছানিতে সাড়া দিতে মানুষ সব সময়ই, সর্বকালেই প্রস্তুত ছিল, আছে এবং থাকবে। মানব জীবনের চূড়ান্ত সমাপ্তি মৃত্যু হলেও সর্বশেষ নয়। আখেরাতে বিচার ফয়সালার মাধ্যমে এপৃথিবীর সকল কর্মের প্রতিদান আল্লাহপাক তাঁর বান্দার জন্য নির্ধারিত করবেন। আখেরাতের সত্যতা, অনিবার্যতা লেখক "মৃত্যু যবনিকার ওপারে" বইয়ের মাঝে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৪৩ পৃষ্ঠায় রচিত এ বইটির প্রকাশনায় রয়েছেন এ. বি. এম. এ খালেক মজুমদার এবং এ বইটি আধুনিক প্রকাশনী ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে ২০০৫ সালে নবম বারের মত প্রকাশিত হয়েছে। বইটি লেখক ২৫টি শিরোনাম এবং একাধিক শিরোনামের উপশিরোনামের মাঝে সাজিয়েছেন। শিরোনামগুলো হলো : মানব

---

১৮. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ৫২

১৯. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন, পরকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, প্রকৃত জ্ঞানের উৎস, যুগে যুগে নবীর আগমন, **পরকাল সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ :** পরকালের বিরোধিতা, পরকালের বিরোধিতা কেন, একমাত্র খোদাভীতি অপরাধ প্রবণতা দমন করে, পরকালে বিশ্বাস ও চরিত্র গঠন, পরকাল সম্পর্কে কুরআনের যুক্তি, পরকালের ঐতিহাসিক যুক্তি, পরকালের ঐতিহাসিক যুক্তি, দুনিয়া মানুষের পরীক্ষা ক্ষেত্র, আলমে বরযখ, কবরের বর্ণনা, **মহাপ্রলয় বা ধ্বংস :** জাহান্নামবাসীর প্রধান প্রধান অপরাধ, শয়তান ও মানুষের মধ্যে কলহ, **জানানাতবাসীর সাফল্যের কারণ :** অগ্রবর্তী দল, দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দল, বাম পার্শ্বস্থিত দল, জাহান্নামবাসীদের দুর্দশা, জান্নাতবাসীদের পরম সৌভাগ্য, **পরকাল জয় পরাজয়ের দিন :** বিরাট প্রবঞ্চনা, পাপীদের পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, পরকাল লাভ-লোকসানের দিন, পরকালের পাঁচটি প্রশ্ন, আত্মা, **পরকালে শাফায়াত :** শাফায়াতের ইসলামী ধারণা, মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার কোন কিছু শুনতে পায় কিনা, একটা ভ্রান্ত ধারণা, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের পার্থিব সুফল, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, শেষ কথা। বইটিতে আব্বাস আলী খান আখেরাত সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং সে আলোকে জীবন পরিচালনার জন্য লেখক এ বইতে মানবমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে লেখকের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য- "যেসব আকীদাহ বিশ্বাসের উপরে ঈমানের প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অন্যতম। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে, আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কিতাব প্রভৃতির প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসই জন্মে না। উপরন্তু প্রবৃত্তির দাসত্ব ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে নেক আমল করতে হলে আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আবার আখেরাতের প্রতি যেমন তেমন একটা বিশ্বাস রাখলেই চলবে না। বরঞ্চ সে বিশ্বাস হতে হবে ইসলাম সম্মত, কুরআন-হাদীস সম্মত। এ বিশ্বাসে থাকে যদি অপূর্ণতা, অথবা তা যদি হয় ভ্রান্ত, তাহলে গোটা ঈমান ও আমলের প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।"[২০] আর এ ঈমান ও আমলের প্রাসাদ গড়ার নিমিত্তেই এ গ্রন্থখানি লেখক লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বইটি লেখক ২৫টি শিরোনাম এবং একাধিক শিরোনামের উপশিরোনামের মাঝে সাজিয়েছেন।

মানবমনের স্বাভাবিক প্রশ্ন

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে মানব মনে সেই আদিকাল থেকে নানান প্রশ্ন দোলা দিচ্ছে। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মানব সম্প্রদায় দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ১- আস্তিক ২- নাস্তিক। আর এ বিশ্বাসের আলোকে দুই বিপরীতমুখী সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

এ পৃথিবীতে মানবের জীবনাচরণ একেকজনের একেক রকম। কেউ খুব শান্তিতে দুনিয়ায় সময় অতিক্রম করে আবার কেউ খুব অশান্তিতে। কেউ খুব সৎ জীবনযাপন করে আবার কেউ খুব অসৎ। কেউ জাতির কাছ থেকে পেল অনাদর। অত্যাচার ও অবিচার আবার কেউ সোহাগ, শান্তি আর ন্যায়বিচার। তাহলে এরূপ বিপরীতমুখী জীবনাচরণ যদি ইহকালীন জীবনের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে মানব জীবনের সার্থকতা থাকে না। তাই জীবনের এ সার্থকতার জন্যই আখেরাতের অনিবার্যতা রয়েছে।

পরকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

মানবজীবনের অর্থবহ সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে ওঠেছে প্রাচীনকাল থেকে। তন্মধ্যে লেখক ৮টি মতবাদ তুলে ধরেছেন।

ক. স্রষ্টা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

---

২০. আব্বাস আলী খান, মৃত্যু যবনিকার ওপারে, আধুনিক প্রকাশনী-২৫, শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা। ৯ম প্রকাশ, আগস্ট'০৫ পৃষ্ঠা : ৮

Dhaka University Institutional Repository

খ. এ জগত অনাদি ও অনন্ত। এর কোন ধ্বংস নেই। শুধু জীবকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু পুনর্জীবন লাভ সম্ভব নয়।

গ. পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী।

ঘ. মৃত্যুর পর মানুষের জন্যে দোযখ বেহেশ্‌ত বা নরক ও স্বর্গ আছে। তবে পাপী নরকে শাস্তি ভোগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে ইহলৌকিক জীবনেও লাঞ্ছিত জীবনযাপন করার জন্যে।

ঙ. এ জগতটা মহাপাপের স্থান। এখানের জীবনটাই এক মহাশাস্তি। আখেরাতে শাস্তি হবে না; শুধুই শান্তি আর শান্তি।

চ. বংশ মর্যাদায় বিশ্বাসী। তাঁদেরকে আল্লাহ বংশগৌরবেই বেহেশতে প্রবিষ্ট করাবেন।

ছ. পরকাল, দোযখ ও বেহেশতে বিশ্বাসী আর একটি দল আছে তাদের বিশ্বাস হলো খোদা তার একমাত্র পুত্রকে (মসীহ) শুলবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তারই বিনিময়ে তিনি সমগ্র মানবজাতির সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তার পুত্রের উপর ঈমান এনে তাঁর কিছু গুণগান করলেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে।

জ. পরকাল/দোযখ ও বেহেশতে বিশ্বাসী বটে, তবে আখেরাতে মুক্তির জন্য দুনিয়ার ক্ষমতাশালী কাউকে খোদার প্রতিনিধি হিসেবে মুক্তিদাতা মনে করে। এ সকল ধারণার বা বিশ্বাসের সার বক্তাকে অসার প্রমাণিত করে লেখক পরবর্তীতে কলম চালনায় প্রয়াস পাবেন।

প্রকৃত জ্ঞানের উৎস

জ্ঞানের উৎস প্রধানত ২টি

১. পঞ্চেন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান) ২. অহী (খোদার পক্ষ থেকে নবীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত অভ্রান্ত নির্ভুল জ্ঞান।)

ইন্দ্রিয় জ্ঞান ভুলের উর্ধ্বে নয়। আর অহীভিত্তিক জ্ঞান সবসময় ভুলের উর্ধ্বে এবং সত্যতার পূর্ণ দাবি রাখে। আর অহীর মাধ্যমেই আখেরাত সম্পর্কীত জ্ঞান মনে করতে হবে। লেখক এপ্রসঙ্গে বলেন,"উপরের আলোচনা দ্বারা জানা গেল, জ্ঞানের প্রথম উৎস পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরকাল সম্পর্কে আমাদেরকে কোনই ধারণা দিতে পারলো না। এখন রইলো দ্বিতীয় সূত্র অহী। দেখা যাক অহী আমাদের কি জ্ঞানদান করে।"[২১]

যুগে যুগে নবীর আগমন

আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে তার প্রতিনিধি হিসেবে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মানব সৃষ্টির আরেকটি উদ্দেশ্য হল, তারা সবসময় আল্লাহ পাকের ইবাদতে নিজেকে উৎসর্গ করবে। অথচ মানুষ আল্লাহর প্রকৃত বিধান ভুলে গিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করে ফেলে। নানা পাপ কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করে তোলে। ঠিক তখনি আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূল প্রেরণ করে মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আদম আ. থেকে হযরত মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল আল্লাহ এ ধরণীতে প্রেরণ করেছেন। তাদের সবাই মানুষকে আখেরাতের ব্যাপারে সঠিক দিকনির্দেশনা ও অভিন্ন মতবাদ দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর তৌহিদবাদ ও আখেরাতের অনিবার্যতা তুলে ধরেছেন। আর এ কথা সত্য যে, নির্ভুল উত্তর একটি হয়ে থাকে। তাই আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

---

২১. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং : ২২

Dhaka University Institutional Repository

লেখক এ প্রসঙ্গে বলেন "পরকাল সম্পর্কীত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আল্লাহর নবীগণ। তাদের জবাব সঠিক এজন্যে যে, তাদের সকলের জবাব হুবহু একই হয়েছেন। আর এর সঠিকতা ও সত্যতার কারণ ছিল এই যে, তাদের জ্ঞান ছিল খোদাপ্রদত্ত"।[২২]

পরকাল সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ

পরকাল বনি আদমের জন্য একটি অনিবার্য অধ্যায়। এ সম্পর্কে নবী প্রদত্ত ধারণা লেখক এভাবে উপস্থাপন করেছেন, "পরকাল সম্পর্কে নবী প্রদত্ত যে ধারণা যাকে বলে ইসলামী ধারণা বা মতবাদ তা হলো সংক্ষেপে এই যে, পৃথিবী, আকাশমণ্ডলী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় সৃষ্টি একদিন অনিবার্যরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংসের সূচনা ও বর্ণনা কুরআনে দেয়া হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। একমাত্র খোদা ব্যতীত আর যত কিছু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর খোদারই নির্দেশে এক নতুন জগত তৈরী হবে। প্রতিটি মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে খোদার দরবারে উপস্থিত হবে। দুনিয়ার জীবনে সে ভালো-মন্দ যা কিছুই করেছে তার হিসাব-নিকাশ সেদিন তাকে দিতে হবে খোদার দরবারে। এটাকে বলা হয় বিচার দিবস। এ দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও বিচারক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।"[২৩]

মানুষ অনিবার্য আখেরাতের বিরোধিতা করে এজন্য যে, তারা এ দুনিয়াকে প্রবৃত্তির আলোকে ভোগ করতে পারবে না। দুনিয়ার জীবনে চরম লাম্পট্য ও যৌন অনাচার তারা নির্ভয়ে করে যেতে পারবে। অথচ খোদাভীতি বা পরকালে হিসেব দেয়ার বিশ্বাস পোষণ করলে দুনিয়ায় যাচ্ছেতাই করার সুযোগ থাকে না। আর দুনিয়ার সকল অন্যায়, অবিচার ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তির মনে খোদাভীতি একান্ত প্রয়োজন। লেখকের ভাষায়-

"অতএব খোদা ও পরকাল ভীতিই মানুষকে পাপাচার থেকে দূরে রাখতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে এর স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে।"[২৪]

পরকালে বিশ্বাস ও চরিত্র গঠন

সকল যুগে এবং সকল কালেই চরিত্রকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চরিত্রবান লোকেরা সর্বকালেই সমাদৃত হয়েছেন। আর চরিত্রবান হওয়ার প্রধান উপায় হল আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়া। অবশ্য নাস্তিকেরাও চরিত্রবান হয়ে থাকে। তবে তাদের চরিত্রের পূর্ণতা থাকে না। তারা আংশিক চরিত্রবান হয়ে থাকে। তাই মানবচরিত্র গড়ার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস প্রধান শর্ত। আখেরাতকে অবিশ্বাস করে যে সত্যিকার চরিত্রবান হওয়া যায় না সে সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হল :

"আসল ব্যাপার এই যে, যারা আমাদের সাথে (আখেরাতে) মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমাদের নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। ঐসব কৃত কাজের বিনিময়ে যা তারা (তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতির দ্বারা) করেছে।"[২৫]

তাই সত্যিকারের চরিত্রবান হওয়ার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস অপরিহার্য। এ অনিবার্যতা তুলে ধরে লেখক বলেন যে, "মানবজাতির ইতিহাসও এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, যখন মানুষ ও কোন জাতি খোদা ও

---

২২. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৪
২৩. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৫
২৪. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৯
২৫. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا الحيوة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن ايتنا غفلون ــ اولئك ماؤهم النار بما كانوا يكسبون সূরা ইউনুস আয়াত নং : ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

আখেরাতকে অস্বীকার করেছে, অথবা ভুলে গিয়েছে, তখনই তারা চারিত্রিক অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে। তাদেরকৃত অনাচার-অবিচার সমাজ জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার আর্তনাদ অবশেষে সে জাতি হয়েছে নাস্তানাবুদ এবং মুছে গেছে দুনিয়া থেকে তাদের নাম ঠিকানা।"[২৬]

তাই বুঝা যাচ্ছে মানব প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখা এবং মানব সমাজের স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পরকাল সম্পর্কে আল-কুরআনের যুক্তি

অবিশ্বাসীরা বলে যে, মৃত্যুর পর মানবদেহের অস্থি, চর্ম, মাংস ও অণু-পরমাণু ক্ষয়প্রাপ্ত হবার বহুকাল পরে তাদেরকে কীভাবে পুনর্জীবিত করা হবে? এর উত্তরে আল্লাহপাক বলেন,"মাটি (মৃতদেহের) যা কিছুই খেয়ে ফেলে, তাসব আমাদের জানা। আর প্রতিটি অণু-পরমাণু কোথায় আছে তা আমাদের গ্রন্থেও সুরক্ষিত আছে।"[২৭] তাই এখানে প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা পুনর্জীবন দিতে সক্ষম এবং অবশ্যই তিনি তা করবেন।

আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনের মাধ্যমে বহু ঘোষণা দিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে শুধু পুনর্জীবিত করবেন না, বরঞ্চ দুনিয়ায় তার যে দেহ ছিল, অবিকল সে দেহই লাভ করবে। এ আল্লাহর জন্য কঠিন কাজ নয় মোটেও। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, "আমি তোমাদেরকে পয়দা করেছি। তবে কেন এর (পরকালের) সত্যতা স্বীকার করছে না।"[২৮]

আল্লাহপাক আরো বলেন, "হে মানবজাতি! কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে- এ বিষয়ে তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ কর তাহলে মনে করে দেখ দেখি, আমি তোমাদেরকে প্রথম মাটি থেকে পয়দা করেছি। অতঃপর একবিন্দু বীর্য থেকে। অতঃপর রক্তপিণ্ড থেকে। অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে, যার কিছু সংখ্যক হয় পূর্ণাঙ্গ, কিছু রয়ে যায় অপূর্ণ। এতে করে তোমাদের সামনে আমার কুদরত প্রকাশ করি এবং আমি মাতৃগর্ভে যাকে ইচ্ছে তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রসবকাল পর্যন্ত রেখে দেই। অতঃপর তোমাদেরকে শৈশব অবস্থায় মাতৃগর্ভ থেকে বহির্জগতে নিয়ে আসি যাতে করে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে এমনও যারা যৌবনের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং এমনও আছে যারা দীর্ঘায়ু লাভ করে বার্ধক্যপ্রাপ্ত হয়। ফল এই হয় যে, কোন বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে আবার তোমরা সে বিষয়ে বেখেয়াল হয়ে যাও। (দ্বিতীয় কথা এই যে,) তোমরা যমীনকে শুষ্ক পড়ে থাকতে দেখ। অতঃপর আমি যখন তার উপরে বারি বর্ষণ করি, তখন তা উর্ধ্ব ও সজীব হয়ে পড়ে এবং নানা প্রকার সুন্দর শস্য উৎপন্ন করে।"[২৯] অতএব প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের পক্ষে দ্বিতীয়বার জীনব দেয়া এবং মানুষকে পুনর্জীবিত করা মোটেও অসম্ভব নয়। আখেরাত ঘটানোও তার পক্ষে খুবই সহজ।

পরকালের ঐতিহাসিক যুক্তি

পরকালের ঐতিহাসিক যুক্তি অতীত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল আসমানী গ্রন্থে এর ঐতিহাসিক যুক্তি বিদ্যমান। প্রতি আসমানী কিতাবে পরকালের অস্তিত্বের ব্যাপারে অভিন্ন বক্তব্য বিদ্যমান।

---

২৬. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং : ৩৪

২৭ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتب حفيظ সূরা কাফ : আয়াত নং : ৪

২৮ نحن خلقنكم فلو لا تصدقون সূরা ওয়াকেয়া আয়াত : ৫৭

২৯. يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقنكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة .....وانبتت من كل زوج بهيج — সূরা হাজ্জ আয়াত নং : ৫

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়া মানুষের পরীক্ষাক্ষেত্র

মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন তার পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন, "তিনিই মৃত্যু ও জীবন দিয়েছেন যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের (কৃতকর্মের) দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম।"[৩০] দুনিয়া যেন মানুষের পরীক্ষাক্ষেত্র তা কুরআনের অন্যত্রও কয়েক স্থানে বলা হয়েছে। তাই পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে দুনিয়াকে সুচারুরূপে পরিচালনা করা ঈমানের অন্যতম প্রধান দাবি।

আলমে বরযখ

আলমে বরযখ শব্দের অর্থ হল : পর্দায় ঢাকা এক অন্ধজগত। অথবা এ বস্তুজগত ও পরকালের মধ্যে এক বিরাট যবনিকার কাজ করছে অদৃশ্য আলমে বরযখ।

আলমে বরযখের সংজ্ঞায় লেখক বলেন, "মৃত্যুর অব্যবহিত পরের কালটাকে যদিও পরকালের মধ্যে গণ্য করা হয়- তথাপি মৃত্যু ও বিচার দিবসের মধ্যবর্তী কালের একটা আলাদা নাম দেয়া হয়েছে যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়- আলমে বরযখ।"[৩১]

এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন, "এবং তাদের পেছনে রয়েছে 'বরযখ' যার মুদ্দতকাল হচ্ছে সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদেরকে পুনর্জীবিত ও পুনরুত্থিত করা হবে।"[৩২]

ইসলামে ৪ প্রকার জগতের ধারণা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে আলমে বরযখ অন্যতম।

কবরের বর্ণনা

মৃত্যুর পরবর্তীকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কবরের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাক ইসলামী যুগে আরবের পৌত্তলিকগণ এবং ইয়াহুদি নাসারা নির্বিশেষে সকলেরই মৃতদেহ কবরস্থ করা হত। কবরের সংজ্ঞায় লেখক বলেন, "প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ কবরস্থ হোক অথবা চিতায় ভস্মিভূত হোক, বন্য জন্তুর উদরস্থ হোক অথবা জলমগ্ন হয়ে জলজন্তুর আহারে পরিণত হোক, তার দেহচ্যুত আত্মাকে যে স্থানটিতে রাখা হবে সেটাই তার কবর।"[৩৩]

মৃত্যুর পরপরই কবরে বা আলমে বরযখে পাপীদের শাস্তি ও নেককার বান্দাহদের সুখ শান্তির কথা আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে-

"যদি তোমরা সে অবস্থা দেখতে যখন ফেরেস্তাগণ কাফেরদের রূহ কবয করেছিল এবং তাদের মুখমণ্ডলে এবং পার্শ্বদেশে আঘাত করেছিল এবং বলেছিল 'নাও' এখন আগুনে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার স্বাদ গ্রহণ কর।"[৩৪]

"ঐসব খোদাভীরুদের রূহ পাক-পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতাগণ কবয করেন তখন তাদেরকে বলেন, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যে নেক আমল করেছেন তার জন্য বেহেশতে প্রবেশ করুন"।[৩৫]

---

৩০. সূরা আলমূলক : আয়াত নং : ২ الذين خلق الموت والحليوة ليبلوكم ايكم احسن عملا

৩১. আব্বাস আলী খান ,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫২

৩২. সূরা মু'মেনুন : আয়াত নং : ১০০ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون

৩৩. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং : ৫৪

৩৪. সূরা ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملئكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق আনফাল; আয়াত : ৫০

৩৫. সূরা আন নহল ; الذين تتوفهم الملئكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون আয়াত : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

মহাপ্রলয় বা ধ্বংস

মহাপ্রলয় শুরু করার জন্য ফেরেশতা হযরত ইসরাফিল আ. খোদার আদেশে প্রতীক্ষায় আছেন। আদেশমাত্রই তিনি তাঁর সিংগায় ফুঁক দেবেন। আর তাতে মহাপ্রলয় বা কেয়ামত সংঘটিত হবে।

হাদীসে এ صور সূর বা শিংগাকে তিন প্রকার বলা হয়েছে। যথা :

১. نفخة الفزاع (নাফখাতুল ফিযা) অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত করার শিংগা ধ্বনি।

২. نفخة الصعق (নাফখাতুয সায়েক) অর্থাৎ মরে পড়ে যাওয়ার বা পড়ে মরে যাওয়ার শিংগা ধ্বনি।

৩. نفخة القيام (নাফখাতুল কিয়াম) অর্থাৎ কবর থেকে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে সকলকে একত্র করার শিংগা ধ্বনি।

শয়তান ও মানুষের মধ্যে কলহ

শয়তান মানুষকে সর্বদা পথভ্রষ্ট করার জন্য নিয়োজিত রয়েছে। অথচ শয়তান আখেরাতে নিজের দোষ স্বীকার করবে না। মানুষও নিজের দোষ পুরোটা শয়তানের ওপর চাপানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু আল্লাহপাক তাদের উভয়কেই পরিণাম ভোগ করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

জান্নাতবাসীদের সাফল্যের কারণ

জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহপাক অবারিত শান্তির স্থান বেহেশত নির্ধারিত করে দেবেন। বেহেশত হবে তাদের জন্য চিরন্তন বাসস্থান। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের খোদাভীতি, ন্যায় পরায়ণতা, আমানতদারীতা, সদাচরণের জন্য আল্লাহপাক তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত করবেন।

আখেরাতের মানবজাতিকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হবে। ১. অগ্রবর্তী দল, ২. দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দল, ৩. বাম পার্শ্বস্থিত দল।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা মানবের কৃতকর্মের আলোকে তাদের প্রতিদানের ব্যবস্থা করবেন।

জাহান্নামবাসীদের দুর্দশা

জাহান্নামের অধিবাসীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। আলকুরআনে নানাস্থানে জাহান্নামবাসীর অবর্ণনীয় শাস্তির বর্ণনা এসেছে। যেমন জাহান্নামবাসী সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন,

"কিয়ামতের দিনে আমরা তাদের মস্তক ও মুখমণ্ডল অধঃমুখী করে হাজির করব। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। জাহান্নামের তীব্রতা যদি হ্রাস পায় আমরা তা বাড়িয়ে দেব। এটা তাদের পরিণামফল। তার কারণ, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহ পস্বীকার করেছিল। তারা বলতো মৃত্যুর পর আমাদের কংকাল মাটিতে মিশে যাবে। তারপর কি করে তা আবার নতুন করে পয়দা হবে?"[৩৮]

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আযযুমার, আলহাজ্ব, আলফাতির, সূরা আননিসা, সূরা আদদুখান, সূরা আহকাফ, সূরা মুহাম্মাদসহ আরো নানান জায়ায় জাহান্নামবাসীদের শাস্তির ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।

---

[৩৮] ونحشرهم يوم القيمة على وجوههم عميا وبكما وصما ــ مأوهم جهنم ــ كلما خبت زدنهم سعيرا ــ ذلك جزائهم بانهم كفروا بايتنا وقالوا ءاذا كنا عظاما ورفاتا ءانا لمبعوثون خلقا جديدا ــ সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত : ৯৭-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

জান্নাতবাসীদের পরম সৌভাগ্য

জান্নাতবাসীরা আল্লাহর দিদার লাভ করবে। অনন্তকাল জান্নাতে অবস্থান করবে। এবং জান্নাতে অবস্থান করবে যার নেয়ামত অফুরন্ত। শান্তির কোন শেষ নেই।

পরকাল : জয়-পরাজয়ের দিন

দুনিয়া হলো মানবের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র। এ পরীক্ষার ফলাফল রয়েছে পরকালে। পরকালে এ পরীক্ষার জয় পরাজয় দৃষ্ট হবে। পরকালে যদি প্রত্যাশিত বা ভাল ফলাফল বান্দাহরা না করতে পারে তাহলে তাদের আফ্সোসের সীমা পরিসীমা থাকবে না।
পক্ষান্তরে জয়ী মুমিন বান্দাদের আনন্দের কোন কমতি থাকবে না।

পরকালের পাঁচটি প্রশ্ন

বিচার দিবসে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে যে প্রধান কয়টি প্রশ্ন করবেন সে সম্পর্কে তিরমিযি শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যে হযরত ইবনে মাসউদ রা.বর্ণনা করেছেন "সেদিন মানব সন্তানকে প্রধানত ৫টি প্রশ্ন করা হবে। তার জবাব না দিয়ে তার এক পা অগ্রসর হওয়ার উপায় থাকবে না। প্রশ্নগুলো হচ্ছে-
ক. তার জীবনের সময়গুলো সে কোন কাজে ব্যয় করেছে।
খ. তার যৌবনকাল সে কোন কাজে লিপ্ত রেখেছে।
গ. সে কিভাবে তার অর্থ উপার্জন করেছে।
ঘ. তার অর্জিত ধনসম্পদ সে কিভাবে কোন পথে ব্যয় করেছে।
ঙ. সে যে সত্য জ্ঞান লাভ করেছিল তার কতটা সে তার জীবনে কার্যকর করেছে।[৩৭]
এ হাদীসটির তাৎপর্য অত্যাধিক। এ ব্যাপারে লেখক বলেন, "উপরোক্ত পাঁচটি প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। মানুষ তার জীবন দুই প্রকারে অতিবাহিত করতে পারে। প্রথমত আল্লাহ, রসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহর আনুগত্যের ভিতর দিয়ে জীবনযাপন করা। দ্বিতীয়ত খোদার আনুগত্যের বিপরীত এক খোদাবিমুখ জীবনযাপন করা।"[৩৮]
আত্মা এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু হলেও এক অনস্বীকার্য সত্তা। আত্মার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যখন আমি পরিপূর্ণরূপে বানিয়ে ফেলব এবং তার ভেতরে আমার রূহের মধ্য থেকে কিছুটা ফুৎকার করে দেব। তখন তোমরা যেন তার সামনে সেজদারত হও।"[৩৯]
আত্মার ব্যাপারে লেখক বলেন, "আত্মা এমন এক বস্তু যা কখনো দৃশ্য না হলেও স্পষ্ট অনুভব কর যায়। এ এমন রহস্যময় শক্তি যা মানবদেহের সংগে সংযোজিত হওয়ার সাথে সাথে সে সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠে।"[৪০]

পরকালে শাফায়াত

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগত ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় সৃষ্টি নিচয়ের স্রষ্টা। তিনি দুনিয়ারও মালিক এবং আখেরাতেরও মালিক। হুকুম শাসনের একচ্ছত্র মালিক যেমন তিনি। তেমনি পরকালে হাশরের মাঠে তাঁর

---

৩৭. لاتزول قدم ابن ادم حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما افنه وعن شبابه فيما ابله ، عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وما عمل فيما علم —
৩৮. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ; ১০২
৩৯. فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين — সূরা আল হিজর; আয়াত : ২৯
৪০. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

বান্দাহদের আমলের হিসাব-নিকাশ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তাই কাউকে ওসিলা করে তার মনঃতুষ্টির জন্য চেষ্টা করে পরকালে তার সুপারিশের উপর বেহেশতের তামান্না করা নিতান্তই কুফুরি ধারণা। তবে আল্লাহ তায়ালার অনুমতি সাপেক্ষে কেউ কেউ শাফায়াত করতে পারবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, قل لله الشفاعة جميعا "বল, শাফায়াতের সমগ্র ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে।"[৪১]

মৃতব্যক্তি দুনিয়ার কোনকিছু শুনতে পায় কি-না

মৃতব্যক্তি দুনিয়ার কোন কিছু শুনতে পায় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,"সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্তও তার জবাব দিতে পারে না। তারা বরঞ্চ এসব লোকের ডাকাডাকির কোন খবরই রাখে না।"[৪২] অতএব মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, নিবেদন করা পরিপূর্ণরূপে শিরক হিসেবে গণ্য হবে।

একটি ভ্রান্ত ধারণা

পরকালে সৎ ও পুণ্যবান লোকই যে জয়যুক্ত হবে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অমুসলমানদের মধ্যে যারা ভালো কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে তারাও বেহেশত পাবে বলে অনেকেই বিশ্বাস করে। কিন্তু আল-কুরআনের ভাষ্যমতে আখেরাতের সফলতার জন্য মু'মিন হওয়া শর্ত। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন, "এবং যে নেক কাজ করবে সে পুরুষ হোক অথবা নারী, তবে যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে এসব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কণামাত্র জুলুম করা হবে না।"[৪৩] আরো যতো জায়গায় আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন সকল স্থানেই ঈমানকে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের পার্থিব সুফল

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের নানান পার্থিব সুফল বিদ্যমান। মানব চরিত্র সৃষ্টিতে এ বিশ্বাস খুবই ক্রিয়াশীল। আল্লাহর ভয় মানবজাতিকে ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য করে। অপরের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট করে তোলে।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য

বাবা মার উচিৎ সন্তানদেরকে উত্তম সন্তান হিসেবে গড়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। কারণ, উত্তম সন্তান হলো পিতা-মাতার জন্য সদকারয়ে জারিয়ার ন্যয়। পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, তাদের অনুগত হওয়া। তাদের খেতমত করার পাশাপাশি সন্তানের আবশ্যক যে, পিতা-মাতার পরকালীন জীবন যাতে সুখের হয় সে চেষ্টা করা। পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলে তাদের রূহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ।

শেষ কথা

মৃত্যুর পর মানুষ যে নতুন জীবন লাভ করে এক নতুন জগতে পদার্পণ করবে তা এক অনিবার্য ও অনস্বীকার্য সত্য। এ শেষ জীবনকে সুখী ও আনন্দমুখর করার জন্যেইতো এ জগত। এ জগতে নেক কাজ করার মাধ্যমে মৃত্যু যবনিকার ওপারে তথা আখেরাতে যেন সফল হওয়া যায় সে চেষ্টা করাই মু'মিন জীবনের একমাত্র দাবি। আখেরাতের জান্নাত-জাহান্নাম অবারিত সত্য। সন্দেহাতীতভাবে তা অবশ্যই মু'মিন ও কাফির বান্দাদের জন্য নির্ধারিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "এ বিচার দিবস একেবারে অতি নিশ্চিত এক মহা সত্য। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রভুর কাছে তার শেষ আশ্রয়স্থল বেছে নিক। একটি ভয়ংকর শাস্তির দিন

---

৪১. সূরা যুমার; আয়াত : ৪৪

৪২ ومن اضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له الى يوم القيمة وهم من دعائهم غفلون সূরা আহকাফ; আয়াত : ৫

৪৩ ومن يعمل من الصلحت من ذكر او انثى وهو مؤمن فالئك يدخلون الجن ولايظلمون نقيرا সূরা আন নিসা; আয়াত : ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

যে তোমাদের সন্নিকট। সে সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি এবং দিচ্ছি। প্রতিটি মানুষ সেদিন তার স্বীয় কর্মফল দেখতেপাবে। এ দিনের অবিশ্বাসী যারা তারা সেদিন অনুতাপ করে বলবে, হায়রে! আমরা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ না করে যদি মাটি হতাম।"[৪৪]

দুনিয়াতে থেকেই আখেরাতের পুঁজি গড়ার জন্য এই বইটি মু'মিন জীবনের জন্য আবশ্যকীয় একটি গ্রন্থ। বইটিতে লেখক কুরআন-হাদীসের আলোকে আখেরাতের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের আখেরাতমুখী জীবন গড়ার তৌফিক দেন এ কামনাই লেখক করেছেন। আর সে কামনাই হোক আমাদের সকলের।

মাওলানা মওদূদী : একটি জীবন, একটি ইতিহাস, একটি আন্দোলন

প্রথিতযশা কলম সৈনিক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক আব্বাস আলী খান সার্থক সাহিত্যরসে, শব্দ ও ভাষাশৈলী প্রয়োগে এবং চিত্রপটের ছবির মত ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত কাহিনী সদৃশ ঘটনার সুস্পষ্ট ও সাবলিল বর্ণনায় সমৃদ্ধ করে উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী রহ. এর জীবন ও জীবনকালের ঘটনাবলি নিয়ে রচনা করেছেন "মাওলানা মওদূদী : একটি জীবন, একটি ইতিহাস, একটি আন্দোলন" নামক গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থখানা ৩৯৯ পৃষ্ঠায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রকাশনা বিভাগের চেয়ারম্যান (তৎকালীন) জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলী কর্তৃক প্রকাশিত ও ১৯৬৭ সনে প্রথম সংস্করণ হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৯, ১৯৮৭ এবং ১৯৯৭ ও ২০০৩ সনে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বারের মত সংস্করণ ও প্রকাশিত হয়। বইটি পঞ্চম সংস্করণ করে প্রকাশ করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রকাশনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসনীম আলম। পঞ্চম সংস্করণে প্রকাশকের কথা লিখতে গিয়ে অধ্যাপক তাসনীম আলম লিখেছেন :

"মাওলানা মওদূদীর জীবনীগ্রন্থ এর চতুর্থ সংস্করণ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। এখন পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বলে আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের অযুত শোকর আদায় করছি। এ সংস্করণটি এমন এক সময় বের হতে যাচ্ছে যখন এর সম্মানিত লেখক মুহতারাম আব্বাস আলী খান এখন আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। এছাড়া পূর্বের সংস্করণগুলোর প্রকাশক অধ্যাপক ইউসুফ আলীও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর সকল নেক আমল কবুল করে জান্নাতবাসী করুন-এই দোয়াই করছি।"[৪৫]

'মাওলানা মওদূদী : একটি জীবন একটি ইতিহাস এটি আন্দোলন' বইটির আলোচনার শিরোনাম ও উপ-শিরোনামসমূহ-

বংশ পরিচয়, মাওলানা মওদূদীর বংশ পরম্পরা, সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী, উকিল আহমদ হাসান মওদূদী, মাওলানা মওদূদীর জন্ম ও শিক্ষালাভ, মওদূদীর বাল্য শিক্ষা, সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্র ও অটুট মনোবল, মওদূদীর কর্মময় জীবনের সূত্রপাত, খিলাফত আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী, হিজরত আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মওদূদী, আল জিহাদু ফিল ইসলাম, মাওলানার স্বাধীন জীবন, মাওলানার সংগ্রামী জীবন, আল্লাহর পথে জিহাদ, এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু, তর্জুমানুল কোরআন, তর্জুমানুল কোরআনের প্রকাশনা, দারুল ইসলামে মাওলানা মওদূদী, দারুল ইসলামে কর্মসাধনা, মাওলানার হিজরত, মাওলানার বিবাহ, পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানার অমর অবদান, মাওলানা মওদূদীর এক জাতীয়তাবাদ, মাওলানা মওদূদী ও মুসলিম লীগ, মাওলানা মওদূদী ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পর,

---

৪৪. ذلك اليوم الحق ــ فمن شاء اتخذ الى ربه مابا ــ انا انذرنكم عذابا قريبا ــ يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكفر يليتنى كنت ترابا সূরা আন নাবা: আয়াত : ৩৯-৪০

৪৫. আব্বাস আলী খান মাওলানা মওদূদী (একটি জীবন, একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন) পঞ্চম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আন্দোলনে পরিবেশ সৃষ্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা, জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন, জামায়াতে ইসলামী, মজলিসে শূরা, জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত, নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন, জামায়াতের লক্ষ্য হুকুমাতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, একটি সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক চৌদ্দই আগস্টে মাওলানা, ভারত বিভাগের পর, মাওলানা মওদূদীর প্রথম কারাবরণ, আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ইসলামবিমুখ শাসকদের ভূমিকা, মাওলানার মুক্তি, আলেমদের ঐক্যবদ্ধ দাবী, সর্বদলীয় কনভেনশন কর্তৃক ডাইরেক্ট একশান, মাওলানা মওদূদীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ফাঁসীকক্ষে মাওলানা মওদূদী, ফাঁসীর আদেশে দেশে, বিদেশে-প্রতিক্রিয়া, মাওলানার মুক্তি, মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর, বহিরাগতদের প্রতি মাওলানার হুঁশিয়ারি, ভাষা সমস্যা, সরকারী চাকুরী সমস্যা, দেশরক্ষা সমস্যা, ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পর, মাওলানা দ্বিতীয়বার পূর্ব পাকিস্তানে, মাওলানার বিদেশ ভ্রমণ, পাকিস্তান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন, পাকিস্তানে সামরিক শাসন, মাওলানা মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয়বার, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানার অবদান, সামরিক শাসনের পর, নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন, লাহোর সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর উদ্বোধনী ভাষণ, জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষিত, জামায়াতের মামলা, মাওলানার মওদূদীর জবাব, আটকের ব্যাপারে আইন-সঙ্গত আপত্তি, আটক করার কারণ সম্পর্কে কতিপয় সাধারণ আলোচনা, বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি, ইসলামী জমিয়তে তালাবা, সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি, লীডারশিপ গায়ের ইসলামী, তর্জুমানুল কুরআনের প্রবন্ধ, তৃতীয় অভিযোগের অতিরিক্ত জবাব, অভিযোগের উত্তরে কাশ্মীরি নেতৃবৃন্দ, মাওলানা ও জামায়াত নেতাদের মুক্তি, বিগত পাকভারত যুদ্ধে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা, মাওলানা মওদূদীর আজাদ কাশ্মীর সফর, পত্রের নকল, যুদ্ধকালে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান, বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের খিদমত, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার বিদেশ গমনের আগে পাক ভারত যুদ্ধের পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত, মাওলানা গ্রেফতার, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার বিদেশ ভ্রমণ, আটষট্টির আগস্ট থেকে ডিসেম্বর, লন্ডনের দিনগুলো, ইউকে ইসলামিক মিশনের সম্মেলনে, গোলটেবিল বৈঠক, মাওলানার ইন্তিকাল, মাওলানার জানাযার অভিজ্ঞতার আলোকে, বাফেলোতে একটি স্মরণীয় সাক্ষাৎকার, মাইয়েত লাহোরে।

বইটির দ্বিতীয় ভাগে মাওলানা মওদূদীর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর পরিশিষ্টে মাওলানার বইসমূহের তালিকা বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থখানার ভূমিকা লেখক আব্বাস আলী খান নিজেই লিখেছেন। প্রকাশকের কোন বক্তব্য এতে পাওয়া যায়নি। তবে চতুর্থবার বইটির সংস্করণ হলেও লেখক কর্তৃক ভূমিকা লেখা হয়েছে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার সময়কালে। ভূমিকা থেকে জানা যায়, মাওলানা মওদূদীর জীবনী ও কর্মসাধনার ওপরে বাংলা ভাষায় রচিত এটিই ছিল প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থখানার প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে মাওলানা মওদূদী জীবিত ছিলেন। তাই লেখক খান সাহেব এটিকে পূর্ণ জীবনী বলা চলে না বলে নিজেই মন্তব্য করেছেন। তবুও বাংলাদেশ হবার পূর্বেই প্রথম সংস্করণের প্রকাশিত সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে পুনঃ প্রকাশের দাবি ও অনুরোধ আসতে থাকায় লেখক দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য তখন মাওলানা মওদূদী দুনিয়া ত্যাগ করে আপন প্রভুর সন্নিধানে চলে যান। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থখানা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আব্বাস আলী খান তাঁর জবানীতে বলেন,

"মাওলানার জীবনী ও কর্মসাধনা সম্পর্কে নতুন করে (দ্বিতীয় সংস্করণ) কলম ধরতে এবার নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা আমাকে বারবার নিরুৎসাহিত করেছে। মুসলিম বিশ্বের সুধীমহলে মাওলানার স্থান এতো উচ্চে, মুসলিম মিল্লাতের জন্যে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে রেখে যাওয়া অবদান তাঁর এতো বিরাট ও বিশাল যে, তার পূর্ণ চিত্র অংকন আমার সাধ্যের অতীত। মুসলিম মিল্লাত ও তার বংশধরদের জন্যে যা কিছু করার এবং বলার তার কোন কিছুই তিনি ফেলে রেখে যাননি। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা, বিশেষ করে তাঁর বিপ্লবী

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' ও 'সীরাতে সারওয়ারে আলম' কয়েক শতাব্দীর জন্যে মুসলিম মিল্লাতের দিকদর্শনের কাজ করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। জীবন সমাজের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের জগত এক বাক্যে তাঁকে ইসলামী জগতের নেতা ও শতাব্দীর সংস্কার ও ইতিহাসস্রষ্টা বলে স্মরণ করছে ও করবে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দাওয়াত, বাণী ও আদর্শ ছিল যেহেতু আন্তর্জাতিক, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে, তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল না কোন ভৌগোলিক দেশভিত্তিক, বরঞ্চ আন্তর্জাতিক এবং সেজন্যে তিনি ছিলেন সকল আঞ্চলিকতা, স্বজনপ্রীতি ও এক দেশদর্শিতার বহু উর্ধ্বে। তাই সারা বিশ্বের মুসলমানের কাছে সাইয়্যেদ একটা অতি প্রিয় নাম, সকলের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার পাত্র। এ গ্রন্থখানি একজন ব্যক্তির শুধু জীবন চরিত্রই নয়, বরঞ্চ একটি জীবন, একটি ইতিহাস ও একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন"।[৪৬]

গ্রন্থখানি রচনায় মাওলানা মওদূদীর চরিত্র ও কর্মের যে বিষয়গুলো লেখককে অনুপ্রাণিত করেছে সে প্রসঙ্গে লেখক খান সাহেব গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেন,

"তিনি (মাওলানা মওদূদী) হর-হামেশা সত্যের প্রচার করেছেন। মিথ্যা, অবিচার, দুর্নীতি ও যুলুম নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর সত্যভাষণ কখনো অপ্রিয় করেছে তাঁর আপনজনকে, অপ্রিয় করেছে তাঁর বন্ধুবান্ধবকে, অপ্রিয় করেছে অনেক বুযুর্গানে কওমকে।

তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দূ, যার আজীবন তিনি সেবা করেছেন। সে ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন, নতুন অলংকারে ভূষিত করেছেন। কিন্তু তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সকল ভাষার প্রতি এবং মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উর্দূ তাঁর মাতৃষাষা হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলা ভাষাকে ভালবাসতেন। বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সপক্ষে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অখণ্ড পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের উপরে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের যে অবিচার ও পক্ষপাতমূলক আচরণ ছিল, তার তিনি তীব্র সমালোচনা করে সমাধান পেশ করেছেন।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বহিরাগত মুসলমানদের আচরণ সম্পর্কে, ভাষা সমস্যা ও দেশরক্ষা সমস্যা সম্পর্কে ন্যায়নীতিভিত্তিক সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে তাঁর দেহের একটি অংশের সাথে তুলনা করেছেন।"[৪৭]

মাওলানা মওদূদী রহ.-এর জীবন, চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে জনাব আব্বাস আলী খান গ্রন্থখানির ভূমিকায় নিজের জবানীতে আরো উল্লেখ করেন,

"তাঁর চরিত্রের আর একটি মধুর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজেকে কখনো ভুলের উর্ধ্বে মনে করতেন না। তাই তিনি সর্বদাই জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে, কাউন্সিল অধিবেশনে (মজলিসে শূরা) নিজেকে সমালোচনার জন্যে পেশ করতেন। যাঁরা তার জন্যে সদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতেন তাঁদেরকে তিনি পূর্ণ সুযোগ দিতেন, যদি তাঁর কোন ভুলত্রুটি তাদের চোখে ধরা পড়ে থাকে, তা দ্বিধাহীনচিত্তে যেন বলে ফেলতে পারেন। এভাবে তিনি বহুদিনের বদ্ধমূল কুসংস্কারকে (খাতায়ে বুযুর্গান গেরেফ্তান খাতাস্ত অর্থাৎ বুযুর্গদের ভুল ধরাও ভুল) ভেঙ্গে চুরমার করেছেন।

তিনি দিবারাত্রি দ্বীনের খেদমতে এমনভাবে নিমগ্ন থাকতেন যে, ঘর-সংসারের সন্তানাদির এবং আপন স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবার কোন ফুরসতই ছিল না তাঁর। মিল্লাত ও বিশ্বমানবতার খেদমতের জন্যে তিনি নিজেকে করে রেখেছিলেন উৎসর্গীকৃত।

---

৪৬. 'আব্বাস আলী খান মাওলানা মওদূদী (একটি জীবন, একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন), ভূমিকা দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা নং-৭-৮

৪৭. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, ভূমিকা দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা নং-৮

Dhaka University Institutional Repository

অতএব এ কথা দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যেতে পারে যে, সাইয়েদ ও মুরশীদ মওদূদীর ব্যক্তিত্ব কোন একটি দেশের মধ্যে সীমিত ছিল না। তিনি ছিলেন না হিন্দুস্তানী অথবা পাকিস্তানী, ছিলেন না আরবি অথবা আজমী। বরঞ্চ তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের, বিশ্বমানবতার।"[৪৮]

গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার শেষে লেখক নিজের বিনয়ী স্বভাব ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে-

"মুসলিম মিল্লাতের শ্রদ্ধেয় মনীষী সাইয়েদ মওদূদীর ব্যক্তিত্বের ওপর কলম ধরতে বারবার যেন নিজের অযোগ্যতাই অনুভব করেছি। তথাপি চারদিকের ক্রমবর্ধমান দাবি ও অনুরোধের সময় ও শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন ছিল তা না থাকায় এ বিষয়ে কলম ধরার হক যে আদায় করতে পারিনি তা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি।"[৪৯]

জনাব খান সাহেব নিজের সিদ্ধহস্ত রচনার পাশাপাশি এ বলে আশা প্রকাশ করেছেন যে, "মাওলানার চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকের ওপরে বিরাট গ্রন্থ রচিত হতে পারে এবং আলবৎ তার প্রয়োজনও রয়েছে। আমার বিশ্বাস যুগের দাবির প্রেক্ষিতে সুধীমহল এ কাজেও অবশ্যি হাত দেবেন এবং দিয়েছেনও অনেকেই।" [৫০]

জনাব আব্বাস আলী খান মাওলানা মওদূদীর জীবনকাল, তাঁর চরিত্র, বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও ইসলামী আন্দোলনে ভূমিকাসহ জীবনের নানান দিক এবং সংশ্লিষ্ট নানান বিষয়াদি খুবই সুন্দরভাবে "মাওলানা মওদূদী একটি জীবন, একটি ইতহাস, একটি আন্দোলন" গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশিত এবং রাসূলে করিম সা. প্রদর্শিত জীবন বিধানের আলোকে; যুগোপযোগী তথা সময়কালের চাহিদা মোতাবেক সে বিধানের প্রয়োগ; সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় মাওলানা মওদূদীর স্বীয় উপস্থাপনায় ও ক্ষুরধার রচনায় যে চেতনা, ভাবনা, নির্দেশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে তা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী রহ.-এর জীবনকাল ও কালের ঘটনা পরম্পরার নানান বিষয়াদি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আব্বাস আলী খান লিখেছেন ঠিকই কিন্তু তার সাথে মাওলানা মওদূদীর প্রথম জীবনে এমন কোন সম্পর্ক ছিল না যা তাঁকে মাওলানার পূর্ণাঙ্গ জীবনকাল রচনায় সাহায্য করতে পারে। মাওলানা মওদূদী রহ. এর নাম, পরিচয় এবং তাঁর সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে খান সাহেব জেনেছেন আরো অনেক সাধারণ মানুষের মত সংবাদ পাঠক হিসেবে। সংবাদের ভাষা এবং খান সাহেবের উপলব্ধির কথা জানা যায় এ গ্রন্থের প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ "ফাঁসীর কুঠরিতে জীবনের জয়গান"-এ। খান সাহেব এ পরিচ্ছেদে লিখেছেন কিভাবে মওদূদী সম্পর্কে তার জানা-বুঝার সূচনা হয়।

ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাওলানা মওদূদী রহ., যে নির্ভীক ঘোষণা দেন তার বর্ণনা দিয়েই লেখক শুরু করেছেন-

"....আপনারা মনে রাখবেন যে, আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি তাদের কাছে কিছুতেই প্রাণভিক্ষা চাইব না। এমনকি আমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন প্রাণভিক্ষা না চায়- না আমার মা, না আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ। কারণ জীবন ও মরণের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে, যমীনে নয়।"[৫১]

"আমি জামায়াতের দৃষ্টিতেও আমার সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করি। আমার এ সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করি। আমার সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত জামায়াত নেতৃবৃন্দকেও আপনাদের জানিয়ে দেয়া কর্তব্য।"[৫২]

---

৪৮. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৯

৪৯. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৯

৫০. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৯

৫১. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা নং ১৯।

৫২. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ঘোষণাসমূহ লেখক আব্বাস আলী খানের হৃদয়ে রেখাপাত করেছিল, যা তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন-

"এছিল সদ্য মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির ধীর, স্থির ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুস্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি। জীবন ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী দৃঢ় প্রত্যয়। অচিরেই ফাঁসীমঞ্চে যার জীবনাবসান সুনিশ্চিত ও অনিবার্য, তা হাসিমুখে বরণ করার কী সুদৃঢ় মনোবল।"[৫৩]

মাওলানা মওদূদীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং ফাঁসীর কুঠরিতে তাঁর নির্ভীক উক্তি আব্বাস আলী খানের মনে যে স্বাভাবিক জাগরণ ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার সাবলিল বর্ণনা খান সাহেব নিজেই দিয়েছেন-

"উনিশ শ' তিপ্পান্ন সালের ৮ই মে লাহোরের সামরিক আদালত মাওলানা মওদূদীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশই নয়, তাঁর নির্ভীক উক্তি ও সত্যের জন্যে জীবনদানের প্রস্তুতিও মানুষের বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে।

মাওলানা মওদূদী অথবা তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামির সাথে তখন পর্যন্ত কোন পরিচয় অথবা যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি আমার। অন্য সংবাদ পাঠকদের মতো মর্মাহত হয়েছি এসংবাদে, কিন্তু মুগ্ধ হয়েছি তাঁর বীর মুজাহিদসুলভ উক্তিতে। মফস্বল শহরের একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজে তখন নিয়োজিত আমি। প্রধান শিক্ষক হিসেবে বহু বই-পুস্তক, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ প্রভৃতি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় বৈ-কি। কিন্তু বিগত কয়েক শতকের ইতিহাসে এমন মর্দে মুজাহিদ, এমন যিন্দাহ শহীদ এবং এমন বিপ্লবী বীর মুজাহিদের নাম পড়েছি বলে মনে পড়ছিল না। তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং ফাঁসীর কুঠরিতে তাঁর নির্ভীক উক্তি আমারও মনে সৃষ্টি করেছিল এক অস্বাভাবিক জাগরণ আলোড়ন। তাঁকে জানবার ও বুঝবার জন্যে মন হয়ে পড়েছিল ব্যাকুল ও সদাচঞ্চল। আর তাঁকে জানবার সুযোগ হয়েছিল বৎসরাধিকাল পরেই।"[৫৪]

লেখক আব্বাস আলী খান মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে জানার ও বুঝার সুযোগ লাভ করলেন। শুধু নিজেই জানা ও বুঝার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না তিনি। এই মহান ব্যক্তিত্ব মাওলানা মওদূদী রাহ. সম্পর্কে খান সাহেব পাঠকদেরকেও এ গ্রন্থখানি পাঠের মাধ্যমে জানার-বুঝার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

"এমন যে মহাপুরুষ-মৃত্যুর হাতছানি যাঁকে ভীত-শংকিত করতে পারেনি, রাষ্ট্রশক্তির রক্তচক্ষু যাঁর সত্য ও সুন্দরের প্রসার স্তব্ধ করতে দিতে পারেনি, মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েও যাঁকে দমিত-বশীভূত করা যায়নি, ইসলামকে যিনি একটি প্রাণবন্ত জীবনাদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন বিশ্বের দরবারে, যাঁর ক্ষুরধার লেখনী অসংখ্য-অগণিত মানব সন্তানকে জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পথে চলতে সাহায্য করেছে, যাঁর বিজ্ঞানসুলভ সংগঠন পদ্ধতি অগণিত পথহারা মানুষের জীবন ও কর্মধারাকে সুশৃংখল ও সুগঠিত করেছে, আসুন তাঁর জীবন ইতিহাস, মানব জাতির প্রতি তাঁর বিশ্বজনীন উদাত্ত আহ্বান, তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস ও গতিধারা আলোচনা করে দেখা যাক।"[৫৫]

এ গ্রন্থখানিতে আব্বাস আলী খান মরহুম মাওলানা মওদূদী রহ.-এর জন্ম, বংশপরিচয় থেকে শুরু করে মাওলানার জীবন ও কর্মের ঐতিহ্যময় দিকগুলো পাঠকের দৃষ্টিপটে ফুটিয়ে তুলেছেন। খান সাহেব গ্রন্থখানিতে ১৬০ (একশত ষাট)টি শিরোনাম এবং ৩ (তিন)টি পরিশিষ্ট সংযোজন এর মাধ্যমে মাওলানার জীবনচিত্রের পুরোপুরি একটি চিত্র অংকনের প্রয়াস পেয়েছেন।

যেহেতু খান সাহেব গ্রন্থখানিকে একটি "জীবনীমূলক" গ্রন্থে রূপ দিতে চেয়েছেন সেহেতু গ্রন্থে বর্ণিত পূর্বাপর সকল বিষয় আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুতে স্থান দেয়া সম্ভব নয়। তাই খান সাহেবের তুলিতে অংকিত মাওলানার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কর্ম এবং অবদানসমূহ উপস্থাপন করা হল-

---

৫৩. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ১৯।

৫৪. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ২০।

৫৫. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ২০।

Dhaka University Institutional Repository

১. আওরংগাবাদ শহরের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদীর ঔরসে হিজরী সন ১৩২১ সালের ৩রা রজব, ইংরেজি ১৯০৩ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. জন্মগ্রহণ করেন। কেন ও কিভাবে নাম রাখা হল, তা লেখক খান সাহেব পাঠকদের জানিয়েছেন এভাবে-

"শিশুর জন্মগ্রহণের ৩ বছর পূর্বে এক অলীয়ে বুযুর্গ তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'দেখ, আল্লাহর ফযলে তোমার একটি পুত্র সন্তান হবে। তার নাম রাখবে আবুল আ'লা মওদূদী। কারণ এই নামে একজন প্রসিদ্ধ কামেল পীর তোমাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে সর্বপ্রথম ভারতে আগমন করেছিলেন'। এই উপদেশ বাণী পিতৃ-হৃদয়ে জাগরূক ছিল। সত্য সত্যই খোদার মহিমায় ৩ বছর পর তাঁর একটি পুত্রসন্তান হলো এবং অপার আনন্দ ও খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয়-মন বিগলিত হলো।"[৫৬]

উপরোক্ত বক্তব্যের সূত্র ধরে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "মওদূদী খান্দানের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম ভারতে পদার্পণ করেন, তাঁর নাম ছিল হযরত শাহ আবুল আ'লা চিশতী রহ.। ইনি হিজরী নবম শতাব্দীর শেষভাগে কর্নাটের উপকণ্ঠে বরাস নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তীতে উক্ত পরিবার দিল্লীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তখন থেকে উক্ত বংশের পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত সকলেই দিল্লীতে বাস করেন। আর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী উক্ত বংশেরই ষষ্ঠ পুরুষ।"[৫৭]

এ প্রসংগে আরো উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদীর খান্দানের সাথে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর রহ. সম্পর্ক রয়েছে এবং এ সম্পর্ক হযরত ইমাম হুসাইন শহীদ রা. পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে।[৫৮]

২. সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্র ও অটুট মনোবলের অধিকারী বালক মওদূদী পিতার চেষ্টায় বিশুদ্ধ উর্দূ ভাষা বলা ও লেখায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। "১৯১৪ সালে তিনি মৌলভী পরীক্ষা (তৎকালে মেট্রিকুলেশনকে মৌলভী, ইন্টারমিডিয়েটকে মৌলভী আলেম এবং ডিগ্রী কলেজকে দারুল উলুম বলা হতো) দেন। ১৯১৬ সালে দারুল উলুমে ভর্তি হন। পরবর্তীতে পিতার মুমূর্ষু অবস্থা দেখে জীবিকা অন্বেষণের তাগিদে দুনিয়ায় আত্মসম্মান নিয়ে বসবাস করতে হলে স্বাবলম্বী হতে হবে এ ভাবনায় এবং সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের জন্যে অল্প বয়সেই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত অসাধারণ লেখনী প্রতিভা কাজে লাগিয়ে সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত হন। ১৯১৮ সালের দিকে স্বীয় বড় ভাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদীর সাথে বিজনৌর থেকে প্রকাশিত "মদীনা" পত্রিকার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।"[৫৯] এভাবে তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ এবং কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। অবশ্য পরবর্তীতে সুনামধন্য উস্তাদদের কাছে বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

৩. 'মদীনা' পত্রিকায় কাজ করাকালে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল ঝড় আরম্ভ হয়। মানসিক ও নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় এবং ইসলামের সংগ্রামী প্রেরণা নিয়ে মাওলানা এ আন্দোলনে শরীক হন। পরবর্তীতে খেলাফত ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও অংশ নেন। খেলাফত আন্দোলনে লেখনীর মাধ্যমে সরাসরি অংশগ্রহণ

---

৫৬. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ২৯

৫৭. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ২২

৫৮. হিজরী তৃতীয় শতাব্দিতে হযরত আলী-ফাতেমীয় বংশের একটি শাখা আফগানিস্তানের হিরাট শহরের সন্নিকট যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, সে স্থানটি পরবর্তীকালে 'চিশত' নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই বংশেরই খ্যাতনামা ওলীয়ে বুযুর্গ হযরত শাহ সুফী আবদাল চিশতী রহ. হযরত ইমাম হাসানের (র.) বংশধর ছিলেন। হযরত আবদাল চিশতী থেকেই প্রচলিত হয় প্রখ্যাত তরীকায়ে চিশতিয়া। ইনি ইন্তেকাল করেন ৩৫৫ হিজরীতে। তাঁর দৌহিত্র এবং স্থলাভিষিক্ত (গদীনশীন) হযরত নাসেরুদ্দীন আবু ইউসুফ চিশতী রহ. হযরত আলী-ফাতেমীয় বংশের দ্বিতীয় শাখা সম্ভূত ছিলেন। তাঁর উর্ধ্বমুখী বংশ পরম্পরা (নসবনামা) হযরত ইমাম আলী নকীর রহ. মাধ্যমে ইমাম হুসাইন শহীদ রা. পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে। হযরত নাসেরুদ্দিন আবু ইউসুফ চিশতীর জেষ্ঠ্য পুত্র হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতী রহ. ভারতীয় চিশতীয় তরীকার পীরগণের আদি পীর ছিলেন। মওদূদী খান্দানের উদ্ভব তাঁরই নামানুসারে হয়েছে।

৫৯. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ৩২, ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এরপর হিজরত আন্দোলনেও তিনি স্বীয় মতামত ব্যক্ত করে তৎকালীন শীর্ষ আলেমসমাজ ও জমিয়ত নেতৃবৃন্দকে অবাক করে দেন। তারা তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত তাত্ত্বিক মতামত শুনে তাঁদের নিজ নিজ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে বালক মওদূদীকে বারবার অনুরোধ জানান। "মওদূদীর অসাধারণ প্রতিভা দেখে ১৯২১ সালের প্রথম দিকে মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আহমদ সাঈদ তাঁকে জমিয়তের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'মুসলিম' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৯২৪ সালে পাক-ভারতের সিংহ পুরুষ মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহর তার 'হামদর্দ' পত্রিকা পরিচালনার জন্য মওদূদীকে আহ্বান জানালে মওদূদীর স্বাধীন মন অন্যের স্বাধীনতা স্বীকারে বাধা দেয়ায় মাওলানা মুহম্মদ আলীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের "আলজমিয়ত" পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।"[৬০]

৪. মাওলানা তাঁর প্রথম প্রকাশনা "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" গ্রন্থের মাধ্যমেই লেখনীর দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। সাথে "তর্জুমানুল কোরআন" পত্রিকার মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম শুরু করেন। পত্রিকার বয়স যখন ৩/৪ বছর তখন তিনি পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা কবি ইকবালের অনুরোধে "দারুল ইসলাম"-এ চলে আসেন, যদিও কিছুকাল পরই কবি ইন্তেকাল করেন। এই দারুল ইসলাম এ মাওলানার অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৬১]

৫. পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানার অমর অবদান রয়েছে। বিশেষ করে দ্বিজাতিতত্ত্ব, ভারতের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দেওবন্দের হাদীস শাস্ত্রের অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর এক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, মুসলিম লীগে যোগদান না করা, সুচিন্তিত তিনটি প্রস্তাব মাওলানার বলিষ্ঠ ও তাত্ত্বিক চিন্তাধারার পরিচয় বহন করে। এদিকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন ও আন্দোলন পরবর্তী পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে তাদের চিন্তাধারার সাথে মাওলানার স্পষ্ট ও যুক্তিনির্ভর মতপার্থক্য ছিল, যা মাওলানার বক্তৃতার অনুবাদ "ইসলামী বিপ্লবের পথ" গ্রন্থে দেখা যায়। মাওলানা নিরলস পরিশ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করে ইসলামী আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। জামায়াতের লক্ষ্য যে হুকুমতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ তা বোঝাতে তিনি সক্ষম হলেন। অবশেষে ভারত বিভাগ হল। পাকিস্তান সৃষ্টি হল। কিন্তু মাওলানা যে সকল বিষয়ে আশংকা করেছিলেন বিভাগের ছয় বছর পূর্বে তাই ঘটতে লাগলো। তাই তিনি তাঁর দাবিসমূহ "আদর্শ প্রস্তাব" নামে পেশ করেন। ফলশ্রুতিতে তাঁকে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারাবরণ করতে হয় এবং ১৯৪৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে ১৯৫০ সালের ২৮ মে পর্যন্ত কারাবরণ করে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু "কাদিয়ানী সমস্যা" পুস্তিকা প্রকাশ করায় এর মাধ্যমে জনসাধারণের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে মাওলানা মওদূদীকে সামরিক আদালত কর্তৃক ফাঁসীর আদেশ দেয়া হয়। যদিও এ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নিন্দা করা হয়েছিল তা না দেখার ভান করেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সেনানী মাওলানাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারণের জন্যেই মূলত এ আদেশ দেয়া হয়। দেখা গেল, ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র সফল তো হলোই না বরং মৃত্যুদণ্ডাদেশ থেকে পিছু হটতে হয়েছিল। তবুও রায় দেয়া হল ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পাকিস্তানসহ সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে বিনা শর্তে মাওলানার মুক্তির দাবি ওঠলে সরকার অবশেষে ১৪ বছরের কারাদণ্ড হ্রাস করে সাড়ে ৩ বছর করতে বাধ্য হয়। অতঃপর পাকিস্তানের এক আইন বিভ্রাটের ফলে

---

৬০. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং : ৪১

৬১ .খুৎবাত (ঈমান, ইসলাম, নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত প্রভৃতির মর্মকথা), ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, কোরআন কি চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহে, তাজদীদ ওয়া ইহইয়ায়ে দ্বীন, ইসলামী বিপ্লবের পথ প্রভৃতি অন্যতম। মাওলানার মর্মস্পর্শী ও বিপ্লবী কোরআনের তফসীর তাফহীমুল কোরআনের সূচনা এখান থেকেই হয়। উপরন্তু ইসলামী মননশীলতা ও জাতীয় অনুভূতির অনুপম গ্রন্থ "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ ৩য় খণ্ড ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ২ বছর ৯ মাস পরেই মুক্তিলাভ করেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদীর ফাঁসীর কক্ষে অবস্থাকালীন ধীর প্রশান্ত মূর্তি ও স্বাভাবিক আচরণের এবং এ আদেশের ফলে দেশ-বিদেশে প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখযোগ্য।

৬. ফাঁসীর মঞ্চ ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মাওলানার মুক্তির পর পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের অনুরোধে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে নানান মত ও পথের কারণে এক দুর্যোগময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। মাওলানা এ পরিস্থিতিতে করণীয় ও সমাধান প্রসঙ্গে নিজের জোরালো মতামত ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে ভাষা সমস্যা, সরকারি চাকুরী সমস্যা, দেশরক্ষা সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে মতামত পেশের পাশাপাশি নিজের ভূমিকাও তুলে ধরেন।

৭.'আব্বাস আলী খান তাঁর রচনায় এরপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন শিরোনামে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা ও কর্মসূচিতে দেশ, জাতি ও ইসলামের সেবার উল্লেখযোগ্য যেসব ভূমিকা, কর্মসূচি ও অবদান রাখেন তা বর্ণনা করেছেন। শিরোনামগুলো হল- ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পর, মাওলানা দ্বিতীয়বার পূর্ব-পাকিস্তানে, মাওলানার বিদেশ ভ্রমণ, পাকিস্তান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন, পাকিস্তানে সামরিক শাসন, মাওলানা মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয়বার, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানার অবদান, সামরিক শাসনের পর।

৮. গ্রন্থখানির ১৬৮ পৃষ্ঠা থেকে ২৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক আব্বাস আলী খান পর্যায়ক্রমে মাওলানা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত ও সংগ্রামে-আন্দোলনে হকপন্থি দল জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন, সরকার কর্তৃক জামাতকে বেআইনি ঘোষণা এবং এর বিপরীতে জামায়াতের মামলা ও সরকারের সকল অন্যায় অভিযোগের বিরুদ্ধে মাওলানার ক্ষুরধার লিখিত জবাব, ফলশ্রুতিতে মাওলানা ও জামায়াত নেতাদের মুক্তি, পাক-ভারত যুদ্ধে মাওলানা ও জামায়াতের ভূমিকা, মাওলানার কাশ্মীর সফর, যুদ্ধকালে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান, মাওলানার চিকিৎসার্থে বিদেশ গমন, লন্ডনে অবস্থানকালে মাওলানার কর্মমুখর দিনসমূহের বিবরণ ও গোলটেবিল বৈঠকের কথা বর্ণনা করেছেন।

৯. দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অংশে আব্বাস আলী খান মাওলানার লেখনী শক্তির প্রেরণা, মাওলানার কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মাওলানার বিপ্লবী সাহিত্য ও এসব সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বিবৃত করেছেন। বিশেষ করে মাওলানার লেখা কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তার মূলনীতি, আল-জিহাদু ফিল ইসলাম, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, ইসলাম পরিচিত, খুতবা, ইসলামী জীবন পদ্ধতি, পর্দা এসব মূল্যবান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি ভারত, সিংহল, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানী, মারিশাস, কোরিয়া, জাপান, সুদানে মাওলানা ও তাঁর সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট অবস্থার কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন।

১০. গ্রন্থখানির দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় অংশে লেখক তাসাউফ ও মাওলানার চিন্তাধারা, আধ্যাত্মিক সংস্কার সংশোধনে মাওলানার মন্তব্য, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্ক পরিমাপের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ এবং মুসলমানদের প্রতি মাওলানার পয়গামের বিবরণ দিয়েছেন। এর সাথে শিক্ষাব্যবস্থা, পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা, খোদাহীন শিক্ষাব্যবস্থা, নীতিবর্জিত শিক্ষা, পূর্বতন শিক্ষাব্যবস্থার সাথে দীনিয়াত সংযোজন, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ, দীন ও দুনিয়ার পার্থক্য বিলুপ্তিকরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে মাওলানার সুচিন্তিত মন্তব্য, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার বিবরণও রয়েছে।

১১. গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় অংশে মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণমূলক বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ও মণিষীদের বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। সন্নিবেশিত বক্তব্যগুলো পাঠকের দৃষ্টিতে মাওলানার জীবন, চরিত্র ও কর্মকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

১২. গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগের চতুর্থ অংশে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মাওলানা পত্রাদির মাধ্যমে তাঁর মনের যেসব কথা ব্যক্ত করেছেন সেসব কথাসম্বলিত পত্রসমূহের বিবরণ সংযোজিত হয়েছে। পত্রাদির

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণের পাশাপাশি এ অংশে মাওলানার মূল্যবান কিছু কথার বর্ণনা ও সংযোজন করেছেন লেখক। এ অংশে সংযোজিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মাওলানার একটি সাক্ষাৎকারের বর্ণনা এবং কিছু ঐতিহাসিক উক্তি।

১৩. গ্রন্থখানির শেষ অংশটি হচ্ছে হৃদয়বিদারক কাহিনী ও শোকগাঁথা সম্বলিত একটি অংশ। এ অংশে বর্ণিত হয়েছে মাওলানা মওদূদী রহ. এর অসুস্থতা, আমেরিকায় অপারেশন এবং ইন্তেকালের সংবাদ। ইন্তেকাল পরবর্তী লেখক খান সাহেবের মাওলানার জানযায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার সুন্দর স্মৃতিচারণ এমনভাবে করেছেন যেন চিত্রের মত পাঠকদৃষ্টিতে ভেসে ওঠে।[৬২] লেখক মাওলানার ইন্তেকাল, ইন্তেকাল পরবর্তী আমেরিকার বাফেলো শহর থেকে মাওলানার দেহ মোবারক পাকিস্তানে নিয়ে আসা পর্যন্ত যে হৃদয়গ্রাহী চিত্র অংকন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করে এবং চক্ষুকে করে সিক্ত।[৬৩]

১৪. গ্রন্থখানির ৩৭৬ পৃষ্ঠা থেকে পরিশিষ্ট-১ শিরোনামে লেখক সংযোজন করেছেন "এক নজরে মাওলানার জীবনের ঘটনাবলি" যা দেখে বা পড়ে যে কেউ মাওলানাকে এক নজরে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবে। এর পাশাপাশি মাওলানার অবদানসমূহও সারমর্ম আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পরিশিষ্ট-২ ও পরিশিষ্ট-৩ শিরোনামে মাওলানার সাথে আল্লামা ইকবালের পত্র আদান-প্রদানের কয়েকটি নমুনা কপি প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী : একটি জীবন, একটি ইতিহাস, একটি আন্দোলন গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক। ইসলামপ্রিয়, সঠিক পথ ও আন্দোলনের অনুসারীদের জন্য গ্রন্থখানি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং করবে। লেখক আব্বাস আলী খান পরিপূর্ণ কিংবা বিশদভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে মাওলানা মওদূদীর জীবন ও কর্মের একটি জীবন্ত চিত্র পাঠক সমীপে উপহার দিয়েছেন।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান

বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ, সাহিত্যিক আব্বাস আলী খানের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান পুস্তিকাটি মূলত ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের রুকন সম্মেলনের উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণের মুদ্রণ রূপ।

পুস্তিকাটি জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম ৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশ করেছেন। পুস্তিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ ইং সালের মার্চ মাসে। পুস্তিকাটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তায় ১১ বছরে ৪র্থ বারের মত প্রকাশ হয়েছে জুলাই-২০০৪।

পুস্তিকাটি আদর্শ প্রচারক কর্মীদের দাওয়াতি যজবা ও কর্মীমান বৃদ্ধি এবং শাহাদাতের তামান্না সৃষ্টির মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রকাশিত হয়েছে। এ কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় প্রকাশকের কথায়-"১৯৯২ সালের রুকন সম্মেলনে প্রদত্ত মুহতারাম আব্বাস আলী খানের উক্ত উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ ও মূল বক্তব্য পুস্তিকাকারে বের করার আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। দাওয়াতি যজবা ও কর্মীমান বৃদ্ধি এবং শাহাদাতের তামান্না সৃষ্টিতে পুস্তিকাটি সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ তায়'ালা আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।"[৬৪]

এ পুস্তিকায় আব্বাস আলী খানের আলোচনায় যে সকল বিষয় প্রকাশিত হয়েছে তা হল : আন্দোলনের পটভূমি, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান, দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজের জন্যে ব্যক্তিগত গুণাবলি (১. মাজাহাদায়ে নফস, ২. হিজরত, ৩. ফানা ফিল ইসলাম হয়ে যাওয়া) গুণাবলি অর্জনের উপায় (নামাযের আকার-আকৃতি, নামাযের দোয়া, সংকল্প গ্রহণ, ব্যাপক জনমত সৃষ্টি, অশ্লীলতা ও সকল

---

৬২. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩৫১।

৬৩. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৬৬।

৬৪. আব্বাস আলী খান, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান- ৪র্থ প্রকাশ, জুলাই ২০০৪, পৃষ্ঠা নং ০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অনাচার-পাপাচার থেকে দূরে থাকাসহ আরো কিছু গুণাবলী)। এছাড়া রুকন সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ ও সমাপনী ভাষণের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে।

৫৬ পৃষ্ঠায় রচিত এ পুস্তিকাটিকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান

২. উদ্বোধনী ভাষণ

৩. সমাপনী ভাষণ

প্রথম অংশের লেখক মূলত: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মানে যেসব বিশেষত্ব বা প্রশংসনীয় ও আবশ্যকীয় গুণাবলী থাকা দরকার সে ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আদর্শ প্রচারের মহানব্রতে যেসব কর্মীরা নিয়োজিত তাদের কাঙ্ক্ষিত মান কি রূপ হওয়া আবশ্যক সে ব্যাপারে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক মূল আলোচনায় পৌঁছার আগে ইসলামী আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে পাঠকদেরকে অবহিত করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে সাহাবায়ে কেরামের পুঙ্খানপুঙ্খ অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। সাহাবাদের অনুসারী হিসেবে এ উপমহাদেশে প্রথম ইসলামী আন্দোলন পরিচালনাকারী সাইয়েদ আহমদ-শহীদ বেরেলভী রহ. এর নমুনা পেশ করেন। সত্যিকার ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষে বেরেলভী রহ. 'তাহারিকে মুজাহেদীন' গঠন করেছিলেন। এবং তিনি তাতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের দুশমন কাফেরদের সাথে কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুসলমানের যোগসাজশের ফলে এ ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারেনি। ১৮৩১ সালে বালাকোটে এক রক্তাক্ত সংঘর্ষে সাইয়েদ সাহেব তার অনেক সঙ্গীদেরসহ শাহাদাত বরণ করেন। সাইয়েদ সাহেবের জিহাদী প্রেরণা ও শাহাদাতের অভিলাষে এবং রেখে যাওয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিলম্বে হলেও জিহাদের এ সুপ্ত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। আলী, আকবর, ইলাহাবাদী, শিবলী, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ ইসলামী মনীষী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনা জাগ্রত রাখেন। হযরত সাইয়েদ আহমদ বালাকোটে জীবন বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে প্রভুর দরবারে পাড়ি জমান। আর ইসলামী আন্দোলনকে আমানত হিসেবে রেখে যান উপমহাদেশের আলেম সমাজের কাছে। তার একশ বছর পর আমানতের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন আলেমে দীন, নওজোয়ান মুজাহিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। যার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল একটি মাসিক পত্রিকা 'তরজমানুল কুরআনের' মাধ্যমে এবং এর মোটামুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে লাহোরে ৭৫ জন মিলিত নেক বান্দাহদের মাধ্যমে গঠিত 'জামায়াতে ইসলামী' নামক একটি বিপ্লবী আদর্শবাদী দল গঠনের মধ্য দিয়ে।

ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান সম্পর্কে জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান হবে মহান আল্লাহপাকের ইপ্সিত এবং পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টজনক। ফলে বান্দার সকল গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন এবং পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত দান করবেন।

পুরস্কার ও জান্নাত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো খোদাভীতি অর্জন করা। লেখক এ প্রসঙ্গে বলেন, "সবশেষে যে কথাটি বলা হয়েছে তা অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, ঈমানসহ নেক আমল এবং তার জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের পুরস্কার- এ সব কিছু নির্ভর করছে খোদাভীতির ওপর।"[৬৫]

দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজের জন্য ব্যক্তিগত গুণাবলির বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন : হাদীসের আলোকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ব্যক্তিগত গুণাবলি যে ধরনের হওয়া প্রয়োজন তা হল :

---

৬৫. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ১২

Dhaka University Institutional Repository

১. মুজাহাদায়ে নফস

ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে প্রাথমিক ও মৌলিক গুণ এই যে, আমাদের প্রত্যেককে নিজের মনের সাথে লড়াই করে প্রথমে তাকে মুসলমান ও খোদার অনুগত বানাতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন,"সত্যিকার মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে সংগ্রাম করছে।"[৬৬]

২. হিজরত (ব্যাপক অর্থে)

জিহাদের পর অর্থাৎ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের পর দ্বিতীয় মর্যাদা হলো হিজরতের। হিজরতের আসল উদ্দেশ্য বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়া বা দেশ ত্যাগ করা নয়। বরঞ্চ খোদার নাফরমানী থেকে পালিয়ে খোদার সন্তুষ্টি লাভের দিকে অগ্রসর হওয়া। নবী করীম সা. কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন হিজরত সবচেয়ে উত্তম? তিনি জবাবে বললেন- "তুমি সেসব কাজ পরিহার করবে- যা আল্লাহ অপছন্দ করেন।"[৬৭]

৩. ফানা ফিল ইসলাম হয়ে যাওয়া

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দেখামাত্রই মনে মনে অংকিত হবে যে কর্মী কোন পথের পথিক। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন যে, "প্রকৃত দাওয়াত ও তাবলীগ হচ্ছে এই যে, আপনি আপনার দাওয়াতের মূর্ত বহিঃপ্রকাশ ও নমুনা বিশেষ। এ নমুনা যেখানেই মানুষের চোখে পড়বে, তারা আপনার কাজের ধরন থেকেই বুঝে নেবে যে, এ একজন খোদার পথিক।"[৬৮]

গুণাবলী অর্জনের উপায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন

কাঙ্ক্ষিত মানে পৌছার জন্য গুণাবলী অর্জনের উপায় বাতলে দিয়েছেন আল্লামা মওদূদী রহ.-এর একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে। যেমন,"জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে খোদার বান্দাহ বলে মনে করা, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন হয়ে থাকা এবং মালিকের হুকুম পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুতি থাকার নামই প্রস্তুত করে। এরূপ ইবাদতের জন্যে মানুষের মধ্যে যতগুলো গুণের দরকার, নামায তার সবই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে।"[৬৯]

নামাযের আকার আকৃতি

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির অন্যতম ও প্রধান অবলম্বন হল নামায। নামাযের জন্য যখন বান্দাহ দাঁড়িয়ে যায়- তখন সে বিনয় নম্রতা ও আনুগত্যের এক মূর্ত ছবি হয়ে দাঁড়ায়। নামাযের দুটি রূপ রয়েছে। একটি জাহিরী, অন্যটি বাতিনী। এ নামায নামাযীর বাতিনীরই বহিঃপ্রকাশ। এ নামাযে নামাযীর মনের বিনয় নম্রতাও প্রকাশ পায়। এতে খোদার সামনে বান্দাহর কোমরই শুধু ঝুঁকে পড়ে না, তার দিলও ঝুঁকে পড়ে।

তৎপরে নামাযের দোয়ায় লেখক নামায একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। এবং প্রথমে আল্লাহর নেক ও প্রিয় বান্দাহ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণের আবশ্যকতা তুলে ধরেন। লেখক কর্মীদেরকে গঠনমূলক কাজের সাথে সাথে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির লক্ষে ব্যাপক দাওয়াতী কাজ সর্বশক্তি দিয়ে করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া নামায শুধু মহৎ গুণাবলী অর্জনেই সাহায্য করে না, বরঞ্চ সকল অশ্লীলতা, পাপাচার-অনাচার থেকে নামাযীকে দূরে রাখে। সেই সাথে মানুষের সকল মানসিক ব্যাধিও নিরাময় করে। যেমন গর্ব, অহংকার, ঔদ্ধত্য, পারস্পরিক মনোমালিন্য, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত, পরচর্চা, পরনিন্দা, পদমর্যাদায় লোভ-লালসা প্রভৃতি।

---

[৬৬]. المجاهد من جاهد نفسه فى طاعت الله

[৬৭] ما الهجرة افضل يا رسول الله ان تهجر ماكره ربك

[৬৮]. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ১৪

[৬৯]. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ১৬

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তিকাটির প্রথম অংশের পরিসমাপ্তিতে এসে লেখক ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী তুলে ধরেছেন। প্রথমত প্রশাসনিক যোগ্যতা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক যোগ্যতা। দ্বিতীয়ত মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরও দুটি ভাষায় তথা আরবি ও ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

আব্বাস আলী খানের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান পুস্তিকার দ্বিতীয় অংশে এসে সকল বাধা বিপত্তি ও বন্ধুর এবং কণ্টাকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে ইসলামী আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশনা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। এ অংশ মূলত খান সাহেবের একটি বক্তৃতার মূদ্রণরূপ। বক্তব্যটি পুরোটাই হৃদয়গ্রাহী শিক্ষনীয় এবং আবেদন সৃষ্টিকারী। বক্তব্যের প্রথমেই তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করেন এজন্য যে তিনি ৩ দিনব্যাপী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের রুকন সম্মেলন করার তৌফিক দিয়েছেন।

তৎপর তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারাগারে রেখে এ সম্মেলন চলছে তাই তিনি বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কারা প্রাচীরের অন্তরালে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের পটভূমি তুলে ধরে বলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এ দেশে সকল ইসলামী তৎপরতা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইসলামের গতিপথ রুদ্ধ করার শক্তি কারো ছিল না কোন দিন। খোদার রাহে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ সংগ্রাম করতে চাইলে তারই মেহেরবানীতে সেপথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এরপর লেখক জামায়াতে ইসলামীর সামনে অগ্রসর হওয়া এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য সকল সরকারের বৈরী আচরণকে তুলে ধরেন। সরকারের কোপানলে পড়েই অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সম্মেলনের পক্ষ হতে প্রিয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তি দাবী করেন। তৎপরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং বিপদ-সংকুল ও ভয়ানক সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

তিনি বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন যে, "আল্লাহর কিতাব, রাসূলের আদর্শ ও খিলাফতে রাশিদার অনুকরণে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করাই জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য" তাই তিনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মানে পৌছার জন্য নানাবিধ গুণাবলী অর্জনের জন্য তাগিদ প্রদান করেন।

৩ দিনব্যাপী রুকন সম্মেলনের সমাপনী দিনে জনাব আব্বাস আলী খান সম্মেলন সুন্দর, সুষ্ঠু, যথাযোগ্য মর্যাদাসহ শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে শেষ করার তৌফিক দেয়াতে আল্লাহর দরবারে লাখো লাখো শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মানে পৌছার জন্য আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য জিহাদের ময়দানে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য আহবান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "এই যা কিছু বললাম- আল্লাহর যিকির, তাকওয়া, আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা তাঁর জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়া। রূহের এ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এই হলো হাকীকী রূহানিয়াত। আর এ সবের জযবাই হলো রূহানী সওগাত। আশা করি আমরা সকলেই নারী ও পুরুষ যেন এ রূহানী সওগাত নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারি।"[৭০]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের এই সবুজ-শ্যামল চত্বরে ইসলামের পতাকাকে বুলন্দ করার জন্য একঝাঁক মেধাবী, যোগ্য নাগরিক তৈরির প্রয়াসে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা প্রয়োজন। আর সে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আব্বাস আলী খান সাহেবের এই প্রকাশনা। 'ইসলামী আন্দোলনের

---

[৭০]. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান'- বইটিতে লেখক মুসলিম বিশ্বের কিছু বাস্তব উদাহরণ পেশ এবং বক্তব্যের সপক্ষে আরো বেশি কুরআন-হাদিসের দলিল উপস্থাপন করলে বইটি আবেদনময়ী ও সার্থক হতো।

বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী রহ.

যুগ ও ইতিহাসের স্রষ্টা উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা মওদূদী রহ. ছিলেন বিখ্যাত আলেমদের শ্রদ্ধার পাত্র, অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। অন্যদিকে স্থান-কাল ভেদে তিনি উপমহাদেশ ও বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী ও মনীষী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের কাছেও ছিলেন সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

মাওলানা মওদূদীর রহ. জীবন ও কর্ম নিয়ে এ সকল আলেমে দ্বীন, জ্ঞানী-গুণী-মনীষী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতামত এবং অনুভূতিতে তা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বিশ্বের সেসব মনীষীদের বক্তব্য, হৃদয়ানুভূতির কথা সংকলন করে লেখক আব্বাস আলী খান সম্পাদনা করেছেন "বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী রহ" গ্রন্থখানি।

এ গ্রন্থখানি ৩৫০ পৃষ্ঠায় বই-কিতাব প্রকাশনী ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ সনের আগস্ট মাসে।

গ্রন্থখানির প্রকাশকালে শুরুতেই তা সম্পর্কে আব্বাস আলী খান বলেন- মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ছিলেন যুগ ও ইতিহাসস্রষ্টা এক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের পাতায় এমন বিরাট মনীষীর উল্লেখ কমই পাওয়া যায়। সাধারণত সবার 'রঙে রঙ মিশিয়ে' অথবা 'গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে' কিছুলোক তা সাময়িকভাবে চমক সৃষ্টি করতে পারেন এবং করেছেনও। কিন্তু বিশ্বের দরবারে কেন, আপন সমাজেও তাঁদের কোন স্থায়ী ও কল্যাণকর প্রভাব তাঁরা রেখে যেতে পারেননি। মাওলানা মওদূদী অতি প্রতিকূল পরিবেশে এক বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন এবং বিপ্লবের সাফল্য লাভও করেছেন। তাঁর আপনজন সংগীসাথী ও সমাজপতিগণ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে অনেক বাধার পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছে। বিশ্বব্যাপী জাহেলী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের প্রচণ্ড বাঁধ ভেঙে তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছেন। অসংখ্য অগণিত মানুষের মনে দুনিয়া বদলে দিয়েছেন। তাঁদের বাস্তব জীবন, আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকর্ম এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করে দিয়েছেন। একেই বলে মানসিক ও নৈতিক বিপব। জাহেলিয়াতের ঘন আঁধার, খোদাদ্রোহিতা ও খোদা বিমুখতা থেকে অসংখ্য মানুষকে ইসলামের স্বচ্ছ ও নির্মল আলোকে টেনে এনেছেন এবং তাদের গোটা জীবনকে এক ও লা'শরীক আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দিয়েছেন। তাঁর এ বিপ্লব তাঁর আপন দেশেই সীমিত থাকেনি, তার প্রভাব সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে।

এ কাজ সহজেই হয়নি। এর জন্যে সারাজীবন তাঁকে অশেষ জুলুম, অবিচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, বহুবার নির্জন কারাবাস, এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হাসিমুখে মেনে নিতে হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বৈরচারী শাসক গোষ্ঠীর কাছে তিনি ক্ষণিকের জন্যেও নতি স্বীকার করেননি। সত্যের প্রতি তাঁর এ অবিচলতা এবং তাঁর অতুলনীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনেকেরই মন জয় করেছে। তাঁর চরিত্রের মধ্যে ইমাম আযম (রহ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ), ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম তাইমিয়ার (র.) চরিত্রের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ইসলামী পণ্ডিত ও মনীষী তাঁকে এ যুগের ইমাম তাইমিয়া বলেও আখ্যায়িত করেছেন। তিনি একই সাথে বহু ফ্রন্টে কৃতিত্বের সাথে লড়াই করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক-বাহকের দল, নাস্তিক খোদাদ্রোহীর দল, উদ্ভট, নবুয়্যতের দাবিদার, হাদীস অমান্যকারীর দল, ইসলামকে নিছক কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মে রূপান্তরকারীর দল, জাহেলিয়াতের চিন্তাধারার আবর্জনায় ইসলামকে আচ্ছন্নকারীর দল এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ছাঁচে ইসলামকে ঢেলে সাজাবার দল- এসবের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড মসিযুদ্ধ চালিয়ে তাদেরকে পরাভূত করেছেন। তাই বিশ্বের সর্বত্র আজ ইসলামের নবজাগরণ দেখা যাচ্ছে। এ তাঁর নির্মল ও বলিষ্ঠ-চিন্তাধারারই ফসল।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বে মাওলানার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে, তিনি ইসলামকে একটি বিপবী চেতনা-বিশ্বাস ও একটি জীবন্ত জীবনবিধান হিসেবে এবং আদিকালীন পবিত্রতা (PRISTINE PURITY) এবং পরিপূর্ণতাসহ পেশ করেছেন। তাঁর প্রকাশভংগি অত্যন্ত সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী। পাঠকের মনের গভীরে তা সহজেই প্রবেশ করে। তাঁর ভাষায় ভাব-প্রবণতা নেই, সত্যকে উপলব্ধি করার প্রেরণা ও প্রবণতা আছে, বিপ্লবের উত্তাপ আছে যা মনমস্তিষ্ককে উত্তপ্ত করে তোলে নির্জন কক্ষ থেকে সংগ্রামের ময়দানে টেনে আনে।

যে সব মতবাদ ও বিশ্বাস মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করে, মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনে, সেসবের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেসবের ভ্রান্তি ও অন্তসারশূন্যতার অকাট্য যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। মানব সমাজে অকল্যাণ, বিশৃংখলা ও শক্তিশালী মসিচালনা করে তা খণ্ডন করেননি।

যে কোন সমাজ বিপ্লবে হরহামেশা যুবসমাজকেই জীবনের সকল প্রকার ঝুঁকি নিতে দেখা যায়। নবী রাসূলগণের বেলায়ও তা-ই দেখা গেছে। মাওলানার চিন্তাধারা ও সাহিত্যে এমন এক বিরাট আকর্ষণ, আছে যা সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে যুবসমাজকে। নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহিতা ও নৈতিক বল্গাহীনতার প্রবল স্রোতে ভাসমান সংগী-সাথীদের থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ পৃথক পথ বেছে নিয়েছেন জীবনের জন্যে। কোন ভয়ভীতি, প্রলোভন অথবা জীবনকে উপভোগ করার সুবর্ণ সুযোগ তাদেরকে ফেরাতে পারেনি সেসব পথ থেকে, যে পথের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন মাওলানার চিন্তাধারা ও সাহিত্যে তারাই আজ ইসলামী বিপ্লবের অগ্রপথিক।

মাওলানার বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিশ্বের বহু ইসলামী চিন্তাশীল ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে যে সব মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, তা একত্রে সংকলিত করে পাঠক সমাজকে পরিবেশন করাই আমার উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থের প্রবন্ধকারগণ শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে মাওলানার রেখে যাওয়া অমূল্য অবদানের উল্লেখই করেননি, সেই সাথে তাঁর প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অশ্রুকাতর অভিব্যক্তিও করেছেন। দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের দুঃসংবাদ তাঁদেরকে এমন ব্যথিত ও মর্মাহত করেছে যেন তাঁদের প্রিয়তম ব্যক্তি তাঁদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের এ শ্রদ্ধাজড়িত ভাবাবেগ ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এ ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ইসলামী প্রেরণা সৃষ্টি করবে এবং মাওলানার চিন্তাধারা থেকে তারা তাদের জীবনের সঠিক পথ বেছে নিতে পারবে। বিশেষ করে মাওলানার তাফহীমূল কুরআন যুগ যুগ ধরে তাদের রাহনুমায়ী করতে থাকবে।

মাওলানা তাঁর সারাজীবন কুরআন পাক এবং নবী মুস্তাফার সা. চরিতকে অনুসরণ করেই চলবার চেষ্টা করেছেন এবং এ দিকেই সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলিম জাতির সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান এ পথেই হতে পারে এ কথা তিনি আগাগোড়াই বলে এসেছেন। মানব সমাজে ইসলামের সঠিক ও বাস্তব রূপায়নই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

দেশ ও বিদেশে বহু জ্ঞানীগুণী ও মনীষী মাওলানার গুণমুগ্ধ হয়ে যেসব মন্তব্য করেছেন এবং বিশেষ করে তাঁর ইন্তোলের পর যাঁরা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ও ভাবাবেগ ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সেসব কথার ভাষান্তর সংকলন ও সম্পাদনার ফসলই এ গ্রন্থখানা। দ্বিতীয় খণ্ডও ইনশাআলাহ প্রকাশিত হবে।

এ গ্রন্থে বিশ্বের যেসকল মনীষীদের বক্তব্য, মতামত প্রকাশিত হয়েছে সেসকল ব্যক্তি হলেন-

১. সালাহুদ্দীন
২. আলতাফ হাসান কুরায়শী
৩. নবাবজাদা নসরুলাহ খান
৪. হুসাইন খান
৫. এ, কে ব্রোহী

Dhaka University Institutional Repository

৬. আলতাফ গওহর
৭. বিচারপতি মুহাম্মদ আফযাল চীমা
৮. অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ
৯. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্ধলভী
১০. উস্তাযুল ওলামা হযরত মুহাম্মদ চেরাগ
১১. মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ
১২. মালিক গোলাম আলী
১৩. আবাদ শাহপুরী
১৪. হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস
১৫. ফরিদ আহমদ
১৬. ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শী
১৭. মাওলানা গোলযার আহমদ মোযাহেরী
১৮. আখবারে যাহান
১৯. সাইয়েদ মুজতাবা হুসাইন
২০. আবদুল করীম আবেদ
২১. সালীম আহমদ
২২. অধ্যাপক ওয়ারেস মীর
২৩. মতিন ফিকরী
২৪. মকবুল জাহাঙ্গীর
২৫. সাইয়েদ আবদুল ওয়াদুদ শাহ
২৬. রফীক গোরী
২৭. মিয়া আবদুল মজিদ
২৮. মুশতাক আহমদ ভাট্টি এম, এ
২৯. মাওলানা মঈনুদ্দীন
৩০. জনৈক প্রবন্ধকার, জাসারাত
৩১. আবদুর রশীদ আরশাদ
৩২. মাওলানা 'আসেম নোমানী (সাক্ষাৎকার)
৩৩. অধ্যাপক আবদুল গণী ফারুক
৩৪. ডাঃ জাবিদ ইকবাল
৩৫. নঈম সিদ্দীকী

গ্রন্থখানি পাঠে মাওলানা মওদূদীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঈমানের দাবী

আব্বাস আলী খান একজন প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং একজন সফল সুলেখক ও অনুবাদক। তাঁর রচিত 'ঈমানের দাবী' বইটিতে তিনি ঈমানের অর্থ ও মর্ম, ঈমানের দাবী, ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা, জীবন ও ধনসম্পদ আল্লাহর নিকট সমর্পণ ঈমানের পরিচয়, বিক্রয় চুক্তিই চূড়ান্ত নয়, আল্লাহর পথে ব্যয়ের তাৎপর্য, রসুল আগমনের উদ্দেশ্য, বাতিলের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা ঈমানের দাবী, অর্থ সম্পদের লিপ্সা না থাকাই ঈমানের দাবী, দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রার্থিব কল্যাণ, ঈমান প্রসঙ্গে হাদীসে রসূল, গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়, বাঁচবার উপায় কি? ইত্যাদি বিষয় সমূহ খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

লোকমান হোসাইন কর্তৃক বিশ্ব তথ্যকেন্দ্র, ঢাকা থেকে ২০০৫ সালের মে মাসে ৬৮ পৃষ্ঠায় রচিত 'ঈমানের দাবী' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক বইটির প্রকাশনা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি সুলেখক আব্বাস আলী খান রচিত 'ঈমানের দাবী' গ্রন্থটি প্রকাশ করার তাওফিক দিয়েছেন। তাঁর লেখালেখি, পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে ভালভাবে পরিচিত হই ১৯৯৪ সালে। তখন প্রতি মাসে একবার সাংগঠনিক কাজে তাঁর বাসায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তখন তিনি 'মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান' শিরোনামে ছাত্রসংবাদে ধারাবাহিক লিখেতেন। কথা প্রসঙ্গে সাহস করে একদিন বললাম স্যার, একটি প্রকাশনা সংস্থা করেছি আপনার লেখা একটি বই দিন। তিনি বললেন পরে দেখা করিও। কথা মতো কিছুদিন পর আবার দেখা করলাম। তখন তিনি 'ঈমানের দাবী' বইটি দেবেন বলে জানালেন। সে সাথে বললেন এ বইটি এক সময় প্রকাশিত হয়েছিল, এর সংস্করণ করে তোমাকে দিব। সে মতে তিনি সংস্কারে হাতও দিয়েছিলেন কিন্তু শত ব্যস্ততার কারণে সংস্করণ সম্পন্ন করতে পারেননি। ফলে সামান্য কিছু সংস্করণ সম্পন্ন করেই বইটি আমাকে দিয়ে দিলেন। বললেন, আল্লাহ তাওফিক দিলে পরে বইটির কলেবর বৃদ্ধি করা যাবে। এবার বই প্রকাশের পালা। কম্পোজ, প্রুফ ও প্রচ্ছদসহ আনুসাঙ্গিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ফেললাম। কিন্তু হঠাৎ আমি দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় বইটি আর প্রকাশ করা হলো না। ইতিমধ্যে আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি এমনি মুহূর্তে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খান সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হয়ে বিলম্বের কারণ জানালাম এবং পাণ্ডুলিপি ফেরত দিতে চাইলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কিছুদিন সময় দিলে বইটি প্রকাশ করতে পারবে? না পারলে এটি আধুনিক প্রকাশনী বা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীকে দিয়ে দিবো। বললাম, হ্যাঁ কয়েক মাস সময় দিলে প্রকাশ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তখন তিনি বললেন তোমাকে যখন বইটি দিয়েছি ফেরত নিবো না। তুমি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করো। কারণ আমার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, বই প্রকাশ হয়েছে তা দেখে যেতে চাই। কিন্তু না আমার দুর্ভাগ্য বইটি যথাসময়ে এবারও প্রকাশ করতে পারলাম না। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ৩ অক্টোবর আব্বাস আলী খান এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ত্যাগ করে মহান আল্লাহর ডাকে পাড়ি জমালেন মহাজীবনের পথে। যাহোক ব্যক্তিগত নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে বইটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ঈমানের পরিচয়, ঈমানের দাবী, মুমিনের গুণাবলী, ঈমান ও কুফরের পার্থক্য, ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা, মুমিনদের জন্য সুসংবাদসহ ঈমানের প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সাবলীলভাবে এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন তিনি। নিঃসন্দেহে এটি ঈমানবিষয়ক একটি মৌলিক গ্রন্থ।"[৭১]

---

[৭১]. আব্বাস আলী খান ঈমানের দাবী- বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র ঢাকা, মে ২০০৫ : প্রকাশকের কথা

Dhaka University Institutional Repository

'ঈমানের দাবী' গ্রন্থে লেখক ঈমানের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "ঈমান অর্থ কোন কিছুকে নির্ভুল ও সত্য মনে করে তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। পরিভাষা হিসেবে ঈমান শব্দটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনে হক ইসলামকে সত্য ও চিরন্তন বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। তার সাথে বিশ্বাস করা আখিরাত, রেসালাত, আল্লাহর সকল ফেরেশতা ও তাঁর নাযিল করা সকল আসমানী কিতাব।

আল্লাহকে বিশ্বাস করা বা আল্লাহর ওপরে ঈমান আনার অর্থ তাঁকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীসহ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ তিনিই সমুদয় সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, প্রভু, বিশ্বজাহানের সর্ব শক্তিমান মালিক ও পরিচালক, মানুষের একমাত্র ইলাহ, বাদশা, প্রতিপালক, শাসক ও আইনদাতা। সকল প্রকার ইবাদাত, বন্দেগী, বাস্তব-আনুগত্য একমাত্র তাঁরই জন্যে। তিনি আদি, অনন্ত, এক ও একক। তিনি সর্বজ্ঞ। এমনি অসংখ্য গুণে তিনি গুণান্বিত। এসব গুণেরও তিনি একমাত্র অধিকারী। এসব গুণে তাঁর নেই কোন শরীক, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী।"[৭২] ঈমান আনার পর ঈমান আনয়নকারীর মধ্যে কি পরিবর্তন কাম্য তা উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক বলেন, "ঈমান আনার পর তার মধ্যে দৈহিক কোন পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং বাঞ্চনীয়ও নয়। কিন্তু পরিবর্তন অবশ্যই হতে হবে তার মানসিকতার, মতবাদ ও চিন্তাধারার, তার স্বভাব-প্রকৃতির, চরিত্রের, আচার-আচরণের, রুচি ও মননশীলতার। ঈমান মানুষটির মধ্যে নিয়ে আসে একটি মানসিক বিপ্লব। যার মন-মস্তিষ্ক ছিল জাহেলিয়াত ও অন্ধ কুসংস্কারে, তমসাচ্ছন্ন, ঈমান আনার পর তার মন-মস্তিষ্ক ইসলামের জ্যোতিতে হবে উদ্ভাসিত।"[৭৩]

ঈমানের দাবী গ্রন্থটিতে তিনি ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেন তা হল- ঈমানের অর্থ ও মর্ম, ঈমানের দাবী, ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা, জীবন ও ধন-সম্পদ আল্লাহ নিকট সমর্পন ঈমানের পরিচয়, বিক্রয় চুক্তিই চূড়ান্ত নয়, আল্লাহর পথে ব্যয়ের তাৎপর্য, রাসূল আগমনের উদ্দেশ্য, বাতিলের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা ঈমানের দাবী, অর্থ-সম্পদের লিপ্সা না থাকাই ঈমানের দাবী, দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পার্থিব কল্যাণ, ঈমান প্রসঙ্গে হাদীসে রাসূল, গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়, বাঁচবার উপায় কি?

"ঈমানের দাবী" বইটি মরহুম খান সাহেবের ঈমান সম্পর্কিত এক অনবদ্য রচনা। এ বইটিতে তিনি যেভাবে খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ অত্যন্ত সাবলীলভাবে আলোচনা করেছেন, তা পাঠে নিঃসন্দেহে একজন মানুষ সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার নির্দেশনা পাবেন এবং ঈমানের দাবী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব

'আব্বাস আলী খানের গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এ বইটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ কর্তৃক ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৪ সালের জুলাই মাসে এ বইটি চতুর্থবারের মত প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থখানির প্রকাশক অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ বইয়ের শুরুতে বলেন, মুহতারাম আব্বাস আলী খান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামী সাহিত্য রচনায় ও অনুবাদে তাঁর কলম ছিল ক্লান্তিহীন।

এ বইতে জনাব খান সুনিপুণভাবে অতীত ও বর্তমান কালের ইসলামের সাথে জাহেলিয়াতে যে সংঘাত তার একটি সুন্দর চিত্র পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। তিনি একসাথে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে ব্রত হিসেবে নিয়েছে তাদের জন্যও সুন্দরভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু করণীয় নির্দেশ করেছেন এ বইখানিতে। এক কথায় এই বইটি ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের মূল্যবান পাথেয় হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলা যায়। ১৪০ পৃষ্ঠায় রচিত এই

---

[৭২]. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা : ১১

[৭৩]. 'আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা : ১৬

Dhaka University Institutional Repository

বইয়ে মোট ১০টি অধ্যায়ে বিভিন্ন শিরোনামে ইসলাম ও জাহেলিয়াত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখকের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। এই বইয়ে লেখক দশটি অধ্যায়ে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন তা হল- ইসলাম ও জাহেলিয়াত, আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত, বিশ্বনবীর আগমন, জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় অবিচল থাকার উপায়, ইসলামের একাত্ততা, একমুখীনতা, মুসলমানদের ঐক্য, জাহেলিয়াতের পুনরুত্থান, জাহেলিয়াতের মারাত্মক অস্ত্র, জাহেলিয়াতের নতুন রণকৌশল এবং উপসংহার।

ইসলামকে নির্মূল করা, বিকৃত করা অথবা তার ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করাই জাহেলিয়াতের লক্ষ্য। এ জন্যে অতীত ইতিহাসের এর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, মানব জাতির সূচনা থেকেই সকল যুগে ইসলামের ওপর জাহেলিয়াতের আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলাম ও জাহেলিয়াত এর সংঘাত-সংঘর্ষ লেগেই ছিল যুগ থেকে যুগান্তরে এবং কোন সময়ে ইসলামী বিজয়ী হয়েছে আবার কোন সময়ে জাহেলিয়াত বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু ইসলাম পরাজিত, নিশ্চিহ্ন বা নির্মূল হবার বস্তু নয়।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের বিজয় কিংবা পরাজয় নির্ভর করে মুসলমানদের ওপর। মুসলমান যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিভাগে পরিপূর্ণরূপে ইসলামি বিধান মেনে চলে; তার মন-মস্তিষ্কে চিন্তাধারা রুচি ও মননশীলতায়, চরিত্র ও আচরণে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামি আদর্শের প্রতিফলন ঘটায়, সর্বস্তরে মানুষ যখন ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে তখন ইসলামের বিজয় অবধারিত।

পক্ষান্তরে মুসলমান যখন ইসলামি আদর্শ ও বিধান ভুলে যায় অথবা পরিহার করে অথবা যখন কোন দেশ ও জনপদের মানুষ ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তখন ইসলামেরই পরাজয় হয় না, পরাজয় হয় সত্য ও সুন্দরের, পরাজয় হয় ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারী মুসলমানদের।

যুগ-যুগান্তর ধরে চলে আসা এ জাহেলিয়াতকে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে হলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সা. নিজে যেভাবে মোকাবিলা করেছেন এবং যেসব পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তা পালন করার মাধ্যমে জাহেলিয়াতের মোকাবিলা করা এবং ইসলামের পথে অবিচল থাকা সম্ভব। জনাব আব্বাস আলী খান বর্তমান সময়কালের মুসলমানদের জন্য এবং ইসলামি প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য এগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন- প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা, ধন-দৌলত ও মর্যাদা সম্পর্কে গোমরাহী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলন, মানব জাতির তথা মুসলমানদের ঐক্য, ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে আইনের চোখে সকলে সমান, ব্যক্তিস্বার্থ-জাতীয় স্বার্থে যুদ্ধের পরিবর্তে মানবতার কল্যাণে তথা আল্লাহর অস্তিত্ব ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ তথা জিহাদের প্রেরণা এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ কিংবা সর্বস্ব ব্যয় ইত্যাদি কাজকর্মের মাধ্যমে ইসলামের পথে অবিচল থেকে জাহেলিয়াতের মোকাবিলা করে দ্বীনকে বিজয় করা সম্ভব।

জনাব খান রাসূল সা.-এর গৃহীত ও বাস্তবায়িত পদ্ধতিসমূহ অনুরসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবশেকে দূরীভূত করার কথা উল্লেখ করেছেন সুন্দরভাবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে ইসলাম তথা সত্য ও সুন্দরের পথে যুগোপযোগী করণীয় সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কোন বক্তব্য বা পদ্ধতির ধারণা এ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি, যা খুবই সময়োপযোগী প্রয়োজন ছিল পাঠকদের জন্য। ইসলাম বর্তমানে বিশ্বে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। দেশে দেশে ইসলাম আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। মুসলমানরা নানাস্থানে নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। নিরীহ মুসলমান নারী-পুরুষদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে (যার শুরু আরো কয়েক বছর পূর্ব থেকে) এর দাবি ছিল নবী-রাসূল সা. প্রদর্শিত-প্রচারিত এবং শান্তি ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা এবং আদর্শ নেতৃত্ব। জনাব আব্বাস আলী খান তাঁর "ইসলাম ও জাহেলিয়তের চিরন্তন দ্বন্দ্ব" গ্রন্থে বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলে তা আরো সময়োপযোগী হতো।

Dhaka University Institutional Repository

'ইসলাম ও জাহেলিয়াত' অধ্যায়ে লেখক জাহেলিয়াতের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, ইসলামের পরিভাষায় জাহেলিয়াত বলতে সেসব কর্মপদ্ধতি বুঝায়, যা ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মন-মানসিকতার পরিপন্থী। এরপর তিনি সূরা আততাগাবুনের ২ নম্বর আয়াত উল্লেখ করেছেন, 'তিনিই সেই মহান সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের, কেউ মুমিন এবং আল্লাহ সবকিছু লক্ষ করছেন, যা তোমরা করছ।' এই আয়াতটির চারটি মর্ম। যথা -

এক. আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা তাঁকে যারা স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেয় তারা মুমিন আর যারা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করে তারা কাফের।

দুই. আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে ভাল ও মন্দ দুটো পথই পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছে করলে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। মূলত স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার জন্য একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার পরিণামের ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন।

তিন. আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে পাপী করে পয়দা করেননি এবং মানুষ তার বিরুদ্ধে কুফরের পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ চান, বান্দা তাঁর দাসত্ব করুক, তাঁরই ইবাদতে মশগুল থাকুক।

চার. আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা যিনি মানুষকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। যার ফলে মানুষ অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করার অধিকারী। কিন্তু কেউ কেউ এটা চিন্তা-ভাবনা না করার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হয়। আর কেউ নির্ভুল ও সঠিক চিন্তার পরিচয় দিয়ে ঈমানদার হয়। এরপর লেখক সূরা আর রূমের ৩০ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন -

"অতত্রব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ) একমুখী হয়ে নিজেদের সকল লক্ষ্য এ দ্বীনের প্রতি কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর, যার ওপর মানুষকে আল্লাহ পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যায় না। এই হচ্ছে একবারে সত্য সঠিক দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।"[৭৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান মানা যাবে না এবং একমাত্র, শুধুমাত্র, কেবলমাত্র আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান মেনে চলতে হবে। 'আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যায় না'- বলতে বুঝায়, আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ছাড়া অন্য কোন দ্বীন বা বিধান সৃষ্টি করে আল্লাহর স্বাভাবিক সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে বদলানো সম্ভব নয়।

আল্লাহর এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে মানুষ আর যা যা করেছে তাই জাহেলিয়াত। তাই ইসলাম ও জাহেলিয়াত সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। আর এই দুই বিপরীতমুখী আদর্শ থেকে সৃষ্টা প্রদত্ত সঠিক এবং নির্ভুল আদর্শ বেছে নিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।

এ প্রসংগে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, মানব ইতিহাসে এমন কোন যুগ বা সময়কাল অতীত হয়নি যখন মানুষকে খোদার পথে আহ্বান জানানোর জন্যে কোন নবী অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত বিদ্যমান থাকেননি। আর সত্যকে অথবা মিথ্যাকে বেছে নিতেই জ্ঞানের প্রয়োজন। আল্লাহতায়ালা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক এ জন্য দান করেছেন যে, তার বদৌলতে মানুষ সত্যকে চিনে নেবে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালনা করবে। স্রষ্টা প্রদত্ত এই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের সদ্ব্যবহার না করলে মানব সমাজের কি ভয়াবহ নৈতিক বিপর্যয় ও অধঃপতন ঘটতে পারে তার উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে লেখক 'নিউজ উইক' পত্রিকায় প্রকাশিত নিউইয়র্ক এবং লন্ডন শহরে সংঘটিত এক বছরের অপরাধ সমীক্ষার উদাহরণ পেশ করেছেন। লেখক প্রশ্ন করেছেন, এসব অপরাধীর জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক কোথায় গেল? তাই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক থাকাটাই যথেষ্ট নয়;

---

[৭৪]: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ــ ولكن اكثر الناس ليعلمون ــ সূরা রূম, আয়াত নং-৩০

Dhaka University Institutional Repository

তার সদ্ব্যবহারই প্রকৃত কাজ। এই সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে কতক লোক ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ ব্যর্থতার কারণ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, মানুষের স্বভাবতই দুটি বিপরীতমুখী প্রবণতা বিদ্যমান। যথা- ১. খোদা ভীরুতা বা সুকৃতির প্রবণতা এবং ২. দুস্কৃতির প্রবণতা। এর মধ্যে সুকৃতি বিজয়ী হলে মানুষ সৎ কাজ করে। পক্ষন্তরে দুস্কৃতি বিজয়ী হলে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। এই দুস্কৃতির প্রবণতা বিজয়ীর কারণসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক তিনটি পয়েন্ট তুলে ধরেছেন-

প্রথমত : মানুষের কূপ্রবৃত্তির খায়েশ।

দ্বিতীয়ত : পূর্ব পুরুষের রীতিনীতির প্রতি অন্ধপ্রীতি, বংশপ্রীতি, জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় নেতা বা পীরকে ভক্তি-শ্রদ্ধার আদলে ব্যক্তিপূজা।

তৃতীয়ত : চরমতম ইসলাম বৈরী পরিবেশ।

'আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত' অধ্যায়ে আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী এবং সমসাময়িক জাহেলিয়াতের সাথে তাঁদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। 'বিশ্ব নবীর আগমন' অধ্যায়ের শুরুতে লেখক সপ্তম শতাব্দীর আরব ভূ-খণ্ডের জাহেলিয়াতের আঁধারে আচ্ছন্ন পরিবেশের বর্ণনা দেন। এ অন্ধত্বের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, প্রথমত তৎকালীন আরব সমাজের জাতীয় এবং পারিবারিক গোঁড়ামি। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে সূরা যুখরখের ২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- "আমরা আমাদের বাবা-দাদাকে একটা রীতিনীতির অনুসারী পেয়েছি। আর আমরা তাদেরই পথকে অনুসরণ করে চলেছি।"[৭৫] দ্বিতীয় কারণ হলো প্রবৃত্তি পূজা। তৃতীয়ত প্রচলিত রেসম রেওয়াজ

উপরোক্ত তিনটি কারণ শুধু তৎকালীন জাহেলিয়াতের যুগেই নয় সকল কালের জাহেলিয়াতেই পাওয়া যায়। এই জাহেলিয়াতের মাঝেই যখন সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা. আগমন করলেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রদান করলেন তখন জাহেলিয়াতের অনুসারীদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো এ প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে তারা চরম বিস্মিত হলো, তারপর তারা রাসূলকে মস্তিষ্ক বিকৃত বলে আখ্যায়িত করলো। কথাগুলোকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো, ঠাট্টা-বিদ্রূপ-উপহাস সহকারে ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। পরে এ দাওয়াত অবাস্তব ঘোষণা করত তারা ক্রমশ নির্যাতন, নিষ্পেষণের পথ বেছে নিলো কিন্তু পরে বিরোধিতা ও অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। ইসলামের ক্রমবিকাশের মূলে ছিলো আল কুরআন। তাই তারা আলকুরআন শ্রবণে বাধা দিত লাগলো, এখনও নব্য জাহেলিয়াতের শাসকগোষ্ঠী কুরআন থেকে মানুষকে দূরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে।

'জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় অবিচল থাকার উপায়' অধ্যায়ে লেখক সাতটি পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। এক. প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা, দুই. ধন-দৌলত ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিন. গোটা জীবনে ইসলামের অনুসরণ। চার. মানব জাতির ঐক্য। পাঁচ. আইনের চোখে সকলে সমান। ছয়. জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা। সাত. আল্লাহর পথে ব্যয়।

'ইসলামের একরূপতা ও একমুখীনতা' অধ্যায়ে লেখক সকল দিক, সকল আদর্শ, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহমুখী হওয়ার যে দাবি ইসলাম করে তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। 'মুসলমানদের ঐক্য ও পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত' অধ্যায়ে জাহেলিয়াতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে পুরোপুরি ইসলামের পথে চলার জন্যে মুসলমানদের ঐক্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। সূরা আলে ইমরানে ১০৩ আয়াতে

---

৭৫. وكذلك مارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا ءاباءنا على امة وانا على ءاثارهم مقتدون — সূরা যুখরুখ, আয়াত নং-২৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ বলেন, 'সকলে মিলে আল্লাহর রশি শক্ত করে ধর এবং দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।' এ ক্ষেত্রে জামায়াতবদ্ধ জীবনের কোন বিকল্প নেই। লেখক ইসলামি জামায়াত গঠন, জামায়াতের পুনরুদ্ধার অধ্যায়ে লেখক কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন। যেমন, নতুন নবুওতের দাবি নিয়ে ভণ্ড নবীর আগমন, নতুন ধর্মের প্রবর্তন, শিরক ও বিদআত প্রচলন, খেলাফত থেকে রাজতন্ত্র প্রবর্তন, অনৈসলাম, তাসাউফ ইত্যাদি। 'জাহেলিয়াতের মারাত্মক অস্ত্র' অধ্যায়ে তিনটি অতি মারাত্মক অস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে-

১. খোদাহীন জীবনব্যবস্থা বা সেকিউলারিজম
২. জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম
৩. গণতন্ত্র বা ড্যামোক্রেসি

এই তিনটি অস্ত্রের ব্যাপারে আলোচনা, পর্যালোচনা এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে বাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষে 'জাহেলিয়াতের নতুন রণকৌশল' শীর্ষক অধ্যায়ে আধুনিক জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য লেখক কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করেছেন, যথা-

এক. ইসলামি ঐক্য
দুই. ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার
তিন. অনৈসলামিক সকল শাসক গোষ্ঠীর অবসান।
চার. সবশেষে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর সাথে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।

'ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব' বইয়ের উপসংহারে বলা যায়,
লেখক আধুনিক জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলামকে জীবানাদর্শ হিসেবে গ্রহণের জন্য বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমুন ও জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রমকে আশার আলোপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত এই দুই সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে উল্লেখ করেছেন।

জনাব আব্বাস আলী খান তাঁর "ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব" গ্রন্থে জাহেলিয়াতের ভিত্তিগুলোর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতি যেসব মতবাদের ওপর ভিত্তি করে সরকার ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানকার পরিস্থিতি, অনিয়ম, মজলুমের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন, বর্ণবৈষম্য, শ্রেণীভেদ ইত্যাদি চিহ্নিত করে পাঠকদৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ও সচেতন জনগোষ্ঠী ভ্রান্ত মতবাদসমূহের কুফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পেত। বিশেষ করে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পথভ্রষ্ট মানুষ এ সকল মতবাদের বীজ হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলতে আগ্রহী ও সক্রিয় হতো।

সর্বোপরি "ইসলাম ও জাহেলিয়াত" গ্রন্থটি ইসলামপ্রিয় ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী মানুষের জন্য যে পথনির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

আব্বাস আলী খান তাঁর ছাত্রাবস্থায়ই ইতিহাস জানা ও লেখার প্রবণতা মনে ধারণ করতেন। শিক্ষাজীবন শেষে চাকুরীর সুবাধে- দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও হৃদয়ের উপলব্ধি থেকে ইতিহাস রচনা ও চর্চার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি প্রায় দু'শ বছর যাবত মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের তথা অমুসলিমদের উপৎপীড়ন, অবিচার ও নির্যাতনের ঘটনাবলী ও পূর্বাপর অবস্থা বর্ণনা করে রচনা করেন 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'। এই বইটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ কর্তৃক ১৯৯৪ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ৫১২ পৃষ্ঠায় রচিত এই গ্রন্থখানি দুইটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ১৫টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় ভাগে ১৬টি অধ্যায় রয়েছে। **প্রথম অধ্যায় :** বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের আগমন, **দ্বিতীয় অধ্যায়** : বিজয়ীর বেশে মুসলমান, বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠ বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ, রাজা গণেশ, ইলিয়াস শাহী বংশ, হিন্দুজাতির পুনরুত্থান, গণেশের বংশ ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান, বাংলার মসনদে হাবশী সুলতান, হোসেন শাহ, শ্রীচৈতন্য, হোসেন শাহ বংশ, **তৃতীয় অধ্যায়** : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় আগমন, মীর জুমলা থেকে সিরাজদ্দৌলা, নবা শায়েস্তা খান, ফিদা খান ও যুবরাজ মুহাম্মদ আজম, সুবাদার ইব্রাহীম খান, সুবাদার আজিমুশ্‌শান, মুর্শি কুলী খান, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খান, আলীবর্দী খান, সিরাজদ্দৌলা, **চতুর্থ অধ্যায়** : বাংলার মুসলিম শাস বিলুপ্তির পটভূমি, মুসলামানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উচ্চাভিলাষ, ফল্‌তায় ইংরেজগণ, **পঞ্চম অধ্যায়** : ইংরেজদে আক্রমণ ও নবাবের পরাজয়, সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা, **ষষ্ঠ অধ্যায়** : মুসলি সমাজের দুর্দশা, নবাব, সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান, নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ঃ কৃষক ও তাঁতী, তাঁতী, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক ঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, **সপ্তম অধ্যায়** : মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষ দীক্ষা, ইংরেজদের আগমনের পর, খৃস্টান মিশনারী ও ইংরেজী শিক্ষার সূচনা, বাংলার মুসলমান বোধনকৃত নতুন বাংলাভাষা, আধুনক বাংলা সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা, **অষ্টম অধ্যায়** : আধুনিক বাং সাহিত্য ও মুসলমান, উনবিংশ শতকের মুসলমান, মুসলমান চরম অগ্নি পরীক্ষার মুখে, ফকীর আন্দোল **নবম অধ্যায়** : ফরায়েজী আন্দোলন, **দশম অধ্যায়** : শহীদ তিতুমীর, কোলকাতায় জমিদারদের ষড়যন্ত্র সভ আলেকজান্ডার রিপোর্ট ও তার প্রতিক্রিয়া, **একাদশ অধ্যায়** : সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদী আন্দোল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. শাহ আবদুল আযীয রহ., শাহ ওয়ালিউল্লা বংশতালিকা, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, বালাকোট বিপর্যয়ের কারণ, বালাকোট বিপর্যয়ের পর, মাওলা বেলায়েত আলী, বিপ্লবী আহমদুল্লাহ, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী, মাওলানা ইমামুদ্দীন, সুফী নূর মুহাম্ম নিযামপুরী, **দ্বাদশ অধ্যায়** : বৃটিশ ভারতের প্রথম আযাদী সংগ্রাম, **ত্রয়োদশ অধ্যায়** : স্যার সাইয়েদ আহম খান, বংগভংগ, আর্য সমাজ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বালগংগাধর তিলক, **চতুর্দশ অধ্যায়** : বংগভংগ রদ তার প্রতিক্রিয়া, **পঞ্চদশ অধ্যায়** : উনিশ 'শ ছয় থেকে ছত্রিশ, খেলাফত আন্দোলন, হিজরত আন্দোল মোপলা বিদ্রোহ, ইসলাম ও মুসলমানদের উপর সুপরিকল্পিত হামলা, সংগঠন আন্দোলন, মুসলিম অধ্যুষি অঞ্চলের স্বাতন্ত্র দাবী, সর্বদলীয় সম্মেলন, মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা, সাইমন কমিশ গোলটেবিল বৈঠক, দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক, তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক, পুনাচুক্তি, ভারত শাসন আই **দ্বিতীয় ভাগ : প্রথম অধ্যায়** : ভারত শাসন আইন, প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, রক্ষাকবচ প্রশ্নে অচলাব সৃষ্টি, নির্বাচনের ফলাফল, বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, আসাম, **দ্বিতীয় অধ্যায়** : প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভ কংগ্রেস শাসন এবং মুসলমান, **তৃতীয় অধ্যায়** : মুসলিম লীগ-কংগ্রেস আলোচনা, **চতুর্থ অধ্যায়** : পাকিস্ত আন্দোলন, **পঞ্চম অধ্যায়** : পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি,**ষষ্ঠ অধ্যায়** : পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীত **সপ্তম অধ্যায়** : বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব, **অষ্টম অধ্যায়** : ক্রিপস মিশন, **নবম অধ্যায়** : ওয়াভেল পরিকল্পন **দশম অধ্যায়** : কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা, **দ্বাদশ অধ্যায়** : একজেকিউটিভ কাউন্সিলে লীগের যোগদা **ত্রয়োদশ অধ্যায়** : গণ পরিষদ, **চতুর্দশ অধ্যায়** : মাউন্টব্যাটেন মিশন, **পঞ্চদশ অধ্যায়** : ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রক্রিয়া, **ষষ্ঠদশ অধ্যায়** : উপসংহার। উল্লেখিত দুই ভাগের অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন শিরোনামে বাংল মুসলমানদের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বইটির ভূমিক লেখক উল্লেখ করেছেন, "প্রায় দেড় যুগ পূর্বে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব আমার ওপ অর্পিত হয়। কথা ছিল বাংলায় মুসলমানদের প্রথম আগমন থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত এ সুদী কালের ইতিহাস লেখার। তবে বিশেষভাবে বলা হয় যে, ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার প

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ সরকার ও হিন্দুদের আচরণ কেমন ছিল তা যেন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিসহ ইতিহাসে উল্লেখ করি।

১৯৩৫ পর্যন্ত ইতিহাস লেখার পর আর কলম ধরার ফুরসৎ মোটেই পাইনি। সম্প্রতি কয়েক বছরের শ্রম ও চেষ্টা সাধনায় ইতিহাস লেখার কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি বলে আল্লাহতা'য়ালার অসংখ্য শুকরিয়া জানাই। এ ইতিহাসের কোথাও শুধুমাত্র অসত্য, স্বকপোলকল্পিত অথবা অতিরঞ্জিত উক্তি করিনি। অনেকের কাছে তিক্ত হতে পারে, কিন্তু আগাগোড়া সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। আমি ইতিহাসের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম বলে তখন থেকেই সত্য ইতিহাস জানা ও লেখার প্রবণতা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। রংপুর কারমাইকেল কলেজের বি,এ চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে আকবর ও আওরঙ্গজেবের ওপরে ইংরেজিতে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করি। কিছু বিরোধিতা ও বাধা সত্ত্বেও প্রবন্ধটি কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। শিক্ষা জীবন শেষ করার পর সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিতে জীবনের পঁচিশটি বছর কেটে যায়। ইতিহাসের ওপর কোন গবেষণামূলক কাজ করার সুযোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত হই। বরঞ্চ ইতিহাসই ভুলে যেতে থাকি। দেড় যুগ পূর্বে আমার ওপর অর্জিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নতুন করে ইতিহাস চর্চার সুযোগ হয়েছে। ইতিহাস একটা জাতির মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করে। কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে অথবা বিকৃত করে পেশ করতে হবে। একজন তথাকথিত মুসলমান যদি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের সুযোগ না পায় এবং তার জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাহলে তার মুখ থেকে এমন সব মুসলিম ও ইসলামী বিরোধী কথা বেরুবে যেসব কথা একজন অমুসলমান মুখ থেকে বের করতে অনেক সাতপাঁচ ভাববে। এ ধরনের হস্তীমূর্খ মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং মুসলমানদের জাতশত্রুগণ তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করছে। মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে তাদের সঠিক অতীত ইতিহাসের সাথে ইসলামেরও সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ একবারে অপরিহার্য। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে প্রসংগক্রমে ইসলামের মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে হলে ইতিহাসের পর্যালোচনা ও ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা সর্বস্তরে তুলে ধরতে হবে।

মুসলমানী জীবনটাই এক চিরন্তন সংগ্রামী জীবন। সংগ্রামবিমুখতার ইসলামে কোন স্থান নেই। তাই ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুবা জাতিকে শত্রুর নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। 'বাংলার মুসলমানদের ইতহাসে' প্রায় দু'শ বছর যাবত মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের উৎপীড়ন-অবিচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অতীতের কথা কেউ কেউ মনগড়া মনে করতে পারেন। বর্তমান সময়ে ভারতে কি হচ্ছে তা কি তারা দেখছেন না? সেখানে প্রতিনিয়ত সংঘটিত লোমহর্ষক দাঙ্গায় যে মুসলমনাদেরকে নির্মূল করা হচ্ছে তা কি তাদের চোখে পড়ে না? সম্প্রতি বোম্বাইয়ে সংঘটিত দাঙ্গার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত চোখে পড়ে না? সম্প্রতি বোম্বাইয়ে সংঘটিত দাঙ্গার জন্য পুলিশকে দায়ী করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর বৈষম্যমূলক আচরণেরও সমালোচনা করা হয়েছে। এরপর উগ্র মুসলিম বিদ্বেষীদের দেশ ভারতে মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা কোথায়? ভবিষ্যতে হয়তো এসবের সঠিক ইতিহাস প্রণীত হবে।

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জাতির নতুন প্রজন্মকে তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ রাখা হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের ভূত বিভাগোত্তর কালের পাকিস্তানী শাসকদের ঘাড়েও শক্ত করে চেপে বসেছিল। পাকিস্তান কি কারণে হয়েছিল, এর আদর্শিক পটভূমি কি ছিল, কেন সুদীর্ঘ সাত বছর নিরলস ও আপসহীনভাবে পাকিস্তান আন্দোলন করা হলো, কেন লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু খুনের দরিয়া সাঁতার দিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল, তার কোন কিছুই নতুন প্রজন্মকে জানানো

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। আমাকে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তখনকার পাঠ্য ইতিহাসে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসের কোন উল্লেখ ছিল না। যার ফলে পাকিস্তানের ভিত আরও নানা কারণে দুর্বল হতে থাকে। পাকিস্তান ও তার শাসকদের প্রতি জনগণের অসন্তোষ ও ক্ষোভ বাড়তে থাকে, যার পরিণামে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে।

অত্র ইতিহাসটিতে মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিকে নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মুসলিম জাতির ইতহাস কালের কোন এক বিশেষ সময় থেকে শুরু হয়ে কোন এক বিশেষ সময়ে গিয়ে শেষ হয়নি। এ ইতিহাসের সূচনা দুনিয়ায় প্রথম মানুষ হযরত আদম আ.-এর আগমন থেকে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ ইতিহাস অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে সময়, কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এবং চলতে থাকবে যতোদিন দুনিয়া বিদ্যমান থাকবে। মুসলমানদেরকে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সামনে অগ্রসর হতে হবে।"[৭৬]

মরহুম খান সাহেব উপলব্ধি করেছেন, একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জাতির নতুন প্রজন্মকে তাদের অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে অথবা বিকৃত করে পেশ করতে হবে। সেই ধ্বংসের প্রকৃত কবল থেকে জাতিকে বাঁচাতে এবং ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াসে মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষায় তাদের সঠিক ইতিহাসের সাথে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নতুন প্রজন্মের জন্য "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" বইটি রচিত হয়েছে। এ বইটিতে প্রসংগক্রমে ইসলামের মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া লেখক এ ইতিহাস লিখতে গিয়ে কোন ধরনের অসত্য, স্বস্খলিত কিংবা অতিরঞ্জিত উক্তি করেননি বলে প্রতীয়মান হয়। তাই 'বাংলার মুসলমনাদের ইতিহাস' বইটির মাধ্যমে অগ্রসর হতে মুসলমানদের পথে চলা আরো সহজতর হবে।

তদোপরি বইটিতে কিছু কিছু বিষয় আরো বিশদভাবে উল্লেখ হওয়া প্রয়োজন ছিল। সে বিষয়ে আলোকপাত করা হল-

১. রাজা গনেশ-এর শাসনকালে গনেশ,কর্তৃক মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে; কিন্তু সে সময়কার মুসলমান বা মুসলিম নেতাদের ভূমিকা এখানে তুলে ধরা হয়নি। গনেশ এর দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বাসনা চরিতার্থের বিবরণ এবং তৎপরবর্তীতে তার দোর্দন্ড প্রতাপের কথা উল্লেখ হয়েছে আলোচ্য অংশে। মুসলমানদের চিত্র দেখানো হয়েছে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং নিরীহ ও নির্যাতিত হিসেবে। রাজা গনেশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে যদিও অনেক স্বাধীন হিন্দু রাজা শান্তিতে বসবাস করেছিলেন; কিন্তু তারা কখনো মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে আসা সমীচীন মনে করেননি। পর্যায়ক্রমে গনেশ তার সুদূর প্রসারী ফলাফলের জন্য তথা ক্ষমতায় আরোহণের জন্য যে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে তাতে সে সফলতা অর্জন করে। এক সময় সে গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ এবং শামসুদ্দীনকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করে। গনেশ-এর মৃত্যু অবধি এ দীর্ঘ পরিক্রমায় মুসলমান শাসক নেতাদের বা মুসলমানদের ভূমিকা এখানে উল্লেখ হলে ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছ হতো।

২. হোসেন শাহ'র বাংলা সিংহাসনে আরোহণের ঘটনা অতীব চমকপ্রদ। নানা রচনা, কথিত উৎস রয়েছে তার আসল পরিচয় সম্পর্কে। লেখক আব্বাস আলী খান অনেক লেখক ও অনেক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন হোসেন শাহের পরিচয় বর্ণনায়; কিন্তু শেষ অবধি এ হোসেন শাহের জন্ম-পরিচয় এবং তার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা এ গ্রন্থের আলোচ্যাংশে পাওয়া যায়নি। গ্রন্থকার ও গ্রন্থের উদ্ধৃতির ধারাধরে লেখক ইতিহাস রচনায় যদি আরো অতীতে অগ্রসর হতেন। তাহলে পাঠক জানতে পারতো হোসেন শাহ'র আসল পরিচয় ও হোসেন শাহের পিতা কথিত সাইয়েদ-এর উত্থানকেন্দ্র কোথায়। এ ছাড়া এ অংশে ইতিহাস লেখক

---

[৭৬]. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
পৃষ্ঠা ৯-১১

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন শাহের সময়ে মুসলমানদের দুর্দশা ব্যতীত কোন ভূমিকা এবং হোসেন শাহের শাসন ক্ষমতা কখন, কীভাবে শেষ হলো তার বিবরণ দিতে পারেননি।

৩. হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও সমস্যা সংক্রান্ত

ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি যুগের পর যুগের সময় অতিক্রান্ত করলেও এবং তাদের মধ্যে প্রতিবেশী হিসেবে কোন ভেদাভেদ না থাকলেও জাতিগতভাবে বৈষম্যমূলক মানসিকতা কাজ করত। এ সমস্যা এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। এ সম্পর্কে আব্বাস আলী খান বিস্তারিত বলতে গিয়ে যে সকল ইতিহাস রচয়িতার উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন তারা হচ্ছেন অধিকাংশই অমুসলিম। যেমন ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর প্রমুখ। তবে তিনি সৈয়দ মুজতবা আলী, আবদুল ওদুদ'র কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেগুলো ড. রমেশ, রবি ঠাঁকুরদের বিশাল বক্তব্য/উদ্ধৃতির মাঝে যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া লেখক যদি এ সম্পর্কে মুসলিম চিন্তা-চেতনাকে উল্লেখ করে বিশদভাবে স্বীয় মতামত তুলে ধরতেন, তাহলে চিরায়ত হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও সম্পর্ক" বিষয়ে প্রকৃত সত্য ইতিহাস জানার সুযোগ হতো।

৪. মুসলমানদের অবদান ও বাংলা সাহিত্য

বাংলা ভাষার উদ্ভব কোথা থেকে তা খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হয় ৫০০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায়। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে বছরের পর বছর ধরে নানান মাধ্যম হয়ে বাংলা ভাষা নিজস্ব রূপে আবির্ভূত । বাংলা ভাষার স্তরসমূহের মধ্যে প্রায় ১৫০ বছর সময়কাল (১২০১-১৩৫০) কে অন্ধকার যুগ বলা হয়। সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারকারী সাহিত্যিকরা এ যুগের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, এ সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। কিন্তু মূল অবস্থা ছিল অন্য রকম। এই ১৫০ বছর ছিল মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্যে অবদান রাখার অনবদ্য ভূমিকা পালনকারী কাল। দৌলত উজির বাহরাম খান, শাহ মুহাম্মদ সগীরসহ অনেক মুসলমান সাহিত্যিক এ সময়ে সাহিত্য রচনা করেন। মুসলিম সাহিত্যিকদের ভূমিকাকে অগ্রহণযোগ্য ও হেয় করেই অমুসলিম সাহিত্যিকরা এ সময়কে আজকার যুগ বলে অভিহিত করেন। লেখক আব্বাস আলী খান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও মুসলমানদের অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক কবি, সাহিত্যিকদের বর্ণনা দিয়েছেন । কিন্তু অন্ধকার যুগ নামে অভিহিত সময়ে মুসলমানদের অবদান ও সে সসময়কার এবং তৎপরবর্তী সময়কার উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যকদের কথা উল্লেখ করার প্রয়াস পেতেন/নিতেন, তাহলে প্রকৃত ইতিহাস আরো জোরালোভাবে ফুটে ওঠতো।

'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' বইটি সম্পর্কে অন্য গুণীজনদের মতামত তুলে ধরা হল: এ সম্পর্কে কবি ও গবেষক মোশাররফ হোসেন খান লিখেছেন :

১৯৯২ সালের নভেম্বরের কথা। 'পৃথিবী' পত্রিকায় কাজ করতে গিয়ে আব্বাস আলী খানের হাতের লেখার সাথে প্রথম পরিচিত হলাম, এর আগেই পরিচিত ছিলাম তাঁর সাহিত্য ভাষার সাথে । কিন্তু ঐ প্রথমই তাঁর টানাটানা, নির্ভুল বানান, চাতুর্যপূর্ণ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ও বাক্যের সাথে পরিচিত হলাম। এই সময়ে 'পৃথিবীতে সালে আর শেষ করেছেন মে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হচ্ছিল ধারাবাহিকভাবে তাঁর সেই বিখ্যাত ইতিহাসকেন্দ্রিক লেখা 'বাংলার মুসলমানদের ইতহাস।' লেখাটি তিনি শুরু করেছিলেন মাসিক 'পৃথিবী' তে নভেম্বর, ১৯৮৯-১৯৯৪) সাড়ে পাঁচ বছর। এই সাড়ে পাঁচ বছর যাবত ধারাবাহিকভাবে তিনি লিখেছেন এবং তা প্রকাশও হয়েছে।

বিস্ময়কর ব্যাপার বটে! বিস্ময়কার এই দিক থেকেও, তিনি যখন এই লেখাটি শুরু করেন তখন তাঁর বয়স (১৯১৪-১৯৮৯) পঁচাত্তর বছর। আর যখন সেটা শেষ করলেন, তখন দাঁড়িয়েছে (১৯১৪-১৯৯৪) আশি বছরে। ভাবা যায়! তখনও তিনি সমানভাবে লিখেছেন। কে না জানে যে তিনি কেবল লেখাকে কেন্দ্র করেই চব্বিশটি ঘণ্টা অতিবাহিত করার অবকাশ পেতেন না। দিনের সিংহভাগ সময়ই তিনি ব্যস্ত থাকতেন নানাবীধ কাজে। এই সব হাজারো কাজের ফাঁকে তিনি যে কীভাবে, নিয়মিত 'পৃবী'র প্রতিটি সংখ্যায় লেখা দিতেন,

Dhaka University Institutional Repository

তা আজও আমার কাছে এক বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে আছে। লিখেতেন নিজের হাতেই। সাধারণ কাগজ আর সাধারণ বলপয়েন্ট ব্যবহার করতেন। লক্ষ করেছি, তাঁর প্রতিটি বর্ণের টানছিল দ্রুতগতিসম্পন্ন, অথচ স্পষ্ট। ইংরেজি এবং বাংলা দুটো হাতের লেখায় সমান কারিশমা- তাঁর মত আর কারো মধ্যে আমি তেমনটি পাইনি। মাঝে মাঝে অনুকরণ করতেও প্রলুব্ধ হয়েছি । কিন্তু পারিনি।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি একাধারে লিখে গেছেন 'পৃথিবীতে 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'। অবশেষে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো ১৯৯৪ সালে, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে। যখন প্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ালো ৫১৬। আর এই গ্রন্থ লেখার জন্য তিনি যেসব ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন, তার সংখ্যা ১১৭। এই ১১৭ খানা সহায়ক গ্রন্থের মধ্যে ৭৮ খানা ইংরেজি এবং বাকি মাত্র ৩৯ খানা বাংলা। সুতরাং এ থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর পাঠ, পরিশ্রম এবং অভিনিষ্ঠতা। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে তিনি অতিবাহিত করেছেন আশিতম বছর। আশি বছর বয়সে, অন্তত আমাদের দেশে এ ধরনের কাজ কেবল বিস্ময়করই নয়, মনে করি- স্মরণকালের এক ইতিহাসও বটে। 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' (১৯৯৪) প্রকাশের সাথে সাথেই তুমুল আলোড়ন তুলেছিল পাঠক মহলে। যার কারণে 'একশো ত্রিশ টাকা দামের এই বিপুলাকারের গ্রন্থটি মাত্র একটি বছর না পেরুতেই নিঃশেষ হয়ে গেল। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো ঠিক তার পরের বছরই ১৯৯৫ সালে।

'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব।

আব্বাস আলী খান রচিত বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসব জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ৮ অক্টোবর ১৯৯৪ দৈনিক সংগ্রাম এ প্রকাশনা উৎসব সম্পর্কে বিশাল রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল

'গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে সুধীবর্গ : বাংলার মুসলমানদের সত্যিকার ইতিহাস তুলে ধরা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।' সামগ্রিক নিউজটি নিম্নরূপ :

"একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে নতুন প্রজন্মকে নিজেদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ রাখা হচ্ছে। বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং ইতিহাসের সুপরিকল্পিত বিকৃতিরোধ করে আমাদের মুসলিম জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলার মুসলমানদের সত্যিকার ইতিহাস তুলে ধরা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রখ্যাত লেখক ও রাজনীতিবিদ জনাব আব্বাস আলী খানের রচিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে দেশের বিশিষ্ট সুধীবর্গ এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেছেন, জনাব খানের জ্ঞানগর্ভ বইটি জাতির আত্মপরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক পুস্তক হিসেবে দীর্ঘকালীন অভাব পূরণ করবে। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। বইটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। আলোচনা করেন যথাক্রমে ইনকিলাব এর নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা রূহুল আমীন খান' ইসলামী ব্যাংক এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মীর কাসেম আলী, এস মজিবুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম, উর্দু ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ এবং কথাশিল্পী শাহেদ আলী গ্রন্থকার জনাব আব্বাস আলী খানও বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন,- দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাস্থায়ী এই আলোচনা সভায় ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু বিপুল সংখ্যক শ্রোতার মিলনায়তন উপচে পড়ছিল। প্রবীণ লেখক ও জননেতা আব্বাস আলী খানের দীর্ঘদিনের শ্রমসাধ্য গবেষণার ফসল 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' বইটি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। ৫১৬ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থটিতে অধ্যায় রয়েছে ষোলটি। মূল্য একশ ত্রিশ টাকা । এতে বাংলায় মুসলমানদের আগমন থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পর্যন্ত তথ্যপূর্ণ ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রামাণ্য ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। জনাব আব্বাস আলী খান 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থ রচনার পটভূমি বিস্তারে তুলে ধরে বলেন, এদেশ থেকে ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতিসত্তা বিলুপ্ত করার মারাত্মক চক্রান্ত চলছে। বিশেষ করে নয়া প্রজন্মকে আমাদের ইতিহাস বিস্তারিত জানাতে হবে, যাতে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে না যায়। ইসলামই আমাদের জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তি। ইতিহাস জাতির দেহে জীবনী শক্তি সঞ্চার করে। লাখো লাখো প্রাণের বিনিময়ে' ৪৭ সালে পাকিস্তান জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু সে ত্যাগের ইতিহাস তৎকালীন শাসকরা জাতিকে জানায়নি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বলেন, লেখক আলোচ্য গ্রন্থে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সর্বকালীন ও সার্বজনীন ধর্ম ইসলামে বিশ্বাসীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের সাথে মিলে এক সত্তায় পরিণত হওয়া অসম্ভব। মধ্যযুগে খৃষ্টানরা ইউরোপে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার শুরু করেছিল, তা আজো অব্যাহত।

তিনি বলেন, আজো বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রচলিত। এর সংস্কার প্রয়োজন। মুসলিম রাষ্ট্রে প্রশাসন ও শিক্ষাসহ সবক্ষেত্রে অমুসলিমদের প্রতি উদারতা ও ইনসাফ দেখানো স্বাভাবিক। তাই বলে নিজেদের নীতি বিসর্জন দিয়ে তাদের নীতি তেমন মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না। তিনি চরিত্রে মানবীয় গুণাবলী পরিস্ফুট করার আহবান জানিয়ে বলেন, রাসূল সা. যে দায়িত্ব পালন করে গেছেন, তা আমাদের পালন করতে হবে। আজ আমাদের রাজনীতিতে সুবিধাবাদ, সাহিত্যে ইসলামের বিকৃত উপস্থাপনা এবং সংস্কৃতিতে বিজাতীয় আচার-প্রথা পরিস্ফুট হচ্ছে। সভাপতি হিসেবে জনাব আবুল আসাদ বলেন, ইতিহাসের বিকৃতি ইসলামের নামে অপপ্রচারসহ নানাভাবে আমাদের জাতিসত্ত্বা ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে। মুসলিম জাতির মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্বের স্বার্থেই ১৯৪৭ সালে স্বতন্ত্র আবাসভূমি ছিল। 'কায়েদে আযম ভারত ভাগ চাননি' বলা ভুল। শত শত বছর রাজত্বের পর কেন মুসলিম শাসনের পতন ঘটেছিল, তার কারণ উপলব্ধি করতে আলোচ্য বইটি সহায়ক হবে। অধ্যাপক শাহেদ আলী বলেন, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' এর মতো বই জাতির প্রয়োজনে পাঠ্য হওয়া উচিত। নিপীড়িত মানুষ মুক্তি লাভের লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু ইসলামী সমাজ কায়েম না থাকায় তাদের আশা পূর্ণ হয়নি। বাংলায় মুসলিম সমাজের সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইতোপূর্বে রচিত হয়নি। এদিক থেকে জনাব আব্বাস আলী খানকে পথিকৃত বলা যায়।

ড. আবদুল্লাহ বলেন, জনাব খান রাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন এবং মুসলিম ইতিহাসের বিকৃতির অপনোদন চান। বইটিতে এ দুটি বিষয় তিনি সাফল্যের সাথে তুলে ধরেছেন। কুরআনের শিক্ষা ভুলে গিয়ে আমরা আজ বাঙ্গালী বনাম বাংলাদেশী দ্বন্দ্বে মেতে আছি। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলাম সমর্থিত নয়। ড. ইবরাহীম বলেন, মুসলিম শাসকদের আগমনের বহু পূর্বেই এদেশে ইসলাম এসেছে। ১৮৭২ সালে আদমশুমারীর আগে কেউ জানত না যে বাংলায় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করা না হলে জাতি হিসেবে আমাদের পতন ঘটাই স্বাভাবিক। নব প্রজন্মের মাঝে ইসলামের বাস্তব অনুসারীদের শাসনভার দেয়া হয়নি। জনাব মুজিবুল্লাহ বলেন, মুসলিম শাসকরা দিল্লী-আগ্রায় বিস্ময়কর প্রাসাদ নির্মাণের পেছনে জনগণের অর্থের অপচয় করেছিলেন সে অর্থ দিয়ে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেত। কিন্তু তারা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেননি। যে ইউরোপকে আরব মুসলিমরা জ্ঞান দান করেছে, তারাই ভারতের মুসলমানদের মার দিয়েছে। মীর কাসেম আলী বলেন, জাতির বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রয়োজনে অতীত ইতিহাস জানতে হয়। বাংলার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদের আগ্রাসন শত শত বছর ধরে চলছে। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। মাওলানা রূহুল আমিন খান বলেন, জাতির ইতিহাস না থাকার চেয়ে তা ভুলে যাওয়া অনেক বেশি মর্মান্তিক। ইতিহাসই জাতিকে আত্মপরিচয় দান করে সাহস যোগায়। ইংরেজ ও হিন্দু মিলে আমাদের ইতিহাস বিকৃত করেছে। অধ্যাপক নাজির আহমদ বেলন, এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান। কিন্তু তারা ইসলামের সামগ্রিকতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। আমাদের আদর্শিক পরিচিতি ও ইতিহাস উপস্থাপনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্যই এ বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। মাসিক পৃথিবী এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময়ই বহু পাঠক তা পুস্তকাকারে বের করার অনুরোধ করেছিলেন।"[৭৭]

খুঁটিনাটি কিছু বিষয় ব্যতীত জনাব আব্বাস আলী খান 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' বইটিতে বাংলায় মুসলমানদের প্রথম আগমন থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের ইতিহাস লেখায় সচেষ্ট প্রয়াস নিয়ে শেষ অবধি সফল হয়েছেন। তিনি সুচিন্তিত, সুদক্ষ ও সুনিপুণভাবে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে অংকন করেন । ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পর মুসলানদের প্রতি বৃটিশ সরকার ও হিন্দুদের আচরণ নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিসহ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে প্রকৃত সত্য উদঘাটনে ও পরিবেশনে আব্বাস আলী খান যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন তাতে পাঠকদৃষ্টিতে মুসলমানদের বিজয়ী বেশে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া, রাষ্ট্রীয়কার্য পরিচালনা এবং সময়ের আবর্তনে মুসলমানদের দুর্দশা পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। সর্বোপরি বইটি লিখে জনাব আব্বাস আলী খান বিশেষ অবদান রেখেছেনে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ইসলামী অর্থনীতি

আব্বাস আলী খান স্বীয় মেধা, প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে অসংখ্য গ্রন্থ লিখেছেন এবং জাতির জন্য অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি নিজেই শুধু রচনা করেননি, রচনার পাশাপাশি তিনি অনুবাদ কার্যে ছিলেন পারদর্শী। তাঁর অনুবাদ কৃত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম একটি গ্রন্থ হচ্ছে- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রচিত ইসলামী অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনার সংকলনকৃত অংশের অনূদিত রূপ "ইসলামী অর্থনীতি"। এ গ্রন্থটি অনুবাদের আরো দু'জন অংশীদার হলেন যথাক্রমে জনাব আবদুস শহীদ নাসিম এবং জনাব আবদুল মান্নান তালিব। গ্রন্থটি যে সংকলনকৃত অংশ থেকে অনূদিত হয়েছে, সে সংকলিত অংশটি সংকলন করেছেন প্রফেসর ডঃ খুরশীদ আহমদ। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক শরীফ হোসাইন এবং প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিচার্স একাডেমী, ঢাকা। এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ হয়েছে ১৯৯৪ ইং সালের অক্টোবর মাসে।

জনাব খান সাহেব "ইসলামী অর্থনীতি" গ্রন্থের ২৮৫ পৃষ্ঠা থেকে ২৯৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশটি অনুবাদ করেছেন। এ অংশটি বইতে নবম অধ্যায় হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। "ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার" নামক এ অধ্যায়ে তিনি পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মহীন গণতন্ত্রের বিপরীতে ইসলামের সুমহান ব্যবস্থাদির উল্লেখ করেছেন। অনুবাদকদের পক্ষে আবদুস শহীদ নাসিম গ্রন্থটির শুরুতে 'আমাদের কথা' শিরোনামে লিখেছেন, "যে কয়টি প্রধান প্রধান উপাদান আধুনিক বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার অন্যতম হলো অর্থ। কারো কারো মতে তো অর্থই নিয়ন্ত্রক শক্তি। তাই অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং করছেন। গড়ে তুলেছেন বহু অর্থনৈতিক মতবাদ। একটার পর একটা মতবাদ চালু করা হচ্ছে মানব সমাজে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে কার্যকর করা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাও তার অবাস্তব নীতির ফলে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে নিজ ঘরেই আত্মহত্যা করে। এখন চলছে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির ছড়াছড়ি। আমাদের চোখের সামনে আছে ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক মতবাদ। এভাবে একটার পর একটা মতবাদ আসছে আর পরীক্ষা চলছে। কোনোটিই মানুষের দুর্ভোগ কমাতে পারেনি, দিতে পারেনি মুক্তি। আসলে মানব মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো মতবাদই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। মানুষের সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র খোদায়ী বিধান, তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। আর এ রাজনীতি, অর্থনীতিসহ মানব জীবনের সকল বিভাগকে পরিচালিত করার সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে

---

৭৭. দৈনিক সংগ্রাম : ৮ অক্টোবার ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম। তাই ইসলামী অর্থনীতিই অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। আধুনিক বিশ্বের সেরা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. মানব জীবনের প্রায় সকল বিভাগের ওপর ইসলামের নির্দেশনা উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থটি ইসলামী অর্থনীতির ওপর তাঁর এক অনবদ্য গ্রন্থ। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ খুরশীদ আহমদ গ্রন্থকারের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক রচনাবলী থেকে চয়ন করে সুনির্বাচিত লেখার এ সংকলনটি তৈরী করেছেন। এর প্রথম অংশে ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশে চিত্রিত হয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা। গ্রন্থটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দারুণ কাজে লাগবে এবং অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের পাথেয় হবে বলে আশা করি।

ইসলামী অর্থনীতি গ্রন্থেও খান সাহেব কর্তৃক অনূদিত অধ্যায়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

১. সঠিক, সহজ ও সরল পথের মানুষদেরকে শয়তানী প্ররোচনার মাধ্যমে বিপথে ধাবিত করার বিষয়টি এখানে আলোচিত হয়েছে। এ প্ররোচনায় না জন আবরণে মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয় এবং মানুষ এক পর্যায়ে এসে তা গ্রহণ করে শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়। এখানে বলা হয়েছে-

"বেহেশতে আদম আ. এবং হযরত হাওয়া আ.কে শয়তান একথা বলে কিছুতেই প্রতারিত করতে পারতো না যে, আমি তোমার ধারা- খোদার নাফরমানী করতে চাই যাতে তুমি বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হতে পার। প্রকৃতপক্ষে শয়তান একথা বলেই প্রতারিত করলো। "হে আদম! তোমাকে কি এমন গাছটি দেখিয়ে দিব যা তোমাকে চিরন্তন জীবন ও চিরস্থায়ী বাদশাহী দান করবে?" শয়তানের উত্তরোত্তর এ ধোঁকাবাজির কবলে আজও মানুষ পতিত হয়। কোন না কোন ভণ্ডামির আবরণে শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করে হকের পথ থেকে সরে আসার।

২. পুঁজিবাদ এবং ধর্মহীন গণতন্ত্রের মাধ্যমে সামাজিক সুবিচারের নামে মানুষকে আবদ্ধ করা হচ্ছে প্রতারণার জালে। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং উদারনীতির নামে এ শয়তানী ব্যবস্থা যুলম-নির্যাতনে দুনিয়াকে গ্রাস করে ফেললে এ প্রতারণা সম্পর্কে মানব জাতি বুঝতে পারে। তখন এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ ধ্বনিত হয়।

৩. সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্রের নামে আবারো প্রতারণার জাল বিস্তার করে শয়তানী শক্তি। এ ব্যবস্থা দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশকে নির্যাতন-নিষ্পেষণে এমনভাবে নিষ্পেষিত করেছে যে, যার নজির মানবীয় ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

৪. বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের পাশাপাশি একশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমান চরম মানসিক গোলামীতে ভুগতে থাকে। তারা এ সকল মতবাদ এর পাশাপাশি সমাজে এবং ইসলামে আমূল পরিবর্তন ঘটানোর চিন্তাভাবনা আরম্ভ করে। তারা মনে করে যে, এসব ছাড়া তাদের কোন মান-সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তারা পরিচিত হবে প্রগতিবিরোধী হিসেবে। এতেই এই নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা ক্ষান্ত হল না তারা নিজেদের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটাও চাইতো যে ইসলামও তার কেবলা পরিবর্তন করুক। তাদের চেতনা ও বাসনা এরকম হলো যে,- "যাদের আনুগত্যে তারা এ উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা পেতে চায় তাদের আনুগত্য ইসলামও করুক এবং 'পশ্চাদগামী দীন' হওয়ার কলংক থেকে ইসলাম বেঁচে যাক।"

উপরোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে চারীদিকে ষড়যন্ত্রের এবং প্রতারণার জাল সম্পর্কে জানা যায়। অথচ সামাজিক সুবিচার রয়েছে কেবলমাত্র একমাত্র ইসলাম-এ। মানুষের মধ্যে সুবিচার কায়েম করা এবং কোনটি সুবিচার ও কোনটি সুবিচার নয়, একথা বলে দেয়া মানুষের স্রষ্টা ও প্রভুরই কাজ। আর প্রকৃত সুবিচার একমাত্র সে ব্যবস্থায় পাওয়া যেতে পারে, যা রচনা করেছেন এমন এক সত্তা যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন এবং যিনি সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ক্ষমতার উর্ধ্বে। সুবিচার করাই ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলাম এসেছেই এজন্যে যে, সুবিচার কায়েম করবে। আল্লাহ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়েতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ইসলাম সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বিষয়াদির কথা উল্লেখ করেছে তা হল-

ক. ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা।

খ. সম্পদ অর্জনের শর্তাবলী।

গ. অর্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রের বিধিনিষেধ।

ঘ. সমাজসেবা।

ঙ. যুলম নির্মূল করা।

চ. জনস্বার্থে জাতীয়করণের সীমা।

ছ. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয়ে শর্ত।

পরিশেষে আমি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে এ প্রশ্ন রাখতে চাই যে, সামাজিক সুবিচার যদি শুধু অর্থনৈতিক সুবিচারের নাম হয়, তাহলে যে অর্থনৈতিক সুবিচার ইসলাম কায়েম করে, তা কি আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এর পরে আর কি কোনো প্রয়োজন আছে, যার জন্যে সকল মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হবে, লোকের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সমগ্র জাতিকে গুটিকয়েক লোকের গোলাম বানিয়ে দেয়া হবে? তাহলে শেষ পর্যন্ত কোন্ বস্তু এ বিষয়ের প্রতিবন্ধক যে, আমরা মুসলমান, আমাদের দেশে ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী খাঁটি শরীয়তের শাসন কায়েম করি এবং খোদার শরীয়ত সেখানে পুরোপুরি কায়েম করে দিই। যেদিনই আমরা তা করব, সেদিন শুধু যে সমাজতন্ত্র থেকে প্রেরণা লাভের কোনো প্রয়োজন হবে না তাই নয়, বরঞ্চ সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষও আমাদের জীবন ব্যবস্থা দেখে অনুভব করবে যে, যে আলোকের অভাবে তারা অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, সে আলোক তাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতি গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয়াবলী পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করে জনাব আব্বাস আলী খান অপরিসীম অবদান রেখেছেন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

স্মৃতি সাগরের ঢেউ

আব্বাস আলী খান ইসলামী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি অন্যতম পুরোধা। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। ইসলামের ওপর অনেক গ্রন্থই তিনি রচনা করেছেন এবং অনুবাদও করেছেন বহু গ্রন্থ। তাঁর রচিত এক একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের চিরদিন প্রেরণা যোগাবে। 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' তার বাধ্যতামূলক আসর অবকাশ যাপন তথা বন্দীশালায় অবস্থানকালে রচিত দীর্ঘ সময়ের স্মৃতিতে ভরা মননের তুলির আঁছড়। দক্ষ ভাষাশৈলী নির্মাণে তিনি একটি স্মৃতি রচনামূলককেও পরিণত করেছেন পাঠকদের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে হিসেবে। বই-কিতাব প্রকাশনীর পক্ষে দিলরুবা আখতার কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৮ পৃষ্ঠায় রচিত 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ'- গ্রনে লেখক আব্বাস আলী খান যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা হল- সূচনা, শিক্ষা ও চাকুরী, দার্জেলিং এ কয়েক মাস, নজরুলের সাথে পরিচয়, জাপানী বোমা ও নিউমোনিয়া, দিলীর লাড্ডু, তমলূক, সরকারী চাকুরী ছাড়ার পর, হাই স্কুলে চাকুরী, সঠিক পথের সন্ধান, জামায়াতে যোগদান, মাছিগোট সম্মেলন, কপোত কপোতী, আলতাফ গওহর, কালা কানুন ও কায়েদে আজম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পৃথক নির্বাচনের ইতিহাস, ভারতীয় কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, ঘোষভ্রাতৃদ্বয়, গান্ধীর রাজনীতি, বঙ্গভঙ্গ ও বৃটিশ পার্লামেন্ট, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা মুহম্মদ আলী, মুসলমান ও হিন্দু পৃথক জাতি, কংগ্রেসের জন্ম, গোলটেবিল বৈঠক, কংগ্রেস শাসন, পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দেশ্য, গান্ধীর ভেতর বাইর, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ, রাখে আলা মারে কে, পীর অলীদের মাযার, সেকাল ও একাল।

Dhaka University Institutional Repository

বায়াত্তরের একত্রিশে জানুয়ারি রাত বারোটায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ডেপুটি জেলার-এর কক্ষে বসার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ কারাবাসের যাত্রা শুরু। কারা প্রকোষ্ঠের নির্জন সেলে বন্দী করে রাখা হয় কিংবদন্তির এই প্রাণ পুরুষ কে। সংকীর্ণ জেলে দিন কাটাতে লাগলেন এবং দুর্বিষহ জীবন-যাপন শুরু হল তাঁর। প্রথম দিকে সংবাদ-পত্রের দেখাও পাননি। এমনকি বইয়ের জগতের কোন যান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও জানার আকাঙ্ক্ষা ছিল না তার। তাঁর ভাষায় এটি ছিল কবরসম জীবন যাপন। তিনি বলেন,

"কবরবাসীদের দেখা হবে- মুনকির-নাকিরের সাথে। হাদীস-কালামের কথা । এখানেও (জেলে) দু'বেলা দু'জন মুনকির-নকীর আসতো। রাতের আঁধারে আসতো ঘন ঘন। অর্থাৎ কিনা দু'ঘণ্টা পরপর একজন।"[৭৮]

'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' রচনার উৎস সম্পকে তিনি বলেন "জেলের মধ্যে এক নিসংগ ও কর্মহীন মানুষ আমি, সাথে এনেছিলুম কালামে এলাহী আর জাস্টিস কায়ানীর- একখানা ইংরেজি বই। আর ছিল কলম ও কালি। পরে কাগজ জোগাড় হয়ে গেল। অগত্যা বসে বসে কাগজের ওপর কালির আঁছড় দিয়ে সময় কাটাতে লাগলুম । শেষটায় সেই আঁছড়গুলো প্রসব করলো 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ'।"[৭৯] বইটি সম্পর্কে আব্বাস আলী খান তাঁর স্বভাবসূলভ বিনয়ী ভাষায় বলেন "অবশ্যি এটা এমন কোন উপভোগ্য বস্তু নয় যা পরিবেশন করার মতন। তবে অবসর মুহূর্তে মনটা যখন চারদিকে স্বর্গে মর্তে বনে বাদাড়ে ঘুরাফেরা করে তখন নিদেন পক্ষে সময় কাটাবার জন্যে এ বইটি কিছুটা কাজে লাগতে পারে।"[৮০]

'স্মৃতি সাগরের ঢেউ'- বইটি কারা প্রকোষ্ঠে বসে অবসর সময়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন এবং কাগজ-কলমের মাধ্যমে ভাষায় রূপ দিয়ে তিনি অন্যান্য গ্রন্থের মত এক অমর গাঁথা রচনা করে গেছেন। বইটিতে সাহিত্যের ছোঁয়া রয়েছে। ভাষাশৈলী নির্মাণে তিনি সুদক্ষ কাব্যকার-এর মত ভূমিকা রেখেছেন। নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ সময়ে রচিত হলেও পাঠকের কাছে মনে হবে এ যেন কোন সুখ স্মৃতিমূলক কোন রচনা। প্রতিটি লাইনে পাওয়া যায় মনের খোরাক্ যার প্রমাণ বইটি প্রকাশের অল্প দিনেই সব কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে জনাব আব্বাস আলী খান সুচিন্তিত ও সৃজনশীল মনন নিয়ে পাঠককে আরো তথ্য সমৃদ্ধ রচনা উপহার দিয়েছেন। তিনি সংযোজন করেন দুটি নুতন অধ্যায়। 'সঠিক পথের সন্ধানে' এবং 'সেকাল ও একাল'। এ দুটি নতুন অধ্যায়ে তিনি স্মৃতি কথার সাথে কিছু তিক্ত ইতিহাস প্রসংঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন। ভবিষ্যাৎ প্রজন্নের জান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সঠিক ইতহাস অবগত হওয়া। এই অনুধাবনই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে ইতহাসের অবতারণা করতে তিনি দৃঢ়ভাবে জানতেন অতীতের সঠিক ইতিহাস না জানলে জাতি দিকভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে তার ইতহাস রচনায় নেই কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ কিংবা বিষোদগার। ইতিহাস সমৃদ্ধ তার এ রচনা লিখিতভাবে জাতীয় জীবনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে কাজে লাগবে। বিশেষ করে তিনি নব প্রজন্ম তথা যুব সমাজ নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই তিনি যুব সমাজকে প্রকৃত ইতিহাস জানিয়ে তাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে দেয়ার প্রচেষ্ট করেছেন।

আব্বাস আলী খান সাহেবের রচিত স্মৃতি সাগরের ঢেউ বইটি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি আল-মাহমুদ বলেন,

---

[৭৮]. আব্বাস আলী খান, স্মৃতি সাগরের ঢেউ বই কিতাব প্রকাশনী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৮। পৃষ্ঠা: ০৮

[৭৯]. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ০৮

[৮০]. আব্বাস আলী খান, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা : ০৯

Dhaka University Institutional Repository

"জনাব আব্বাস আলী খানের 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' বইখানি পড়ে এর অন্তর্নিহিত সাহিত্য রসে আপ্লুত হলাম। আমার ধারণা ছিল একজন রাজনৈতিক নেতার আত্মস্মৃতি স্বভাবতই জটিল রাজনৈতিক ঘটনায় ভরপুর থাকবে। কিন্তু পড়তে গিয়ে এক ধরনের উপন্যাসের গুণ আমাকে শেষ পর্যন্তই টেনে নিয়ে গেল। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ' বক্তব্য ঋজু ও উপস্থাপনা নির্ভীক।"

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বইটি সম্পর্কে বলেন' "স্মৃতি সাগরের ঢেউ কালের একটি বাতায়ন। এ বাতায়নে অতীতে অনেকখানি দেখা যায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঝড়ো দিনগুলোর সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের একটা অন্তরঙ্গ চিত্র খান সাহেব তাঁর এ স্মৃতি চারণায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর স্বচ্ছ ও রসঘন ভাষায় ইতহাসের উপাদানগুলো গল্পের মত সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। রাজনীতিকের হাত থেকে আসা এ ধরনের সাহিত্যে একটা নতুন স্বাদ ও বিশিষ্টতা থাকে 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ'- এ এস্বাদ ও বিশিষ্টতা সকলেরই নজরে পড়বে।"

দেশের বাইরে কিছুদিন

পুস্তিকাটি সুসাহিত্যিক আব্বাস আলী খান-এর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তিনটি দেশ-থাইল্যন্ড, মালোয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণের ওপর লেখা একটি চমৎকার উপস্থাপনা। বইটি প্রকাশ করেছ আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশদাস লেন,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। এটির ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে আগষ্ট ১৯৯৫, রবিউল আউয়াল ১৪১৬, শ্রাবণ ১৪০২ সনে। প্রকাশক বইটি প্রকাশনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন " পুস্তিকাটি লেখকের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তিনটি দেশ-থাইল্যন্ড, মালোয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণের কাহিনী। এ দেশ ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনগুলোর আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। এ পুস্তিকাটি হতে পাঠকগণ দেশ গুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। আশা করি পাঠকবৃন্দ বইটি পড়ে যেমন আনন্দ উপভোগ করবেন, তেমনি ইসলামী আন্দোলনের প্রতি অনুপ্রাণিত হতে পারবেন"[৮১]। পুস্তিকাটির শুরুতে লেখক তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে গেস্ট স্পীকার হয়ে দেশের বাইরে গিয়েছেন। আগস্ট ১৯৯৫ সালে তিনি মালয়েশিয়া সফর করেন। আগস্টের ছয় তারিখ থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত মোট পনের দিন সফর করেছেন। এই সময় তিনি মালয়েশিয়ান ইসলামী যুব সংগঠন 'ABIM'[৮২] এর বিংশতি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত সম্মেলনে যোগদান করেন। এর আগে তিনি একটি পারিবারিক কাজে থাইল্যান্ড সফর করেন। পরে ব্যাংকক থেকে কুয়ালালামপুর গমন করেন। কুয়ালালামপুরে ইফসুর তিনদিনব্যপী ওয়ার্কশপ প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। মালয়েশিয়ার কেলান্তান নামক রাজ্যটিতে পাস (PAS) নামের ইসলামী সংগঠন সরকার পরিচালনা করছে। আগস্ট দশ তারিখে খান সাহেব কেলান্তান সফর করেন। কেলান্তান রাজ্যের ইসলামী সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর[৮৩] সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সাদাসিদা সহজ

---

[৮১]. আব্বাস আলী খান, দেশের বাইরে কিছুদিন, প্রকাশকের কথা

[৮২]. Angkatan Belia Islam –Malayasia Abim –

[৮৩]. মুখ্যমন্ত্রী একজন সাদাসিদে সহজ-সরল খোদাভীরু মুসলমান। প্রখ্যাত আলেম। ভারত, পাকিস্তান, কায়রো জামে আযহার থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। বিলাসিতার পরিবর্তে সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। তিনি সরকারী ভবনে বাস করেন না। সরকার থেকে বেতন যা পান তার চল্লিশ ভাগ ছেড়ে দেন সরকারের জন্য, চল্লিশ ভাগ দেন সংগঠনকে এবং বিশ ভাগ মাত্র খরচ করেন নিজের জন্য। ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী।
তাই হযরত ওমরের জীবনধারা অনুকরণের চেষ্টা করছেন।
(আব্বাস আলী খান, দেশের বাইরে কিছু দিন, আধুনিক প্রকাশনী,আগস্ট ১৯৯৫ পৃষ্ঠা নং ২৯)

Dhaka University Institutional Repository
সরল খোদাভীরু জিন্দেগী দেখে তিনি মুগ্ধ হন। এ সফরে তিনি নওমুসলিম ইউসুফ ইসলামের[৮৪] সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৫ই আগষ্ট এশার নামাযের পর খান সাহেব বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে এক শিক্ষক সমাবেশে যোগদান করেন। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে গুরুত্বপূনর্ণ বক্তব্য রাখেন।
১৭ আগস্ট খান সাহেব মালয়েশিয়া থেকে সিংগাপুর গমন করেন। সেখানে জুরং ইস্টের মসজিদে হাসানাতে বাংলাদেশীদের এক সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। সিংগাপুর থেকে ব্যাংকক হয়ে তিনি ২০ আগস্ট ঢাকা পৌঁছেন।

ইসলামী বিপ্লব : একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব

ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত খ্যাতনামা লেখক ও চিন্তাবিদ আব্বাস আলী খান নানাবিধ বিষয়ে সাবলীল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বহু সাহিত্য গন্থ লিখেছেন । 'ইসলামী বিপব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব' বইটি তাঁর রচিত ক্ষুদ্র, কায় অথচ মূল্যবান একটি গ্রন্থ। খান সাহেব কর্তৃক রচিত ২৩ পৃষ্ঠার এ বইটি ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ৩য় বারের মত প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক প্রকাশনীর পরিচালক এ .বি. এম. এ খালেক মজুমদার বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছেন। বইটি প্রকাশ করেছে আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। উক্ত গ্রন্থে লেখক নবীগণের আগমন, নবী মুহাম্মাদের (সাঃ) বিপ্লব, নবীর পক্ষ থেকে বিপ্লবের ডাক, বাতিলপন্থি দল সত্যের ডাকে সাড়া দিলোনা কেন, প্রথম হিজরত, মদীনায় হিজরত, নৈতিক বিপ্লবের সুফল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

মানব সভ্যতায় ইসলামী বিপ্লবের অবদান এবং এ বিপ্লব যে একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব, সে সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। প্রধানত তিনি ইসলামী বিপ্লবের সিপাহসালার মানবতার মুক্তির মহান দূত নবী করিম (সা.)-এর বিপ্লবের ধরন ও এর ফলে পরিবর্তিত সঠিক অবস্থার সারসংক্ষেপ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেনে। তিনি বই-এর শুরুতেই উল্লেখ করেন ইতিহাসের পাতায় বহু বিপ্লবের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে বিপ্লবের ডাক দেয়ার পূর্বে আরব দেশের অবস্থা ছিল চরম নাজুক। বলা যায় মানুষের সমাজ ছিল বন্য পশুর সমাজ । নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না। অসামাজিক কাজগুলো সম্পাদনে বিবেককে কখনো নাড়া দিতো না । নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদ ছিল সর্বত্র ।

রাসূল (সা.) সমগ্র মানবজাতির সার্বিক সংস্কার সংশোধন এবং মানুষকে প্রকৃত মানবীয় মর্যাদায় ভূষিত করার জন্য মহান ও কঠিন কাজের কর্মসূচি নিয়ে পথ চলা শুরু করেন । তিনি প্রথমতই সকল কিছুর কেন্দ্র-বিন্দু মানুষের মনের সংস্কার সংশোধনে প্রয়াসী হলেন। তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন তার সঠিক আত্ম পরিচয় । আর মানুষ এই আত্ম-পরিচয়ের মাধ্যমে জানতে পারলো সকল কৃতকর্মের হিসাব আলাহ তায়ালার কাছে পেশ করতে হবে এবং কৃতকর্মকান্ডের হিসাব আলাহ তায়অলার কাছে পেশ করতে হবে এবং এর ফলাফলের আলোকে এক চিরসুখময় জীবন অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিময় জীবন ভোগ করতে হবে। এ ভাবনা-ই রাসূলের বিপ্লবের কর্মসূচির সফলতার সূচনা করেছিল।

বিপ্লবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে আল্লাহ তায়ালার নির্ধেশে রাসূল (সা.) সার্বক্ষণিক সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাদেরকে শোনালেন আল্লাহর মহান বাণী এবং শেখালেন ধৈর্য

৮৪. প্রাক্তন পপ তারকা গায়ক ক্যাট স্টিভেনস বর্তমানে নওমুসলিম ইউসুফ ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

ধারনের কথা। বললেন পরীক্ষার কথা এবং আল্লাহর মদদের কথা। এভাবে মক্কায় তেরো বছর ধরে তিনি নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন আদর্শ লোক তৈরি করতে থাকেন। নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন লোক তৈরি করা রাসূল (সা.) এর বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সফলতা।

রাসূল (সা.)-এর নৈতিকতা মানুষের মনের ও চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল। ফলে এক দুর্বার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। অদম্য সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ইসলামের অনুসারীরা সমগ্র আরব বিজয় লাভ করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা তৎকালীন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী ইরান ও রোম সাম্রাজ্য দুটিও করতলগত করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি অর্জন। যার জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শনের পাশাপাশি আল্লাহর পথে জীবন দেয়াকে জীবনের সবচেয়ে পরম কাম্য মনে করতেন।

রাসূল (সা.)-এর নৈতিক বিপ্লবের আলোচনার শেষে আব্বাস আলী খান বর্তমান প্রেক্ষাপটের বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরেছেন । তার সমাধানে রাসূল (সা.)-এর সেই বিপ্লবের অপরিহার্যতার কথা ব্যক্ত করেছেন । তিনি বলেন, সারা বিশ্বে হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, স্বৈরাচারিতা, দর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যৌন অনাচারসহ চরম অবক্ষয় বিরাজ করছে। এই অবক্ষয়জনিত কারণে মুমূর্ষু মানব জাতিকে রক্ষার জন্য তাই একটি সার্বিক নৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন। যে বিপ্লব অনুসরণ করবে নবী

মুস্তাফা (সা.)-এর মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি।

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)

বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম ও উল্লেযোগ্য সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব অর্পিত হয় আব্বাস আলী খান-এর ওপর। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিটি কর্মীর জামায়াতের ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। এ জামায়াতটির সত্যিকার পরিচয় কি, তা গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? কি তার পট ভুমি, ভারতীয় মুসলমানদের কোন জীবনমরণ সন্ধিক্ষন এ জামায়াতের প্রতিষ্ঠা, এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কি তার পরিচয়? আম্বিয়ায়ে কেরামের আন্দোলনের সাথে কি এর সম্পর্ক, দুনিয়ার অন্যান্য আন্দোলনের ও দলের এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রাথক্য কি এমনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানবার কৌতুহল জামায়াত কর্মী কেন ও অন্যান্যেরও থাকা স্বাভাবিক। আর এ প্রয়োজনীয়তা থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার উদ্যোগ নেয়া হয়। চার দিনব্যাপী রুকন সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতভাবে উপস্থাপন করেন আব্বাস আলী খান। রুকন সম্মেলনে রুকনদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এ ইতিহাস বই আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বইখানি প্রকাশ করেছে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিচার্স একাডেমী, ৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার ঢাকা-১২১৭। অত্র একাডেমীর পরিচালক আবদুস শহীদ নাসিম এর প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেছেন। লেখক উক্ত বইয়ে যেসব বিষয়ের আলোচনা করেছেন তা হল : জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, দারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা,

জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত, জামায়াতে ইসলামীর বেশিষ্ট্য, পরিশিষ্ট, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার কিছু মূল্যবান কথা।

আলেমে দীন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর জীবনীর ওপর ২২শে অক্টোবর ১৯৮৫ মওদূদী রিচার্স একাডেমী কর্তৃক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে প্রবন্ধকার ছিলেন এ একাডেমীর চেয়ারম্যান আব্বাস আলী

Dhaka University Institutional Repository

খান। তিনি সেমিনারে 'আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ প্রবন্ধটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে মওদূদী রিচার্স একাডেমী কতৃক পরিচালিত শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট ঢাকা- ১২১৭। প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৮৫ তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০১সালে। লেখক ৩০ পৃষ্ঠার এ বইয়ে সর্বপ্রথম মাওলানার সংগ্রামী জীবন, তাঁর কঠোর শ্রম সাধনা, অগাধ জ্ঞান চর্চা , তাঁর ওপর বিভিন্নমুখী নির্যাতনের কথা উপস্থাপন করেছেন। এরপর তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বলেন, অসাধারণ ও অতুলনীয় মেধাশক্তির অধিকারী হওয়ায় তিনি আরবী ভাষা, কুরআান, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে আলেমকুল শিরোমণি, দার্শনিক, ইসলামী চিন্তানায়ক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সুদক্ষ সংগঠক, বাগ্মী ও সুসাহিত্যিক। তদুপরি তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। এরপর তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী, কোনো আন্দোলন ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, মাওলানা মওদূদীর অবদান, ত্রিশের দশকে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মুসলিম মিল্লাতের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে মাওলানা মওদূদী, তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে মাওলানা মওদূদীর অবদান, চারিত্রিক গুনাবলী ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সবশেষে খান সাহেব লিখেছেন যে, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সারা জীবনের কর্মসাধনার সঠিক মূল্যায়ন করলে একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয় যে, একজন বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি অনেক দ্বীনি খেদমত[৮৫] আঞ্জাম দিয়েছেন। বইয়ের শেষে খান সাহেব মাওলানা মওদূদীর শিক্ষাগত সনদপত্র উল্লেখ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী

১৯৯৭ সালের ২৫-২৭শে ডিসেম্বর টঙ্গীস্থ জামেয়া ইসলামিয়ায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে রুকনদের উদ্দেশ্যে সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগ খান সাহেবের এ ভাষণকে 'ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী' এ শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। জামায়াতের প্রকাশনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেন। বইটির প্রথম প্রকাশ: মে -১৯৯৮, দ্বিতীয় প্রকাশ: জুলাই -২০০৪, আষাঢ় - ১৪১১, জমা. আউয়াল ১৪২৫। বইটির মুদ্রণ করেছে আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭। বইটিতে লেখক অনেকগুল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। খান সাহেব রুকনদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে যেসব বিষয় আলোচনা করেছেন তা হল : ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলনের সূচনা, খুলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন, ভারত উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলন, মুসলিম জাতিসত্তার পদমর্যাদা ও দায়িত্ব, বিপ্লবের জন্য লোক তৈরী, লোক তৈরীর পদ্ধতি, চিন্তা ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি, ব্যক্তি ও দলের অনিবার্য গুণাবলী, দলীয় গুণাবলী, পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত, মুহাসাবা (সংস্কারমূলক সমালোচনা), নিরলস ও অবিরাম সংগ্রাম, আল্লাহর সাথে গভীর নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি, নেতৃত্বের আনুগত্য, জনগণের আস্থা অর্জন, হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাত, শাহাদাতের অভিলাষ জান্নাতের নিশ্চয়তা দান করে।

সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক

স্বনামধন্য লেখক সুসাহিত্যিক আব্বাস আলী খান বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত 'সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক' বইটিতে মানব রচিত মতবাদ সমাজতন্ত্র[৮৬] শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে আবুল আ'লা মওদূদী রিচার্স একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকের দায়িত্ব পালন

---

৮৫. দ্বীনি খেদমত, দ্বীনের খেদমত করা। দ্বীনের বিধিবিধান পালন করা।

৮৬. সমাজতন্ত্র, মানুষের মাঝে ধনী গরিবের ব্যবধান দূর করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এর জন্ম হয় এবং সেখানে এর পতন হয়।

Dhaka University Institutional Repository
করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম, সেক্রেটারী : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিচার্স একাডেমী, ঢাকা ১২১৭। বইটির প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৫। লেখক শুরুতে আশা প্রকাশ করেছেন যে বইখানি শ্রমিক মহলে কাজে লাগবে এবং সমাজতন্ত্রীদের মনভুলানো প্রচার প্রোপাগান্ডার-শিকার হওয়া থেকে শ্রমিক সমাজ ও সাধারণ পাঠকবর্গ নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। এরপর লেখক এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবিচার সমাজতন্ত্রের জন্ম দেয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে শ্রমিক ও সমাজতন্ত্র, শ্রমিকদের ধর্মঘট করা বে আইনি ঘোষিত হয়। শ্রমিক ইউনিয়ন সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন, এক চাকুরী ছেড়ে অন্য চাকুরী গ্রহণ করার উপায় নেই। অমানুষিক কঠোরতা , সমাজতন্ত্রে সাম্যের এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত, পণ্যদ্রব্যের বিস্ময়কর অগ্নি মুল্য, শ্রেণী- বৈষম্য প্রকট, মানুষকে পশুতে পরিণত করা হয়, সমাজতন্ত্র এক অতি নিকৃষ্ট ধরনের পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র : খোদা ও ধর্মবিরোধী একটি মত, সমাজতান্ত্রিক নেতাই সমাজতন্ত্রীদের খোদা, মানবতার সত্যিকার মুক্তি- পথ, জনকল্যাণমুখী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি, সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী লাল বন্ধুদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন।

সবশেষে লেখক বলেছেন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অভিশাপ থেকে সমাজ ও কৃষক-শ্রমিককে মুক্ত করতে হলে ইসলামী ব্যবস্থাই তার এক মাত্র পথ। ইসলাম বিশ্ব মানবতার জন্য খোদার এক বিরাট রহমত।

মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান

প্রখ্যাত গবেষক আব্বাস আলী খান মাওলানা মওদূদীর জীবনীর ওপর অনেক গবেষনাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান' এ গ্রন্থটি ও খান সাহেবের মাওলানা মওদূদীর বিভিন্ন অবদানের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এটি

প্রকাশ করেছে শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ ওয়ারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার , ঢাকা -১২১৭। প্রকাশকাল ঃ প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৫, তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৪, মুদ্রণে : আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা -১২১৭। লেখক এ গ্রন্থে মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান, ইসলামী পুনর্জাগরণ, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, রাজনীতির অংগনে মাওলানার অবদান, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান, তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান, সীরাতে সারওয়ারে আলম, এক নজরে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

সবশেষে লেখক বলেছেন মাওলানার জীবন ও কর্মসাধনা ছিল আয়নার মতো স্বচ্ছ, অমলীন ও সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর চিন্তাধারার ওপর গবেষণার জন্য চিন্তাশীল মহলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : তাঁর চিন্তাধারা

পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা

মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে খান সাহেবের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। তিনি তাঁর মানসপটে পরকালের সুন্দর চিত্র তৈরি করে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে আমাদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর 'মৃত্যু যবনিকার ওপারে' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানব জীবনে মৃত্যু[৮৭] যে অনিবার্য সত্য সে কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "বেঁচে থাকাকালীন মানুষের জীবনে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কত রঙিন স্বপ্ন। কারো জীবন ভরে ওঠে অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দে, লাভ করে জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করার সুযোগ সুবিধে ও উপায়-উপকরণ। ধন-দৌলত, মান-সম্মান, যশ ও গৌরব- আরো কত কি! অবশেষে একদিন সব কিছু ফেলে সকলকে কাঁদিয়ে তাকে চলে যেতে হয় দুনিয়া ছেড়ে। তার তখতে তাউস, বাদশাহী, পরিষদবৃন্দ, উজির-নাজির ,বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীবৃন্দ, অঢেল ধন-সম্পদ কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। পারে না কেউ বহু চেষ্টা তদবীর করেও। অতীতেও কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারেনি আর কেউ পারবেও না ভবিষ্যতে।"[৮৮]রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, সাদা-কালো সবাইকেই স্বাদ গ্রহণ করতেই হয় মরণের। পরকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ উল্লেখ করে তিনি পরকালের উপর সঠিক তথ্য আমাদের নিকট উপস্থাপন করেছেন। পরকাল সম্পর্কে তার স্বচ্ছ ধারণা তাঁর লেখনী থেকে পাওয়া যায় এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "পৃথিবী, আকাশ মণ্ডলী ও তন্মধ্যে যাবতীয় সৃষ্টি একদিন অনিবার্যরূপে ধ্বংস হবে এ ধ্বংসের সূচনা ও বর্ণনা কুরআনে দেয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে, একমাত্র খোদা ব্যতীত আর যত কিছু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর খোদারই নির্দেশে এক নতুন জগত তৈরি হবে। প্রতিটি মানুষ পূর্ণ জীবন লাভ করে খোদার দরবারে উপস্থিত হবে, দুনিয়ার জীবনে সে ভাল-মন্দ যা কিছুই করেছে তার হিসাব-নিকাশ সেদিন তাকে দিতে হবে খোদার দরবারে এটাকে বলা হবে বিচার দিবস, এ দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও বিচারক স্বয়ং আল্লাহ।"[৮৯]

ইসলামী সংগঠন : কাঙ্ক্ষিত নৈতিক মান ও পতনের কারণ

আল্লাহ তায়ালার মনোনীত জীবন বিধান " الاسلام "[৯০]কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগঠন অপরিহার্য। "রাসূল সা. বলেছেন সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। আনুগত্য ছাড়া সংগঠন নেই।"[৯১] একটি আদর্শবাদী সংগঠনের দায়িত্বশীল কেমন হবেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আব্বাস আলী খান নিজেই। সংগঠনের প্রতি তাঁর প্রশ্নহীন আনুগত্য এবং সকল কর্মসূচিতে সময়ানুবর্তিতা প্রমাণ করে তিনি একজন উঁচুমানের দায়িত্বশীল ছিলেন এবং সংগঠন সম্পর্কে তার ধারণা ছিল স্পষ্ট। একটি আদর্শবাদী সংগঠনের কর্মীদের কাঙ্খিত নৈতিক মান কেমন হবে এর জন্য তিনি রচনা করেছেন 'ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান' নামক গ্রন্থ। আর একটি আদর্শবাদী দলের পতন হতে পারে যে সকল কারণে সে ব্যাপারেও তিনি সুন্দর দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এজন্য তিনি আমাদের কাছে তাঁর চিন্তা ও দর্শনকে কলমের তুলি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন 'একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ও তার থেকে বাঁচার উপায়'বইতে।

---

[৮৭]. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر فتنة والينا ترجعون - সূরা আল আম্বিয়া আয়াত-৩৫

[৮৮]. আব্বাস আলী খান ,মৃত্যু যবনিকার ওপারে, আধুনিক প্রকাশনী (নবম প্রকাশ ২০০৫)পৃষ্ঠা নং১৫

[৮৯]. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৫

[৯০]. ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتب إلا من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بأيت الله فإن الله سريع الحساب - সূরা আল ইমরান আয়াত-১৯

[৯১]. عن عمر ابن الخطاب رضـ قال لااسلام الابجماعة ولا جماعة الا بامارة ولا امارة الا بطاعة

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার সমালোচনা

আব্বাস আলী খান প্রচলিত ত্রটিপূর্ণ পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য সমাজ ব্যস্থার ভোগবাদী-চিন্তা চেতনা মানবতাকে ভুলণ্ঠিত করেছে। নৈতিক মুল্যবোধের অভাবে তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবার প্রথা ভেঙে পড়েছে। এক সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হতো না। দুনিয়ার অর্ধেক ভূখণ্ড দখল করে সেগুলোকে তাদের উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছিল। কোটি কোটি মানুষকে তাদের গোলামে পরিণত করেছিল। সে সব অঞ্চল থেকে অর্থ সম্পদ শোষণ করে নিজেদের দেশকে উন্নত করেছে। সমৃদ্ধ করেছে ।তাদের অধিকৃত দেশগুলোতে অন্যায় অবিচার করেছে। কত শত মানুষের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে । সমগ্র পৃথিবীতে তার সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, শ্রেণী সংগ্রাম ও বর্ণ বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে । খান সাহেব বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান পরাশক্তি আমেরিকা তথা যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "বস্তুগত দিক দিয়ে আমেরিকা অতি উন্নত, সমৃদ্ধশালী এবং দুনিয়ার উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী একটি দেশ। কিন্তু বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে, মজলুম মানবতার হাহাকার দুরীকরণে, অন্যায় অবিচারের স্থলে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায় উপরন্ত তাকে অন্যায় অবিচারের প্রশয় দাতা হিসাবে ও অভিযুক্ত করা হয় পক্ষপাতিত্ব, নিষ্ঠুরতা এবং দুর্বল ও অনুন্নত দেশ গুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করা হয়ে থাকে।"[৯২]

ইসলামী শ্রমনীতি : মানব রচিত শ্রমনীতি

খান সাহেব শ্রমিক তথা শ্রমজীবি মানুষের জন্য ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। মানব রচিত শ্রমনীতির মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণী প্রতারিত হয় এ বিষয়টি তিনি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করেছেন। অথচ রাসূল সা. বলেছেন "শ্রমিকের ঘাম শুকাবার পূর্বে তার পাওনা পরিশোধ কর।"[৯৩] মহানবী সা. আরো বলেছেন "নিজ হাতে উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু।"[৯৪]আল্লাহর রাসূলের বাণীকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করে খান সাহেব মানব রচিত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কুফল এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার সুফল এবং উভয় অবস্থায় শ্রমজীবি মানুষের অধিকারের বিষয় তুলনামুলক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

আল্লাহর আইন ও তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা

আব্বাস আলী খান মানুষের তৈরি করা মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ও তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা। তিনি বিশ্বাস করতেন এ প্রথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি[৯৫] আল্লাহর হুকুম এ জমীনে প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালাই মানুষের একমাত্র পালনকর্তা[৯৬], রিযিকদাতা, বিধানদাতা, মৃত্যুদাতা। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই সকল শক্তির একমাত্র উৎস। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

---

৯২. আব্বাস আলী খান, বিদেশে পঞ্চাশ দিন, শৌমী প্রকাশনী (দ্বিতীয় সংস্করন ১৯৯৭)পৃষ্ঠা নং-৩

৯৩ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه ـ.

৯৪ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله

৯৫ واذ قال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى اعلم ما لاتعلمون ـ ـ সূরা আল বাকারা, আয়াত-৩০

৯৬. الحمد لله رب العالمين ـ সূরা আল ফাতেহা, আয়াত -০১

Dhaka University Institutional Repository
ও সংগ্রাম করে গিয়েছেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তার লেখনী চিন্তা-গবেষণা দ্বারা আমাদেরকে জাগ্রত করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

ইতিহাসে গভীর পান্ডিত্য এবং সাবলীল বর্ণনা

আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন খ্যাতমান ইতিহাসবেত্তা। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে ছোটবেলা থেকে তিনি ইতিহাস চর্চা করতেন, তিনি তার চিন্তা-চেতনায় পোষণ করতেন যে কোন জাতিকে তার সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা না দেয়া গেলে সে জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান হচ্ছে "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস"। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বাংলার মুসলমানদের স্বচ্ছ ও বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ ধরনের উচ্চমানের প্রামাণ্য গবেষণা বাংলাদেশের ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

ঈমানের অনিবার্য দাবি : জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা তথা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ[৯৭] ঈমানের অপরিহার্য দাবি হিসাবে মনে করতেন আব্বাস আলী খান। মানুষের তৈরি করা আইন দিয়ে যে সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হয় তা ভেঙে তদস্থলে আলাহর আইনের মাধ্যমে যে সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হয় তা প্রতিষ্ঠার সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টাই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। এককথায় জাহেলী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে সে স্থলে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ অপরিহার্য। একজন মুমিনের জন্য জিহাদ একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। এটি তার ঈমানের অপরিহার্য দাবি আল্লাহতায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মুজাহিদদের অনেক ফজিলত তথা মর্যাদার কথা বলেছেন।[৯৮] রাসূল সা.বলেছেন দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখর হল জিহাদ।[৯৯] একজন মুমিনের জন্য এটা অপরিহার্য যে দ্বীন হক প্রতিষ্ঠার জন্য তথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য তাকে বাতিলের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।[১০০]

---

৯৭. وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتبكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج - ملة ابيكم ابراهيم - هو سمكم المسلمين - من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس - فاقيموا الصلوة واتوا الزكوة واعتصموا بالله - هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير - সুরা হাজ্জ- আয়াত, ৭৮

৯৮. لايستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرار والمجاهدون فى سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة - وكلا واعد الله الحسنى - وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما - সুরা আন নিসা- আয়াত ৯৫

৯৯. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد

১০০. এ সম্পর্কে খান সাহেব লিখেছেন, 'একজন মুমিনের জন্য এটাও অপরিহার্য যে, সে যখন দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার একজন সৈনিক , তখন তাকে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য শত্রুকে চিহ্নিত করে রাখতে হবে। তার শত্রু হলো বাতিলপন্থীর সাথে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাদের সাথে কোন প্রকারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা চলবে না।' এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, " হে মুহাম্মদ তুমি এমনটি কখনো পাবে না যে, যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তারা বন্ধুত্ব রাখে এমন লোকের সাথে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেন । এই বিরোধিতাকারী পিতা হোক, পুত্র হোক, ভাই হোক অথবা আপন স্বজন হোক না কেন । তারা (ঈমানদানগণ) এমন, যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্ ঈমান দৃঢ়ভাবে অংকিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর পক্ষ থেকে একটি আত্মা বা প্রাণশক্তি দান করে তাদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করেছেন। ..... তারাই হলো আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দল অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। (মুজাদিলাঃ ২২) (আব্বাস আলী খান, ঈমানের দাবী,বিশ্ব তথ্যকেন্দ্র, মে'২০০৫,পৃষ্ঠা-৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আন্দোলন : ত্যাগ ও কুরবানী

আব্বাস আলী খান তাঁর সমগ্র জীবনকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতকে মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। লেখনী প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কথাগুলোকে গ্রন্থাকারে উপস্থাপন করেছেন সকল মানুষের কাছে। খান সাহেব মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন আলল্লাহ তায়ালা মানবজাতির একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। ইসলামের মধ্যে মানুষের সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মানুষের ব্যক্তি, পরিবারসহ সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রানন্তকর প্রচেষ্টা তাই ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের জন্য খান সাহেব তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন । জীবনে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নবী মুহাম্মদ সা. এর সাহাবীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাস্তায় মুমিনদের অর্থদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।[১০১]

জনকল্যাণমূলক ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন

আব্বাস আলী খান জনকল্যাণমূলক ইসলামী অর্থনৈতিক ধারণা মনে পোষণ করতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সুদকে অপছন্দ করতেন। সুদ ও মানুষকে প্রতারিত করার মত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। ইসলাম মানুষকে অর্থ উপার্জনের স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে তার জন্য একটি নির্ধারিত সীমারেখা রয়েছে। ইসলামে সম্পদ অর্জনের জন্য বৈধ অধিকার রয়েছে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একজন মানুষ তিনভাবে সম্পদ উপার্জন করতে পারবে।

১.উত্তরাধিকার সূত্র ২.উপার্জন ৩. হেবা বা দান। সে উপার্জনই বৈধ যা হারাম উপায়ে অর্জিত নয়।[১০২] আবার বৈধভাবে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করার ও লাগামহীন স্বাধীনতা মালিককে দেয়া হয়নি। বরঞ্চ তার জন্য কিছু আইনগত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যাতে করে এমন পন্থায় ব্যয় হয় যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়।[১০৩] আর এ ধরনের জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক চিন্তা চেতনায় তিনি তার জীবনকে পরিচালিত করতেন।

---

১০১. مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء - والله واسع عليم - সুরা আল বাকারাহ - ২৬১

১০২. ' চুরি,আত্মসাৎ, মাপে কম-বেশি করা, বলপূর্বক হস্তগত করা । সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার বৃত্তি, মজুতদারী, জুয়া, প্রতারণামূলক সওদা, মাদকদ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অশ্লীলতা প্রচারণার মাধ্যম জীবিকা অর্জন ইসলামে হারাম। এসব সীমারেখার মধ্যে যে সম্পদ অর্জন করবে সে তার বৈধ মালিক হবে। তা বেশি হোক বা কম হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। এ ধরনের মালিকনার জন্যে কম বেশি করার কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করা যেতে পারে না। কম হওয়া এটা বৈধ করে দেয় না যে, অপরের সম্পদ কেড়ে তা বেশী করা যাবে। তার বেশি হওয়া অনুমতি দেয় না যে, বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে কম করা যাবে। অবশ্যি যে সম্পদ এ বৈধ সীমারেখা লংঘন করে অর্জিত হবে এ সে সম্পর্কে এ প্রশ্ন করার মুসলমানদের অধিকার থাকবে যে, এ সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করা হয়েছে'। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামী অর্থনীতি, পৃষ্ঠা-২৯৫)

১০৩. ' ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি তার সম্পদ পাপাচারের জন্য ব্যয় করতে পারবে না। মদ্যপান ও জুঁয়ার দ্বার তার জন্যে রুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যভিচারের দ্বারও বন্ধ করা হয়েছে। মুক্ত স্বাধীন মানুষকে ধরে এনে দাস-দাসী বানানো এবং কেনা-বেচার অধিকার ইসলাম দেয় না। ব্যয়বাহুল্য এবং সীমাতিরিক্ত বিলাসীতা করার উপরেও ইসলাম বিধি-নিষেধ করেছে'।(সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামী অর্থনীতি, পৃষ্ঠা-২৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা

Islam is a complete code of life. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এবং আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলাম।[১০৪] আব্বাস আলী খান ইসলামকে তার বাস্তব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি প্রথমত এ জীবন বিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ লেখাপড়া করতেন। ইসলামের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে তিনি অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআন, সাহাবীদের জীবন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার উপর তিনি প্রচুর লেখাপড়া করেন। ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিটি বিষয়ে তার জ্ঞানের গভীরতা ছিল ঈর্ষনীয়।

ইলমে তাসাউফের দর্শন

আব্বাস আলী খান ব্যক্তিগত জীবনে একজন আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইলমে তাসাউফের উপর যথেষ্ঠ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। সরকারি চাকুরি ছাড়ার পর তিনি ফুরফুরার পীর মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দীকির হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি পীর সাহেবের দরবারে ইসালে সাওয়াবের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে ইলমে তাসাউফ চর্চায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দায়রা শরীফে অবস্থানকালীন সময়ে মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী তাঁকে দুটি বই দিয়েছিলেন একটি আল জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ অন্যটি হল হিযবুল্লা। এই দুটি পড়ে ইসলাম জানার তাঁর তীব্র আগ্রহ জাগে। তিনি পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে বিভিন্ন সবক ও তালকীন গ্রহণ করে ইলমে তাসাউফ এর চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। পীর সাহেবের একজন উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী জীবনে ইলমে তাসাউফের প্রভাব তার জীবনে লক্ষ্য করা যায়।

অমুসলিমদের অধিকার সচেতনতা

আব্বাস আলী খান অমুসলিমদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মুসলিম মানুষে মানুষে কোন বিভেদ তৈরি করাকে কখনো উৎসাহিত করেনি। এক্ষেত্রে রাসূল সা. আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। রাসূল সা. মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। রাসূল সা. অমুসলিমদের ইজ্জত-আব্রুর জান-মালের নিরাপত্তাসহ সকল ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিধান করেছিলেন। পাশাপাশি তাদের সাথে সুন্দর ও ভাল আচরণের ও নির্দেশ দিয়েছিলেন । এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "যারা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয় না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না বরং তাদের অধিকার আদায় কর।"[১০৫] এ আয়াত অমুসলিমদের অধিকারের শিক্ষা দেয়। রাসূল সা. এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন যে, "অমুসলিমদের উপর কোন জুলুম করা হলে আমি নিজেই যালেমদের বিরূদ্ধে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে মুকাদ্দমা দায়ের করবো।"

---

১০৪. ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتب إلا من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بأيت الله فإن الله سريع الحساب -- সূরা আল ইমরান আয়াত-১৯

১০৫. ولاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلون فى الدين ولم يخرجوكم من ديياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين সুরা আল মুমতাহানা - ০৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : গুণাবলি ও অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্বাস আলী খানের গুণ-বৈশিষ্ট্য

শিক্ষানুরাগ ও জ্ঞান চর্চা

খান সাহেব শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও প্রচুর পড়াশুনা করতেন। বাংলা ইংরেজি এবং উর্দু এ তিন ভাষাতেই ছিল তাঁর সমান দখল। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি কখনো পড়া এবং লেখা কোনটিই ত্যাগ করেননি। তিনি ছিলেন মহান শিক্ষক। হাজারো লাখো জনতা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। উত্তরবঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্ট। ধর্মীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকে সর্বস্তরের জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি জীবন সায়াহ্নে প্রতিষ্ঠা করেন "সাদাকা ফাউন্ডেশন। এগুলি তার শিক্ষানুরাগের ফসল।

খোদাভীরুতা ও পরহেজগারী

খান সাহেব ছিলেন বড় তাহাজ্জুদ গুজার , ফরজ ওয়াজিব ও সুন্নাত নামায সমূহ তো বটেই নফল নামাজ সমূহও তিনি নিয়মিত আদায় করতেন। নামাজের হিফাজতের ক্ষেত্রে এবং খুশু খুজুর সাথে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি এস্তেখারা করতেন এবং আল্লাহর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করতেন। একান্তে যখন তিনি তাফসীর পড়তেন তখন তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত।

দায়িত্ববোধ

খান সাহেব তাঁর দায়িত্ব যথাযথ পালন করতেন। পারিবারিক, সাংগঠনিক,সকল কাজ তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রায়ই পারিবারিক বৈঠক করতেন এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য বলতেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের দোষত্রুটি তুলে ধরতেন এবং সংশোধনের জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি সবাইকে পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করে পরকালে চির শান্তির জীবন কে বেছে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলতেন। আলাহর মাগফিরাত লাভের বাসনা জাগ্রত করার উপদেশকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক দায়িত্ব হিসাবে মনে করতেন।

কর্মপ্রিয়তা

তিনি নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসতেন । তিনি কখনো অলস সময় কাটাতেন না। ঘরে কিংবা অফিসে কোন কাজ অথবা লেখা এবং পড়া নিয়ে তিনি মগ্ন থাকতেন। একজন সাধারণ মানুষের মত তিনি ঘর গৃহস্থালির কাজ করতেন। কোন কাজকেই ছোট মনে করতেন না। শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকায় যে কোন ধরনের কায়িক পরিশ্রম তিনি করতে পারতেন এতে তার ক্লান্তি বোধ হত না ।

নিয়্যতের নিষ্ঠা ও ইখলাস

খান সাহেবের নিয়্যত ছিল খাঁটি । তিনি নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সাথে ইসলামী আন্দোলনের সত্তাকে সুদীর্ঘ সময় ধরে রেখেছিলেন। তাঁর খুলুসিয়তের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না। তাঁর একনিষ্ঠ মনোবৃত্তির কারণে কোন পার্থিব লোভ লালসা তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের এ কঠিন পথ থেকে একবিন্দুও দূরে সরতে পারেনি। তাঁর ঐকান্তিক এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের গণমানুষের কাছে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পৌছেছে।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন তিনি খুবই পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল। তাঁর চিন্তা, চেতনা ও ধ্যান ধারণা ছিল অত্যন্ত পরিস্কার , পরিচ্ছন্ন। তিনি সর্বদা পুতপবিত্র থাকতে পছন্দ করতেন। ভদ্র, মার্জিত ও পরিপাটি জীবন যাপন করতেন । তিনি নিজের কাপড় চোপড় নিজেই ধুইতেন। নিজেই ইস্ত্রী করতেন। তিনি পাশ্চাত্যের

Dhaka University Institutional Repository

অপবিত্র ও নাপাক সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনা করতেন। তিনি পুত-পবিত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতেন। বাহ্যিক এবং আত্মিক উভয় দিক থেকে তিনি পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন।

কষ্ট সহিষ্ণুতা

খান সাহেব ছিলেন অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তি। বাংলাদেশের জেলা, শহর, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল কখনো কখনো সড়ক পথে, কখনো রেল পথে, কখনো নৌপথে পরিভ্রমন করেছেন। কখনো তাকে পরিশ্রান্ত বা ক্লান্ত মনে হয়নি। এমনি কি বিদেশে ভ্রমনে ১৮/২০ ঘণ্টা বিমান ভ্রমনের পরেও ঠিক সময়মত তিনি সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে সাবলিল ভঙ্গিমায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯৯১- এর প্রলংকারী ঘুর্ণি ঝড়ের পর অশিতিপর বৃদ্ধ নেতা ছুটে গেছেন চট্রগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। দিন, রাত নৌকায়, হেঁটে তিনি রিলিফসামগ্রী বিলি করেছেন। দু:স্থ অসহায়, সম্বলহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সাহস যুগিয়েছেন এবং প্রাণ ভরে দোয়া করেছেন। মৃত্যুর তিন মাস পূর্বেও তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ পাঠাগারের জন্য তিন তলা বিল্ডিং এর কাজটি নিজে সার্বক্ষণিক তদারকী করেন।

সময়ানুবর্তিতা

খান সাহেবের দৈনন্দিন জীবন ছিল রুটিন মাফিক। তিনি সব কাজেই পানচুয়েল ছিলেন তার সহকর্মীদের নিকট তার যে গুণটি সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় ছিল তা হচ্ছে তার সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ। প্রতিটি অনুষ্ঠানে , বৈঠকে তিনি ঠিক সময়ে উপস্থিত হতেন। নামাজের কাতারে সামনে গিয়ে বসতেন। তিনি কখনো অলস সময় কাটিয়েছেন এমন কখনো দেখা যায়নি। তার এ রুটিন মাফিক জীবন যাপন পদ্ধতি সকলের জন্য অনুকরণীয় এবং অনুসরণযোগ্য।

শৃংখলা ও আনুগত্য

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই পবিত্র ও সুশৃংখল। তিনি সংগঠনের সকল সিদ্ধান্ত বিনা বাক্যে মেনে নিতেন। তিনি ছিলেন জামায়াতের নায়েবে আমীর। তাঁর বয়স আমীরে জামায়াতের চাইতে আট বছর বেশী ছিল। কিন্তু তিনি সাধারণ কর্মীর মতোই তাঁর আনুগত্য করতেন। আনুগত্য শৃংখলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সংগঠনকে খুব ভালবাসতেন। তিনি সাংগঠনিক শৃংখলা মেনে চলতেন, মতের পার্তক্য থাকা সত্ত্বেও ঐক্যমতে কাজ করতেন।

সুবক্তা

তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভাষায় বক্তৃতা করতেন । রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গালাগাল করাতো দূরের কথা, কখনো কাউকে মর্যাদা হানিকর কোন কথা বলেন নি। তাঁর বক্তব্য হতো হৃদয়গ্রাহী, জ্ঞান গর্ভ ও শিক্ষানীয় তাঁর বাচন ভঙ্গী ছিল নিখুত এবং শব্দ চয়নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারঙ্গম। সব ক্ষেত্রেই ছিল তার নিজস্ব একটি ভঙ্গিমা এবং প্রতিটি শব্দ শ্রোতাদের অন্তরে প্রবেশ করত। বক্তব্য প্রদান করার সময় তিনি নিজে কখনো উত্তেজিত বা আবেগ প্রবণ হতেন না। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় মানুষ আবেগ আপ্লুত হয়েছে এবং ডুকরে কেঁদে চোখের পানি ফেলেছে। মহান আলাহ তায়ালা তাঁর কণ্ঠে দিয়েছিলেন এমন এক গাম্ভীর্য ও তেজ যা বয়সের ভারে কখনো ক্ষীণ হয়নি।

সুসাহিত্যিক

খান সাহেব ছিলেন এক উচ্চমানের সাহিত্যিক। স্মৃতি সাগরের ঢেউ বইতে তাঁর সাহিত্যে রসিক হিসাবে পরিচয় মিলে। শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও তিনি প্রচুর পড়াশুনা করতেন এবং সময় ও সুযোগ থাকলেই তার লেখনী দ্বারা দেশ ও জাতিকে আলোকিত করার চেষ্টা করছেন। বাংলায় ইংরেজী এবং উর্দু এ তিন ভাষাতেই ছিল তার সমান দখল। তিনি অনেক গুলো বই অনুবাদ ও করেছেন । সংশিষ্ট ভাষায় কত খানি দখল ছিল তা তার অনুবাদ গ্রন্থগুলো পাঠ করলে অনুধাবন করা যায়। তার লেখনী প্রতিভা সম্পর্কে দৈনিক সংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository
সম্পাদক আবুল আসাদ লিখেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাহিত্য চর্চায় তিনি সময় দিতে পারলে একজন ভাল উপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবে আবির্ভূত হতে পারতেন।

বহু ভাষাবিদ ও গবেষক

তিনি বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন । আরবী, ফার্সি ভাষাও জানতেন। আরবীতে তাঁর দখল এতটা ছিল যে একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক হওয়ার পর ও জুমার নামাযে খুতবা দেয়ার অনুরোধ আসলে দ্বিধা দ্বন্ধ ছাড়াই উঠে পড়তেন মিম্বরে। খুতবা দিতেন একজন যোগ্য আলেমের মতোই। নামাযে ইমামতি করতেন অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়াক্তে প্রায়ই নতুন নতুন আয়াত তেলাওয়াত করতেন। উর্দু ভাষায় তাঁর পান্ডিত্য ছিল এত বেশী যে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বই , পর্দা ও ইসলাম, আসান ফেকাহ, ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার বইসহ অনেকগুলি বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইতিহাসবেত্তা

তিনি ছিলেন একজন বড় ইতহাসবিদ ও গবেষক, ইতিহাসের একজন ভাল ছাত্র হিসাবে ছাত্র অবস্থায় তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। তাঁর রচিত বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস । ইতিহাসের ছাত্র শিক্ষকদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। অসম্ভব পরিশ্রম, ধৈর্য এবং একাগ্রতার সমন্বয়ে তিনি রচনা করেন, "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" । তার সাহিত্য জীবনের এক অসমান্য চূড়াস্পর্শী এ গ্রন্থটি কেবল আজকের দিনের জন্য নয় আগামী শতাব্দীর জন্য এটি সমান দরকারি গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে। তিনি ইতিহাসের কেবল বহিরাঙ্গকেই ধারণ কনেনি স্পর্শ করেছেন তার অন্তর্গত দেয়ালকেও।

প্রখর স্মৃতিশক্তি

তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। ছোট বেলায় কোন কবিতা বা উদ্ধৃতি মুখস্ত করলে জীবনের শেষ বয়সেও তা অনায়াসে কোন রকম হের ফের ছাড়া হুবহু বলে দিতে পারতেন। তিনি কুরআনের অনেক অপরিচিত আয়াত মুখস্থ পারতেন। তাঁর বিরল স্মৃতিশক্তির কারণে ৮৫/৯০ বৎসরের বৃদ্ধ বয়সেও জামায়াতে ইসলামীর মত একটি বৃহৎ সংগঠন পরিচালনা করতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হননি।

আকর্ষণীয় কণ্ঠের অধিকারী

খান সাহেব ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষনীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী । তিনি সুমধুর সুরে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি কুরআনের ঐতিহাসিক কাহিনী এবং হক বাতিলের দ্বন্ধ সংঘাতপূর্ণ আয়াতগুলো পড়তেন মধুর কণ্ঠে আর শ্রোতারা অজান্তে ভেসে যেতো সে সংগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমিতে। খান সাহেব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর কনিষ্ঠ নাতনী শামীমা পারভীন চৌধুরী পারু লিখেছেন "নানাজী বাড়ীতে থাকলে নানাজীর কুরআন তেলাওয়াতের মধুর কণ্ঠের আওয়াজ শুনেই ঘুম ভেঙ্গে যেতো। নানাজী কখনও ডাকতেননা যে উঠ নামাজ পড়।" তাঁর কণ্ঠ সুন্দর হওয়ায় তিনি শিল্পী
আব্বাস উদ্দীনের গান গাইতেন।

ইলমে তাসাউফের সর্বোচ্চ কামালিয়াত হাসিল

ফুরফুরা শরীফের পীর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আবদুল হাই সিদ্দিকীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি লাভ করেন। তাসাউফের পথে অগ্রসর হয়ে ফুরফুরা শরীফের খলিফার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে তার আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। তিনি ফুরফুরা শরীফের বড় বড় আলেমদের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে ইলমে তাসাওফের সর্ব্বোচ্চ কামালিয়াত হাসিল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী

আব্বাস আলী খান ছিলেন আজীবন সুস্বাস্থের অধিকারী। তিনি ছিলেন খুব নিয়মতান্ত্রিক। তার জীবন ছিল সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত, সব সময় অল্প খাবার খেতেন। নিয়মানুবর্তিতা এবং কঠোর সময়ানুবর্তিতা ও পরিশ্রমের কারণেই তিনি তাঁর স্বাস্থ্যকে অটুট রাখতে পেরেছিলেন। তিনি কায়িক পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করতেন না।

সুন্দর হস্তাক্ষর

তাঁর হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি সাধারণ কলম ব্যবহার করতেন। কিন্তু তার প্রতিটি বর্ণ ছিল স্পষ্ট। তিনি বানান ভুল লিখতেননা। তাঁর বাংলা ইংরেজী ও আরবী প্রতিটি লেখাতেই ছিল শৈল্পিক ছোয়া।

ত্যাগ ও কুরবানী

আল্লাহর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা থাকার কারণে পার্থিব দু:খ কষ্ট বিপদ আপদেও তিনি কখনো পেরেশান হয়ে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেননি। তিনি তার জীবনের সব কিছু ইসলামী আন্দোলনের জন্য ত্যাগ করেছেন। তিনি বলতেন পার্থিব জীবনের প্রাচুর্য, বিত্ত, বৈভব ইত্যাদি সবই মানুষকে পিছুটান দেয়। এজন্য তিনি কখনো বিত্ত বৈভবের পিছনে দৌড়াননি। এসবকিছু ত্যাগ করে আখেরাত মুখী জীবন গঠন করেছেন।

রাসুল (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণ

তিনি ছিলেন রাসুলুলাহ সা. এর পরিপূর্ণ অনুসারী। রাসুলের জীবনাদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছেন । এবং অন্যদেরকে সে আদর্শের আলোকে চলতে উৎসাহিত করেছেন। শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, পারিবারিক , সামাজিক, রাস্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই তিনি রাসুলের আদর্শকে অনুসরণীয় বলে মনে করতেন। ইসলামী আন্দোলন যে ত্যাগ কুরবানী, ধৈর্য, অধ্যবসায়, বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা আশা করে তা কেবল জীবনকে আখেরাত কেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে পারলেই সম্ভব। এক্ষেত্রে তিনি নবী সা. সাহাবাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেছেন রাসুলুল্লাহ সা. এর নির্দেশে মক্কার সাহাবাগন রা. যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন কোন পিছু টানই তাদেরকে আটকে রাখতে পারেনি। অত্যন্ত প্রশান্ত মন নিয়ে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেছেন। অন্যদিকে মদীনায় আনসার সাহাবাগন রা. এ অসহায় মুহাজীরদের ভরণ পোষনের দায়িত্ব নেন। আর্থিক অবস্থা তাদেরও ভাল ছিলোনা। কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রশান্ত মনে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। মুহাজির ও আনসার উভয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে আখেরাত কেন্দ্রিক জীবন গঠন ও রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য। আব্বাস আলী খান ছিলেন রাসুলের একজন স্বার্থক অনুসারী ।

আতিথেয়তা

খান সাহেব ছিলেন খুব অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর আতিথেয়তা সকলকেই মুগ্ধ করত। তার বাসা থেকে আপ্যায়ন ব্যতীত আসা ছিল অসম্ভব। রাসুল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন অতিথিকে সম্মান করে।" তিনি রাসুল (সা.) এর এ বাণীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাস আলী খানের অবদানসমূহ

শিক্ষা বিস্তারে অবদান

'আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশাল অবদান রেখেছেন। সরকারী চাকুরীজীবি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করলেও তিনি এক পর্যায়ে সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তিফা দিয়ে নিজেকে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত করেন। ১৯৫২ সালে তিনি জয়পুর হাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করে ধ্বংস প্রায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। এভাবে আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাল ধরে সে গুলোকে মানুষ গড়ার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

আমাদের দেশের নৈতিকতা বিবর্জিত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের জনগণের আশা আকাংখার প্রতিফলন করতে ব্যার্থ হয়েছে । এ বিষয়টি খান সাহেব গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিত আদর্শিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নৈতিক মান সম্পন্ন উন্নত জাতি গঠনের মানসে এবং উত্তরবঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি তা'লীমুল ইসলাম ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এ ট্রাস্টের অধিনেই পরিচালিত হচ্ছে তা'লীমুল ইসলাম স্কুলএন্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসাবে গড়ে তোলা ছিল তাঁর আজীবন স্বপ্ন । এ ট্রাষ্ট সম্পর্কে খান সাহেব লিখেছেন জীবনকর্ম ১১৬/১১৭

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় মেরিন বায়োলজী অন্তর্ভূক্তকরণ

খান সাহেবের শিক্ষানুরাগ এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে পরিচিতির কারণেই তাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পন করা হয়। তার মন্ত্রীত্বকালীন সময়েই তিনি চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন বায়োলজী পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেন।

সাদাকা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সর্বস্তরের জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর জীবন সায়েহে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'সাদাকা ফাউন্ডেশন'। বর্তমানে এই ফাউন্ডেশনটি আব্বাস আলী খান ফাউন্ডেশন' নামে পরিচালিত হচ্ছে তিনি চেয়েছিলেন এই ট্রাস্ট গঠিত এবং পরিচালিত হোক আত্মীয় স্বজন ও নিকটজনদেও দ্বারা। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আদর্শ ও কর্মসূচী থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ যেন বিচ্যুত না হয় সম্বভত এশারণেই তিনি ট্রাস্টি হসিাবে মনোনীত করেছিলেন আমাকে ও অন্যান্যদেরকে। অনেক গুলি মহৎ উদ্দেশ্যকে[১০৬] সামনে রেখে এ সাদাকা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।

---

১০৬. ক. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও বিকাশের জন্য পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা।

খ. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বুদ্ধিজীবী সমাবেশ, ওয়াজ মাহফিল, সিরাত মাহফিল এবং তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আয়োজন কর।

গ. সমাজের সৃষ্টিশীল মানব সম্পদকে গবেষণা, প্রকাশনা এবং প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত করা।

ঘ. ইসলামের মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি আলোকিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ এবং প্রয়োগে সহায়তা প্রদান করা।

ঙ. গণযোগাযোগের সকল মাধ্যমকে ব্যবহার করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। তার প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের এই পাঁচদফা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি ট্রাস্টিদের উপর অপন করেছেন বিভিন্ন কর্মসূচী। এ মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জয়পুরহাটে তার নিজস্ব জমিতে একটি সম্পূর্ণ লাইব্রেরী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা এবং এই ফাউন্ডেশনের কর্মসূচীতে রয়েছে বিস্তারিত পরিকল্পনা যেমন-

১. সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান ওেখেছেন এমন কৃতি ব্যক্তিদের বৃত্তি, পুরস্কার পারিতোষিক ও পদক প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ ওলিউলাহ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

লাইব্রেরী হলো মনের খোরাক। আব্বাস আলীখান একথা ভালভাবে উপলব্ধি করেন। এছাড়া ছোট বেলা থেকে বই কেনা এবং বই পড়া ছিল তাঁর শখ। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসোবে দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি তাঁর শখ অনুযায়ী স্কুল লাইব্রেরীকে মনের মত করে সাজিয়েছিলেন। তাঁর শখের বাস্তব প্রতিফলন হল তিনি জয়পুরহাটে তাঁর নিজস্ব জমিতে একটি লাইব্রেরী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। এর নামকরণ করেন "শাহ ওয়ালিউল্লাহ পাঠাগার"। মৃত্যুর তিন মাস পূর্বেও তিনি পাঠাগারের জন্য ৩য় তলা বিল্ডিং এর কাজটি নিজে সার্বক্ষণিক তদারকী করেন। এ পাঠাগারের জন্য তিনি অনেক দূর্লভ বই সংগ্রহ করেন।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিচার্স একাডেমী প্রতিষ্ঠা

উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী এর সাহিত্য ও তাঁর জীবন কর্মকে মানুষের নিকট সুন্দর করে উপস্থাপন করার প্রত্যয়ে আব্বাস আলী খান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শুধু মাত্র মাওলানা মওদূদীর জীবন দর্শন নয় ইসলামের সঠিক পরিচয় মানুষের নিকট উপস্থানের নিমিত্তে ইসলামী সাহিত্য রচনা , সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করা সহ এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার জন্য মওদূদী রিচার্স একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। খান সাহেবের বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলে মাওলানা মওদূদী রিচার্স একাডেমী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়্যারম্যান হিসাবে তিনি আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

মননশীল পত্রিকা প্রকাশ

সংবাদপত্রকে বলা হয় "Store house of knowledge" সংবাদপত্রকে সমাজের দর্পনও বলা হয় । একটি মননশীল পত্রিকা দেশের নাগরিকদের সুপ্ত প্রতিভা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে খান সাহেব সঠিক সংবাদ প্রবাহের জন্য এবং দেশের নাগরিকদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের জন্য "দৈনিক সংগ্রাম" পত্রিকা পত্রিকা প্রকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খান সাহেব ছিলেন এ প্রকাশনার সূচনালগ্নের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি এ পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনেক মেধা ও শ্রম দিয়েছিলেন। খান সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকৃত্রিম আন্তরিকতার ফসল হল আজকের "দৈনিক সংগ্রাম" পত্রিকা। পত্রিকাটি বর্তমানে ইসলম প্রিয় নাগরিকদের মুখপাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জয়পুর হাট ঈদগা ময়দান প্রতিষ্ঠা

মুসলমানদের উৎসব হচ্ছে দু'টি। একটি "ইদুল ফিতর অপরটি ঈদুল আজহা" এলাকার জনসাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ঈদের নামাজ ভালভাবে জামাতের সাথে আদায় করতে পারে সে বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি নিজ এলাকায় একটি ঈদগা ময়দান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর অনেক দূর-দুরান্তের মানুষ এ ঈদগাহ মাঠে নামাজ আদায় করতে আসেন। তিনি আমৃত্যু এ ঈদের নামাজে ইমামতি এবং খুৎবা দিয়েছেন।

---

২. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকামের জন্য সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন , পুস্তক-পুস্তিকা, মনোগ্রাম, প্রচারপত্র প্রকাশ ও প্রচারের জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৩. পাঠাগার কেন্দ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে সার্বিক সহযোগিতা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

৪. সমাজের দুস্থ অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সাহায্যার্থে অনুদান এবং সমাজ কল্যাণমূলক নানা সেবামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের সহযোগিতা করা।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : আব্বাস আলী খানের সময়কাল (১৯১৪-১৯৯৯)

আব্বাস আলী খান ১৯১৪ খৃস্টাব্দে জয়পুরহাট জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময় বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল বৃটিশ শাসনাধীন। খান সাহেব (১৯১৪-১৯৯৯) সর্বমোট ৮৫ বছর আয়ুস্কাল পেয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনি বৃটিশ শাসনামল, পাকিস্তানী শাসনামল এবং বাংলাদেশ আমল সারাসরি অবলোকন করেন।

সমসাময়ীক অবস্থা : (১৯১৪-১৯৯৯)

আব্বাস আলী খানকে বলা হয় ত্রিকালের সাক্ষী। তিনি বাংলাদেশে তিন ধরনের শাসন প্রত্যক্ষ করেন, বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানী শাসন, বাংলাদেশী শাসন। তাঁর সময়ের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অবস্থা কেমন ছিল তা উপস্থাপন করা প্রয়োজন। অত্র অধ্যায়ে প্রথমে বৃটিশ শাসনামল এরপর পাকিস্তানী শাসনামল ও বাংলাদেশী শাসনামল উল্লেখ করা হবে।

- বৃটিশ উপনিবেশিক শাসান (১৭৫৭-১৯৪৭)
- পাকিস্তানী শাসন (১৯৪৭-১৯৭১)
- বাংলাদেশী শাসন (১৯৭১-১৯৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : বৃটিশ ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৫৯৯ খৃঃ কতিপয় ব্যবসায়ীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর[১] জন্ম হয়। রানী এলিজাবেথের অনুমোদনক্রমে তারা ভারতের সাথে ব্যবসা শুরু করে। ১২১২ খৃষ্টাব্দে বাদশা জাহাঙ্গীরের কাছে

থেকে সনদ লাভ করে। এ কোম্পানী সর্বপ্রথম সুরাট বন্দরে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬৪৪ সালে তারা বাদশা শাহজাহানের ফরমান সহ বাংলায় উপস্থিত হয়, এবং শাহ সুজা মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে তাদের বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। ইংরেজ বণিকরা উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে মেতে

---

[১] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঃ রানী এলীজাবেথ প্রদত্ত সনদের (১৬০০ খ্রি.) মাধ্যমে সৃষ্ট ব্রিটিশ নৌ সংগঠনটি প্রাচ্যের জলপথে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে এবং পরবর্তীসময়ে ভারতে উপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আন্তঃমহাসাগরীয় যোগাযোগ উন্মুক্ত হওয়ার পর পশ্চিম ইউরোপের নৌ ঘাঁটিসমূহ বহির্দেশে উপনিবেশ সম্প্রসারণের সুযোগ পায়।

প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ : ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রানী এলিজাবেথ প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে সৃষ্ট কোম্পানির প্রাথমিক নাম ছিল 'The Governor andCompany of Merchants of LondonTrading in to the East Indies'

অনেক বছর পর্যন্ত প্রাচ্যে সমুদ্র যাত্রার আয়োজন ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগকারী নিজেই করত। ১৬০৮ খ্রি: এমন একটি সমুদ্র যাত্রা সুরাটে পৌছালেও কোন পণ্য আদান প্রদান হয়নি। পর্তুগিজরা তাদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৬১২- খ্রিষ্টাব্দে মুগল প্রশাসক থেকে কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। তখন পর্তুগিজ শক্তিকে পাল্টা শক্তি দ্বারা মোকাবেলা করা হয়। ১৬১৫ খ্রিঃ রাজা প্রথম জেমস স্যার টমাস রোকে সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর দরবারে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। রো কর্তৃক সম্রাটকে রাজার পক্ষ থেকে উপঢৌকন প্রদান এবং তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহার সম্রাটকে সন্তুষ্ট করে। ফলশ্রুতিতে দূত যা প্রার্থনা করেছিল তা সম্রাট মঞ্জুর করেন। তিনি বানিজ্য করার অনুমতি চেয়ে তা লাভ করেন। এভাবে কোম্পানি দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে শুরু করে যেগুলোকে তাঁরা ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যকুঠি বলে আখ্যায়িত করেছিল। ১৬৩৯ খ্রি. কোম্পানি ওয়াল্ডিওয়াশ-এর স্থানীয় প্রশাসকের কাছ থেকে একটি অনুমতি লাভ করে। এর মাধ্যমে কোম্পানি মাদ্রাজে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা লাভ করে এবং এ স্থানে নিজেদের ভূখণ্ডের ন্যায় শাসন করার অধিকার পায়। মাদ্রাজে ফোর্ট সেন্ট গির্মানের পর এটি ভারতের কোম্পানি বাণিজ্যের দফতরে পরিণত হয়।মহানদী বদ্বীপের হরিহরপুরে ১৬৩৩ খ্রিঃ একটি ফ্যাক্টরি স্থাপনের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রবেশ করে। ফেব্রুয়ারী মাসের ০২ তারিখে ইংরেজগণ সম্রাট শাহ আলম থেকে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি সম্বলিত একটিফরমান লাভ করে। কোম্পানি বাংলার সুবাদার শাহ সুজা এর কাছ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন সুবিধা পায়। সুবাদার ইংরেজদেরকে বার্ষিক নামমাত্র ৩০০০ টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনাশুল্কে বানিজ্য করার অধিকার লাভ করেন। এ সুবিধাটি পরবর্তি সময়ে কোম্পাকি বাংলার রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করে। একই বছরে ইংরেজরা হুগলি তাদের ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। ১৬৫৮ খ্রিঃ তারা কাসিমবাজারে আরও একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। ১৬৬৮ খ্রিঃ বাংলার রাজধানী ঢাকায় একটি নতুন ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়। জব চার্নক কর্তৃক ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা শহরের পত্তন হওয়ার মাধ্যমে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা পূর্ণতা পায়। এর পর থেকে বাংলায় কোম্পানি আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কোম্পানি সুবাহ বাঙ্গালায় তাদেও নানা দাবি অর্জন সবসময় আইনগত অধিকার হিসাবে দেখেছে। এভাবে কোম্পানি সম্রাট থেকে একটি নতুন ফরমান লাভ করে। এ ফরমানের দ্বারা কোম্পানি বার্ষিক তিন হাজার টাকা পরিশোধের মাধ্যমে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে শোভা সিং-এর বিদ্রোহ কোম্পানিকে এর কলকাতা বসতির নিজস্ব প্রতিরক্ষা তৈরি করার সুযোগ করে দেয়। সুবাদার এর সামরিক তাৎপর্য অনুধাবন না করেই কোম্পানিকে অনুমতি প্রদান করেন। কোম্পানির প্রভাব বিস্তারের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল কলকাতা সুলতানটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারি ক্রয় করা যার মাধ্যমে একটি শক্তির ভিত্তি নীরবে রচিত হয়। ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বী অপর একটি কোম্পানি গঠিত হয়, এবং একটি General Society Trading for East Indies নামে সংসদীয় ভাবে অঙ্গীভূত হয়। এ ঘটনা সমূহের পর কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম স্থাপিত হয়। এবং ১৭০০ সালে এটি একটি স্বাধীন প্রেসিডেন্সিতে রুপান্তরিত হয়। ১৭০২ সালে দুপ্রতিদ্বন্দ্বী East India Companies একটি নতুন সনদেও মাধ্যমে একীভূত হয় এবং নতুন নাম The United Company of Merchants of England Trading to the East Indies গ্রহণ করে। যদিও কোম্পানির শেষ সময় পর্যন্ত এটির প্রচলিত নাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহাল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছিল, যার ফলশ্রুতিতে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ দৌলাকে পরাজিত করে চিরদিনের জন্য মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করে। নবাব সিরাজ দৌলার পতনের পর মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পিছিয়ে পড়ে। বাংলা, বিহার তথা ভারত ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু'শ বছরে এদেশের জনগনের ভাগ্যে যা হবার তাই হয়েছে । অবশ্য কিছু বিষয় মংগল সাধিত হলেও পরাধীনতার অভিশাপ, লাঞ্ছনা, অপমান জাতিকে জর্জরিত করেছে । সিরাজদ্দৌলার পতনের অব্যবহিত পরে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর যে শাসন নিষ্পেষণ চলেছিল তার নজির ইতিহাসে বিরল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দারিদ্র দেশকে গ্রাস করে ফেলে । পলাশী যুদ্ধের পর মীর জাফর নাম মাত্র নবাব থাকলেও সামরিক শক্তির নিয়ন্তা ছিল ইস্টন্ডিয়া কোম্পানী। ১৭৬৪ সালের পর দেশের অর্থনীতিও সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা ও সর্বদিক দিয়ে। ঐতিহাসিকরা মোটামোটি হিসাব করে বলেছেন ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র ২৩ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চালান হয় ৩ কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড।[২] পলাশিযুদ্ধের পূর্বে সামরিক ও বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। কোম্পানী ক্ষমতা হস্তগত করার পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রথমধাপেই মুসলিম সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়। তার ফলে শুধু কিছু উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারীই বেকার হয়ে পড়েনি, বরঞ্চ হাজার হাজার নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীও কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে।

ফকীর আন্দোলন : ১৭৬৪ সালে মীর কাসেমের পরাজয়ের পর ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী যখন দেওয়ানী লাভ করে তখন থেকে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচারমূলক শাসন চালাতে শুরু করে। তার পর থেকে ফকীর আন্দোলন[৩] শুরু হয় এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৩৩ বা ১৮৩৪ সালে। তাদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য

---

[২] মুর্শিদাবাদের খাযাঞ্চিখানা থেকে পাওয়া গেল পনর লক্ষ পাউন্ডের টাকা, অবশ্য বহুমূল্য মণিমাণিক্য দিয়ে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রিটিশ স্থলসেনা ও নৌসেনা পেলো চার লক্ষ পাউন্ড; সিলেক্ট কমিটির ছয়জন সদস্য পেলেন নয় লক্ষ পাউন্ড; কাউন্সিল মেম্বররা পেলেন প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার পাউন্ড; আর খোদ ক্লাইভ পেলেন দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড, তাছাড়া ত্রিশ হাজার পাউন্ড বার্ষিক আয়ের জমিদারীসহ বাদশাহ প্রদত্ত উপাধি 'সাবাত জং'। অবশ্য পলাশী বিজয়ী ক্লাইভের ভাষায় 'তিনি এতো সংযম দেখিয়ে নিজেই আশ্চর্য '। মীর কাসিম দিয়েছেন নগদ দুলক্ষ পাউন্ড কাউন্সিলের সাহায্যের জন্যে। মীর জাফর নন্দন নজমদ্দৌলা দিয়েছেন এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাউন্ড। এছাড়া সাধারণ সৈনিক, কুঠিয়াল ইংরেজ কত লক্ষ মুদ্রা আত্মসাৎ করেছে, বলা দুঃসাধ্য। বিখ্যাত জরিপবিদ জেমস রেনেল ১৭৬৪ সালে বাইশ বছর বয়সে বার্ষিক হাজার পাউন্ডে নিযুক্ত হন, এবং ১৭৭৭ সালে বিলাত ফিরে যান ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করে। এ থেকেই অনুমেয়, কোম্পানির কর্মচারীরা কী পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করতেন। তারা এ দেশে কোম্পানী রাজ্যের প্রতিভূ হিসেবে এবং চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর হোমে প্রত্যাগত হয়ে এরূপ রাজসিক হালে বাস করতেন যে, তাঁরা 'ইন্ডিয়ান নেবাবস' রূপে আখ্যাত হতেন। . . . . . ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন, "আমি কেবল স্বীকার করতে পারি, এমন অরাজকতা, বিশৃংখলা, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধনাপহরণের পাশব চিত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি।" অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এ শোষাণযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদূদ, পৃ: ৬০-৬২)

৩. ফকির আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মজনু শাহ, মাজু শাহ, টিপু পাগল ও গৎনফর তুর্কশাহ। খালেকদাদ চৌধুরী তাঁর ময়মনসিংহে ফকীর অভিযান প্রবন্ধে মজনু শাহকে মাজু শাহের বড়ো ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেন। ১৭৬৪ সালে মীর কাসেম আলীর পরাজয়ে . . . এ দেশে ইংরেজ অধিকার বদ্ধমূল হয়। দক্ষিণাঞ্চরের বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ঐ একই সালে মজনুর (মজনু শাহ) অনুচরদের হাতে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। (বিপ্লব আন্দোলনে দক্ষিণবংগের অবদান আজিজুর রহমান, হাসান জামান সম্পাদিত 'শতাব্দী পরিক্রমা', পৃ: ১৮০)।

১৭৮৪ সালে মাজনুশাহ ময়মনসিংহ, আলাপসিং, জাফরশাহী এবং শেরপুর পরগণার জমিদারদের সমস্ত ধন-দৌলত লুণ্ঠন করে। সেখানে সংবাদ রটে যে, মাজু শাহের ভাই মজনু শাহ দুইশ' দুর্ধর্ষ ফকীরসহ জাফরশাহী পরগনায় আসছেন। তাঁর এই অভিযানের ভয়ে জমিদার এবং প্রজারা অন্যত্র পালিয়ে যায়। কিন্তু ঢাকার চীফ মিঃ ডে-ও রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বেগমবাড়ীর সৈন্যবাহিনীই সেই অভিযান প্রতিরোধ করে। ফলে ফকীরেরা ফিরে যায়। মিঃ ডে-ও রিপোর্টে আরও উল্লেখ আছে যে, জমিদারদের ধন-সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণাঞ্চলের ছিল ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্ট ও তাদের আশ্রয়পুষ্ট শোষণকারী জমিদারদের উচ্ছেদ করা ও তাদের অর্থাগার লুট করা। উত্তরাঞ্চলে এদের অভিযানের ফলে বহু জমিদার ইতিপূর্বেই (১৭৭৩) ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

ফরায়েজী আন্দোলন

ফরায়েজী আন্দোলন[৪] বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুসলমানদের ধর্ম, তাহজিব-তমদ্দুনকে ধ্বংস করে হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার করে ফেলার এক সর্বনাশা পরিকল্পনা শুরু করে হিন্দুজমিদারগণ। বাংলার মুসলমানদের

ফরায়েজী আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুসলমানদের ধর্ম, তাহজিব-তমদ্দুনকে ধ্বংস করে হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার করে ফেলার এক সর্বনাশা পরিকল্পনা শুরু করে হিন্দুজমিদারগণ । বাংলার মুসলমানদের এহেন চরম দুর্দিনে ১৭৮৪ সালে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। ১৮ বছর বয়সে তিনি হজ্জ পালন করেন। এরপর আরো আঠারো বছর সেখানে থেকে সমাজ, রাজনীতিতে শিক্ষা গ্রহন করেন এবং ১৮২০ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ এদেশকে দারুল হরব হিসেবে ঘোষণা দেন। মুসলমানদের ধূতি ছেড়ে তহবন্দ/পায়জামা পরিধান করতে বলেন। সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে তাওবা করতে বলেন।

লুণ্ঠনের ব্যাপারটি সত্য নয়। খাজনা ফাঁকি দেয়ার জন্যে সুচতুর ও অসাধু জমিদারেরা এরূপ মিথ্যা সংবাদ রেভেনিউ কমিটির কাছে পাঠিয়েছিল। (শতাব্দী পরিক্রমা, পৃ: ২৭)

পুনরায় ফকীর অভিযান শুরু হয় দু'বছর পর ১৭৮৬ সালে। ময়মনসিংহকে ফকীরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে লেফটন্যান্ট ফিন্ডকে ঢাকা পাঠানো হয়। ময়মনসিংহের কালেক্টর রাউটনের সাহায্যের জন্য আসাম গোয়ালপাড়া থেকে ক্যাপ্টেন ব্রেটনকে পাঠানো হয়। সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্যদের সাথে ফকীরদের যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়, তাতে ফকীর বাহিনী পরাজিত হয়ে ছত্রভংগ হয়ে যায়। তারপর আর বহুদিন যাবত তাদের কোন তৎপরতার কথা জানা যায় না। ফকীরদের অভিযান বন্ধ হওয়ার পর জমিদারগণ তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের নাম করে প্রজাদের কাছ থেকে বর্ধিত আকারে রাজস্ব আদায় করতে থাকে এবং নতুন কর ধার্য করতে থাকে। তাতে প্রজাদের দুর্দশা আরো চরমে পৌছে। প্রজাদের নির্যাতনের অবসানকল্পে ১৮২৬ সালে টিপু পাগল নামক জনৈক প্রভাবশালী ফকীর কৃষক প্রজাদের নিয়ে এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন। জমিদারেরা সকল ন্যায়নীতি ও ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন নং -৮ অগ্রাহ্য করে প্রজাদের ওপর নানাবিধ 'আবওয়াব' ধার্য করতে থাকে। এসব আবওয়াব ও নতুন নতুন উৎপীড়নমূলক কর জবরদস্তি করে আদায় করা হতো। তাছাড়া জমিদারেরা আবার প্রতিপত্তিশালী লোকদের কাছে তাদের জমিদারী অস্তায়ীভাবে উচ্চমূল্যে ইজারা দিত। ইজারাদারেরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উৎপীড়নের মাধ্যমে প্রজাদের কাছ থেকে উচ্চহারে খাজনা আদায় করতো। এসব উৎপীড়ন বন্ধের জন্যে টিপু প্রজাদেরকে সংগঠিত করেন। এসব অভিযানকারী ফকীরদেরকে ইতিহাসে অনেকে লুণ্ঠনকারী দস্যু বলে অভিহিত করেছেন। আসলে ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন জনগণের শ্রদ্ধয় অলী-দরবেশ শ্রেণীর লোক।

[৪] সম্ভবত ঃ ফরায়েজ শব্দটি থেকে ফারায়েজী আন্দোলনের উৎপত্তি। মুসলমান সমাজে ইসলামের ফরয কাজগুলি ভুলতে বসেছিল এবং অনৈসলামী আচার অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজে প্রচলিত করেছিল। যাবতীয় ইসলাম বিরোধী রীতি নীতি পরিত্যাগ করে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পুন প্রতিষ্ঠাই ছিল মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, সৈয়দ নিসার আলী, তিতুমীর প্রমুখ মনীষীদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একত্ববাদকে নির্ভেজাল রূপের ওপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রুসূল সা. এর প্রবর্তিত নয় এমন সব স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি 'শরক' বলে প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বিতীয়ত তিনি ইসলামের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য বা 'ফরজ' পালনের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন, যেমন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ধর্মীয় কর বা যাকাত প্রদান করা, রমজান মাসে রোজা রাখা, হজ্জ পালন করা। এ খেতেই হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শোষিত, বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মুসলমান জনসাধারণ হাজী শরীয়তুল্লাহর[৫] আহ্বানে নতুন প্রাণ সঞ্চার অনুভব করল এবং দলে দলে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনে হিন্দু স্বার্থে চরম আঘাত লেগেছিল বলে তারা ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় তাঁকে দমন করতে সকল শক্তি প্রয়োগ করল।

শহীদ তিতুমীরের আন্দোলন

শহীদ তিতুমীর সমসাময়িক একজন অতীব মজলুম ব্যক্তি। তিনিও হাজী শরীয়তুল্লাহর মত অধঃপতিত মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর এ নিছক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে হিন্দু জমিদারগণ শুধু প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করেনি, ইসলাম র্ধম এবং মুসলমান জাতির প্রতি তাদের অন্ধ বিদ্বেষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

৫.শরীয়তুল্লাহ, হাজী (১৭৮১-১৮৪০) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ইসলামি সংস্কারক। তাঁর নামানুসারে শরিয়তপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমাধীন শ্যামাইল গ্রামের এক ছোট তালুকদার পরিবারে ১৭৮১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি মক্কা গমন করেন এবং বাংলাদেশে ফিরে আসেন ১৮১৮ সালে। দেশে ফিরে তিনি তৎকালীন আরবের ওহাবী আন্দোলন এর অনুরূপ ইসলামি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর শুরু করা আন্দোলন পরবর্তীকালে ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়।

শরীয়তুল্লাহর সংস্কার আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয়। কিন্তু সমাজের অন্যান্য বেশ কিছু দিকও এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ইসলামি পুনরভ্যুদয়ের সমর্থক, একজন সমাজ সংস্কারক এবং একজন জনপ্রিয় কৃষক নেতা হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি র কুশাসন, শোষণ ও অত্যাচারে বাংলার জনগণের নাভিশ্বাস উঠে ছিল। ১৭৯৯ সালে ১৮ বছর বয়সে মক্কা গমনের সময় শরীয়তুল্লাহ রেখে যান প্রভুসুলভ আচরণকারী নীলকর দের নির্যাতন ও অত্যাচারে নির্যাতিত, নির্বাক, নিদারুণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট অসহায় জনগণকে। নীলকরদের পাশাপাশি সংঘবদ্ধ মাড়োয়ারি সম্প্রদায় ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর অধীনে বড় বড় জমিদারি ক্রয় করত।

এর অধীনে বড় বড় জমিদারি ক্রয় করত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়োজিত গোমস্তাগণ ছিল মধ্যস্থতাকারী তৃতীয় গ্রুপ। এরা ছিল প্রধানত মাড়োয়ারি এবং তাদের বাঙালি সহযোগিগণ। এই গোমস্তাদের ছিল সারা দেশের হাট-বাজার ও নদী-বন্দরের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। যৌথভাবে পরিচালিত হিংস্রতা ও অত্যাচার মানুষজনকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের ক্রীতদাসদের পর্যায়ে উপনীত করে। এই ভয়াবহ সামাজিক পরিবর্তন তৎকালীন ইংরেজ পুলিশ কমিশনারের বার্ষিক রিপোর্টে 'ঘৃণ্য বিপ্লব' হিসেবে আখ্যাত হয়েছে। ১৮১৮ সালে শরীয়তুল্লাহ দেশে ফিরে আসেন। মক্কায় তৎকালীন বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদদের তত্ত্বাবধানে প্রায় দুই দশক তিনি ধর্ম শিক্ষা ও আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি একটি ভাল ও সম্মানজনক ভবিষ্যৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। ১৭৯৯ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত আরবে তাঁর অবস্থানকালে সৌদি শক্তির উত্থান ও পতন এবং 'মাওয়াহিদুন' বিপ্লব অর্থাৎ তথাকথিত ওহাবীবাদের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। খেদীব মুহম্মদ আলীর পুত্র ইবরাহিম পাশার নেতৃত্বে মিশরীয় অভিযানের মাধ্যমে সৌদি শক্তি পরাভূত হয়। কিন্তু ইসলামি পুনরুজ্জীবনের বিপ্লবী ধর্মীয় উদ্দীপনা আরবদের হৃদয়কে টগবগে এবং স্পন্দিত ও সজীব করে তোলে। এই পুনরুজ্জীবনের অগ্নিশিখা সঙ্গে নিয়ে শরীয়তুল্লাহ ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশে তা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে নিজস্ব সংগ্রামের ফল ব্যতীত মানুষের আর কিছুই নেই, তাই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হয় যে, যিনি জমি চাষ করেন তার উৎপাদিত ফসলের ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে সৃষ্ট জমিদারদের কোন অধিকার নেই। হাজী শরীয়তুল্লাহ তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দেন যে, হিন্দু প্রতিবেশীদের বহু ঈশ্বরবাদী পূজা উৎসবে অংশ নেওয়া যাবে না। জমিদার কর্তৃক তাদের ওপর আরোপিত কোন ধরনের ফসলী-করও প্রদান করা যাবে না। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুগ রাজস্বই কেবল প্রদান করা যাবে। এই নীতি সদ্য সৃষ্ট হিন্দু ভূ-স্বামিগণকে শরীতউল্লাহর আন্দোলনের বিরোধিপক্ষ হিসেবে প্রকাশ ঘটায়। হিন্দু ভূ-স্বামিগণ কৌশলে রক্ষণশীল মুসলিম কৃষকসহ তাদের পৃষ্ঠপোষক শক্তিসমূহকে একত্রিত করেন এবং নীলকরদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে ১৮৪০ সালের দিকে উভয় পক্ষ ক্রমশ সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। এ অবস্থায় ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ মারা যান এবং তাঁর পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েজীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। [মঈন-উদ-দীন আহমদ খান]

Dhaka University Institutional Repository

পলাশী যুদ্ধের পঁচিশ বছর পর ১৭৮২ খৃ: সাইয়েদ মীর নিসার আলী তিতুমীর[৬] পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে প্রকৃত পীর এর সন্ধানে তিনি মক্কা গমন করেন। সেখানে

---

[৬] **তিতুমীর** (১৭৮২-১৮৩১) বাংলার প্রজাকুলের ওপর স্থানীয় জমিদার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনের নেতা। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার। মুসলিম সমাজে শিরক ও বেদআতের অনুশীলন নির্মূল করা এবং মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য।

তিতুমীরের প্রকৃত নাম সায়্যিদ মীর নিসার আলী। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুর (মতান্তরে হায়দারপুর) গ্রামে ১১৮৮ বঙ্গাব্দের (১৭৮২ খ্রি.) ১৪ মাঘ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মীর হাসান আলী এবং মায়ের নাম ছিল আবিদা রোকাইয়া খাতুন। তিতুমীরের পরিবারের লোকেরা নিজেদের হজরত আলীর রা. বংশধর বলে দাবি করতেন। তাঁর এক পূর্বপুরুষ সায়্যিদ শাহাদাত আলী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব থেকে বাংলায় আসেন। শাহাদাত আলীর পুত্র সায়্যিদ আবদুল্লাহ দিল্লির সুলতান কর্তৃক জাফরপুরের প্রধান কাজী নিযুক্ত হন এবং তাঁকে 'মীর ইনসাফ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। শাহাদাত আলীর বংশধরগণ 'মীর' ও 'সায়্যিদ' উভয় বংশানুক্রমিক খেতাবই ব্যবহার করতেন।

গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিতুমীর স্থানীয় এক মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। তিনি ছিলেন কুরআনে হাফেজ, বাংলা, আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষ এবং আরবি ও ফারসি সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগী। তিনি ইসলামি ধর্মশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, দর্শন, তাসাওয়াফ ও মানতিক বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিতুমীর একজন দক্ষ কুস্তিগীর হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন।

তিতুমীর ১৮২২ সালে হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কাশরীফ যান এবং সেখানে তিনি বিখ্যাত ইসলামী ধর্মসংস্কারক ও বিপ্লবী নেতা সায়্যিদ আহমদ বেরেলভীর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। সায়্যিদ আহমদ তাঁকে বাংলার মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতিনীতির অনুশীলন এবং বিদেশী শক্তির পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে তিতুমীর চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী অনুশাসন প্রচার শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের শিরক ও বেদআত অনুশীলন থেকে বিরত থেকে ইসলামের অনুশাসন মোতাবেক জীবনযাত্রা পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেন। বিশেষ করে তাঁতি ও কৃষকদের মধ্যে তিনি ব্যাপক প্রচারকার্য চালান। কিন্তু অচিরেই মুসলমানদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং তাদের ওপর অবৈধ কর আরোপের জন্য পুরার হিন্দু জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তিতুমীরের সংঘর্ষ বাধে। কৃষককুলের ওপর জমিদারদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে অপরাপর জমিদারদের সঙ্গেও তিতুমীর সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এসব অত্যাচারী জমিদার ছিলেন গোবরডাঙার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাগোনিয়ার রাজনারায়ণ, নাগপুরের গৌরীপ্রসাদ চৌধুরী এবং গোবরা-গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়।

এ প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা এবং কৃষকদের নিরাপত্তা দানের লক্ষ্যে তিতুমীর এক মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে তাদের লাঠি ও অপরাপর দেশীয় অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষণ দান করেন। তাঁর শিষ্য ও ভাগিনেয় গোলাম মাসুমকে বাহিনীর অধিনায়ক করা হয়। তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে জমিদারগণ তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজদের সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। গোবরডাঙার জমিদারের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির ইংরেজ কুঠিয়াল ডেভিস তার বাহিনী নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান করে পরাজিত হন। তিতুমীরের সঙ্গে এক সংঘর্ষে গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার নিহত হন। বারাসতের কালেক্টর আলেকাজান্ডার বশিরহাটের দারোগাকে নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান করে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। এ সময়ে তিতুমীর ইন্দ ইন্ডিয়া কামপানি সরকারের কাছে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

তিতুমীর ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে নারকেলবাড়িয়ায় এক দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর মুজাহিদ বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ নিয়োগ করে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দান করেন। মুজাহিদদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারে উপনীত হয়। কলকাতা থেকে একটি ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। কিন্তু ইংরেজ ও জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনী মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। অবশেষে লর্ড বেন্টিঙ্কের লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ১০০ অশ্বারোহী, ৩০০ স্থানীয় পদাতিক, দুটি কামানসহ গোলন্দাজ সৈন্যের এক নিয়মিত বাহিনী তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী মুজাহিদদের উপর আক্রমণ চালায়।

মুজাহিদগণ সাবেকি ধরনের স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে বাঁশের কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংরেজরা কামানে গোলাবর্ষণ করে কেল্লা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ প্রাণ হারায়। বহুসংখ্যক অনুসারিসহ তিতুমীর যুদ্ধে শহীদ হন (১৯ নভেম্বর ১৮৩১)। মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক গোলাম মাসুমসহ ৩৫০ জন মুজাহিদ ইংরেজদের হাতে বন্দি হন। গোলাম মাসুম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৪০ জন বন্দিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

[মুয়াযযম হুসায়ন খান]

Dhaka University Institutional Repository
সাইয়েদ আহমেদ বেরলবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তখনই মীর নিসার আলী তার হাতে বায়আত করে মুরীদ হন। মক্কা থেকে তিনি কলকাতায় সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর পরার্মশ সভা সমাপ্তির পর নিজ গ্রাম চাঁদপুরে ফিরে এসে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তার পর ইসলামী দাওয়াতরে কাজ শুরু করেন।

তিতুমীরের দাওয়াতের মূলকথা ছিল ইসলাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং প্রত্যেকটি কাজকর্মে আল্লাহ তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন । কৃষক সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

সারফারাজপুর নামক গ্রামবাসীর অনুরোধে তিনি তথাকার শাহী আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচারের জন্য তাঁর একটি খানকাহ তৈরী করেন।

তিতুমীর যে কাজ শুরু করলেন তার মধ্যে অন্যায়ের কিছু ছিলনা। বরঞ্চ মুসলমান হিসাবে এ ছিলতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু হিন্দুগণ তা সহ্য করবে কেন? মুসলমান জাতিকে নির্মূল করার গভীর ষড়যন্ত্র তাদের নস্যাৎ হয়ে গেল। তারা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লো তিতুমীর ও তার অনুসারীদের প্রতি তাদেরকে নির্মূল করার জন্য আর এক নতুন চক্রান্ত শুরু হলো। হিন্দুদের চক্রান্ত্রের ফলশ্রুতিতে ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার ৫০ জন বন্দুক ও তরবারীধারীকে নিয়ে নারিকেলবাড়ীয়ায় পৌছেন। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে মুসলমানদের বীরত্ব দেখে আলেকজান্ডার বিস্মিত হন এবং দারোগা ও একজন জমিদার মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। বেগতিক অবস্থা দেখে আলেকজেন্ডার প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করেন।

পরবর্তীতে আলেকজান্ডারের রিপোর্ট এর ভিত্তিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার কর্নেল স্টুয়ার্টকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করে তার অধীনে একশত ঘোড়া সওয়ার, গোরা সৈন্য তিন শত পদাতিক সৈন্য দুটি কামানসহ নারিকেল বাড়ীয়া অভিমুখে যাত্রা করার নিদের্শ দেয়। ১৫ই নভেম্বর রাতে কোম্পানী সৈন্য নারিকেলবাড়ীয়া পৌছে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিতুমীরের লোকজন বাঁশের কেল্লা তৈরী করে। ইংরেজ সেনাপতি ও তিতুমীরের সাথে কিছু কথোপকথন হয়, যাতে দোভাষীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝি হয় ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের সাথে তিতুমীরের লোকজন টিকতে পারেনি। কয়েক জন শহীদ হন বাকীরা বন্দী হন। এভাবে তিতুমীরের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

সাইয়েদ আহমেদ শহীদের জেহাদী আন্দোলন

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠে। এ আন্দোলন পরিচালিত হয়ে ছিল একমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারাই। এ আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিলেন সাইয়েদ আহমেদ শহীদ[৭] বেরলভী (র.) এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল অসমুদ্র হিমাচলে একটি অখন্ড

---

[৭]. **সাইয়েদ আহমদ** ৬ ই সফর ১২০১ হিজরী (ইং ১৭৮৬) এলাহাবাদের রায় বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনী লেখকগণ তাঁর জন্ম সংক্রান্ত এক বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পুণ্যময়ী জননী স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর রক্তে লেখা একখানি কাগজ পত পত করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর জনৈক নিকটাত্মীয় স্বপ্নের কথা শুনে বলেন, চিন্তার কার নেই। আপনার গর্ভ থেকে যিনি জন্মগ্রণ করবেন তিনি হবেন ইতিহাসের একজন অতি খ্যাতনামাা ব্যক্তি। - (সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৫৬)। এ স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর অনুসারীদের তাজা খুনে বাংলাদেশ থেকে বালাকোট পর্যন্ত ভারতভূমি রঞ্জিত হয়েছে। তাঁদের সে রক্তলেখা স্মৃতি পরবর্তী এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত মুসলমানদেরকে অবিরাম জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে- বিদেশী ও বিধর্মী শাসন- শোষণের নাগপাশ থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করে।

সাইয়েদ আহমদের বয়স যখন চার মাস চারদিন তখন সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে মকতবে পাঠানো হয়। কিন্তু শিশু সাইয়েদ আহমদের শিক্ষার প্রতি কোন অনুরাগই ছিল না।

গোলাম রসুল মেহের বলেন, শৈশবে কেন যে তিনি শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন তা বলা মুশকিল। তবে পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, তিনি ফারসী ভালোমত রপ্ত করে ফেলেছিলেন এবং অনর্গল এ ভাষায় কথা বলতে পারতেন। আরবী ভাষাও এতটা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কিন্তু কতিপয় লোকের চরম বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ অভীষ্ট লক্ষে পৌছা সম্ভাব হয়নি। তথাপি এ আন্দোলনের আগা গোড়া যে রূপ গোপনে ও সুনিপুণ কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়, তা কল্পনাকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দেয়। মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সাইয়েদ সাহেব তাঁর জ্ঞান চক্ষু খুলে দেয়। তিনি দেখলেন তার সামনে ৩টি পথ

১. হককে পরিত্যগ করে বাতিলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

২.হককে পরিত্যগ না করে হকের সঙ্গে থেকে বিপদ আপদ নীরবে সহ্য করা।

৩. পুরুষোচিত সাহস ও শৌর্যবীর্য সহকারে বাতিলের মুকাবিলা করা।

সাইয়েদ সাহেব তৃতীয় পথটা অর্থাৎ আল্লাহর পথে জেহাদকে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে এবং পরকালের মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করেন। বালাকোটের শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁর অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বৃটিশ ভারতের প্রথম আযাদী সংগ্রাম

১৮৫৭ খৃঃ ভারত ব্যাপী এক প্রচন্ড বৃটিশবিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়। শাসক গোষ্ঠী তার নাম দিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ। এটি ছিল মূলত সিপাহী বিপ্লব[৮]। ১৮৫৭ সালে জনতা, সিপাহী, মুজাহেদীন মিলে যে সংগ্রাম শুরু

শিখেছিলেন যে, "মেশকাতুল মাসবীহ" নিজে নিজেই পড়তে পারতেন। তার বড় ভাই সাইয়েদ ইবরাহীম ও সাইয়েদ ইসহাক তাঁ পড়াশোনার জন্যে যথেষ্ট তাকীদ করতেন। কিন্তু পিতা নৈরাশ্য সহকারে বলতেন, "বিষয়টি তার উপরেই ছেড়ে দাও।"
মৌলভী সাইয়েদ জাফর আলী নকভী বলেন, শাহ ইসমাইল প্রতিদিন ফজর নামাজের পর হাদীস ব্যাখ্যা করে শুনাতেন। সাইয়ে সাহেবও কোন কোন হাদীসের গুরুত্ব বণনা করতেন এবং শ্রোতাগণ এর থেকে উপকৃত হতো। বাল্যকাল থেকেই সাইয়েদ আহম শরীর চর্চায় অভ্যস্থ ছিলেন এবং তিনি ছিলেন অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী। শৈশবকাল থেকে তার মধ্যে জেহাদের প্রেরণ জাগ্রত ছিল এবং তিনি প্রায় সমবয়সীদের সামনে বলতেন 'আমি জেহাদ করব' 'আমি জেহাদ করব।' সকলেই এটাকে শিশুসুল প্রগলভ উক্তি মনে করতো। কিন্তু তাঁর মা শিশুর এ উক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। গোলাম রসুল মেহের তাওয়ারিখে আজমিয়া বরাত দিয়ে বলেন, বালক সাইয়েদ আহমদ বস্তীর বালকদের মধ্য থেকে একটি 'লশকরে ইসলাম' দল গঠন করতেন এবং উচ্চস্ব জেহাদী শ্লোগানসহ একটি কল্পিত 'লশকরে কুফফার' এর ওপর আক্রমণ চালাতেন এবং 'ইসলামী সেনাদল' জয়লাভ করলো এ 'কাফের সেনাদল' হেরে গেল বলে চিৎকার করে আকাশ-বাতাস মুখরিত করতেন।- (সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসু মেহের, পৃঃ ৫৯)

[৮] **সিপাহি বিপ্লব, ১৮৫৭** মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে শুরু হয় এবং শীঘ্রই তা মিরাট, দিল্লি এ ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এটা সারা বাংলাদেশ জুড়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এ সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ বাংলাদেশকে সতক ও উত্তেজনাকর করে তুলেছিল। ১৮৫৭ সালের ১ নভেম্বর চট্টগ্রামের পদাতিক বাহিনী প্রকাশ্য বিদ্রোহে মেতে ওঠে এবং জেলখানা হতে সকল বন্দিদের মুক্তি দেয়। তারা অস্ত্রশস্ত্র এ গোলাবারুদ দখল করে নেয়, কোষাগার লুণ্ঠন করে এবং অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হয়।

চট্টগ্রামে সিপাহিদের মনোভাব ঢাকার রক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সিপাহিদের আরও অভ্যুত্থানের আশংকায় কর্তৃপ ৫৪তম রেজিমেন্টের তিনটি কোম্পানি এবং একশত নৌসেনা ঢাকায় প্রেরণ করে। একই সাথে যশোর, রংপুর, দিনাজপুর এ বাংলাদেশের আরও কয়েকটি জেলায় একটি নৌ-ব্রিগেড পাঠানো হয়। প্রধানত ইউরোপীয় বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবীদে সংগঠিত করে ঢাকা রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নৌ-বিগ্রেড ঢাকা পৌছে সেখানে নিয়োজিত সিপাহিদের নি করতে গেলে অবস্থা চরমে ওঠে। ২২ নভেম্বর লালবাগে নিয়োজিত সিপাহিগণকে নিরস্ত্র করতে গেলে তারা প্রতিরোধ সৃষ্টি কে সংঘটিত খণ্ডযুদ্ধে বেশ কিছু সিপাহি নিহত ও বন্দি হয় এবং অনেকেই ময়মনসিংহের পথে পালিয়ে যায়। অধিকাংশ পলাতক সিপা গ্রেপ্তার হয় এবং অতিদ্রুত গঠিত সামরিক আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য তাদের সোপর্দ করা হয়। অভিযুক্ত সিপাহিদের মধ্যে জন মৃত্যুদণ্ড এবং বাকিরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এ রায় দ্রুত কার্যকর করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে সিলেট, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং যশোরে চাপা ও প্রকাশ্য উত্তেজনা বিরাজমান ছি পলাতক সিপাহি ও ইউরোপীয় সৈন্যদের মধ্যে সিলেট এবং অপরাপর স্থানে কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে, যার ফলে উভয় পক্ষেই প্রাণহ ঘটে। সিলেট এবং যশোরে বন্দি ও নিরস্ত্র সিপাহিদের স্থানীয় বিচারকদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত বিচার করা হয়। ফাঁসি ও নির্বাসন ছিল সংক্ষিপ্ত বিচারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল তাতে এদেশে বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূল আলোড়িত হয়েছিল, শাসকদের দৃষ্টিতে একে বিদ্রোহী বলা যেতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল বৈদেশিক শাসন শোসনের বিরুদ্ধে সত্যিকারের আযাদী সংগ্রাম। ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতে যে বৃটিশবিরোধী সংগ্রাম শুরু হয় তার বহুবিদ কারণ ছিল। শতাব্দীর পঞ্জিভূত আক্রোশ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরিত হয়েছিল। শাহ ওয়ালি উল্লাহ শাহ আব্দুল আজীজ, সাইয়েদ আহমেদ শাহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ-প্রমুখ বীর মুজাহিদগণ যে জেহাদী প্রেরণার সঞ্চার করে রেখেছিলেন তা যেন বারুদের স্তূপের মধ্যে দিয়াশলাইর কাজ করে। চারদিকে দাউ দাউ করে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠে। স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যে যেখানে পেরেছে সংগ্রামে যোগদান করেছিল। সিপাহিদের সাথে যোগ দিয়েছে সাধারন মানুষ, কৃষক, মজুর সরকারি-বেসরকারী বহু কর্মচারী তবে কোন আদর্শে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। ইংরেজ সরকারের কতিপয় দমনমূলক কার্যকলাপ বিপ্লবকে তরান্বিত করে। ১৮৪৩ সালে আমীরদের হাত থেকে সিন্দুদেশ ইংরেজ সরকার গ্রাস করে। ১৮৪০ সালে ডালহোসী নবদিক্ষিত খ্রষ্টানদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দিয়ে আইন করলে তার প্রতিবাদে একমাত্র কলকাতা শহরে ৬০ হাজার লোক স্বাক্ষরিত এক স্বারকলিপি প্রদান করেও কোন ফল পায়নি। নিষ্ঠুরতা, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অদম্য লালসায় নিপীড়িত, নিষ্পেষণ, মর্মন্তুদ হাহাকার ও আর্তনাধের রূপ ধারণ করে ভারতের আকাশ-বাতাস মোহিত করে এবং সাতান্ন সালে বিরাট বিপ্লবরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান

স্যার সাইয়েদ আমদ খান ব্রিটিশ সরকারের অধীনে উচ্চপদে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। তার বিশ্বাস জন্মেছিল যে মোগল সম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপের ওপরে ভারতে এক সুশৃখল বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দেশ থেকে সহসা ইংরেজদের উৎখাত করা যাবে না। এজন্য তিনি ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াকে মুসলমানদের জন্য অনুচিত মনে করতেন। মুসলিম সমাজের উন্নয়নে তার শ্রেষ্ঠ অবদান হল তিনি ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৭৫ সালে আলীগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এ কলেজের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যার সাইয়েদ আহমদ মুসলিম সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে খ্যাতি লাভ করে। তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক মনোনয়ন প্রথার দাবী জানান।

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গ ভঙ্গ[৯] ছিল লর্ড কার্জনের প্রশাসনের সব চেয়ে সুফলপ্রদ ব্যবস্থা। বঙ্গ ভঙ্গ করা হয়েছিল সুষ্ঠু ও সুফলপ্রসূ প্রশাসনিক কারণে। বাংলা তখন বৃটিশ ভারতের সর্বপ্রধান প্রদেশ ছিল। বিহার উড়িষ্যা এ প্রদেশরই অর্ন্তভূক্ত

সিপাহি যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া একটি অনুজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত করে। জমিদার-জোতদারগণ নিশ্চিতভাবে সিপাহিদের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ গরু ও ঘোড়ারগাড়ি এবং হাতি সরবরাহ; পলায়নরত সিপাহিদের গতিবিধির সন্ধান প্রদান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কৌশলগত সমর্থন প্রদান করেন। সরকার কৃতজ্ঞতার সাথে জমিদার-জোতদারগণের এ সকল সেবার স্বীকৃতি প্রদান করে এবং পরে তাঁদেরকে নওয়াব, খান বাহাদুর, খান সাহেব, রায় বাহাদুর, রায় সাহেব প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করে এবং নানা পার্থিব সম্পদ দ্বারা পুরস্কৃত করে। জমিদার-জোতদারগণের প্রদর্শিত ভূমিকা অনুসরণ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও কোম্পানির সরকারের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ ও কৃষককুল সার্বিকভাবে এ বিষয়ে উদাসীন ছিল এবং সিপাহি যুদ্ধের স্পর্শ থেকে দূরে ছিল। তবে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির ফলে তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। [রতনলাল চক্রবর্তী, বাংলা পিডিয়া, শিয়াটিক সাসাইটি]

৯.বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ লর্ড কার্জন (১৮৯৮-১৯০৫) ভাইসরয় থাকাকালীন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর কার্যকর হয়। এটি আধুনিক বাংলার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বঙ্গভঙ্গের ধারণা কার্জনের স্বকীয় চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয় নি। ১৭৬৫ সাল থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বিহার ও উড়িষ্যা সমন্বয়ে গঠিত বাংলা ব্রিটিশ ভারতের একটি একক প্রদেশ হিসেবে বেশ বড় আকার ধারণ করেছিল। এর ফলে প্রদেশটির প্রশাসনকার্য পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে এবং এজন্য এটিকে বিভক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে ১৮৯,০০০ বর্গ মাইল এলাকা শাসন করতে হতো এবং ১৯০৩ সাল নাগাদ প্রদেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭ কোটি ৮৫ লক্ষে দাঁড়ায়। এর ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলার অনেক জেলা কার্যত বিচ্ছিন্ন এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অবহেলিত ছিল। ফলে এতদঞ্চলের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কলকাতা ও এর নিকটস্থ জেলাসমূহ সরকারের সকল কর্মশক্তি ও মনোযোগ আকৃষ্ট করে। অনুপস্থিত ভূস্বামীদের দাবি ও জোর করে আদায়কৃত খাজনার ভারে চাষীদের অবস্থা ছিল দুর্দশাগ্রস্ত; এবং ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিক্ষা ছিল অবহেলিত। প্রদেশের প্রশাসনিক যন্ত্রকে প্রয়োজন অপেক্ষা কমসংখ্যক কর্মচারী নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হতো। বিশেষত নদ-নদী ও খাঁড়িসমূহ দ্বারা অত্যধিক বিচ্ছিন্ন পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে পুলিশী কাজ চালানো অসুবিধাজনক হলেও উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত সেখানে আলাদা মনোযোগ প্রদান করা হয়নি। জলপথে সংঘবদ্ধ জলদস্যুতা অন্তত এক শতাব্দীকাল বিদ্যমান ছিল।

প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ, প্রতিরক্ষা অথবা ভাষাগত সমস্যাবলী সরকারকে প্রশাসনিক সীমানা নতুন করে নির্ধারণের ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখতে প্রণোদিত করে। বাংলার প্রশাসনিক এককসমূহকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা মাঝে-মধ্যে নেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে বাংলা থেকে পৃথক করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৫৪ সালে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে সরাসরি বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং প্রদেশটির শাসনভার একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ওপর অর্পণ করা হয়। ১৮৭৪ সালে চীফ কমিশনারশীপ গঠনের মানসে (সিলেটসহ) বাংলা থেকে আসাম বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ১৮৯৮ সালে লুসাই পাহাড়কে এর সাথে যোগ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ ১৯০৩ সালে প্রথম বিবেচনা করা হয়। কার্জনের প্রারম্ভিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রশাসনিক কার্যকারিতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূল বিভক্তি-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া চলাকালীন সময়ই সম্ভবত বাংলায় এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাব্য সুবিধাদির ব্যাপারটি কর্মকর্তাবৃন্দ প্রথমে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। আদিতে প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতা নয় বরং ভৌগোলিক ভিত্তিতে বাংলাকে বিভক্ত করা হয়। এ ব্যাপারে 'রাজনৈতিক বিবেচনাসমূহ' ছিল বোধ হয় 'অনুচিন্তা'।

সরকারের তরফ থেকে যুক্তি ছিল যে, বঙ্গভঙ্গ ছিল তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যসম্বলিত অধিমিশ্রভাবে গৃহীত একটি প্রশাসনিক কার্যসাধনের উপায়। প্রথমত, এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্বের কিয়দংশ উপশম এবং প্রত্যন্ত জেলাসমূহে অধিক দক্ষ প্রশাসন নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর আসামকে (চীফ কমিশনার কর্তৃক শাসিত) যাতে সাগরে নির্গমপথ প্রদান করা যায় এরূপভাবে এক্তিয়ার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তার উন্নতিবিধান করা। তৃতীয়ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উড়িয়া-ভাষাভাষী জনগণকে একক প্রশাসনের অধীনে একত্রিত করা। অধিকন্তু, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাগুলিকে বাংলা থেকে পৃথক এবং আসামের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাবও ছিল। অনুরূপভাবে ছোট নাগপুরকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সাথে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল।

সরকারের প্রস্তাবসমূহ ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তার ওপর জনমত নিরূপণের উদ্দেশ্যে কার্জন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব বাংলার জেলাগুলি সফর করেন। তিনি বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করেন এবং বিভক্তির ব্যাপারে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে বক্তৃতা দেন। এ সফরকালেই তিনি একটি বিস্তৃত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে আইন পরিষদ, স্বতন্ত্র রাজস্ব কর্তৃত্ব ও একটি পরিপূর্ণরূপে সজ্জিত প্রশাসনকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে পারে এমন ভূখণ্ড নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন প্রদেশ সৃষ্টি।

সম্প্রসারিত কর্ম-পরিকল্পনাটি আসাম ও বাংলা সরকারদ্বয়ের সম্মতি লাভ করে। নতুন প্রদেশটি গঠিত হবে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী (দার্জিলিং বাদে) বিভাগসমূহ এবং মালদা জেলাকে আসামের সাথে একত্র করে। বাংলাকে যে শুধু পূর্বদিকে এ বৃহৎ ভূখণ্ডসমূহ ছেড়ে দিতে হবে তাই নয়, তাকে হিন্দি-ভাষাভাষী পাঁচটি রাজ্যও মধ্যপ্রদেশকে ছেড়ে দিতে হবে। পশ্চিম দিকে সম্বলপুর এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে উড়িয়া-ভাষাভাষী পাঁচটি রাজ্যের সামান্য ভূখণ্ড বাংলা লাভ করবে। বাংলার নিজের দখলে যে ভূখণ্ড থেকে যায় তার আয়তন ১৪১,৫৮০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ, যাদের মধ্যে চার কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু ও নব্বই লক্ষ মুসলমান।

নতুন প্রদেশটি অভিহিত হবে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে, যার রাজধানী হবে ঢাকা এবং অনুষঙ্গী সদর দফতর চট্টগ্রামে। এর আয়তন হবে ১০৬,৫৪০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা হবে এক কোটি আশি লক্ষ মুসলমান ও এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু সমবায়ে মোট তিন কোটি দশ লক্ষ। এর প্রশাসন গঠিত হবে একটি আইন পরিষদ ও দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি রাজস্ব বোর্ড নিয়ে। কলকাতা হাইকোর্টের এক্তিয়ারকে বজায় রাখা হয়। সরকার নির্দেশ করে দেয় যে, নতুন প্রদেশটির স্পষ্টরূপে চিহ্নিত পশ্চিম সীমানা এবং সঠিকভাবে নির্ধারিত ভৌগোলিক, জাতিগত, ভাষাগত ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি থাকবে। নতুন প্রদেশটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, এটা

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। এর আয়তন ছিল ১৭৯,০০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল মোট ৯০০০০০০। এত বড় প্রদেশের সুষ্ঠু পরিচালনা, আইন শৃংখলা মজবুত রাখা এবং সকল অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখা ছিল একেবারে অসম্ভব।

১৯০৫ সালের প্রথম দিকে লর্ড কার্জন ইংলেন্ড থেকে প্রত্যার্বতন করেন। তার অনুপস্থিতিতে বৃহত্তর আসাম গঠনের পরিকল্পনা গৃহিত হয়। কার্জনের প্রত্যার্বতনের পর পরিকল্পনাটি ভারত সচিব ব্রডরিক সমীপে পেশ করা হয়। ব্রডরিক পরিকল্পিত নতুন প্রদেশের নাম দেন বেঙ্গল এন্ড আসাম (পূর্ব বাংলা ও আসাম) বংগ ভংগ মুসলিম সমাজের জন্য মংগলময় হলেও এর পিছনে তাদের কোন প্রচেষ্টাই ছিলনা । শাসন ব্যবস্থা সহজ দ্রুতুর, সুষ্ঠ ও সুন্দর করার জন্যে এবং এর সুফল যাতে অবহেলিত ও অনুন্নত বাংলার পুর্বাঞ্চলও,ভোগ করতে পারে তার জন্যে এ বংগ ভংগের পরিকল্পনা ছিল শাসকদের। মুসলমানদের নয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুগন নতুন গভর্নরকে বিক্ষোভ প্রর্দশন করে। হিন্দু মহলে এটাকে জাতীয় ঐক্যের প্রতি আঘাত বলে অবহিত করে। অতঃপর নানাভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে থাকে। যথা তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার শাস্তি। মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব। কালবিলম্ব না করে হিন্দুগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। হিন্দু আইনজীবীগণ এর আইনগত বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। সাহিত্যিকগণ প্রচার শুরু করলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি চরম আঘাত আনা হল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রলাল ব্যানার্জি বলেন, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা আকস্মিক বর্জপাতের ন্যায়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৬ সালের ৭ ই আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে। বিলাতী দ্রব্যবর্জন করে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শিক্ষাঙ্গন পরিত্যাগ করে। এ সময় বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গড়ে উঠে। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করে বঙ্গভঙ্গ রদ করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য। বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীরা ছিল খড়গহস্ত। সর্বোপরি হত্যা, লুণ্ঠন, নৈরাজ্য, খুন বিলাতী দ্রব্য বর্জনসহ সর্বপ্রকার আন্দোলনকরে হিন্দুগন বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

বঙ্গভঙ্গ রদ ও তার প্রতিক্রিয়া

রাজা পঞ্চম জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তার আরোহণের কালে আপন মুখে ঘোষণা করার অভিপ্রায়ে ১৯১১ সালে ভারত আগমন করে। এক অতি জাঁকজমকপূর্ন সমাবেশে ভাবগম্বীর পরিবেশে রাজা পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করলেন বঙ্গভঙ্গ রদ করা হল। হিন্দুগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল । বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষনা দ্বারা তাৎক্ষণিক নিশ্চিত হল যে, ভারত সম্রাজ্যের অপরাধ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে দিয়ে রাজদম্পতির নিরাপদ ভ্রমণের নিশ্চয়তা পাওয়া গেল। বিভাগ বাতিল করে মুসলমানদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। বৃটিশ সরকারের এ হাস্যকর অভিনয়ের কার্যকরণ হল বিভাগ রদের খেয়ালী তৎকালীন ভারত সচিব ক্রু এর শাস্তিকে --- লাভ করে। বিশ্বাসকে মারাত্মক ভুল বলে অভিহিত করে বিক্ষুব্ধ হয়ে ছিল তাদের কে শান্ত করাই ছিল ক্রুর অভিপ্রায়। বঙ্গভঙ্গ রদ সম্পর্কে লর্ড ---- বলেন,

পরে আমাকে এ কথা জানানো হল যে উভয় বাংলায় যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে সমস্ত বাঙ্গালী যেটাকে অন্যায় মনে করে তা দুর করার জন্য কিছু কাজ একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল । অবশ্য এ সময়ে বিদেশে এমন আশা করা হচ্ছিল যে অবিচার দূর করার জন্য কিছু করা হবে। "বৃটিশ সরকার যে

এর নিজস্ব চৌহদ্দির মধ্যে এ যাবৎ বাংলার তুচ্ছ ও অবহেলিত প্রতিনিধিত্বমূলক সমপ্রকৃতির মুসলমান জনগণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিবে। অধিকন্তু, সমগ্র চা শিল্প (দার্জিলিং বাদে) এবং পাট উৎপাদনকারী এলাকার বৃহদংশ একক প্রশাসনের অধীনে নিয়ে আসা হবে। ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই তারিখের একটি সিদ্ধান্তে ভারত সরকার তার চূড়ান্ত সঙ্কল্প ঘোষণা করে এবং ঐ একই বছরের ১৬ অক্টোবর তারিখে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন"। ডিগবাজী করে রেখে ছিলেন, মুসলমানদের প্রতি যে চরম অন্যায় করা হয়েছিল এ অনুভূতি তাদের অনেকের মধ্যেই এসেছিল । বৃটিশ পার্লামেন্ট কতৃর্ক অনুমোদিত দীর্ঘদিনের সুচিন্তিত সিদ্বান্তকে অনেক বছর পর রাজা পঞ্চম জর্জের মুখের ঘোষণা দ্বারা পরিবর্তিত করে দুনিয়ার সামনে তাদের মযর্দাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছিল এ অনুভূতি ও তাদের ছিল। অবশেষে পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এবং বঙ্গভঙ্গ রদের দরুণ তাদের যে বিপুল ক্ষতি হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থপনের সিদ্ধান্ত সরকার করেন যাতে, এ অঞ্চলের অনুন্নত লোকদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। দুই বাংলার একত্রীকরণে বাংলার হিন্দুগণ আনন্দে গদগদ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মুসলমানদের কোন প্রকার উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি তারা বরদাশত করতে কিছুতেই রাজী ছিল না। তাই সরকার কর্তৃক ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তে তাদের মাথায় যেন আবার বজ্রাঘাত হলো। কতিপয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অগ্নিশর্মা হয়ে এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। যেহেতু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হিন্দু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রভাবের মূল উৎসকেন্দ্র, সে জন্য আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হলে প্রথমটির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে বলেও তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অবিলম্বে বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করে। তাঁরা বলেন যে, প্রদেশে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে জাতীয় জীবনের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন অধিবাসীদের মধ্যে বিরাজমান অনৈক্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে। তাঁরা বড়োলাটকে এ বিষয়ের সাবধান করে দেন যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হবে অত্যন্ত নগণ্য ও হাস্যকর। কারণ, তাদের মতে, যতেষ্ঠ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর অভাব হবে এবং মূলতঃ মুসলমান কৃষিজীবীদের জন্যে প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের কোন মূল্য হবে না বলেও তাদের সন্দেহ আছে।"[১০] এই সম্পর্কে বাংলার মুসলিম জননেতা মরহুম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯১৩-১৪ সালের বাজেট অধিবেশনে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা[১১]করেন।

---

[১০] -(Govt. of India, Speeches by Lord Hardinge of Penhurst, Vol. 1. pp-203-20, Calcutta, 1916)

[১১] "ভারত সরকারের ২৫শ আগস্টের প্রতিবেদনে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, বঙ্গভঙ্গ রদের দরুন যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার দ্বারা মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না, তারপর আঠার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল এবং এখন দেখার সম এসেছে তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি কতখানি পালন করেন। দিল্লী দরবারের ঘোষণার অল্পদিন পর মহামান্য বড়োলাট যখন ঢাকায় পদার্পণ করেন, তখন প্রতেত্যকেই আশা করেছিল যে, মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি কোন একটা ঘোষণা করবেন। অবশ্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলব যে আমরা যা আশা করেছিলাম, সেদিক দিয়ে এ অতি তুচ্ছ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বকে ছোট করতে চাই না। কারণ, পূর্ব বাংলার শিক্ষার উন্নয়নে যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল, তা এর দ্বারা বিদূরিত হবে। একটি মুসলিম অধ্যুষিত কেন্দ্রে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অশেষ সুযোগ- সুবিধার কথা অস্বীকার করিনা। কিন্তু এই যে বলা হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু মুসলমানদের উপকারার্থে করা হচ্ছে অথবা এটা হচ্ছে মুসলমানদেরকে খুশী করার একটা বিশিষ্ট পদক্ষেপ- আমি এসবের প্রতিবাদ করছি। বড়োলাট সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জন্যে এবং তাই হওয়া উচিত।' এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরিকল্পিত একটি মুসলিম কলেজ এবং ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক স্টাডিজ- .এটাকে মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করার অভিপ্রায় বলেও ধরা যেতে পারে না। কারণ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবত ষোল আনা শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামদিসহ সরকার কোলকাতয় একটি একচেটিয়া হিন্দু-কলেজ চালিয়ে আসছেন এবং ঢাকায় একটি মুসলিম কলেজ হলে তা হবে মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের অবহেলিত দাবীর দীর্ঘসূত্রী স্বীকৃতি। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সম্পর্কে কথা এই যে, যে অঞ্চলে মুসলমানগণ দীর্ঘকাল যাবত আরবী ও ফার্সী শিক্ষার বাসনা পোষণ করে আসছে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের শুধু স্বাভাবিক ফল মাত্র এই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। এটা সকলের জানা না থাকতে পারে যে, পূর্ব বাংলার জেলাগুলো থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্র বাংলাদেশের মাদরাসাগুলোতে পড়াশোনা করে এবং এই শ্রেণীর অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের কোন ব্যবস্থা ব্যতীত একটি বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই ন্যায়সংগত হতো না। আমি আশা করি সরকারী কর্মকর্তাগণ এ কথা উপলব্ধি করবেন যে, যদিও মুসলমানগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই রায় দিয়েছে, কিন্তু এটাকে, এমনকি একটি মুসলিম কলেজ এবং ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক স্টাডিকেও তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ বলে তারা মনে করে না।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ গঠন ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকা শহরে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন[১২] নাম দিয়ে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। মুসলমানদের সংকট মুহূর্তে এ সম্মেলনের প্রয়োজনিয়তা উপলব্ধি করেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৮০০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদেন । তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন মুহসিমুল মুলক, ভিখারুল মুলক, আগাখান, হাকিম আজমল খান, মাও মুহাম্মদ আলী। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুসলিমলীগ[১৩]নামে এ পৃথক দলটি ঘঠিত হয়।

(-Bangladesh Historical Studies on the Budget for 1913-14, pp. 149-50)

[১২] ১৯০৬ সালে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহত হয়। এ সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার পিছনে বাংলার মুসলমানদের তৎকালীন উদীয়মান নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হকের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। উক্ত সম্মেলনের জন্যে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক ও ভিখারুল মুলক। সম্মেলনকে জয়যুক্ত করার জন্যে ৩৩ বৎসর বয়স্ক যুবক এ.কে ফজলুল হক প্রভূত উৎসাহ সারা ভারত সফর করেন যার ফলে সম্মেলনে ৮০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ সম্মেলনেই বাংলা তথা সারা ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে এবং জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বলতে গেলে বঙ্গ ভঙ্গের ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে হিন্দু বিদ্বেষ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্জলিত হয়েছিল, তাই মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিল। (আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন-১৯৯৪, পৃ: নং ৩২৩-৩২৪)

[১৩]**মুসলিম লীগ** ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দল। শুরুতে আগা খান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক পরিচালিত এ দলটি মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে জনসমর্থন তৈরিতে এবং অবশেষে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে । ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় হতে চিহ্নত করা যেতে পারে। সরকারের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব এবং ভারতে প্রতিনিধিত্বমুলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সম্ভ্রান্ত শ্রেণী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ সম্মানিত নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ না দিতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তিনি আলীগড়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আন্দোলন শুরু করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর মতো অন্যান্য মুসলমান নেতারাও বিশ্বাস করতেন যে, একটি পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবে মুসলমানগণ ব্রিটিশদের প্রতি বিরোধিতার পরিবর্তে আনুগত্যের মাধ্যমেই অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাঝে ইংরেজি শিক্ষা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি তাঁর অনুসারীদের সর্বশক্তি নিয়োগের নির্দেশ দেন। এ উপলব্ধি এবং অনুবর্তী সক্রিয়তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করে।

এ চিন্তার অনুসরণে নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি (১৮৬৩), সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৭), ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৮) এবং অন্যান্য অনেক স্থানীয় আঞ্জুমান গড়ে ওঠে। এগুলি রাজনীতির চেয়েও সামাজিক পুনর্জাগরণমূলক কাজে অধিকতর সক্রিয় ছিল।

ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ আলোচনা এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রচার করার জন্য বছরে একবার অনানুষ্ঠানিকভাবে সভায় মিলিত হতো। কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গভঙ্গ এর (১৯০৫) বিরুদ্ধে পরিচালিত বিক্ষোভ এবং স্বদেশী আন্দোলন এর প্রেক্ষাপটে এমনি এক সভা (সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন) ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্বে মুসলমান নেতাদের একটি প্রতিনিধিদল মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ সমস্যাবলি তুলে ধরার জন্য সিমলায় গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গভঙ্গের গোঁড়াসমর্থক ঢাকার নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ কংগ্রেস সমর্থকদের বঙ্গবঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ মোকাবিলা করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি এ সভায় একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনের প্রস্তাব করেন। সভার সভাপতি নওয়াব ভিকার-উল-মুলক প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং এভাবে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ সৃষ্টি হয়।

সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যাবলি ছিল মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা, ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলা। একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহর পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য হিন্দুদের শক্তিশালী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলায় যে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করেছিল বাংলার হিন্দুগণ যার প্রতি মুসলমানদের কোন সমর্থন ছিল না। বরঞ্চ মুসলমানদের জীবন ও ধনসম্পদ বিপন্ন হয়েছিল সে সন্ত্রাসবাদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের একটি আলাদা রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ একটি দুর্বল সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগকে বাতিল করে দেয়। এসব সংবাদপত্র দ্রুত মুসলিম লীগের বিলুপ্তি ঘটবে বলে প্রচার চালায়। এটা সত্য যে প্রথম দিকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে লীগের গতিশীলতার অভাব ছিল; কারণ এটা এমন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠিত হওয়ার পর প্রায় গোটা এক বছর মুসলিম লীগ নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসা এবং র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার তরুণ প্রজন্মের মুসলমানগণ মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন। তারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরোধিতা তো করেনই, অধিকন্তু ভারতে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠারও দাবি করেন। ১৯১০-এর দশকে মুসলিম লীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদলে একটি নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করে। লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এর সময়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি ঘটলে মুসলিম লীগ জড় ও স্থবির অবস্থায় পড়ে। ১৯২০-এর পর থেকে কয়েক বছর খেলাফত সংগঠনই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সকল কাজ পরিচালনা করে এবং বস্তুত মুসলিম লীগের সেসময় করণীয় প্রায় কিছুই ছিল না।

রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের কাঠামোর মধ্যে থেকে মুসলিম লীগ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে নি। ১৯৩৫ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেতৃত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সংগঠনটি রাজনৈতিকভাবে অর্থবহ ছিল না। অনেক মুসলমান নেতার অনুনয়-বিনয়ের পর জিন্নাহ লন্ডন হতে ভারতে ফিরে আসেন এবং মুসলিম লীগের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নাহ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখাসমূহ পুনর্গঠিত করে নতুন কাঠামো প্রদান করেন। নতুন কমিটিসমূহকে জনসংযোগ এবং আসন্ন নির্বাচনী রাজনীতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। মোট নয়টি প্রদেশে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে লীগ ১০৪টি আসন লাভ করে। মোট প্রাপ্ত আসনের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক (৩৬টি) শুধু বাংলাতেই অর্জিত হয়েছিল। মুসলিম লীগ আইন সভায় কংগ্রেসের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। মনে করা হয় যে, বাংলায় লীগের বিজয় ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান পেশাদার ও মুসলমান ভূমি মালিক সম্প্রদায়ের যৌথ সমর্থনের ফল। উল্লেখ্য যে, আলেম শ্রেণী মুসলিম লীগের কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকাতেই আগ্রহী ছিল।

১৯৩৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ.কে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং এর ফলে তার মন্ত্রিসভা কার্যত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় পরিণত হয়। হকের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ব্যবহার করে বাংলাকে মুসলিম লীগের দুর্গে পরিণত করা হয়। বাংলার মুসলমানদের নেতা হিসেবে ফজলুল হক মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি দাবি করে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাংলার মুসলিম জনমতের ওপর ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল।

গর্ভনর জন হার্বাট-এর পরামর্শে ফজলুল হক পদত্যাগ করলে খাজা নাজিমউদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে মুসলিম লীগ একটি যথার্থ জাতীয় সংগঠনে পরিণত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১১৭টি আসনের মধ্যে দল ১১০টি আসন অর্জন করে। ফলে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম লীগই বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একক সংগঠন। তখন পর্যন্ত কংগ্রেস প্রভাবাধীন একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া, ভারতের অন্যান্য মুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহে লীগের সাফল্য সমভাবে উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে লীগের সাফল্য এর নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক সকল আলোচনা ও চুক্তিতে মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জিন্নাহর মতামত গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। লাহোর প্রস্তাবের ছয় বছর পরে এইচ.এস সোহরাওয়ার্দী আইন সভায় মুসলমান সদস্যদের দিল্লি কনভেনশনে 'একটি মুসলমান' রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জিত হলে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সকলের সংগঠনে পরিণত হয়। [সিরাজুল ইসলাম]

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই এ সময়ে বৃটিশকে সাহায্য করে। এ সময় হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা খুব জোরদার হয়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসী লীগের এক যুক্ত কমিটিতে লক্ষ্ণৌ চুক্তি[১৪]সম্পাদিত হয়। চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়। চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় আইন পরিষদের নির্বাচত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদের দিতে রাজী হয়।

খেলাফত আন্দোলন

১৯১১ সালে ইতালি বিনা কারণে তুরস্ক সাম্রারাজ্যভুক্ত ত্রিপোলি আক্রমণ করে শেষ পযর্ন্ত তা গ্রাস করে নেয়। ১৯১২ খ্রী : বলকানের খ্রীস্টানরা তুর্কী শাসনের বিরোদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বৃটিশ সরকার তুরস্কের বিরূদ্ধে পশ্চিমা শক্তিকে সমর্থন করে। উপমহাদেশের মুসলমানগণ তুরস্কের খেলাফতকে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মনে করতেন। এবং তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম জাহানের খলীফা এবং মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতিক মনে করতেন। ভারতীয় মুসলমানগণ আশা করেছিল বৃটিশকে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে তুরস্ককে কোন প্রকার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক বিনষ্ট করাই ছিল বৃটিশদের উদ্দেশ্য। মাওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী, ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি, আবুলকালাম আযাদ এবং এ কে এম ফজলুল হকের নেতৃত্বে উপমহাদেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী 'খিলাফত আন্দোলন'[১৫]শুরু করে। কংগ্রেস ও জামিয়তে উলমায়ে হিন্দ খেলাফত আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করেন।

অসহযোগ আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের বৃটিশের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। যুদ্ধকালীন অকুণ্ঠ সমর্থনের পুরস্কার দেয়া হয় ভারতবাসীকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও বিভিন্ন দমননীতির মাধ্যমে। ১৯১৯ সালে একটি আইন করা হয় বড় লার্ট আইন নামে পরিচিত। এ আইনে জুরীর পরামর্শ ব্যতিরেকেই রাষ্ট্রবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সরকারকে দেয়া হয়েছিল। ফলে দেশে বিক্ষোভের দাবানল জলে ওঠে। ১৯২০ সালে ভারতের হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানকারী সংস্থা ও সংগঠনসমূহ যেভাবে বৃটিশ সরকারের সাথে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ভারতবাসীর স্বরাজ লাভকে এ অহিংস আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। ১৯১০ সালের সে মাসে অনুষ্ঠিত খেলাফত কমিটির সম্মেলনে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গঠিত হয় এসময় আব্বাস আলী খান বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত পল্লীর

---

[১৪] লক্ষ্ণৌ চুক্তি. ১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লীগের এক যুক্ত কমিটিতে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির দুটি ফল হয়েছিল। এক- এ চুক্তি পরবর্তীকালের খেলাফত আন্দোলন কালীন কংগ্রেস লীগ ঐক্যের পূর্বসূত্র চিহিত করে। দুই- এ চুক্তির ভেতর দিয়ে একজাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লীগের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়। কংগ্রেস ভারতীয় আইন পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদেরকে দিতে রাজী হয়। বাংলাদেশে তারা পাবে শতকরা ৪০টি, পাঞ্জাবে ৫০টি, বিহারে ২৫টি, যুক্ত প্রদেশে ৩০টি, এর এর সাথে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিয়ে কংগ্রেস মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নেয়। কিন্তু লক্ষ্ণৌ চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাংগামাও শুরু হয়। (আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ: নং ৩৪৬)

[১৫]. খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উদ্ভূত একটি প্যান-ইসলামি আন্দোলন। ওসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯) প্যান-ইসলামি কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। নিজ দেশে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন নির্মূল করার লক্ষ্যে এবং বিদেশী শক্তির আক্রমণ থেকে তাঁর ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে বিশ্ব-মুসলিম সম্প্রদায়ের 'সুলতান-খলিফা' মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি এ আন্দোলনের সূচনা করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে তাঁর দূত জামালুদ্দীন আফগানি প্যান-ইসলামবাদ প্রচারের জন্য ভারত সফর করার পর এ মতবাদের প্রতি কিছু ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে অনুকূল সাড়া জাগে।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয়ে ১৯১২ সালে সর্বপ্রথম হাতে খড়ি গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় ছিল তার শৈশব কাল । তিনি দেখলেন ছাত্র, শিক্ষক, চাষী, মজুরদের মধ্যে খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংকল্প সুদৃঢ় ও অবিচল। যে কোন ত্যাগ স্বীকার ও হাসিমুখে জীবন দিতে প্রস্তুত। অসহযোগ আন্দোলন[১৬] জনমনে বেশ সাড়াজাগায়। বিলেতী

---

[১৬]. **অসহযোগ আন্দোলন** এম.কে গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে প্রবর্তিত ভারতের একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। বিভিন্ন কারণে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯২০ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়। রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে সামরিক আইন যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশদের প্রদত্ত উদার অঙ্গীকারকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে। ক্ষতিকর বলে বিবেচিত দ্বৈত-শাসনের কর্ম-পরিকল্পনাসহ মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট খুব অল্পসংখ্যক লোককেই সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল। এতদিন পর্যন্ত সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষ বিচারে আস্থাশীল গান্ধী এখন অনুভব করতে পারলেন যে বাধ্য হয়েই সরকারের সঙ্গে অসহযোগ আরম্ভ করতে হবে। একই সময়, মিত্র শক্তিবর্গ ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত সেভর চুক্তির কঠোর শর্তাবলি ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। মুসলমানগণ খিলাফত আন্দোলন শুরু করে এবং গান্ধী নিজেকে তাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম করার সিদ্ধান্ত নেন। গান্ধীর 'দক্ষতাপূর্ণ উঁচুস্তরের রাজনৈতিক চতুরতা' ভারতে শুরু হতে যাওয়া অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন লাভ নিশ্চিত করে।

১৯২০ সালের ২২ জুন তারিখ গান্ধী ভাইসরয়কে লেখা একটি চিঠিতে 'স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসা কুশাসনের আশ্রয় নেওয়া শাসককে সাহায্য প্রদান প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে প্রজাবৃন্দের' স্বীকৃত অধিকারের কথা দৃঢ়রূপে ঘোষণা করেন। ঐ চিঠিতে প্রদত্ত সতর্কীকরণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন চালু করা হয়। কলকাতা অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর ১৯২০) আন্দোলনের কর্মসূচি স্পষ্টরূপে বিবৃত করা হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল খেতাব ও সরকারি পদ ত্যাগ করা এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের মনোনীত পদসমূহ থেকে ইস্তফা প্রদান করা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অসহযোগকারীরা সরকারি দায়িত্ব, দরবার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে না এবং তারা স্কুল-কলেজ থেকে তাদের সন্তানদের প্রত্যাহার করবে, পরিবর্তে জাতীয় স্কুল-কলেজ স্থাপন করবে। তারা ব্রিটিশ আদালত বর্জন করবে এবং নিজস্ব সালিশি আদালত প্রতিষ্ঠা করবে; তারা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করবে। অসহযোগকারীদেরকে কঠোর নিয়মানুবর্তীভাবে সত্য ও অহিংসা পালন করতে হবে।

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২০) কলকাতার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। সেখানে দলীয় সংগঠনের উন্নতিসাধনের ওপর জোর দেওয়া হয়। চার আনা চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীর জন্য কংগ্রেসের সদস্যপদ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কংগ্রেস কর্তৃক অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তা এটিকে নতুন কর্মশক্তি যোগায় এবং ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এটা সর্বভারতব্যাপী বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে শুরু করে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে গান্ধী সারা ভারত সফর করেন এবং শত শত জনসভায় ভাষণ দেন।

প্রথম মাসে ৯,০০০ ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে এবং সমগ্র দেশব্যাপী গড়ে তোলা আটশরও অধিক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীনে বাংলায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। পাঞ্জাবও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের ডাকে সাড়া দেয় এবং এ ব্যাপারে লালা লাজপৎ রায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। অন্যান্য যে সকল এলাকা অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ছিল সেগুলি হলো মুম্বাই, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম; মাদ্রাজ তেমন একটা ঐকান্তিকতা প্রদর্শন না করে পিছনে পড়ে থাকে।

আইনজীবীদের আদালত বর্জন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের মতো ততটা সফল ছিল না। সি.আর দাশ, মতিলাল নেহরু, এম.আর জয়াকর, এস.কিচলু, ভি.প্যাটেল, আসফ আলী খান ও অন্যান্যদের মতো অনেক বিশিষ্ট আইনজীবী তাঁদের লাভজনক ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁদের এ আত্মত্যাগ অনেকের জন্য অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। আবারও সংখ্যার দিক থেকে বাংলার অবস্থান ছিল সকলের শীর্ষে এবং এরপর আসে অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক ও পাঞ্জাব।

কিন্তু সম্ভবত এ কর্মসূচির সবচেয়ে সফল দিক হলো বিদেশী বস্ত্র বর্জন। বিদেশ থেকে যে সকল বস্ত্র আমদানি করা হয় তার মূল্য ১৯২০-২১ সালের ১০২ কোটি টাকা থেকে নেমে এসে ১৯২১-২২ সালে ৫৭ কোটিতে দাঁড়ায়।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে সরকারের প্রতি একটি নতুন চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া হয়। 'মুসলমানদের জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে চাকরি চালিয়ে যাওয়া ধর্মীয় দিক থেকে আইন-বিরুদ্ধ', এ মত পোষণ করার কারণে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুহম্মদ আলীকে গ্রেফতার করা হয়। গান্ধী এবং তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস মুহম্মদ আলীকে সমর্থন করেন এবং এতদ্বিষয়ে প্রকাশ্য লিখিত ঘোষণা প্রচার করেন। পরবর্তী নাটকীয় ঘটনা হলো ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখ শুরু হওয়া প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত সফর। প্রিন্স যেদিন মুম্বাই এসে পৌঁছেন সেদিন সমগ্র ভারতব্যাপী হরতাল পালিত হয়। তিনি যেখানেই যান সেখানে তাঁকে রাস্তাঘাট জনশূন্য ও দরজা জানালা অর্গলবদ্ধ রাখার মাধ্যমে বিরূপ সংবর্ধনা জানানো হয়। সরকারের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতায় সাফল্য অর্জনের দ্বারা সাহসী হয়ে অসহযোগকারীরা ক্রমেই অধিকতর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পুলিশের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এর সদস্যদের সারিবদ্ধভাবে ও একই রকম বেশে সজ্জিত হয়ে কুচকাওয়াজ করে গমনের দৃশ্য সরকারের নিকট কোনক্রমেই অভিপ্রেত ছিল না। কংগ্রেস ইতঃপূর্বেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহকে যেখানে তারা মনে করত জনগণ প্রস্তুত সেখানে ট্যাক্স প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্য বর্জন সরকারী চাকুরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগসহ অনুসাঙ্গিক কর্মসূচী পালনের দেশব্যাপী হিড়িক পড়ে যায়। এ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের এক পর্যায়ে চেন্সরিচিরা নামক স্থানে এক সহিংস ঘটনা হওয়ার কারণে কংগ্রেস নেতা গান্দী মর্মাহত হন। তাই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পূর্বে আন্দোলন পরিহার করেন। ১৯২৪ সালে তুরস্কের এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোস্তফা কামাল পাশা ক্ষমতা দখল করেন। এবং তুরস্কের সর্বশেষ কাষ্ঠপুত্তলিকা সুলতান আব্দুল হামিদকে নিষিদ্ধ করে খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন করেন। ভারত খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে নেমে আসে হতাশা।

হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা

খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা চলছিল। আন্দোলনের ব্যর্থতার সাথে তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। হিন্দু মসলমানদের মধ্যে আবার শুরু হল রক্তাক্ত সংঘর্ষ। খেলাফত আন্দোলনে গান্দীর সহযোগিতার মধ্যে আন্তরিকতা থাক বা নাথাক এ আন্দোলনকে মনদিয়ে সর্মথন কংগ্রেসের অনেক হিন্দু মেনে নিতে পারেনি। মসজিদের সামনে জোর জবর দস্তি বাজনা বাজানোর উপলক্ষ করে দাংগা হাংগামা সূত্রপাত করলো তারা এবং এ দাংগা রক্তাক্ত সংঘর্ষে রূপ ধারণ করে চারদিকে বিস্তার লাভ করতে লাগল। বিগত দেড় শতাব্দীর অবহেলিত ও পশ্চাদপদ মুসলমান জীবন ক্ষেত্রে কোন সুযোগ সুবিধা চাইতে গেলেই

না করাসহ ব্যাপক আইন অমান্যকারী আন্দোলন বলবৎ করার অনুমতি প্রদান করে রেখেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ ফলাফলও ছিল। উত্তর প্রদেশে অসহযোগের সভা ও চাষীদের সভার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ আন্দোলন কেরালার মালাবারে মুসলমান প্রজাদের তাদের ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হতে সাহায্য করে। আসামে চা বাগানের শ্রমিকগণ ধর্মঘটে যায়। পাঞ্জাবে আকালি আন্দোলন ছিল সর্বজনীন অসহযোগ আন্দোলনের একটি অংশ।

বাংলায়ও এটি প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে। শুধু কলকাতায়ই নয়, গ্রাম বাংলায়ও প্রাথমিক জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। চাঁদপুর নদীবন্দরে গুর্খারা কুলিদের বে-আইনিভাবে দৈহিক আঘাত করার পর (২০-২১ মে) এটা চরম সীমায় পৌছে। জে.এম সেনগুপ্তের নেতৃত্বাধীনে সমগ্র পূর্ববাংলা ছিল উত্তপ্ত। কিন্তু সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত গ্রামীণ আন্দোলন ছিল মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে পরিচালিত ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী বিক্ষোভ।

অসহযোগ আন্দোলন যত চলতে থাকে ততই এটা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হতে থাকে যে, বাংলার নারীরা প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক। নারী জাতীয়তাবাদীরা এখানে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির *মহিলা কর্ম সমাজ* অথবা মহিলাদের সংগঠন বোর্ডের আওতাধীনে নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করে। *সমাজের* নারীরা সভার আয়োজন করে ও অসহযোগের মর্ম জনে জনে প্রচার করে। নারী স্বেচ্ছাসেবিকাগণ এগিয়ে আসে। সি.আর দাশের যথাক্রমে স্ত্রী ও ভগিনী বাসন্তী দেবী ও উর্মিলা দেবী, জে.এম সেনগুপ্তের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা, অন্যান্যদের যেমন মোহিনী দেবী, লাবণ্যপ্রভা চন্দকে সঙ্গে নিয়ে এ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ঘটনাক্রমে তাঁদের কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র ছিল বিদেশী মদ ও বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা এবং রাস্তাঘাটে খদ্দরের কাপড় বিক্রি করা।

আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকার ফৌজদারি আইনের ১০৮ ও ১৪৪ ধারা জারি করে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং ডিসেম্বর মাস নাগাদ ভারতের সকল স্থান থেকে ৩০,০০০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে শুধু গান্ধী জেলের বাইরে ছিলেন। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি মালব্যের উদ্যোগে আপস-মীমাংসায় পৌছতে আলাপ-আলোচনার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এতে এমন শর্তাবলি জুড়ে দেওয়া হয় যার অর্থ দাঁড়ায় খিলাফত নেতৃবৃন্দকে বলি দেওয়া। এ পন্থা গ্রহণে গান্ধী রাজি ছিলেন না। ঐ সময় তিনি কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের নিকট থেকে ব্যাপক আইন অমান্যকারী আন্দোলনের পর্ব শুরু করার বিষয়ে বেশ কিছুটা চাপের মধ্যেও ছিলেন। গান্ধী সরকারের সমীপে চরমপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু সরকার এতে কোন সাড়া না দেওয়ায় তিনি সুরাট জেলার বারদলি তালুকে আইন অমান্যকারী আন্দোলন প্রবর্তন শুরু করেন। এ সময় চৌরিচৌরার দুঃখজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় যা আন্দোলনের গতি পরিবর্তন করে। ৩,০০০ ব্যক্তির এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা ২৫ জন পুলিশ ও একজন ইন্সপেক্টরকে হত্যা করে। এ ঘটনা গান্ধীর নিকট বেশি বাড়াবাড়ি মনে হয়। এর ফল হলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ আন্দোলন স্থগতি করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এভাবে ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অসহযোগ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও অর্জন সম্পর্কে বলা যায়, এটি খিলাফতকে নিশ্চিত করতে ও পাঞ্জাবের অন্যায় প্রতিবিধানের লক্ষ্য অর্জনে আপাতভাবে ব্যর্থ হয়। এক বছরের মধ্যে প্রতিশ্রুত স্বরাজ আসে নি। তৎসত্ত্বেও, ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা ছিল শুধু অস্থায়ী পদক্ষেপ। একটি খণ্ডযুদ্ধ শেষ হলেও বৃহত্তর সংগ্রাম অব্যাহত ছিল।
[রঞ্জিৎ রায়, বাংলা পিডিয়া]

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধ হয়ে পড়ত অনিবার্য। ব্রিটিশ সরকার ও হিন্দু মুসলিমকে পাশাপাশি রেখে বিগত কয়েক শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস আলোচনা করে একথাই স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ ও হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের পরম শত্রুরূপে তাদের ভূমিকা পালন করতে কোন দিক দিয়ে ত্রুটি করেনি। এ উপমাদেশ থেকে মুসলিম জাতীর উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাদের এমাত্র লক্ষ্য।

মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য দাবী

সাম্প্রদায়িক দাংগা হাংগামার গতিবেগ প্রশমিত না হয়ে উত্তরোত্ত বৃদ্ধিপেতে থাকে এবং এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯২৭ সালে জানপুরের মাওলানা হযরত মোহানী ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসনতন্তের দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে পেশ করেন একে বলা যেতে পারে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম পথের দিশারী।

সর্বদলীয় সম্মেলন

এদিকে সম্প্রদায়িক সম্প্রতি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাও আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হয়। ভারতের নেতৃস্থানীয় হিন্দু, মুসলমান ও শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দেন কিন্তু উগ্রপন্থী হিন্দুদের হঠকারিতায় সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা

মি. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ[১৭] প্রথমে কংগ্রেসের একজন অতি উৎসাহী ও একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন এবং তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলিম মিলনের দূত। কিন্তু তাঁরা দীর্ঘদিনের মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি কংগ্রেসের হিন্দু

---

[১৭] **মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ** (১৮৭৬-১৯৪৮) আইনজীবী, রাষ্ট্রনায়ক এবং পাকিস্তানের স্থপতি। তিনি ১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতা পশ্চিম ভারতীয় উপকূলের কাথিয়াবার থেকে গিয়ে করাচিতে বসবাস করছিলেন। জিন্নাহ করাচির একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বোম্বের গোকুলদাস তেজ প্রাইমারি স্কুল এবং করাচির সিন্ধু মাদ্রাসা হাইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে খ্রিষ্টান মিশনারি সোসাইটি হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৯২ সালে মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে তিনি লন্ডন যান এবং আইন পড়ার জন্য লিংকন'স ইনে ভর্তি হন। জিন্নাহ ১৮৯৬ সালে করাচিতে ফিরে আসেন। ১৮৯৭ সালে তিনি আইন ব্যবসায়ের জন্য বোম্বাই যান, কিন্তু প্রথম তিন বছর তাঁকে কঠিন অর্থকষ্টে ভুগতে হয়। শতাব্দীর মোড় ঘুরতেই তাঁর ভাগ্যের পরিবর্তন হতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আয়ের দিক থেকে তিনি বোম্বাইর সব আইনজীবীকে ছাড়িয়ে যান। জিন্নাহ রাজনীতিতে আসেন ১৯০৬ সালে। সেসময় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের তীব্র প্রতিবাদমুখর পরিস্থিতিতে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। দাদাভাই নওরোজীর কংগ্রেসের নতুন ব্যানারে তখন 'স্বরাজ'-এর স্লোগান যুক্ত হয়, জিন্নাহও তাঁর পেছনে সামিল হন।

১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস হলে রাজনীতিতে জিন্নাহর উত্থান শুরু হয়। এ আইনের মাধ্যমে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে ইম্পেরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে রূপান্তরিত করা হয় এবং এতে নতুন ৩৫ জন মনোনীত সদস্য এবং ২৫ জন নির্বাচিত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে এর কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। এতে মুসলমানদের এবং জমিদারশ্রেণীর জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে। জিন্নাহ বোম্বাইয়ের একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর মুসলিম লীগের সঙ্গে জিন্নাহর যোগাযোগ শুরু হয়। জিন্নাহ পরের বছর ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দেন। এ অধিবেশনে কংগ্রেসের সঙ্গে একই সুরে 'স্বরাজ' দাবি করার লক্ষ্যে মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আলী ও সৈয়দ ওয়াজির হাসানের অনুরোধে জিন্নাহ ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন।

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস বোম্বাইতে তাদের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়। বোম্বাইর মুসলিম নেতাদের সম্মতি নিয়ে জিন্নাহ একটি পত্রের মাধ্যমে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেসের সঙ্গে একই স্থানে এবং একই সময়ে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগকে তার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের আহবান জানান। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উগ্রপন্থীরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। ১৯১৬ সালের শরৎকালে জিন্নাহ পুনর্বার ইম্পেরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে লক্ষ্ণৌতে একই স্থানে একই সময়ে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানে রাজী করান। জিন্নাহ লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। দুটি দলের অধিবেশনেই তাদের যৌথ কমিটির তৈরি করা ন্যূনতম সংস্কারের দাবি অনুমোদন লাভ করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের আচরণ এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁদের বৈরী নীতিতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। অতঃপর ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেন। এ সম্মেলনে হিন্দু ও শিখদের বিদ্বেষাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তার পর পরই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম কনফারেন্সে তিনি তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এ চৌদ্দ দফার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে পৃথক করে সিন্ধুপ্রদেশ গঠন, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্তন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর আইন পরিষদে জনসংখ্যা অনুপাতে আসন বণ্টন এবং দেশের শাসিত্ব স্বাশিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধি নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রবর্তন

ভারত সরকারের কাছে তা পেশ করা হয়। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে আইন পরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্বে অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়া হবে এই মর্মে কংগ্রেস জিন্নাহর সঙ্গে একমত হলে পৃথক নির্বাচনী এলাকা সংক্রান্ত ভারতীয় রাজনীতির প্রধান অভ্যন্তরীণ সমস্যার সুরাহা হয়। এই ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর জিন্নাহ মুসলমানদের সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রাউল্যাট আইন পাস করে ভারত সরকার রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য প্রচুর ক্ষমতা হাতে নেয়। এর প্রতিবাদে জিন্নাহ ইম্পেরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন এবং গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এপ্রিলের প্রথম দিকে গান্ধীর অনুসারীরা অমৃতসরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে তিনজন ইউরোপীয় ব্যাংক ম্যানেজারকে হত্যা করে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালা বাগে সংঘটিত হয় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ।। গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে এই দল সম্পর্কে জিন্নাহর ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যায়। এখান থেকেই তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ করেন। মুসলিম লীগের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কে ভাটা পড়ে, কারণ তিনি দেখতে পান যে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অভিজাতশ্রেণী কিছুতেই ব্রিটিশ রাজের প্রতি তাঁদের চিরাচরিত আনুগত্য থেকে সরে আসতে রাজী নন, বরং তাঁরা ইংরেজদের তাঁদের পৃষ্ঠপোষক মনে করেন। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কংগ্রেস যেসব অঙ্গীকার করেছিল, দলটি তা কখনও পালন করে নি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তেই থাকে।

জিন্নাহর জন্য বিশের দশক ছিল শুধুই রাজনৈতিক হতাশার। রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে ব্রিটিশ সরকার টালবাহানা করতে থাকে, কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে, ভারতীয় গণমানুষের ভাগ্য নির্ধারণে গান্ধী সোজা মানুষের রাজনীতি অব্যাহত রাখেন এবং মুসলমানরা তাদের অবস্থান ও শক্তি সম্পর্কে শোচনীয় সঙ্কটে ভুগতে থাকে। ১৯৩০ সালে লন্ডনে নিষ্ফল প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে জিন্নাহ নিজেকে প্রায় অপাংক্তেয় হিসেবে আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব পান আগা খান এবং কংগ্রেসের নেতৃত্ব পান গান্ধী। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও জিন্নাহকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না এবং তিনি যে কোন গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন তা কেউ ভাবলেনই না। ১৯৩১ সালে জিন্নাহ সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি লন্ডনে স্থায়িভাবে বসবাস করবেন এবং চিরদিনের জন্য ভারতীয় রাজনীতি ত্যাগ করবেন। লন্ডনে তিনি প্রিভি কাউন্সিল বারে আইনব্যবসা শুরু করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বিভিন্ন আইন পরিষদে মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের প্রতিনিধিত্ব রাখার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আইন অনভিজাত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম নেতৃবৃন্দের আহবানে জিন্নাহ ভারতে ফিরে এসে মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নতুন ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দেখা গেল ভারতের দশ কোটি মুসলমান মোটেও একটি সংঘবদ্ধ সম্প্রদায় নয়। তারা ছিল বিচ্ছিন্ন, একে অপরের নিকট অনেকটা অপরিচিত এবং ধর্ম ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোন যোগসূত্র ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মুসলমান হলেও সেখানে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ একটি আসনও পেল না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবে মুসলমানরা নানা পুরনো দলের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ ছিল এবং জিন্নাহর পুনরুজ্জীবিত মুসলিম লীগের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। সিন্ধু প্রদেশেও মুসলমানরা লীগকে পাত্তা না দিয়ে ভারত বিভক্তি নীতির বিরোধিতা করে কংগ্রেসের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ শুধু বাংলায় জয়লাভ করে এবং কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে।

১৯৩৮ সালে জিন্নাহ হিন্দুদের মুসলিম বিরোধী প্রচারণার মোকাবেলা করার জন্য দিল্লিতে উধহি নামে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। ১৯৪০ সালে জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারণা শুরু করেন এবং ঐ বছর ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এ অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক উত্থাপিত 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করা হয়। হয়।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তখন থেকে মি. জিন্নাহ কংগ্রেস বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. ওয়াম জে. ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে চৌদ্দ দফার অধিকাংশ দফা স্বীকৃতি লাভ করে[১৮]।

সাইমন কমিশন

ভারত শাসন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধাণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৮ সালে ভারতে একটি রয়েল কমিশন প্রেরণ করেন। এ কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন । কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য নেয়া হয়নি বলে কংগ্রেস মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজতৈক দল গুলি এ কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত করে। কমিশন একটি গোলটেবিল বৈঠকের সুপারিশ করে।

গোলটেবিল বৈঠক

সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩০ সালে ১২ নভেম্বর লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়। এ বৈঠকে ছিল ৮৯ জন প্রতিনিধি । ৫৮ জন ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং ৩১ জন ইংলেন্ডের রাজনৈতিক দল ও যুবরাজদের থেকে মনোনীত। রাজা পঞ্চম জর্জ সেন্ট জেমস প্যালেসে বৈঠকের উদ্বোধন করেন। কংগ্রেস বৈঠক বর্জন করেন। মুসলিমলীগ বৈঠকে অংশগ্রহণ করে[১৯]। সে সময় বৃটেন লেবার পার্টি ক্ষমতায় ছিল। তারা হিন্দু মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার বিপরীতে অভিমত প্রকাশ করে। ভারতের মুসলিম প্রতিনিধিগণ পৃথক নির্বাচন পদ্দতি ও পৃথক জাতীয়তার ওপর অটল থাকেন। ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী সিদ্বান্ত ছাড়াই বৈঠক মুলতুবী হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩১ সালের ৮ই অক্টোবর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে গান্ধীজী মুসলমানদের ন্যায় সংগত দাবী উপেক্ষা করে বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের আলোকে সম্প্রদয়ীক সমস্যা আপনা আপনিই চলে যাবে। অথার্ৎ তিনি ভারতের একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের বলিষ্ঠ দাবী পেশ করেন। দ্বিতীয় বৈঠক কোন সিদ্বান্ত ছাড়াই শেষ হয়।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক হয় ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালের শীতের মৌসুমে। এ বৈঠকের ভিত্তিতে Indi Act of 1935/ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন[২০] পাস হয়। এ আইনের প্রথমাংশে ফেডারেল পদ্ধতির শাসন

---

১৮. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ: নং ৩৬৪

১৯. গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মুসলিম লীগের মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মি. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মি. এ, কে. ফজলুল হক, স্যার মুহাম্মদ ইসমাইল, আগা খান, স্যার আবদুল কাইয়ুম, স্যার আবদুল হালিম গজনবী, স্যার আকবর হাদারী, স্যার মুহাম্মদ শফি, স্যার শাহ নওয়াজ ভুট্টু প্রমুখ নেতা লন্ডনে পৌঁছেন। মুসলিম সদস্যগণ লন্ডনে পৌঁছে মহামান্য আগা খানকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন। প্রায় দু'মাসকাল বৈঠক স্থায়ী হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আলী ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বৈঠকে যোগদান করেন এবং অসুস্থ অবস্থায় আসনে উপবেশন করেই তাঁর নব্বই মিনিটব্যাপী দীর্ঘতম ভাষণ দান করেন।

২০. ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই আইনকে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : এই আইনে ভারতে সর্ব প্রথম একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এতদিন পর্যন্ত ভারতে ভারতে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদিও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রেও আভাস প্রদান করা হয়েছিল তথাপি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এই আইনে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং করদমিত্র দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া এক সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। দ্বিতীয়াংশে প্রদেশগুলোতে সীমিত স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হয়। আলাদা নির্বাচন প্রথা রাখা হয়।

প্রাদেশিক নির্বাচন

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ভারতের প্রদেশ গুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সাতটি প্রদেশে ইউপি, সিপি, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বে, মাদরাজ ও উত্তর পশ্চিম সীতাকুন্ড প্রদেশে কংগ্রেস সকল আসনে জয়ী হয়। এভাবে ভারতের ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে ভারতে আর কোন দলের অস্তিত্ব নেই।[২১] বাংলায় শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিমলীগ কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পাঞ্জাব, সিন্দু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রদেশ ও আসামে মুসলমান প্রধানমীন্ত্রর অধীনে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ভারতে এগারটি প্রদেশের মধ্যে যে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়,তার দ্বারা মুসলমানদের আশংকা সত্যে পরিণত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস শাসনাধীনে মুসলমানগণ যে, সকল ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তার প্রকৃত প্রমান আড়াই বছরের কুশাসন।[২২]১৯৩৯ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলেন্ডে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ

---

২. সরকারী বিষয় বিভাগ : সরকারী বিষয়গুলোতে কেন্দ্রীয় বিষয়, প্রাদেশিক বিষয় ও যৌথ বিষয় হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় বিষয়ে আইন তৈরির ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দেওয়া হয়। আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, শিক্সা ইত্যাদি বিষয়ে আইন তৈরির ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন সভার ওপর ন্যস্ত করা হয়।

৩. প্রদেশিক স্বায়ত্বশাসন : ভারতের প্রদেশগুলোতে দ্বৈতশাসন রহিত করে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করা হয়। জননির্বাচিত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাই কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে সব প্রাদেশিক দফতর পরিচালনা দায়িত্ব পায়। মন্ত্রিসভা প্রদেশের আইনসভার কাছে দায়ী থাকে।

৪. কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন চালু করা হয়। ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর জেনাওেলের উপরই শাসনক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রীদের কাছে হস্তান্তর করার সংস্থান ছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভকে আইন সভার নিম্নকক্ষ ফেডারেল এসেম্বলীর কাছে দায়ী থাকতে হতো।

৫. শাসন বিভাগের প্রাধান্য ঐ আইনে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ওক্ষার জন্য বিস্তারিত বিধান করা হয়। প্রথমত, অনেকগুলো বিষয়ে ভারতের আইনসভাগুলোকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, কোন কোন পরিস্থিতিতে গভর্ণও জেনারেল ও গভর্ণও মন্ত্রী ও আইনসভার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার একনায়কসুলভ ক্ষমতা লাভ করে।

৬. সাংবিধানিক মর্যাদার সমস্যা : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভের অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

৭. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা : কেন্দ্রীয় আইনসভা ফেডারেল এসেম্বলী' ও 'কাউন্সিল অব স্টেটস' নামে দুটি কক্ষ নিয়ে গঠনের বিধান করা হয়। উভয় কক্ষেও হাতে সমান ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৮. বিচারবিভাগ : একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক সমন্বয়ে একটি ফেডারেল কোর্ট গঠন করা হয়।

৯. সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা : এ আইন তথা ভারতের সংবিধান সংশোদনের কোন ক্ষমতাই ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা প্রাদেশিক আইনসভাগুলোকে দেওয়া হয়নি।

১০. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ : ভারত সরকারের ওপর ব্রিটেনস্থ ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণ বেশ কিছুটা শিথিল করা হয়। বস্তুত ভারত সরকারের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষমতা হস্তান্তও করা হয়।

১১. প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা বিন্যাস : এ আইনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়।

১২. সিভিল সার্ভিস ; বেসামরিক কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে গভর্নর জেনারেল ও ভারত সচিবকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২১. নিউজ ক্রনিকলের প্রতিনিধির নিকটে মিঃ গান্ধী বলেন,- There was only one party which could deliver the goods, and that was the congress. I would not accept any other party except the Congress . . . . damn it by whatever name you may. There can be only one party and that is the Congress.
একটি মাত্র দল আছে যা (দেশ ও জাতির) কল্যাণ করতে পারে এবং তা হলো কংগ্রেস। কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দল আমি মানি না। . . . যে কোন নামই দাওনা কেন, ভারতে একটি দল আছে এবং তা কংগ্রেস। (স্মৃতি সাগরের ঢেউ- আব্বাস আলী খান, পৃ : ২০৯)

২২. সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগগুলোতে যে সব কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, তারা সকলেই হিন্দু। দক্ষ ও যোগ্য মুসলমান কর্মচারীর কোন মূল্যই দেয়া হতো না। ইউপি মন্ত্রিসভা একজন দক্ষ জেলা প্রশাসকের চাকুরী স্থায়ীকরণের বিষয়টির চরম বিরোধিতা

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে বৃটিশ সরকার সহযোগিতা করতে অনুরোধ করলে কংগ্রেস অসহযোগীতার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং একযোগে ছয়টি প্রদেশ থেকে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

পাকিস্তান আন্দোলন

কংগ্রেসের আড়াই বছরের কুশাসন মুসলমানদের এক নতুন রাজনৈতিক দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে প্রস্তাব[২৩] গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কে এম ফজলুল হক। তার পর সমগ্র ভারত উপমহাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আববাস আলী খান তৎকালীন সময়ে বাংলার সরকারের অধীনে ইনফরমেশন বিভাগে চাকুরীরত। পাকিস্তান আন্দোলন সকল মুসলমানদের প্রানে অদম্য প্রেরণা ও আশা আকাঙ্ক্ষার জোয়ার এনে দেয়। বিশেষ করে খান সাহেব বিগত কয়েক বছর বিভিন্ন সরকারী চাকুরী করতে গিয়ে হিন্দু কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি যে আচরণ লক্ষ্য করেছেন তাতে তিনি উপলব্দি করেছেন পাকিস্তান ব্যতীত মুসলমানদের বাছাঁর কোন উপায় ছিল না । তাই পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে তিনি জীবনের এক নতুন আশার আলো দেখতে পান।

পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি

ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র জীবন বোধ ও জীবন বিধান এবং পরকালের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে জবাবদিহির ভিত্তিতে মুসলমান একটি জাতি। উপমহাদেশে ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, হিজরী '৯৩ সালের

করে এজন্যে যে উক্ত অফিসার ছিলেন একজন মুসলমান। মধ্য প্রদেশের কয়েকটি বস্তি এলাকার সকল মুসলমানের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং মহিলাদের অপহরণ করা হয়। একটি গ্রামের দেড়শত পুরুষকে হত্যার মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করে পুলিশ হাজতে অনাহারে রাখা হয়। পরে তদন্তে তারা সকলে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হয়। নাগপুর হাইকোর্টেও প্রধান বিচারপতি একটি মামলার রায়ে নির্ভীক চিত্তে মন্তব্য করেন যে পুলিশ, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, ম্যাজিস্ট্রেট, হাকিম এবং এমনকি মন্ত্রী পর্যন্ত বহু নির্দোষ নিরাপরাধ মানুষকে ফাঁসিতে পাঠিয়েছেন। তাদের অপরাধ শুধু এই ছিল যে, তারা ছিল মুসলমান। যে সব মুসলমান পূর্ব থেকে বিভিন্ন উচ্চ পদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের চাকুরী ও জীবন উভয়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। (স্মৃতি সাগরের ঢেউ- আব্বাস আলী খান, পৃ: ২১০)

২৩. ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ উপমাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব পেশ করেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক। মূল প্রস্তাবের ভাষা নিম্নরূপ : Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no Constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, Viz, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to consititute 'Independent States' in which the Constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specially provided in the Constitution of for miniorities in thsese units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them, and in other parts of India where the Mussalmans are in a minority, adequate, effective and mandatory safeguards shall be specially provided in the Constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

-Justice Syed Shameem Husain Kadir: Creation of Pakistan, p. 192.

Dhaka University Institutional Repository
রজব মাসে তথা ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন মুসলমানগন সিন্দু ভূখন্ডে প্রথম পদক্ষেপ করেন পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা তখনই হয়। উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমান দুটি পৃথক পৃথক জাতী তাদের ধমীর্য় বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, ন্যায়, অন্যায় ও হালাল-হারামের মাপকাঠি সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীত মুখী হওয়ায় উভয়ে দুটি পৃথক জাতি, এ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সৃষ্টি।

পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা

লাহোর প্রস্তাবের কোন বিচার বিবেচনা না করেই হিন্দুদের পক্ষ থেকে তার চরম বিরোধিতা শুরু হয়। মিঃ গান্ধী আশা প্রকাশ করেন যে বৃটেন প্রস্তাবটি কার্যকর করতে দেবে না । পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ৬ ই মে পুনাতে বলেন হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের কোন ইতিবাচক কর্মসূচী নেই। তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবকে নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়ীত করে বলেন এ চব্বিশ ঘণ্টার অধিক সময় টিকেবে না। হিন্দু মহাসভা ১৯ শে মে পাকিস্তান প্রস্তাবকে হিন্দুবিরোধী এবং জাতীয়তা বিরোধী বলে উল্লেখ করেন। ১৯৪০ সালের ২৪ শে মে বোম্বে প্রাদেশকি মুসলিম লীগ সম্মেলনে কায়েদে আযম কংগ্রেসের মিথ্যা প্রচারণার কথা উল্লেখ করেন। কংগ্রেস ও হিন্দু জাতীর চরম বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পাকিস্তান আন্দোলন চলতে থাকে এতে মুসলমানদের ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

ভারত ছাড় আন্দোলন

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে তার অধিবেশনে ভারত ছাড় প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ বড়ো দুঃখজনক। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মনে করেছিল যে যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় অবধারিত । এ সুযোগে দেশে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সমগ্র দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা ছিল কংগ্রেসের পরিকল্পনা। এভাবেই মুসলমানদের সকল দাবী প্রত্যাখ্যান করে উপমহাদেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে । এ সম্পর্কে মাওঃ আবুল কালাম আযাদ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তাঁর মনে এ পরিকল্পনা ছিল যে, যেইমাত্র জাপানীরা বাংলায় পৌছে যাবে এবং ব্রিটিশ সৈন্য বিহারে পিছু হটে আসবে, কংগ্রেস গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে। কিন্তু কংগ্রেসের এ পরিকল্পনা অমূলক ও অবাস্তব প্রমাণিত হয়।

ওয়াভেল পরিকল্পনা : ১৯৪৫

১৯৪৫সালের জুন মাসে ভারত সচিব হাউস অব কমন্সে এক বিবৃতির মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানকল্পে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বল হয় ভাইসরয় তাঁর কার্যকরী কাউন্সিলে প্রধান সম্প্রদায়গুলোর ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধি নেবেন। এ কাউন্সিলে ভাইসরয় এবং সেনাপ্রধান ছাড়া সকলে হবেন ভারতীয় গান্দী এটা প্রত্যাক্ষান করেন।

শিমলা সম্মেলন

ভাইসরয় ২০ শে জুন শিমলায় সকল দলের সম্মেলন আহ্বান করেন। শিমলাচুক্তি সম্মেলনে কংগ্রেস মুসলীম লীগের এবং অন্যান্য দলের একুশ জন যোগদান করেন। সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে চরম মতানৈক্য হয়।

সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৫ সালে ১৫ ই আগস্ট বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। জুলাইয়ের শেষের দিক ইংলেন্ডের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বছরের শেষে শীত মওসুমে ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের দাবী পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার সকল মুসলিম আসন মুসলমানরা লাভ করে। এবং প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর ৪৯৫ মুসলিম আসনের মধ্যে ৪৪৬ টি মুসলিম লীগ লাভ করে । এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় একমাত্র মুসলিম লীগই মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ।

Dhaka University Institutional Repository

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা

১৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬সালে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে ভাইসরয় লড ওয়াভেল এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আলোচনান্তে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে কেবিনেট মন্ত্রীদের একটি বিশেষ মিশন ভারতে প্রেরণ করা হয়। তারা ২৪ শে মার্চ ১৯৪৬ নতুন দিল্লীতে পৌছেন । তিন মাস অবস্থান করে এ মিশন ১৬ই মে একটি প্রতিনিধিত্ব মূলক শক্তিশালী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে বিবৃতি প্রদান করেন। ১৪ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। যাদেরকে ভাইসরয় মধ্যবর্তী কেবিনেটের আমন্ত্রণ জানান। এতে তফসিলী সম্প্রদায়ের ১ জনসহ কংগ্রেসের ৬ জন, মুসলিম লীগের ৫ জন, ১ জন শিখ, ১ জন ভারতীয় খ্রীষ্টান এবং ১ জন পার্শী, তফসিলী সম্প্রদায়ের ১ জন। কংগ্রেসে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ফলে কেবিনেট মিশনের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন

কেবিনেট মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তান হাসিল করার উদ্দেশ্য এবং বৃটিশ গোলামী এবং বর্ণহিন্দুদের ভবিষ্যৎ প্রাধান্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য মুসলিম জাতির পক্ষে ডাইরেক্ট অ্যাকশন[২৪]অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং বৃটিশের মনোভাব ও আচরনের প্রতিবাদে বিদেশী সরকার প্রদত্ত সকল প্রকার খেতাব পরিত্যাগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি আবেদন জানানো হয়। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জন্য ১৬ই আগস্ট নির্ধারিত হয়। ১৬ ই আগস্ট হিন্দুদের ওপর আক্রমন করার কোন পরিকল্পনা মুসলানদের ছিলনা । বরঞ্চ লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কংগ্রেস মুসলিম নিধনের নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরী করে। ১৬ই আগস্টের কদিন পূর্ব থেকেই এ মিথ্যা গুজব ছড়ালো যে মুসলিম লীগ তথা কলকাতার মুসলমানগণ হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করবে। এ গুজব ছড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল যেন হিন্দুগণ কলকাতার শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ মুসলমান নির্মূল করার জন্য তৈরি হয়। আব্বাস আলী খান সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকলে ও পাকিস্তান আন্দোলন মনে প্রাণে সমর্থন করতেন । মুসলিম লীগ মহলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশন পোগ্রামে সরাররি অংশগ্রহন কারী হিসাবে খান সাহেব বলেন "১৬ই আগষ্ট মুসলমাদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের ওপর আক্রমন চালানো হবে এরূপ কোন পরিকল্পনার বিন্দুবিসর্গও কানে আসেনি। আমি তখন

---

[২৪]. ডাইরেক্ট এ্যাকশন/প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ব্রিটিশ দাসত্ব ও অনুমিত বর্ণহিন্দুর আধিপত্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মুসলিম লীগ আহুত হরতাল । প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পটভূমি হলো এই যে, মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করায় মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দিক থেকে অপ্রস্তুত বোধ করে। একগুঁয়ে কংগ্রেসকে পরিকল্পনার ব্যাপারে সম্মত করাতে কেবিনেট মিশনের পুনঃপুন ব্যর্থতাকে মুসলিম লীগ ব্রিটিশের বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করে। আর এই একই কারণে জিন্নাহ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বিদায় জানিয়ে পাকিস্তান হাসিলের জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার্যসূচি'র ডাক দেন। ১৯৪৬ সালের ২৭-২৯ জুলাই মুসলিম লীগের এক কাউন্সিল সভায় এ মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ প্রস্তাব গ্রহণ করার পর অচিরেই লীগ ওয়ার্কিং কমিটি একই বছর ১৬ আগস্টকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণাপূর্বক এক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ঐ দিন ভারতের সকল প্রদেশে সব রকম ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বন্ধ রাখা ও সর্বাত্মক হরতাল পালনের জন্য লীগ নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম জনসাধারণের প্রতি এক নির্দেশ পাঠানো হয়। বাংলায় পুনর্গঠিত মুসলিম লীগের স্থপতি হিসেবে প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনুভব করেন যে, বাংলায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসটি রীতিমতো জঙ্গি মেজাজে পালিত হওয়া উচিত। ঐ দিবস উপলক্ষ্যে দিবসটিকে সফল করে তুলতে তাঁর ব্যাপক প্রস্তুতির ফলে এক সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যা সম্ভবত তিনি কখনও চান নি। পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক নিধনযজ্ঞে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। এ দাঙ্গার সময় কলকাতার একটা বিরাট অংশ জুড়ে কয়েকদিন ধরে আগুন জ্বলতে থাকে। কলকাতার এই প্রত্যক্ষ কর্মসূচিজনিত দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রতিক্রিয়ার আকারে অচিরেই অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করে, বিহার ও নোয়াখালীতে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার দাঙ্গা উভয় পক্ষের জন্যই ছিল কমবেশি সমান ক্ষতিকর। তবে অন্যত্র এটি একতরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিহারে এককভাবে মুসলমান ও নোয়াখালীতে হিন্দুরা প্রাণ হারায়। তবে সামগ্রিকভাবে এ দাঙ্গায় প্রাণহানি মুসলিম পক্ষে অনেক বেশি হয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস প্রত্যক্ষ ফলাফল প্রদান করে। ঐ দিনই ভারতের নিয়তি নির্ধারিত হয় এবং ঐ দিনই যুক্তবাংলার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের বিষয়টি চিরকালের মতো নির্ধারিত হয়ে যায়। বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। [সিরাজুল ইসলাম]

Dhaka University Institutional Repository

ফ্যামিলিসহ কোলকাতায় থাকতাম, বাসায় আমার সাথে আমার স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা মাত্র। গোলযোগের কোন আশঙ্কা থাকলে তাদেরকে একাকী ফেলে ১৬ই আগস্টে মুসলিম লীগের জনভায় নিশ্চিত মনে কিছুতেই যেতে পারতাম না।" সেদিন খান সাহেব মুসলিম লীগ কর্মীদের হাতে কোন অস্ত্র দূরের কথা কোন লাঠিসোটাও দেখতে পাননি। তবে পাকিস্তান লাভের আশায় সকলকে উজ্জীবিত দেখতে পেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মঞ্চে উঠার পর মুসলিম লীগ মিছিলের ওপর এবং জনসভায় আগমনকারীদের ওপর হিন্দুদের সশস্ত্র আক্রমণের সংবাদ আসতে থাকলো। অতঃপর আক্রান্ত মুসলমানদের অনেকেই রক্তমাখা জামা-কাপড় নিয়ে সভায় হাজির হয়ে হিন্দুদের সশস্ত্র হামলার বিবরণ দিতে লাগল। শ্রোতাদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হল।

একজিকিউটিভ কাউন্সিলে মুসলিম লীগের যোগদান

১৯৪৬ সালে দুসরা সেপ্টেম্বর। অন্তর্বর্তী সরকার কার্যভার গ্রহণ করেন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর একমাস অতিবাহিত হলে মুসলিম লীগ উপলব্ধি করে যে সরকারের বাইরে অবস্থান মুসলিম স্বার্থের চরম পরিপন্থি। হিন্দু সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে দুস্কৃতিকারীগণ উৎসাহিত বলে মনে হচ্ছে। অতএব এমতাস্থায় মুসলিম ভারত রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগকে অবশ্যই সরকারে যোগদান করতে হবে। জিন্নাহর মতে কোয়ালিশন সরকারের বাইরে থাকার চেয়ে ভেতরে থেকে ভালভাবে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে পারবেন। ২৫ শে অক্টোবর ১৯৪৬, একজিউকিটিত কাউন্সিল গঠিত হয়।[২৫]

মাউন্ট ব্যাটেন মিশন

১৯৪৭ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী বৃটেন প্রধানমন্ত্রী এটলী এ্যডমিরাল দি ভাই কাউন্ট মাউন্টব্যাটেনকে ওয়াভেলের স্থানে ভাইসরয় হিসেবে নিয়োগ দেন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ২২শে মার্চ দিল্লী পৌছেন। তার নিয়োগ কংগ্রেসকে উল্লাসিত করে। পূর্ব থেকেই নেহারুর সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি ভারতকে অখণ্ড রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন । একান্ত অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও ভারত বিভাগ বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেসকে মেনে নিতে হয়।

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিক্রিয়া

ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। বাংলার এবং পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনসভাকে নির্দেশ দেয়া হয়, যেন তারা প্রত্যেকেই দুই দু ভাগে মিলিত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোকে নিয়ে এক ভাগ এবং অবশিষ্ট আর এক ভাগ। ১৯৪৭ সালে ২রা জুন ভাইসরয় সাত নেতার এক আলোচনা সভার আহ্বান করেন। তারা হলেন নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান আব্দুর রব নিশতার

---

[২৫]. এক্সিকিউটিবকাউন্সিল এর সদস্যবৃন্দ হলেন,

কংগ্রেস

জওহরলাল নেহরু -(External Affairs and Commonwealth Relations)
বল্লভ ভাই প্যাটেল- (Home, Information & Broadcasting)
মি. রাজা গোপালচারিয়া- (Education & Arts)
আসফ আলী- (Transport & Railway)
জগজীবন রাম- (Labour)

মুসলিম লীগ

লিয়াকত আলী খান- (Finance)
আই আই চুন্দ্রিগড়- (Commerce)
আবদুর রব নিশতার- (Communications)
গজনফর আলী খান- (Health)
যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল- (Legislative)

Dhaka University Institutional Repository

এবং বলদেব সিং পরিকল্পনাটি তাদের কাছে পেশ করা হয়। এবং তা অনুমোদিত হয়। মাউন্টে ব্যাটেন গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এ কথা বলে তাকে সম্মত করার চেষ্টা করেন যে বর্তমান পরিকল্পনাটি অতি উত্তম।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন পরিকল্পনাটি সারা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা হয়। ভাইসরয় ৪ঠা জুন সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে প্রতিটি পযার্য়ে ও মুহূর্তে তিনি নেতৃবৃন্ধের হাত ধরাধরি করে কাজ করছেন। সে জন্য পরিকল্পনাটি তাদের ক্ষোভ অথবা বিস্ময়ের কারণ হয়নি। যাই হোক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষনা করেন যে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পরীক্ষামূলক তারিখ নির্ধাতি হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৪ই জুন মিলিত হয় এবং পরিকল্পনা মেনে নেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে সাথে ভারত বিভাগ সম্পর্কে জোর দিয়ে একথা বলে যে ভূগোল পর্বতমালা ও সমুদ্র ভারতের যে আকার, আকৃতি নির্মাণ করে দিয়েছে যেমনটি আছে কোন মানবীয় সংস্থা তা পরিবর্তন করতে পারবে না এবং তার চুড়ান্ত ভাগ্য নির্ণয়ের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কমিটি বিশ্বাস করে যে যখন বর্তমান ভাবাবেগ প্রশমিত হবে, তখন ভারতের সমস্যাসমূহ তার যথাযথ প্রেক্ষিতেই বিবেচিত হবে। এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রান্ত মতবাদ কলংকিত ও পরিত্যক্ত হবে।[২৬]

৩ জুন ১৯৪৭ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বেঙ্গল আইনসভার অধিবেশন ২০ শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। এবং ১২৬-৯০ ভোটে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্লামেন্ট উপস্থাপন

প্রধানমন্ত্রী এটলী ভারত স্বাধীনতা হাউস অব কমেন্সে ৪ঠা জুলাই পেশ করেন। ১৫ই জুলাই হাউস অব কমেন্সে এবং ১৬ই জুলাই হাইস অব লর্ডসে তা গৃহীত হয়। বিলটি ১৮ই জুলাই রাজকীয় সম্মতি লাভ করে। অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের জন্য ২০ শে জুলাই পৃথক পৃথক দুটি প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট কায়েম হয়। বিগত সাত বছরের সংগ্রামের ফসল হিসেবে পাকিস্তান নামে একটি নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো । এ ধরনের একটি রাষ্ট্র দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম। দেশ বিভাগের পর কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে লক্ষাধিক মুসলিম স্বাধীন ভারতে নিহত হয়েছে। এবং তাদের বহু মসজিদ ও ধর্মীয় স্থান ধ্বংস হয়েছে। ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। আপরাধীদের শাস্তি দূরের কথা, তাদের হাতেই ভারত সরকার কে জিম্মা থাকতে হয়েছে। এসব বুঝতে পেরে মুসলমানদের পৃথক ও স্বাধীন আবাস ভূমির দাবী করা হয়েছে। বস্তুত হিন্দু জাতি ও নেতৃবৃন্দের চরম মুসলিম বিদ্বেষই পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের ভিত্তিতে ১৫ই আগস্ট হতে ভারতের উপর থেকে প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[২৬]. ১৫ই আগস্ট গান্ধী বলেন, আমি নিশ্চিত যে এমন এক সময় আসবে যখন এ বিভাগ পরিত্যক্ত হবে । কংগ্রেস মুখপত্র 'দি হিন্দুস্থান টাইমস' ও তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্তরূপ আশা ব্যক্ত করে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, গ্রন্থাকার, হিন্দু নেতা এ আশা পোষন করতেন যে ভারত এক ও অখণ্ড হবে। পাকিস্তান বেশী দিন টিকবে না এবং কংগ্রেসের অধীনে ভারত পুনরায় একটি অখণ্ড ভারতে পরিনত হবে (Economis,17 May1947 ;Sunday Times I June 1947 ; Manchester Guardian 15Aug.1947,Round Table Sept.1947,P 370 ; Guy Wint : The Brtish In Asia-p.179;I.H.Qureshi:The Struggle for Pakistan,pp,195-96)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পাকিস্তানী শাসনামল(১৯৪৭-১৯৭১)

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান[১] রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব বাংলা, আসাম প্রদেশের সিলেট জেলা এবং কিছুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য নিয়ে দেশটি গঠিত। পাকিস্তান রাজ্য ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত দুটি ভূখণ্ডে বিভক্ত ছিল। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ জনগণকে একটি সংবিধান উপহার দিতে পারেনি। সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গণপরিষদ পাকিস্তানের সংবিধানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি আদর্শ প্রস্তাব[২] গ্রহণ করে। পাকিস্তানের সংবিধানিক ইতিহাসে এটি একটি মাইল ফলক ও গুরুত্বপূর্ন দলিল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবটি পেশ করেন।

---

১. পাকিস্তান' শব্দটি কোন ভৌগলিক অঞ্চল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, এ ব্যবহৃত হয়েছে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র অর্থে। এই অর্থেই আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে 'প্রথম পাকিস্তান' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন,
আল্লাহ তায়লার কুদরাতের হস্ত অবশেষে রসূল মকবুল (সা)-এর ঐতিহাসিক হিজরতের মাধ্যমে মদীনায় এক ধরনের 'পাকিস্তান' কায়েম করে দেয়।
(খুৎবাতে ওসমানী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী, পৃ: ১৪০; তারিখে নযরিয়ায়ে পাকিস্তান, অধ্যাপক মুহাম্মদ সালিম, পৃ: ৩১)।
লাহোর প্রস্তাবে যে একটি স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করা হয়েছিল তার নাম পাকিস্তান বলা হয়নি। এ নামটি চৌধুরী রহমত আলী পছন্দ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালে 'বজমে শিবলী' অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন- উত্তর ভারত 'মুসলিম' এবং একে আমরা 'মুসলিম' রাখব। শুধু তাই নয়। একে আমরা একটি মুসলিম রাষ্ট্র বানাবো। এ আমরা তখনই করতে পারব যখন আমরা এবং আমাদের এ উত্তরাঞ্চল ভারতীয় হওয়া থেকে বিরত থাকবে। এ হচ্ছে তার পূর্বশর্ত। যতো শীগগির আমরা ভারতীয়তাবাদ পরিহার করব ততোই ভালো আমাদের এবং ইসলামের জন্য (Choudhury Rahmat Ali: p.172, I.H Quereshi: The Struggle for Pakistan, pp.115-116) চৌধুরী রহমত আলী ও এ প্রথমে
পাকিস্তান নাম ব্যবহার করেননি । তিনি মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের কথাই বলেছেন।

২. আদর্শ প্রস্তাবে পাকিস্তানের জাতীয় লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ কতগুলো রূপরেখা ঘোষিত হয়েয়েছিল। এর মূল বিষয় নিম্নে উপস্থাপন করা হল :
ক. আদর্শ প্রস্তাবে বলা হয়, " পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধি এই গণপরিষদ স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান রচনার প্রস্তাব করছে"।
খ. পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা এর জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রযোগ করা হবে। অর্থাৎ পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে।
গ. পাকিস্তান একটি যুক্তরাষ্ট্র হবে। যেসব এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং যেসব এলাকা ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যোগ দিবে সেসব এলাকা নিয়ে এই যুক্তরাস্ট গঠিত হবে। পাকিস্তানের প্রদেশগুলো সংবিধানের নির্দেশিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে স্বায়ত্ত শাসিত হবে।
ঘ. পাকিস্তান ন্যায়বিচারের ইসলামী নীতিভিত্তিক রাষ্ট্র হবে। সেখানে ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য, সহনশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মূল নীতি পুরোপুরি মেনে চলা হবে। সেখানে মুসলমানদের পবিত্র কোরআন ও সুন্নায় নির্দেশিত ইসলামী শিক্ষা ও বিধিবিধান অনুযায়ী জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া হবে।
ঙ. পাকিস্তানের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত স্বাধীনতা রক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে।
চ. পাকিস্তানের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার শর্তে তাদের সমানাধিকার, বাকস্বাধীনতা, সামিাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি রক্ষা করা হবে।
ছ. সেখানে সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণীগুলোর ন্যায়সংগত স্বার্থ রক্ষায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হবে।
ঞ. পাকিস্তান যুক্তরাষ্টের ভৌগোলিক অখনণ্ডতা, স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব অধিকার রক্ষ করা হবে।
ট. পাকিস্তানের জনগণ যাতে উন্নতি লাভ করে বিশ্বের দরবারে সম্মানজনক আসন লাভ করতে পারে। সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন[৩] তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র পূব পাকিস্তানের ভাষা ও

ঠ. আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানব জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পূর্ণ অবদান রাখতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করা হবে।

৩. **ভাষা আন্দোলন** বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত গণ-আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হন এবং ভাষার ব্যাপারে তাঁরা একটি চূড়ান্ত দাবিনামা প্রস্তুত করেন; দাবিটি হলো : পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও সরকারি কার্যাদি পরিচালনার মাধ্যম হবে বাংলা আর কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি বাংলা ও উর্দু।

ভাষাসংক্রান্ত এই দাবিকে সামনে রেখে সর্বপ্রথম আন্দোলন সংগঠিত করে তমদ্দুন মজলিস। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। ক্রমান্বয়ে অনেক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং একসময় তা গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফোরামে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা চলে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভার আয়োজন করে। সভার পরও মিছিল-প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। এ মাসেরই শেষদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। পরের বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের উর্দু অথবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাবে সংশোধনী এনে বাংলাকেও পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষই পূর্ব পাকিস্তানের, যাদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন বিরোধিতা করলে এ দাবি বাতিল হয়ে যায়। এ খবর ঢাকায় পৌঁছালে ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা বিক্ষুব্ধ হন। *আজাদ*-এর মতো পত্রিকাও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনা প্রস্তাবে যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সমালোচনা করে। এরপর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি নতুন রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন শামসুল আলম।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। গণ-পরিষদের ভাষা-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া ছাড়াও পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকেটে বাংলা ব্যবহার না করা এবং নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাখার প্রতিবাদস্বরূপ ঐদিন ঢাকা শহরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটিদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। ধর্মঘটের পক্ষে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই শ্লোগানসহ মিছিল করার সময় শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল ওয়াহেদ প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। আব্দুল মতিন, আবদুল মালেক উকিল প্রমুখ ছাত্রনেতাও উক্ত মিছিলে অংশ নেন; বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হয়। একজন পুলিশের নিকট থেকে রাইফেল ছিনিয়ে চেষ্টা করলে পুলিশের আঘাতে মোহাম্মদ তোয়াহা মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ১২-১৫ মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়।

আন্দোলনের মুখে সরকারের মনোভাব কিছুটা নমনীয় হয়। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তবে চুক্তিতে তিনি অনেকগুলি শর্তের সঙ্গে একমত হলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাঁকে কোন কিছুই মানানো যায়নি।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ঢাকার দুটি সভায় বক্তৃতা দেন এবং দুই জায়গাতেই তিনি বাংলা ভাষার দাবিকে উপেক্ষা করে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। জিন্নাহর বক্তব্য তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়; এর আহ্বায়ক ছিলেন আবদুল মতিন।

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে থাকে। এ সময় জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান উভয়েই পরলোকগত। লিয়াকত আলী খানের জায়গায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে। ১৯৪৯ সালে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। পূর্ব পাকিস্তানে বঞ্চনা ও শোষনের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং এখানকার জনগণ ক্রমেই এই মতে বিশ্বাসী হতে শুরু করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জায়গায়

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার ষড়যন্ত্র করে। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে দেশের জনগনের ওপর যে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছিল তা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার জনগনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত এক পর্বতসমান ভূল[৪]। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন অধ্যাপক

তাদের উপরে আরোপিত হয়েছে নতুন ধরনের আরেক উপনিবেশবাদ। এ প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পায়।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে, প্রদেশের সরকারি কাজকর্মে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এ সময় সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি (একুশে ফেব্রুয়ারি) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। এসব কর্মসূচির আয়োজন চলার সময় সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের (১৯০৫-৭৪) সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কি-না এ প্রশ্নে সভায় দ্বিমত দেখা দেয়, তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সঙ্কল্পে অটুট থাকে।

পরদিন সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাংশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়। সভা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ উপাচার্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করেন। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে আবদুল মতিন এবং গাজিউল হক নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোট ছোট দলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে, ছাত্রীরাও এ আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসররত মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত (রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ শ্রেণীর ছাত্র) নিহত হয়। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন আবদুস সালাম মারা যায়। অহিউল্লাহ্ নামে আট-নয় বছরের এক কিশোরও সেদিন নিহত হয়।

এ সময় গণপরিষদের অধিবেশন বসার প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলি চালানোর খবর পেয়ে গণপরিষদ সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ এবং বিরোধী দলের সদস্যসহ আরও কয়েকজন সভাকক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান। অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাংলা ভাষার দাবির বিরোধিতা অব্যাহত রেখে বক্তব্য দেন।

পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল গণবিক্ষোভ ও পুলিশি নির্যাতনের দিন। জনতা নিহতদের গায়েবানা জানাজার নামায পড়ে ও শোকমিছিল বের করে। মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি পুনরায় লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট চালায়। এতে শফিউর রহমানসহ কয়েকজন শহীদ হন এবং অনেকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা যে স্থানে গুলির আঘাতে নিহত হয়, সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। ১৯৬৩ সালে এই অস্থায়ী নির্মাণের জায়গায় একটি কংক্রীটের স্থাপনা নির্মিত হয়।

গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল পাস করে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে এই আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) একপর্যায়ে এর সদস্য ফরিদপুরের আদেলউদ্দিন আহমদের (১৯১৩-১৯৮১) দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫২ সালের পর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাঙালিদের সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। [বশীর আল হেলাল]

[৪] ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাষার প্রশ্নে যে কোন হঠকারী সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে তমুদ্দুন মজলিস কর্তৃক প্রচারিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা' শীর্ষক পুস্তিকায় বলা হয় 'বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু মুসলিমের ওপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালানোর চেষ্টা করা হয় তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিসই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবী উথাপন করেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে নূরুল হক ভূঞাকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ শামসুল হককে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের বিভিন্ন হলের প্রতিনিধি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ, তমদ্দনু মজলিশের সমন্বয়ে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ পূনর্গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলা ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন পূর্বপাকিস্তানের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৪৮ সালের ২০ শে মার্চ গর্ভনর জেনারেল কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১ শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে, উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা[৫]। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ছাত্ররা জিন্নাহর প্রতিবাদ করে। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে ও বলা হয় যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে উর্দু । এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তুমুল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে গণপরিষদে লিয়াকত আলী খান রির্পোটের উপর আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা করেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে। এর ফলে ক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা ৩০শে জানুয়ারী ছাত্রধর্মঘট পালন করেন। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট শোভাযাত্রার আয়োজন করে। এ দিকে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার নূরুল আমীন সরকার ঐ সকল সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু ১৪৪ দ্বারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে শোভাযাত্রা বের করে। পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানী গ্যাস ব্যবহার করে সকালের মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিকাল তিনটার সময় পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদে বাজেট অধিবেশন চলাকালে পরিষদ ভবনের সন্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের মিছিল বের করা হয় । মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সম্মুখে হাজির হলে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালায় । গুলিতে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার প্রমুখ নিহত হয়। এ বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী সকল স্তরের মানুষ প্রচনণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা এত বেশি ছিল যে সরকার বাংলার সংঘবদ্ধ জনতার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যদা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধাণে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যদা লাভ করে। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি মাইলফলক হিসেবে থাকবে।

তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্কের অবসান হবার আশংকা আছে। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে ন্যায়সংগত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্তব্য।

[5] Urdu and Urdu will be the state language of pakistan

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপ্রার্থক্য ও রাজনৈতিক সংকট

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। উভয় অংশের সম্প্রীতি এবং সংহতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল পারস্পারিক সহযোগিতা, সহমর্মীতা, ইনসাফপূর্ণ আচরণ, ধর্মীয় বন্ধন। তাই দু দেশের দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি সৃষ্টির লক্ষ্যে পাক সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয় যে "ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্র, স্বাতন্ত্র-সাম্য, সহনশীলতা ও সামাজিক সুবিচার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন আইন পরিষদেই ইসলামের নির্দেশ ও অনুজ্ঞা বিরোধী আইন প্রণীত হবে না এবং প্রচলিত আইনকে পবিত্র কুরআন সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী অনুজ্ঞার সাথে সুসামঞ্জস্য করা হবে"।[৬]

পরবর্তী সময় শাসক গোষ্ঠী এ সাংবিধানিক ঘোষনা নানা ছল চাতুরীর মাধ্যমে অবহেলা করেন। তাদের কথা ও কাজে মিল ছিল না। শাসক গোষ্ঠী কোন অন্যায় করলেও তাদের প্রতিবাদ করা যেত না। যেহেতু পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে মুসলিম লীগ একক চালিকাশক্তিছিল তাই স্বাধীনতার পর পাকিস্তানকে একমাত্র মুসলিম লীগের সম্পত্তি মনে করা হতো। ফলে কোন নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। পূব বাংলায় ছিল পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। গণতান্ত্রিক নীতি মুতাবিক কেন্দ্রীয় রাজধানী, স্থল, নৌ, বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব বঙ্গে স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। শুধু তাই নয়, ইনসাফ মুতাবেক সশস্ত্র বাহিনী ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির শতকরা ৫২ ভাগ পূর্ব বঙ্গবাসীর পাওয়ার দরকার ছিল। সরকারি চাকুরীতে পূর্ব বঙ্গবাসীর প্রতিনিধিত্ব ছিল নামে মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের ও স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে বৈদেশিক শত্রুর প্ররোচনা বলে এমনকি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে মনে করে। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের অনুগত দুর্বল প্রাদেশিক সরকার গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। তাদের অন্যায় অপকর্ম ঢাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানে ঐক্য সংহতি ও ইসলামের দোহাই দিত। পাকিস্তানী নেতৃত্বের প্রতি এসব কারণে পূর্ব বাংলার জনগনের মনে অনাস্থা সৃষ্টি হয়।

এ ধরনের রাজনৈতিক সংকটের ফলে দেশের উভয় অংশে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত বাংলা ভাষা আন্দোলনের পর থেকে এ অঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি বিদেশী সরকার বলে ভাবতে শুরু করে। পূর্ব বঙ্গবাসীদের প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগ। এ কারণেই আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ পূর্ব বঙ্গবাসীদের প্রাপ্য কেন্দ্র থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আস্থাশীল করতে পারেনি। ফলে তাদের জনপ্রিয়তা পূর্ববঙ্গে শূন্যের কোঠায় নেমে যায়।

---

[৬]. ১৯৫৬ সালের সংবিধান

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনে জয়লাভ

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের প্রাককালে শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, আতাহার আলীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে একুশ দফা[৭] ভিত্তিক প্রচার প্রচারনার এক প্রবল তুফান সৃষ্টি করে। হঠকারী মুসলীম লীগ এ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে জয়লাভ করে।[৮] যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। ২রা এপ্রিল কৃষক শ্রমিক পাটির নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক পুর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারনে ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে গর্ভণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন এবং গর্ভণরের শাসন জারি করেন। এতে পূর্ব বাংলার অধিবাসীগন ব্যপক হারে ক্ষুব্ধ হন।

১৯৫৬ সালের পাকিস্তানী শাসনতন্ত্র ও এর বৈশিষ্ট্য

১৯৫৬ সালের ৯ই জানুয়ারী নতুন গণ পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু করে। ২রা মার্চ গর্ভণর জেনারেল নতুন শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর করেন এবং ২৩ মার্চ থেকে তা বলবৎ করা হয়। শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলা নাম পরির্বতন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়। পশ্চিমাঞ্চলের সকল প্রদেশ একিভূত করে এক ইউনিটের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তান নাম রাখা হয়। দু প্রদেশের মধ্যে সংখ্যা সাম্য নীতি প্রর্বতন করা হয়।বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হয়।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধাণ কার্যকরী হয়। এ প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন চৌধূরী মোহাম্মদ আলী। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত এটি চালু থাকে।

১৯৫৬ সালের সংবিধাণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল,এ সংবিধাণ ছিল পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম সংবিধাণ[৯], এ সংবিধণের ইসলামিক বিধান সমূহ উল্লেখযোগ্য, এতে গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, এটি একটি লিখিত সংবিধান, এ সংবিধাণে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়, এ সংবিধাণের মাধ্যমে পাকিস্ত ানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, ১৯৫৬ সালের সংবিধাণ ছিল দূস্পরিবর্তনীয়, এ সংবিধাণে

---

৭. একুশ দফার উল্লেখযোগ্য ঘোষনা ছিল, বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দান। সমবায় ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন, দেশে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা,পানি সেচ্ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, এক বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, সকল প্রকার সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ, ঢাকা ও রাজশাহী বিদ্যালয়ের সকল কালাকানুন বাতিল করে ওগুলোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা, শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে আলাদা করা, ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ও সরকারী ছুটির দিন বলে ঘোষনা করা, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন দান এবং পররাষ্ট্র, অর্থ ও প্রতিরক্ষা ব্যতীত অন্যান্য বিভাগকে প্রদেশে আনয়ন করা।
(ডঃ এমাজ উদ্দীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, পৃষ্ঠা : ১৩২)

৮. ৩০৯ আসনের পরিষদে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ টি এবং মুসলীম লীগ মাত্র দশ আসন পায়। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে।

৯. ১০৫ পৃষ্ঠার এ সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১৩টি অংশ, ২৩৪ টি বিধি এবং ৬টি তালিকা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়, এতে সমতার নীতি গৃহীত হয়, এতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তিত হয়, এ সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়, ভারত ও আয়ারল্যান্ডের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ ১৯৫৬ সালের সংবিধানে কয়েকটি রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতি[১০] গৃহীত হয়।

বিভিন্ন সরকারের উত্থান-পতন (১৯৫৬-১৯৫৭)

১৯৫৬ সালের ৯ই মার্চ শেরে বাংলা ফজলুল হক পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে খাদ্যের দাবীতে ভুখা মিছিলে গুলি চলে। ফলে ফজলুল হক ও আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা সংকটে পড়ে। ৩০ শে আগস্ট আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান হয়। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন সোহরাওয়ার্দী। ১৯৫৭ সালের ১০ই আক্টোবর সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ১৮ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন চুন্দ্রীগড়। মাত্র ৫৯ দিন পর চুন্দ্রীগড়ের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং ফিরোজখাননুন কে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।

সামরিক শাসন (১৯৫৮-১৯৬৯)

১৯৫৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর স্পীকার আব্দুল হাকিমের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর[১১] সাভাপতিত্বে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। দুই দলের বিবাদমান সদস্যগণ প্রথমে হাতাহাতি, ঘুষাঘুষি করেন, এর পর হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তা দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে। এ ঘটনার এক পর্যায়ে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী চেয়ারের আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হন। দুদিন পর হাসপাতালে শাহেদ আলীর মৃত্যু হয়। ১৯৫৮ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে এক কালিমা লিপ্ত অধ্যায় সৃষ্টি হয়। রাজনীতিকদের চরম দায়িত্ব- জ্ঞানহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন উশৃংখল আচরণ দেশকে সামরিক শাসনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। কেন্দ্র ও প্রদেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক এ

---

১০. রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতিগুলো কোন আদালতে কার্যকরী হতো না, তথাপি রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে এটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে কর্মে অনুপ্রণিত করত। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়নীতি এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

১১. **শাহেদ আলী** (১৮৯৯-১৯৫৮) রাজনীতিক ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার। ১৮৯৯ সালে চাঁদপুর জেলার মতলব থানার আশ্বিনপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে বি. এ (অনার্স), ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ এবং ১৯২৫ সালে বি. এল ডিগ্রি লাভ করে কুমিল্লা জেলাকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২৯ সালে শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে শাহেদ আলী দীর্ঘকাল কৃষক-প্রজা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কুমিল্লা জেলা শাখার সহসভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এ.কে ফজলুল হক কর্তৃক কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠিত হলে (১৯৫৩) তিনি তাতে যোগদান করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং ১৯৫৫ সালে পরিষদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে শাহেদ আলী কৃষক-শ্রমিক পার্টি ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগ দেন (১৯৫৮)। ১৯৫৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) দলীয় সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী কর্তৃক স্পিকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব পরিষদে গৃহীত হয়। ফলে ২৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতেই সরকারি দলের সদস্য এবং বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং অচিরেই তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ঘটনাচক্রে শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [মুয়াযযম হুসায়ন খান]

Dhaka University Institutional Repository

সংকটজনক পরিস্থিতির অজুহাতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে মার্শাল 'ল' জারি করেন। সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা ২৪শে আক্টোবর একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। উভয় প্রদেশ থেকে ৪ জন করে আটজন অরাজনৈতিক বেসামরিক ব্যক্তি এবং চারজন করে জেনারেল সমেত বার সদস্যের মন্ত্রিসভায় আয়ুব খানকে করা হয় প্রধানমন্ত্রী। অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার আগেই আয়ুব খান ইসকান্দার মীর্জার কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা দখল করেন। ২৮শে আক্টোবর তাঁর কাছ থেকে ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রথমে কোয়েটা পরে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হয় । ১৯৫৮ সালে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়। ১৯৫৯ সালের ২৭ শে অক্টোবর আয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ'[১২] প্রর্বতন করেন। ১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে[১৩] আয়ুব খান নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করে সামরিক খোলস ভেদ করেন।

১৯৬২ সালের সংবিধান প্রণয়ন ও প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ

১৯৬০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী আয়ুব খান ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি শাসনতন্ত্র সংস্থা গঠন করেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ছিলেন এ সংস্থার চেয়ারম্যান। সংবিধান সংস্থা এক প্রশ্নমালা রচনা করে। ১৯৬১ সালের ৬ই মে শাসনতন্ত্র সংস্থা প্রেসিডেন্টের কাছে এক বিবরণী পেশ করে। ১৯৬১ সালের ৩১শে অক্টোবর একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ আয়ুব খান দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির নতুন শাসনতন্ত্র[১৪] প্রবর্তন করেন । ২৮শে এপ্রিল ৮০ হাজার বিডি মেম্বারের ভোটে জাতিয় পরিষদ এবং ৬ই মে প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হয়। ৮ই জুন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং মার্শাল 'ল' অপসারিত হয় এবং আয়ুব খান নতুন করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।

সামরিক শাসক আয়ুববিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের ১৪ই জুলাই সকল রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। আয়ুব খানের সহযোগিতায় মুসলিম লীগের একাংশ নিয়ে কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করে আয়ুব খান তাতে যোগ দেন।

---

[১২]. মৌলিক গণতন্ত্র। ১৯৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রবর্তিত একটি স্বল্পকাল স্থায়ী স্থানীয় সরকার পদ্ধতি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯' জারি করেন। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ এ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতো এবং তারা একে জেনারেল আইয়ুব খান এবং তাঁর সহযোগী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার একটি সুনিপুণ কৌশল হিসেবেই গণ্য করতো।

[১৩]. উভয় প্রদেশের ইউনিয়ন কাউন্সিল, ইউনিয়ন কমিটি এবং টাউন কমিটি হতে নির্বাচিত আশি হাজার (৮০,০০০) মৌলিক গণতন্ত্রী ১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জাতির পক্ষে প্রেসিডেন্টের প্রতি আস্থা জ্ঞাপর করেন।

[১৪]. ১৯৬২ সালের সংবিধান ছিল একটি লিখিত দলীল, এ সংবিধানে কোন মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়নি, এটি ছিল সুপরিবর্তনীয়,বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকার কর হয়, কেন্দ্রে ও প্রদেশে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ এ সংবিধান ও বজায় ছিল। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে স্বাধীন করার ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী[১৫] সেপ্টেম্বর মাসে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ২৪ শে জুন প্রদত্ত নয় নেতার বিবৃতির প্রতি সমর্থন জানান। তাঁর নেতৃত্বে বিরোধিদলীয় নেতৃবৃন্দ এ সময় পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে ব্যাপক সফর করেন। ১৯৬২ সালের ৫ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী ও নূরুল আমীনের ঐক্যবদ্ধ বিরোধিদলীয় জোট ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এন, ডি, এফ গঠিত হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা ছিল প্রতিবাদমুখর। তারা হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে, বহুলোক এ আন্দোলনে হতাহত হয়।

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী আশি হাজার বিডি মেম্বারের ভোটে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, NDF, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দলের সম্বনয়ে 'কপ' গঠন করা হয়। জাতীয় ঐক্যের প্রতিক রূপে কায়েদে আযমের বোন ফাতেমা জিন্নাহকে আয়ুব খানের বিরোধীদলীয় প্রার্থী দাঁড় করানো হয়। বিডি মেম্বারদের সীমিত ভোটের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বিরোধী দলের জন্য অসাধ্য হলেও নিবার্চনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে বিরোধী দলের কর্মীগণ এক প্রবল গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

"১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাহোর দখল করে শালিমারবাগে বিজয়োৎসব করার ঘোষণা দেয়। বিরাট ট্যাংক বাহিনী এগিয়ে আসে। পথে কোন নদী নেই বলে স্থলপথে সহজেই এগিয়ে আসে। এতো বড় ট্যাংক বাহিনী মোকাবেলার জন্য জেনারেল টিক্কাখান অভিনব ব্যবস্থা গ্রহন করেন। ৫০ জন সেনিক কোমরে ডিনামাইট বেঁধে রাস্তার দু'পাশের জঙ্গলে থাকবে এবং ট্যাঙ্ক বাহিনী আসার সাথে তারা ট্যাংকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বে । এভাবে আত্মাহুতি দেয়ার জন্য তিনি উৎসাহ দেন। ভারতীয় ট্যাংক বাহিনী এ জাতীয় আক্রমণের কথা কল্পনাও করেনি। সম্মুখের দিকের ৫০টি ট্যাংক বিধস্ত হয়ে গেলে দ্রুত ধাবমান পেছনের ট্যাংকগুলো একটার ওপর একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ট্যাংকে অবস্থানরত ভারতীয় সেনিক বিরাট সংখ্যায় নিহত হয়। লাহোর বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।"[১৬]

---

১৫. **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী** (১৮৯২-১৯৬৩) বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৬) এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৬-৫৭)। তিনি ১৮৯২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এসসি (সম্মান) ও বি. সি. এল ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে লন্ডনের গ্রেইজ ইন থেকে ব্যারিস্টার-এট-ল সম্পন্ন করেন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরেই তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯২১ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনোত্তর ফজলুল হক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শ্রম ও বাণিজ্যমন্ত্রী, ১৯৪৩-১৯৪৫ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী, ১৯৪৬-৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, পাকিস্তান আমলে ১৯৫৪-৫৫ সালে মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী এবং ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে ১৩ মাস পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

১৬. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, কামিয়াব প্রকাশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে ৬ দফা কর্মসূচি[১৭] ঘোষণা করেন। ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে এক সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এ সম্মেলনেই পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবী উপস্থাপন করেন। ছয় দফার প্রশ্নে শুধু সরকারী মহলের নয়, বিরোধী দলগুলোর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে সংগ্রামরত বিভিন্ন দল ছয় দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্দেশ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মাওলানা ভাসানী ছয় দফার বিরোধিতা করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ১৫ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পাল্টা আন্দোলনের ডাক দেন। বামপন্থী নেতা আব্দুল হক মোহাম্মদ তোয়হা , অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন আহমদ এবং মোজাফফর আহমদও ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ছয় দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দুভাগ হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালের ৩০শে এপ্রিল আতাউর রহমান খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় কয়েকটি দলের[১৮] সমন্বয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট জোট গঠিত হয়।

---

১৭. ১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সংসদ ও রাজ্যপরিষদসমূহ সার্বভৌম হবে;

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক;

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। মুদ্রাব্যবস্থা আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা স্টেট ব্যাঙ্ক থাকবে;

অথবা

সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে;

৪. সব ধরনের কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ অর্থেই ফেডারেল সরকার চলবে;

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোন হারে আদায় করা হবে;

৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

১৮. পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)এর সমন্বয়ে'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (PDM) নামে রাজনৈতিক জোট কায়েম হয় এবং প্রত্যেক দল থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়।
১. এনডিএফ থেকে সর্বজনাব নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আতাউর রাহমান খান। ২. মুসলিম লীগ থেকে মিয়া মমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা, জনাব তোফাজ্জল আলী ও খাজা খায়রুদ্দীন। ৩. জামায়াতে ইসলামী থেকে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালের শেষের দিকে আয়ুব খান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের কয়েক জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। এ মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত হয়। প্রথমে লেঃ কর্নেল মোয়াজ্জম হোসেনকে এ মামলার প্রধান আসামী করা হয়। কয়েক দিন পর শেখ মুজিবকে এ মামলায় জড়িয়ে তাকেই এক নম্বর আসামী করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন কর্মিটোলা সেনানিবাসে এ মামলার বিচার কার্য শুরু হয় এবং মামলার পূর্ণ বিবরণ প্রতিদিন সংবাদপত্রে পকাশিত হতে থাকে। মামলার ধারা বিবরণী অনুসারে মামলাটি যে সুপরিকল্পিত সাজানো ছিল এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

ফলে সাজানো মামলার প্রহসন থেকে শেখ মুজিব এবং তার সহকমীদের মুক্তি, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও গণবিরোধী স্বৈরাচারী সরকারের মূলৎপাটনের নিমিত্তে বাঙালী সমাজ এক প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে।

১৯৬৯ সালের ৭ই জানুয়ারী পি, ডি, এম এর সাথে ছয়দফা পন্থী আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ এবং পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর সমন্বয়ে ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি বা ডাক (DAC)[১৯] গঠিত হয়। ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের রক্তক্ষয়ী ব্যাপক আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের মুখে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পদত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলোপ ও গভর্নর ও মন্ত্রীদের অপসারিত করেন। ২৬শে মার্চ জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ওয়াদা করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম। ৪. আওয়ামী লীগ থেকে নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান, এডভোকেট আবদুস সালাম খান ও গোলাম মুহাম্মদ খান লুন্দখোর। ৫. নেযামে ইসলাম পার্টি থেকে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, জনাব ফরীদ আহমদ ও এমআর খান।

[১৯]. **DAC এর দফা :** আট দলীয় জোট গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্যে ঐ বৈঠকেই নিম্নরূপ ৮ দফা দাবিতে সবাই ঐকম্য পোষণ করেন : ১. কেন্দ্রে ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। ৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।
৪. নাগরিক অধিকার পুনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল। বিশেষত বিনাবিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল। ৫. শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং কোর্ট ও ট্রাইব্যুনাল সমীপে দায়েরকৃত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার। ৬. ১৪৪ ধারার আওতায় দেওয়া সর্বপ্রকার আদেশ প্রত্যাহার। ৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল। ৮. সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত যাবতীয় বিধি-নিষেধাজ্ঞ প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রেস ও পত্রিকা পুনর্বহাল। এভাবে পিডিএমভুক্ত ৫ দল ও এর বাইরের ৩ দল মিলে DAC নামে ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠলো। অতঃপর এ নামেই আন্দোলন পরিচালনা করা হলো। DAC-এর কেন্দ্রীয় আহবায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানকেই করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশ[২০] পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমালোচিত হলেও শেষ পর্যন্ত তার আইনগত কাঠামো আদেশের ভিত্তিতেই ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে স্মরণকালের বৃহত্তম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পূর্ব ঘোষিত ১৯৭০ সালের ৫ই আক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে পুনঃনির্ধারিত ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকার কয়েকটি এলাকাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী। পাকিস্তানের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল

আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সর্বমোট ৩১০টি আসনের পূর্ব বাংলায় ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অবশিষ্ট ২টি আসনের মধ্যে ১টি পায় পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, অপরটি পায় নির্দলীয়। অপর পক্ষে পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৪৪ টি আসনের মধ্যে মোট ৮৮ আসন দখল করে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশিষ্ট ৫৬টি আসনের মধ্যে ৭টি রাজনৈতিক দল পায় ৪৩টি আসন আর নির্দলীয় প্রার্থীরা পায় ১৩টি আসন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনে জয়যুক্ত হয়। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ আসনে ভুট্টোর পিপলস পার্টি জয়ী হয়।

নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি

নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজর্ন করে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ৬ দফা ভিত্তিক সংবিধান রচনার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেন এবং ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান তখন ৬ দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবকে কিছুটা নমনীয় করার আশায় জুলফিকার আলী ভুট্টোকে নিয়ে ঢাকায় আসেন। আলোচনার ক্ষেত্রে শেখ মুজিব ৬ দফার প্রশ্নে অটল থাকলে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান আলোচনা চালিয়ে যান এবং ১৩ই ফেব্রয়ারী ঘোষণা দেন ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনার শেষে বিদায়লংগ্নে তিনি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন।

---

২০. আইনগত কাঠামো আদেশ । এ আদেশে জাতীয় পরিষদের আসন ৩১৩ নির্ধারন করা হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে ১৬৯টি আসন এবং বাকি ১৪৪টি আসন পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয়। প্রাদেশিক পরিষদের আসন ৩০০তে নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় পরিষদকে অধিবেশন বসার দিন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে, নতুবা পষিদ ভেঙ্গে যাবে এবং আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অধিকন্তু, জাতীয় পরিষদের প্রণীত সংবিধান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে। প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না করলেও জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে যাবে। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হবে। ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগ আন্দোলন

বৈধভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ দলের হাতে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করার দূরভিসন্ধিমূলক পায়তারা ইয়াহিয়া খানের ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে বেরিয়ে আসে লক্ষ লক্ষ জনতার হাজার মিছিল । ২ ও ৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। এ দিনগুলোতে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ বাধে । এ কারণে সান্ধ্য আইন জারি করা হয় । কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা সান্ধ্য আইন লঙ্ঘন করে। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় শেখ মজিবুর রহমান ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন[২১]। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, কলকারখানা সবকিছুর চাকাই বন্ধ হয়ে যায়। গোটা বেসামরিক প্রশাসন শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। এ দিকে ইয়াহিয়া খান তদানীন্তন গভর্নর জনাব আহসানের পরিবর্তে টিক্কা খানকে পূব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠান । কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন এত বেশি সুসংহত ছিল যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিক্কা খানকে শপথ বাক্য পাঠ করতে অস্বীকার করেন। অবস্থা দৃষ্টে সচতুর ইয়াহিয়া খান ১০ মার্চ শেখ মুজিবকে রাওয়াল পিন্ডিতে র্সবদলীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেন । এরপর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সাথে কয়েক দিন ধরে আলোচনায় মিলিত হন। ভুট্টো ও ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন । ৬ই মার্চ ইয়াহিয়া খান উপায়ন্তর না দেখে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন ধার্য করেন।

৭ মার্চ রেসকোর্সে শেখ মুজিব

"পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক মহাসমাবেশে হয়। মঞ্চে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশে উক্ত সমাবেশে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ সকল মহলের লোকই বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়। শেখ সাহেব সেই জনসমুদ্রে ২৫ মার্চ আহূত গণপরিষদে অধিবেশনে যোগদান প্রসঙ্গে এমন চারটি শর্ত[২২] আরোপ করেন, যা পূরণ না হবারই কথা। অর্থাৎ শেখ মুজিব এ বৈঠকে যোগদান না করার পরোক্ষ ঘোষণা দিলেন। এ সমাবেশেই শেখ মুজিবের প্রখ্যাত ভাষণের শেষ উচ্চারণ ছিলো, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান।' সমাবেশে

---

[২১] ৩ মার্চ বিকেলে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিব অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত কর ও খাজনাদান বন্ধ ঘোষণা করেন। তিনি সেখানে তিনটি দাবি উত্থাপন করেন ১. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ২. সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। ৩. জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। (অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড , কামিয়াব প্রকাশন-২০০২-২০০৪, পৃষ্ঠা-১২১।

২২. ৪টি শর্ত নিম্নরূপ :

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।
৩. এ পর্যন্তকার হত্যার তদন্ত করতে হবে।
৪. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেননি। তবে ঐ দিনই এক বিবৃতিতে পরবর্তী এক সপ্তাহের এক দীর্ঘ কর্মসূচি নির্দেশ করেন, যার কয়েকটি নিম্নরূপ-

১. খাজনা ও কর দেওয়া বন্ধ থাকবে।
২. সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও সকল আদালত হরতাল পালন করবে।
৩. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৪. স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন উপায়ে পাকিস্তানে টাকা পাঠানো বন্ধ থাকবে।
৫. প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।

বলাবাহুল্য, পূর্ব-পাকিস্তানে ইয়াহইয়া খানের শাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। বেসরকারিভাবে শেখ মুজিবের শাসনই চলতে থাকে।"[২৩]

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ

বাঙালী জাতির স্বাধীনতার সূর্যকে চিরতরে স্তব্দ করে দেয়ার মানসে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কে নিরীহ ঘুমন্ত বাঙালী জাতির ওপর লেলিয়ে দেয়া হয়। দুধর্ষ সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাতের আধাঁরে বাঙালী নিধনযজ্ঞে। পঁচিশে মার্চের সামরিক আইনের পর এদেশের বিদ্রোহী বাঙালী সৈনিক, ই. পি. আর, পুলিশ, আনসার বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাক বাহিনীর আকস্মিক হামলা, নির্বিচারে হত্যা ও বর্বরতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাধীনতার দাবী রাতারাতি সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ সন্ধ্যাবেলা কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমান ইংরেজীতে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন[২৪]। শুরু হয় প্রতিরোধ আর মুক্তির সংগ্রাম এ সম্পর্কে মাঈদুল হাসান লিখেছেন ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং মাত্র ৯ মাসের ব্যবধানে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরে গণপরিষদ গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জারি করে। এ ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়।

অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার গঠন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল এ সরকর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর

---

২৩. অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১২২।

২৪. Major zia on behalf of our Great Leader the supreme commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman we hereby proclaim Independence of Bangladesh, And that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formet. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of seventy five million people of Bangladesh, and that Government of the people headed by him is the only lesitimate Government of the people of the Independent sovereign state of Bangladesh which legally and constitutionally formed and is worthy of being recognised by all the Government of the world.

I therefore appeal on behalf of our Great Leader Sheikh Mujibur Rahman to the Governments of all the Democratic countries of the world ..... May Allah help us, joy Bangla.(মেজরঅব. এম. এ. ভূঞা- 'মুক্তি যুদ্ধে নয়মাস' এবং মেজর অব. রফিকুল ইসলাম-A Tale of Millions.)

Dhaka University Institutional Repository

রহমানের অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজলরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করে তার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রী, এবং এ. এইচ. এম কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। মুক্তিবাহিনীকে সামরিক নেতৃত্ব দিতে কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীকে ঐবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতি ও চূড়ান্ত বিজয়

বাংলাদেশের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দান করে। অবশ্য এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ ব্যক্তি ও দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে দেশের সর্বত্র পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সাবেক ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ ও বিভিন্ন দলের কর্মীরা পাক-বাহিনীর অগ্রগতিরোধে সচেষ্ট হয়।

মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী[২৫] গেরিলা রণকৌশল অবলম্বন করে। মুক্তিবাহিনী চোরাগোপ্তা হামলার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গতিরোধের চেষ্টা করে। গেরিলা বাহিনীর হামলায় পাক-সৈন্যদের মনোবলও অনেকাংশে বিনষ্ট হয়।

---

[২৫]. মুক্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সংগঠিত সশস্ত্রবাহিনী। শুরুতে এর নাম ছিল মুক্তিফৌজ। ১৯৭১-এর মার্চের শুরু থেকে সারা দেশের শহর ও গ্রাম এলাকায় ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরাই পরবর্তীতে সংগঠিত হয়ে মুক্তিফৌজ ও মুক্তিবাহিনী গঠন করে। তবে কখন কিভাবে এর সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠে এবং কিভাবে এর নাম মুক্তিবাহিনী হয়, সেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট দালিলিক তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মূলত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : প্রথম শ্রেণীর সদস্যরা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, অন্যভাগ আসে ইতিপূর্বে শহর ও গ্রামে সংগঠিত সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন শাখার সদস্য ও তাদের অনুসারী বেসামরিক জনগণ থেকে। মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বড় ঘটনা ছিল ১৯৭১-এর ২৭ মার্চ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণা। এই ঘোষণায় মেজর জিয়া নিজেকে 'বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মির কমান্ডার-ইন-চীফ' হিসেবে উপস্থাপন করেন, যদিও তাঁর প্রতিরোধ কার্যক্রম চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এলাকার মধ্যেই সীমিত ছিল। জিয়াউর রহমানের ঘোষণা পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী সৈন্যদের আলাদা হয়ে যাওয়ার সূত্রপাত ঘটায় ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল কর্নেল (পরবর্তীকালে জেনারেল) এম. এ. জি ওসমানী তেলিয়াপাড়ায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল তারিখে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে সংগঠিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল জুলাই মাসের ১১ থেকে ১৭ তারিখের মধ্যে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের এক সভায় যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিদ্যমান সমস্যাবলী এবং ভবিষ্যৎ কৌশল বিবেচনায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তসমূহ ছিল-

যোদ্ধাদের ও দল গঠন এবং যুদ্ধের কৌশল হবে নিম্নরূপ : (ক) ৫ থেকে ১০ জন প্রশিক্ষিত সদস্যকে নিয়ে গঠিত গেরিলা দল তাদের উপর অর্পিত সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্ধারিত এলাকায় প্রেরণ করা হবে; (খ) যোদ্ধারা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ আক্রমণ পরিচালনা করবে এবং তাদের শতকরা ৫০ ভাগ ও তদূর্ধ্ব অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে। শত্রুবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী গোয়েন্দা নিয়োগ করা হবে এবং তাদের ৩০ শতাংশকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হবে।

নিয়মিত সৈন্যদের বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন ও সেক্টরে সংঘবদ্ধ করা হবে।

শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার সময় নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করা হবে : (ক) ঝটিকা বা অতর্কিত আক্রমণ এবং লুকিয়ে থেকে শত্রুর ওপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য বিপুলসংখ্যক গেরিলা যোদ্ধা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হবে; (খ) শিল্প-কারখানা অচল করে দেওয়া হবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হবে; (গ) তৈরি পণ্য অথবা কাঁচামাল রপ্তানিতে পাকিস্তানীদের বাধা দেওয়া হবে; (ঘ) শত্রুর চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হবে; (ঙ) কৌশলগত সুবিধা লাভের লক্ষ্যে শত্রুবাহিনীকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং (চ) বিচ্ছিন্ন শত্রু সেনাদের নির্মূল করার লক্ষ্যে তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা হবে।

বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী গেরিলা তৎপরতা জোরদার করার পাশাপাশি কোন কোন এলাকায় পাক-সৈন্যদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পাক-সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর হামলায় নাস্তানাবুদ হয়ে সীমান্ত এলাকা, গ্রামাঞ্চল ও ছোট ছোট শহর ছেড়ে দিয়ে ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে জড়ো হয়। এভাবে মুক্তিবাহিনী দেশের বেশির ভাগ এলাকার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রন কয়েম করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীর অধীন প্রায় এক লাখ সৈন্য ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এভাবে কয়েক মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনীসমূহ প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়মিত সদস্যদের নিয়ে তিনটি বাহিনী গঠন করা হয় : মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে জেড ফোর্স, খালেদ মোশারফের অধীনে কে ফোর্স এবং কে. এম শফিউল্লাহর নেতৃত্বে এস ফোর্স। সৈনিকদের অধিকাংশই এসেছিল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্স, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর যেসব সদস্যকে এই বাহিনী গুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি, তাদেরকে বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য কয়েকটি ইউনিট এবং সাব-ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছিল। যাদেরকে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল, তারা ছিল অধিকাংশই অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য। এছাড়া, কতিপয় স্বতন্ত্র বাহিনীও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং অনেক এলাকা মুক্ত করে। এগুলির মধ্যে ছিল মুজিব বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন এবং হেমায়েত বাহিনী। বাম ধারার রাজনৈতিক দলসমূহের কয়েকটি বাহিনীও যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠন করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই বাহিনীর ছিল দুটি জাহাজ এবং ৪৫ জন নৌ সদস্য। জাহাজ দুটি পাকিস্তানী নৌ বহরের ওপর বেশ কয়েকটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু দুটি জাহাজই ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর ভুলবশত ভারতীয় জঙ্গী বিমান দ্বারা আক্রান্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সময় জাহাজ দুটি মংলা সমুদ্র বন্দরে একটি বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছিল।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিমাপুরে ২৮ সেপ্টেম্বর এয়ার কমোডর এ. কে খোন্দকারের অধিনায়কত্বে এর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। প্রারম্ভিক অবস্থায় এটি ১৭ জন কর্মকর্তা, ৫০ জন কলাকুশলী এবং ২টি উড়োজাহাজ ও ১টি হেলিকপ্টারের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। বিমানবাহিনী পাকিস্তানী লক্ষ্যবস্তুসমূহের ওপর বারোটির অধিক ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছিল এবং ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ভারতীয় আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট সফলকাম হয়েছিল।

চূড়ান্ত পর্যায় ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকে মুক্তিবাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ঝটিকা আক্রমণ শুরু করে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারত অধিকতর আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। অবশেষে, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বস্তুত, নভেম্বর মাস থেকেই ভারতীয় সৈন্যরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়ে আসছিল। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা বেলুনিয়া অভিযান পরিচালনা করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে খুব দ্রুত যুদ্ধ জয় সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও মাত্র দুই সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ঢাকাকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। পূর্ববর্তী কয়েক মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য ছিল এর অন্যতম সাহায্যকারী কারণ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চতুর্দশ ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল জমশেদ মিরপুর ব্রিজের নিকট ভারতীয় জেনারেল নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঐ দিন সকাল ১০.৪০ মিনিটে ভারতীয় মিত্রবাহিনী এবং কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি সেনাদল ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করে। এটি ছিল নয় মাস দীর্ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সংকেত। দেশের বিভিন্ন স্থানে তখনও বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চলছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড-এর অধিনায়ক লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর অধিনায়ক এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড-এর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খোন্দকার। [হেলাল উদ্দিন আহমেদ]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। দেশের সাংবিধানিক পরিচিতি হয় গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করা হয় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরেপেক্ষ মতবাদ। ইসলামী জাতীয় চেতনার আলোকে মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান কে ভেঙ্গে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি গত ঐক্য কে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সশস্ত্র সহযোগিতা, সর্মথন ও সংরক্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে দেশের ধর্ম ও অখণ্ড পাকিস্তান প্রয়াসী এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়।

শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর লক্ষ প্রাণের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ২২শে ডিসেম্বর মুজিব নগরস্থ 'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার' ঢাকায় এসে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলের 'স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র' আনুযায়ী দেশ শাসিত হতে থাকে। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে শেখ মুজিবর রহমান[২৬] দেশের মাটিতে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ দ্বারা রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী থেকে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী সংবিধান আদেশ কার্যকরী ছিল।

গণপরিষদের অধিবেশন

১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে গণপরিষদের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। এ অধিবেশনে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়।

---

[২৬]. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** (১৯২০-১৯৭৫) সম্মোহনী নেতা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৪৮), পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক (১৯৪৯), আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৩-১৯৬৬), সভাপতি (১৯৬৬-১৯৭৪), বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (তাঁর অনুপস্থিতিতেই ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২), বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী (১৯৭২ থেকে ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৫), এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫)।

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) টুঙ্গীপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের একজন সেরেস্তাদার। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে শেখ মুজিবুর রহমান মেট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই. এ এবং ১৯৪৭ সালে একই কলেজ থেকে বি. এ পাস করেন। মুজিব ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি প্রাদেশিক বেঙ্গল মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৪৩ সাল থেকে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ তাঁকে ফরিদপুর জেলায় নির্বাচনী প্রচারণায় নিযুক্ত করেন।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর তিনি আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফলে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়ে ওঠেনি।

Dhaka University Institutional Repository

গণপরিষদের অধিবেশনে সংবিধান উপস্থাপন

১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন উক্ত দিবসে গণপরিষদের অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিলের আকারে উপস্থাপন করেন। ১৩ই অক্টোবর গণপরিষদ কিছু সংশোধনীসহ ঐ খসড়া সংবিধানের কার্যপ্রণালীর বিধিমালা গ্রহণ করে।

চূড়ান্ত সংবিধান অনুমোদন

১৯৭২ সালের ১৮ই অক্টোবর গণপরিষদে সংবিধান বিলের ওপর সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। এ আলোচনা শেষ হয় ৩০শে অক্টোবর। অতঃপর ৩১শে অক্টোবর খসড়া সংবিধানের ধারাওয়ারী আলোচনা শুরু হয় ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত চলে। ৪ঠা নভেম্বর সংবিধানের ৩য় ও সর্বশেষ পাঠ শুরু হয়। মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে এ কাজ শেষ হয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে বাংলাদেশ সংবিধান গণপরিষদ কতৃক গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ১৫ই জুলাই মাত্র সাত মাসের মধ্যে সংবিধানের প্রধম সংশোধনী[২৭] আনা হয়। এ সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার। এ সংশোধনীর মাধ্যমে দালাল আইন ট্রাইব্যুনাল (বিশেষ) আদেশ ১৯৭২ প্রবর্তন হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩

দ্বিতীয় সংশোধনী[২৮] আইনটি প্রণীত হয় ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর। এটি ছিল ১৯৭৩ সালের ২৪ নম্বর আইন। সংশোধনী আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'জুরুরী বিধান' সম্বলিত নতুন ভাগের সংযোজন।

বাংলাদেশ সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ২৮শে নভেম্বর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী[২৯] গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ চুক্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এ সংশোধনী আইনটি গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৪

১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনী[৩০] জতীয় সংসদ কর্তক গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতি এ সংশোধনী আইনকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন। চর্তুথ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রবর্তন ও একদলীয় সরকারের প্রচলন করা হয়।

---

[২৭]. *প্রথম সংশোধনী আইন* ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই 'সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩' গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে একটি অতিরিক্ত দফা সংযুক্ত করা হয়, যা 'গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে অন্যান্য অপরাধ'-এর দায়ে যে কোনো ব্যক্তির বিচার ও শাস্তি অনুমোদন করে। ৪৭ অনুচ্ছেদের পরে একটি নতুন অনুচ্ছেদ ৪৭ক সংযুক্ত করা হয়, যাতে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় যে, উপরে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রযোজ্য হবে না।

[২৮] *দ্বিতীয় সংশোধনী আইন* সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩ গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। এই আইনের ফলে (১) সংবিধানের ২৬, ৬৩, ৭২ ও ১৪২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয়; (২) ৩৩ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়, এবং (৩) সংবিধানে একটি নতুন ভাগ, যথা ভাগ ৯ক সংযুক্ত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।

[২৯] *তৃতীয় সংশোধনী আইন* সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৭৪ বলবৎ হয় ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর। এর দ্বারা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কতিপয় ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত রেখা নির্ধারণের ব্যাপারে একটি চুক্তি কার্যকর করার লক্ষ্যে সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা হয়।

[৩০]. *চতুর্থ সংশোধনী আইন* সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫ গৃহীত হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। এই সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানে কতিপয় বড় পরিবর্তন আনা হয়। সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়; বহুদলীয়

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হলে এই সংবিধানের আলোকে সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মাধ্যমে ১১টি আসনে আওয়ামী দলীয় প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

কার্যত ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসন লাভ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ৫টি আসনে, জাতীয় লীগ ১টি আসনে এবং জাসদ ১টি আসনে জয় লাভ করে।

বাকশাল গঠন

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে একটি মাত্র 'জাতীয় দল' গঠন করতে পারবেন। এর ফলে কার্যত রাষ্ট্রপতি এক দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সাংবিধানিক অধিকার লাভ করে। এ সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি এক আদেশ বলে 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল নামে একটি জাতীয় দল গঠন করে। বাকশাল[৩১] গঠনের ফলে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। এর ফলে জনগণের মনে সন্দেহ- সংশয় সৃষ্টি হয়।

মুজিব সরকারের সাফল্য

প্রথমত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে ১৯৭২ সালের ১২ই মার্চ ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ সরকার দশ মাসের মধ্যে দেশের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল।

তৃতীয়ত, মুজিব সরকার মাত্র দেড় বছরের মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

চতুর্থত, মুজিব সরকার যুদ্ধকালে বিধস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে।

পঞ্চমত, মুজিব সরকারের একটি বড় সাফল্য ছিল ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন অনষ্ঠান।

ষষ্ঠত, মুজিব সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য জোটনিরপেক্ষ নীতি।

সপ্তমত, মুজিব সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য আইনশংখলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থলে আনা হয় একদলীয় ব্যবস্থা; জাতীয় সংসদের বিভিন্ন ক্ষমতা খর্ব করা হয়; বিচার বিভাগ তার স্বাধীনতার অনেকখানি হারিয়ে ফেলে; সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা ও প্রয়োগের এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত হয়। এই আইন দ্বারা (১) সংবিধানের ১১, ৬৬, ৬৭, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৮০, ৮৮, ৯৫, ৯৮, ১০৯, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১৪১ক এবং ১৪৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়; (২) ৪৪, ৭০, ১০২, ১১৫ ও ১২৪ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করা হয়; (৩) সংবিধানের তৃতীয় ভাগ সংশোধন করা হয়; (৪) তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিল পরিবর্তন করা হয়; (৫) প্রথম জাতীয় সংসদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়; (৬) রাষ্ট্রপতির পদ ও এই পদের প্রার্থী সম্পর্কে বিশেষ বিধান করা হয়; (৭) সংবিধানে একটি নতুন (একাদশ) ভাগ সংযুক্ত করা হয়; এবং (৮) সংবিধানে ৭৩ক ও ১১৬ক অনুচ্ছেদ দুটি সংযুক্ত করা হয়

[৩১]. **বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ** (বাকশাল) বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ভিত্তিতে ১৯৭৫ সালের ৭ জুন আইনত বৈধ একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ১১৭-ক অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি নতুন 'জাতীয় দল' গঠন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যা একদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সংঘটিত নানাবিধ অনাচার প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নেবে, অন্যদিকে যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর জাতি পুনর্গঠনের কাজ শুরু করবে। এরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একটি জাতীয় দল গঠন করে এর নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (সংক্ষেপে বাকশাল)। বাকশালের বিধিবিধানে বিভিন্ন সরকারি চাকুরে ও সেনাবাহিনীর সদস্যসহ অপরাপর সব দল ও সংগঠনকে জাতীয় দলে যোগ দিয়ে অপশক্তির মোকাবেলা করা এবং দেশ পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার কথা বলা হয়। বাকশালের বিভিন্ন দিক, কার্যক্ষেত্র এবং সম্ভাবনা সবিস্তারে বর্ণনা করে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এই দুঃসাহসিক উদ্যোগকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুজিব সরকারের ব্যর্থতা

প্রথমত, ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মুজিব সরকারের শাসন ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রথম দিকে অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিল না হলেও ১৯৭৪ সালে এটা জটিল আকার ধারণ করে।

দ্বিতীয়ত, শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার সেনাবাহিনীর প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে। পাস্তিান আমলে যেখানে প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্ধ ছিল ৭৮ শতাংশ সেখানে মুজিব আমলে ১৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। ফলে ক্ষুব্ধ সেনাবাহিনী সরকারের পতনকে তরান্বিত করে।

তৃতীয়ত, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে চোরাচালান, সীমান্ত পাচার বৃদ্ধি পায়। পাট, কৃষিপণ্য, খাদ্যশস্য, বিদেশী বস্ত্র, বিলাসসামগ্রী প্রভৃতি বিদেশে পাচার হয়ে যায়। চোরা চালান রোধ করতে না পারা এটা এ সরকারের বড় ধরনের ব্যর্থতা।

চতুর্থত, জাতীয়করণকৃত শিল্প কল-কারখানায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং অযোগ্য ও অদক্ষ লোকদেরকে নিয়োগ করায় উৎপাদন হ্রাস পায় এবং দুর্নীতি বৃদ্বি পায়। এর ফলে সাধারণ মানুষ মুজিব শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

পঞ্চমত, রক্ষী বাহিনীর[৩২] উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ফলে সেনাবাহিনীর সদস্যগ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এটা এ সরকারের বড় ধরনের ব্যর্থতা।

ষষ্ঠত, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৪ সালে প্রথম দিকে অনাবৃষ্টি এবং পরে অতি বৃষ্টির ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। যথাসময়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তন ও সিপাহী জনতার বিপ্লব

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হন। ফলে আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের ধর্মনিরেপেক্ষ রাজনীতির অবসান ঘটে। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত একটি প্রতি বিপ্লবের চেষ্টা চলে। কিন্তু সিপাহী জনতার নযীরবিহীন ঐক্যবদ্ধ শক্তি সাতই নভেম্বর প্রত্যুষে নস্যাত করে দেয়। ৭ ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সন্নিবেশ করেন। সমাজতন্ত্র সংবিধানে নতুনভাবে ব্যাখ্যায়িত হয়। সমাজতন্ত্র এর স্থলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিস্থাপন করা হয়। শাসনতন্ত্র শুরু করা হয় আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম দিয়ে। এ ছাড়া শাসনতন্ত্রে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার যে বিধান ছিল তার উচ্ছেদ হয়। বিলোপ ঘোষিত সংবাদ পত্রগুলো আত্মপ্রকাশ করে।

---

৩২. রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গঠিত একটি আধাসামরিক বাহিনী। দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ জারি করা হয়। স্বাধীনতার পরপরই দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় সরকার সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে রক্ষীবাহিনী নামে একটি আধা সামরিক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ-১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ) জারি করা হয় এবং ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই আদেশ কার্যকর করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশটিতে আইনের অসম্পূর্ণতা থাকায় বাহিনীটি একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারেনি। আইনে বলা হয়, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে এ বাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে এবং সরকারের নির্দেশক্রমে সামরিক বাহিনীকেও সাহায্য করবে। এর তত্ত্বাবধান কর্তৃত্ব থাকবে সরকারের হাতে এবং এর পরিচালনা ও নির্দেশনায় থাকবেন একজন পরিচালক (পরে মহাপরিচালক)। আদেশের ১৭ অনুচ্ছেদে এর জন্য বিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়। রক্ষীবাহিনীর যে কোন অফিসার কোন পরোয়ানা ছাড়াই অপরাধী সন্দেহে যে কোন লোককে গ্রেপ্তার করতে পারবে এবং যে কোন ব্যক্তিকে এবং যে কোন স্থান, মোটরযান অথবা নৌযান তল্লাসী করতে পারবে এবং প্রয়োজনে সন্দেহযুক্ত মালামাল জব্দ করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনকাল

প্রেসিডেন্ট জিয়ার রেফারেন্ডাম

১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান[৩৩] রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনগণের আস্থা যাচাই করেন। সকল সামরিক প্রশাসকই এভাবে গণরায় নেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। এটা কোন নির্বাচন নয়। এতে জনগকে

---

৩৩. জিয়াউর রহমান (শহীদ) (১৯৩৬-১৯৮১) রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী প্রধান, স্বাধীনতার ঘোষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়ার বাগবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মনসুর রহমান কলকাতায় এক সরকারি দপ্তরে রসায়নবিদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জিয়াউর রহমান শৈশবে কিছুকাল বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে ও কলকাতায় অতিবাহিত করেন। ভারত বিভাগের অব্যবহিত (১৯৪৭) পর তাঁর পিতা করাচিতে বদলি হলে জিয়াউর রহমান কলকাতার হেয়ার স্কুল ছেড়ে করাচির একাডেমী স্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুল থেকেই তিনি ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি করাচির ডি. জে কলেজে ভর্তি হন। একই বছর তিনি কাকুল মিলিটারি একাডেমীতে অফিসার-ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন।
জিয়াউর রহমান ১৯৫৫ সালে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশন লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে তাঁকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলি করা হয়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীতে কর্মরত থাকেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে (১৯৬৫) একটি কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে খেমকারান সেক্টরে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। যুদ্ধে দুর্ধর্ষ সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য যেসব কোম্পানি সর্বাধিক বীরত্বসূচক পুরস্কার লাভ করে, জিয়াউর রহমানের কোম্পানি ছিল এদের অন্যতম। ১৯৬৬ সালে তিনি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমীতে পেশাদার ইনস্ট্রাক্টর পদে নিয়োগ লাভ করেন। ঐ বছরই একটি কম্যান্ড কোর্সে যোগদানের জন্য তাঁকে কোয়েটার স্টাফ কলেজে পাঠানো হয়। ১৯৬৯ সালে তিনি মেজর পদে উন্নীত হয়ে জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে দ্বিতীয় অধিনায়ক পদের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭০ সালে মেজর জিয়াউর রহমানকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনারা বাঙালি হত্যার অভিযানে লিপ্ত হবার পর তাদের হাতে বন্দী হন শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চলে যান আত্মগোপনে। জনগণ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ১৯৭১-এর ২৬ ও ২৭ মার্চের মধ্যবর্তী সময়ে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাংলাদেশের পূর্ব বিঘোষিত পতাকা সমুন্নত রাখে। মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

মেজর জিয়া এবং তাঁর বাহিনী সামনের সারিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁরা বেশ কয়েকদিন চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অভিযানের মুখে কৌশলগতভাবে তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় জিয়াউর রহমান বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১ নং রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে এবং পরে 'জেড' ফোর্সের প্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমান একজন অসম সাহসী যোদ্ধা হিসেবে প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমান অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতার পর তাঁকে 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

স্বাধীনতার পর জিয়াউর রহমানকে কুমিল্লায় সেনাবাহিনীর বিগ্রেড কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। ১৯৭২ সালের জুন মাসে তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ পদে উন্নীত হন। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে এবং বছরের শেষ নাগাদ মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর ২৫ আগস্ট জিয়াউর রহমান চীফ অব আর্মি স্টাফ নিযুক্ত হন। ঐ বছরের ৩ নভেম্বর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বাধীন ঢাকা ব্রিগেডের সহায়তায় মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। জিয়াউর রহমানকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় এবং গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এর তিন দিন পর (৭ নভেম্বর) ঘটে সিপাহী-জনতার বিপ্লব। এই ঘটনা জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করা হয়। অধিকন্তু ঐ দিন সেনা সদরে এক বৈঠকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা হয়। রাষ্ট্রপতি জাস্টিস সায়েম-কে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং তিন বাহিনীর প্রধান, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, এয়ার ভাইস মার্শাল এম. জি তাওয়াব ও রিয়ার অ্যাডমিরাল এম. এইচ খানকে উপ-প্রধান করে সামরিক আইন প্রশাসক করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৯ নভেম্বর জাস্টিস সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালে জিয়াউর রহমান এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অবশেষে, ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সায়েম পদত্যাগ করলে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

হ্যাঁ বা না ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় মাত্র। এ জাতীয় রেফারেন্ডামের আইনগত ভিত্তি রয়েছে। ৩০শে মে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসাবে জেনারেল জিয়াউর রহমান হ্যাঁ ভোট হাসিল করেন।

বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু

১৯৭৬ সালের ২৮শে জুলাই সামরিক ফরমান বলে PPR[৩৪] নামে একটি বিধি জারী করা হয়। এ বিধিতে বলা হয় যারা কোন রাজনৈতিক দল গঠন করতে আগ্রহীদের এ বিধি অনুযায়ী সরকারের কাছে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল কায়েম করেন এর নাম ছিল বাকশাল। ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়া PPR এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দেন। যাতে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রথা চালু হয়। দেশের মোট ৫৩টি রাজনৈতিক দল অনুমোদেনের জন্য আবেদন করে এবং ২১টি দল অনুমোদন লাভ করে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (১৯৭৭)

১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৩৫২টি ইউনিয়নের জনগণ এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এ নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকার এবং সরকারের উন্নয়ন কৌশলের প্রতি পল্লীর প্রভাবশালীদের সমর্থন লাভ করা।

জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা র্কমসূচি

দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ৩০শে এপ্রিল ১৯ দফা কর্মসূচি[৩৫] ঘোষণা করেন।

পৌরসভা নির্বাচন

১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে দেশের ৭৭টি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং ঢাকা পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্বর মাসে। নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের ২০জন আওয়ামী লীগ-এর অপরদিকে অবশিষ্টরা হলেন সরকারী দলের।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৭৮ সালের ৩রা জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা হয়। তখনও বি এন পি নামে কোন দল গঠিত হয়নি। জেনারেল জিয়া জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নমিনী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্ট-এর নমিনী হিসাবে জেনারেল ওসমানী নির্বাচন করেন। ১ কোটিরও বেশী ভোটের ব্যবধানে জেনারেল জিয়া বিজয়ী হন। ১২ই জুন তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেন।

জিয়াউর রহমান তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে সংঘটিত এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। তাঁকে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে সমাহিত করা হয়।

[এমাজউদ্দীন আহমদ]

৩৪. Political Parties Regulations 1976

৩৫. স্বীয় কাজে গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমান ১৯-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দেশে দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনই ছিল এ কর্মসূচির লক্ষ্য। কর্মসূচির মুখ্য বিষয় ছিল আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন। এ কর্মসূচির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দ্রুততর প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশে অধিকতর উৎসাহ দান। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং নারী, যুবক ও শ্রমজীবীদের বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী করেই এ কর্মসূচি প্রণীত হয়। এর লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রিসভা গঠন

১৯৭৮ সালের ৩রা জুন নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে জেনারেল জিয়া বেসামরিক সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি ১৯৭৮ সালের ৩০ জুন একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভায় ২৮ জন মন্ত্রী ২ জন প্রতিমন্ত্রী ছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে ১৮ জন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলের, ৪ জন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ২ জন ইউ পি টি, ৩ জন মুসলীম লীগ এবং ১ জন তফশিলী ফেডারেশনের।

বি,এন, পি গঠন

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট র্নিবাচনের পর পরর্বতী সংসদ র্নিবাচনের পূর্বে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। যে ছয়টি দলকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট[৩৬] গঠন হয়েছিল সে কটি দলের নেতা ও কর্মীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি এন পি গঠন করেন। এ দলের সভাপতি পদ দখল করেন জিয়াউর রহমান,সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগ করেন বি চৌধুরকে।

রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল ও দলীয় কার্যক্রম সূচনা

রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল ও দলীয় কার্যক্রম সূচনা ১৯৭৮ সালের ১৭ই নভেম্বর এক ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল ঘোষণা করেন। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে কার্যকলাপ শুরু করেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯

১৯৭৮ সালের ৩০শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ভাষণে বলেন, ১৯৭৯ সালের ২৭ শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে বিরত থাকে। উল্লেখযোগ্য দাবীগুলোর মধ্যে ছিল নির্বাচনের পূর্বেই রাজবন্দীদের মুক্তি, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং সার্বভৌম ও কার্যকর জাতীয় সংসদ। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল ২০৭টি আসন লাভ করে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসন লাভ করে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী

সংবিধানের-৭২(১) ধারামতে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৯ সালের ২ রা এপ্রিল জাতীয় সংসদ আহ্বান করেন। জাতীয় সংসদের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে তুমুল বিতর্ক, সুদীর্ঘ আলোচনা- সমালোচনা ও বিরোধী দলের একাংশের সংসদ ত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল বাংলাদেশের সংবিধান পঞ্চম সংশোধনী আইন গৃহীত হয়। এ সংশোধনী আইনের ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণিত সকল আদেশ সামরিক আইন প্রবিধান সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন আদেশ দ্বারা সংবিধানের যে সকল সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন করা হয়েছে তা বৈধভাবে গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষিত হল। এ বিলটি উপস্থাপন করেন সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান। তখন আওয়ামী লীগ-এর বিরোধী দলের নেতা ছিলেন আওয়মী লীগের নেতা আসাদুজ্জামান খান ।

সামরিক আইন প্রত্যাহার

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সংবিধানের পঞ্চম সংসধনী আইনটি গৃহীত হলে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ক্ষেত্র রচিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়া ৬ই এপ্রিল এক ঘোষণায় দেশ হতে সামরিক আইন

---

[৩৬] জাতীতাবাদী ফ্রন্টের অংগদলগুলো ছিল : ১. জাতীতাবাদী গণতান্ত্রিক দল(জাগদল), ২. ন্যশনাল আওয়ামী পার্টি(ভাসানী), ২. ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ই.উ.পি.পি), ৩. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, ৪. বাংলাদেশ লেবার পার্টি এবং ৫. বাংলাদেশ তফশিলী ফেডারেশন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাহার করেন। সামরিক আইন প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূর্যোদয় ঘটলো ।

জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড

৩০ শে মে ১৯৮১ সাল শনিবার বাংলাদের ইতিহাসে আর এক কলংকিত অশুভ পদক্ষেপ। বর্ষণ শ্রান্ত রজনীর শেষ প্রহরে ভোর ৪টায় ২০জন সামরিক র্কমকর্তার একটি দল ঝটিকা আক্রমণ করে নির্মমভাবে হত্যা করে চট্রগ্রাম সার্কিট হাউজে ঘুমন্ত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানকে । তারপর বিদ্রোহীরা চট্টগ্রাম রেডিও চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ৪১ বছর বয়স্ক মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরের নেতৃত্বে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠনের ঘোষণা করে। এ বিপ্লবি পরিষদ ১৩টি নির্দেশ জারির মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করে সংবিধান বাতিল ঘোষণা এবং জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ার ঘোষণা করে।

উপ-রাষ্টপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহন

রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হওয়ার খবর ঢাকায় পৌছার সংগে সংগে দেশের সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার[৩৭] অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং সংবিধনের কতিপয় অনুচ্ছেদের দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকার স্থগিত করে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সকল দলের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন । এ সকল নেতা রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যার ঘটনার ব্যাপারে তীব্র নিন্দা ও গভীর শোক প্রকাশ করেন। অপরদিকে জণসর্মথন লাভে র্ব্যথ বিদ্রোহী সৈন্যরা শীঘ্রই

---

৩৭. আবদুস সাত্তার (জাস্টিস) (১৯০৬-১৯৮৫) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। আবদুস সাত্তার ১৯০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুরের দাড়কা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ এবং ১৯২৯ সালে বি. এল ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা জজকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এসময় তিনি এ.কে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। আবদুস সাত্তার ১৯৪১ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতী শুরু করেন। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর (১৯৩৯), কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাইব্যুনালের অ্যাসেসর-মেম্বর (১৯৪০-৪২) এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (১৯৪৫) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারত বিভক্তির পর আবদুস সাত্তার ঢাকায় এসে (১৯৫০) ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন।তিনি ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং আই.আই চুন্দ্রিগড়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন (১৯৫৭)। আবদুস সাত্তার ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৬৯-৭২)।

বিচারপতি সাত্তার ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ জীবনবীমা কর্পোরেশনের পরিচালক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান (১৯৭৩-৭৪), সংবাদপত্র বেতন বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯৭৪-৭৫) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল' অ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স-এর চেয়ারম্যান ছিলেন।তিনি ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলের (জাগদল) আহ্বায়ক ছিলেন বিচারপতি সাত্তার। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি এই দল বিলুপ্ত ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে নবগঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সহ-সভাপতি পদে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান নিহত হলে তিনি দেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক সামরিক অভ্যুত্থানে আবদুস সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৮৫ সালের ৫ অক্টোবর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। [মোফাখ্খার হোসাইন খান]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করেন। মেজর জেনারেল মঞ্জুর ধৃত ও নিহত হন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীপ অফ স্টাপ মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদ সাত্তারের সরকারের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন । জিয়া হত্যা মামলা তদন্ত করার জন্য সরকার দুটি ট্রাইব্যুনাল তিনসদস্য বিশিষ্ট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্ত এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই মেজর জেনারেল আব্দুর রহমান এর নেতৃত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয় এবং জেনারেল অভিযুক্ত বিভিন্ন পদ মর্যাদায় ৩১ জন সামরিক অফিসারকে বিচার করে ১২ জনকে ফাঁসিতে মৃতুদণ্ড এবং ১৭ জনকে বিভিন্ন প্রকার দণ্ড প্রদান করেন । বাকি ২ জন রাজ সাক্ষী হন। ১৯৮১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬ষ্ঠ সংশোধনী

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নৃশংষভাবে নিহত হলে উপ-রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন । সংবিধানের ১২৩ ধারা মতে রাষ্ট্রপতির শূন্যপদ পূরণের জন্য ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়। এ নির্বাচনে আব্দুস সাত্তার প্রার্থী হতে চাইলে সংবিধানের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কেননা সংবিধানের ৬৬(২-ক) উপ-ধারা মতে উপ- রাষ্ট্রপতির পদটি একটি অলাভজনক পদ। সুতরাং তিনি র্নিবাচনের প্রার্থী হতে পারেন না।

১৯৮১ সালের ২৯ শে জুন জনৈক জাতীয় সংসদ সদস্য এ নিয়ে বৈধতার প্রশ্ন উপস্থাপন করেন, ১৯৮১সালের ১লা জুলাই জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ৮ই জুলাই এ সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদ কতৃক গৃহীত হয়, যা সংবিধানের ৬ষ্ঠ সংশোধনী নামে পরিচিত।

১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি র্নিবাচন

১৯৮১ সালের ৩০শে মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ ধারা মতে রাষ্ট্রপতি পদশূন্য হলে ১৮০ দিনের মধ্যে তা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করার বিধান রয়েছে সেহেতু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ধার্য করেন। সরকারের পক্ষ থেকে ২১ শে সেপ্টেম্বর নির্বাচনের তারিখ নির্ধারন করা হয়। ২১ শে সেপ্টেম্বর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। কেননা বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কয়েকটি শর্তারোপ করে, শর্ত গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নির্বাচনের তারিখ পরির্বতন, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা, রাজবন্দীদের মুক্তিদান এবং সকল দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। এ সকল দাবির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন নির্ধারিত হয় ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর[৩৮]। ১৫ই নভেম্বর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন আমল

আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ৪ মাস সময়ও শাসন করতে পারেননি। শাসনর্কায পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, দলীয় কোন্দল, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভৃতি কারণে দেশ যখন কিছুটা

---

[৩৮]. ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার, অন্যতম বৃহত্তম রাজনেতিক দল আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন। জেনারেল এম .এ. জি ওসমানী, এম. এ জলিল, মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর)-সহ ৮৩ জন প্রার্থী মনোয়নপত্র পেশ করে।

৩৩জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাড়ান। নির্বাচনে সর্বমোট ৩১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের সর্বমোট ৩৮০৫১০১৪ জন ভোটারের মধ্যে ২১৬৭০২৫৩জন (৫৫.৪৭) ভাগ ভোট প্রদান করেন। মোট প্রদত্ত ভোটের ৬৪.৮০ ভাগ লাভকরে করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার নির্বাচনে জয় লাভ করেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন পান ২৬.৩৫ ভাগ ভোট। বিরোধীদল গুলো দাবী করে যে, সরকারীদল সীমাহীন কারচুপি, ভয়ভীতি ও সন্ত্রস সৃষ্টি করে রায় নিজেদের পক্ষে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক হতাশা ও সংকটের সন্মুখীন সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৮২ সালের ২৪মে মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান লেপ্টেনেন্ট জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ[৩৯] সামরিক আইন জারী করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ভূমিকা গ্রহন করেন। তিনি সংবিধান স্থগিত করেন, জাতীয় সংসদ বাতিল করেন এবং মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে দেন। তিনি দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ব ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৮২ সালের ২৭শে মার্চ বিচারপতি আব্দুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহনের প্রধান লক্ষ্য হল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। তিনি আরো বলেন, সরকারের চরম ও পরম দায়িত্ব হল দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং যথাশীঘ্র পরিস্থিতি অনুকূলে এনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। ১৯৮২ সালের ১১ এপ্রিল এরশাদ তাঁর সরকারের কার্যক্রমের ঘোষণা করেন ।

এরশাদ সরকারের ১৮ দফা র্কমসূচী

১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারি করার সময় জেনারেল এরশাদ জাতির উদ্দেশে বলেন, যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তার প্রধান লক্ষ্য। ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি ১৮ দফা র্কমসূচী ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে তিনি বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করেন।

জেনারেল এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

১.ঘরোয়া রাজনীতির অনুমুতি প্রদান : বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম প্রদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল হতে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমুতি প্রদান করেন।

২.প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমুতি প্রদান : জেনারেল এরশাদ ১৯৮৪ সালের ১লা এপ্রিল হতে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমুতি প্রদান করেন। এর ফলে সকল দল প্রকাশ্য রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে।

৩.এরশাদের দল গঠন প্রক্রিয়া : ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি এ এফ. এম আহসান উদ্দীন চৌধুরী 'জনদল' নামে ২০৮ সদস্যবিশিষ্ট এক নতুন দলের নাম ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 'জাতীয় পার্টি'[৪০] প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

[৩৯] **হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, (লে. জেনারেল)** (১৯৩০-) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (১৯৮৩-১৯৯০)। তিনি ১৯৩০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রংপুরে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬০-৬২ সালে তিনি চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে এডজুট্যান্ট ছিলেন। এরশাদ ১৯৬৬ সালে কোয়েটায় অবস্থিত স্টাফ কলেজে স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে শিয়ালকোটে অবস্থিত ৫৪ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, ১৯৬৯ সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভের পর ১৯৬৯-৭০ সালে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এবং ১৯৭১-৭২ সালে সপ্তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭৩ সালে এরশাদকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডজুট্যান্ট জেনারেল নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৯৭৩ সালের ১২ ডিসেম্বর কর্নেল পদে এবং ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি দিল্লিতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে অংশগ্রহণ করেন। ঐ বছরই আগস্ট মাসে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতির পর তাঁকে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ১৯৭৯ সালে তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পর থেকেই রাজনীতিতে এরশাদের আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন।

[৪০] রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকায় এক সমাবেশে জনদল নামে নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে জনদলের কমিটি গঠন বিলম্বিত হয়। বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে আহ্বায়ক এবং এম.এ মতিনকে সাধারণ সম্পাদক করে জনদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন : জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ জারি করেন এবং এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১৯৮৩ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পৌরসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

৫. গণভোট আনুষ্ঠান : ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী এরশাদ মোট প্রদত্ত ভোটের ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা সূচক ভোট লাভ করে।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন

ছাত্র সংগাম পরিষদ

জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় ছাত্রসমাজ। ১৯৮২ সালের শেষ দিকে এরশাদ সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকে জেনারেল এরশাদ সরকারের শিক্ষানীতি বাতিল এবং অন্যান্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের শেষ দিকে ১৯৮৩ সালের (১৪-২০) শে ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এতে দুজন ছাত্র নিহত হয়। বাধ্য হয়ে জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন জনগণের রায় ছাড়া শিক্ষানীতি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না । কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১৯৮৩ সালের ৬ই মার্চ ১০ দফা দাবি ঘোষণা করেন।

১৫ দলীয় জোট

জেনারেল এরশাদ ঢাকার একটি মোদার্রেসীন সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, এ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের প্রতিবাদে কয়েকটি রাজনৈতিক দল একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে এবং ১৯৮৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী ১৫ দলীয় জোট[৪১] গঠন করতে সম্মত হয়। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অক্ষুণ্ন রেখে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল দলগুলোকে নিয়েই এ জোট গঠিত হয়। ১৫ দল ১৯৮৩ সালের ৭ই এপ্রিল তাদের ১১ দফা দাবী প্রকাশ করে।

১৪ দলীয় জোট

১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে ৭টি দল একটি জোট গঠন করে, ৭ দলীয় ঐক্য জোটের মূল দাবী ছিল বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে বহাল রাখা সরকারের প্রস্তাবিত গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল এবং অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী জনদল থেকে সরে দাঁড়ান। পরবর্তী সময়ে জনদলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনোনীত হন মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক হন রিয়াজউদ্দীন আহমদ (ভোলা মিয়া)।

দলগঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এরশাদের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালের ১৩ জুন জাতীয় ফ্রন্ট নামে একটি নতুন মোর্চা গঠিত হয়। এ ফ্রন্টে বিএনপি থেকে শাহ আজিজ গ্রুপ, জনদল ও মুসলিম লীগের একাংশ, গণতান্ত্রিক পার্টি, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি এবং নির্দলীয়ভাবে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু যোগ দেন। ফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটিতে সদস্য ছিলেন ১৩ জন।

১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সীমিত আকারে তুলে নেওয়ার পর মাত্র ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে জাতীয় ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় জাতীয় পার্টি। দলের চেয়ারম্যান হন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

[৪১] ১৫ দলের অন্তর্ভুক্ত দল গুলো হল, ১. আওয়ামী লীগ (হাঃ), ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ৩. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (হাঃ), ৪. সাম্যবাদী দল(তোঃ), ৫. আওয়ামী লীগ (ফরিদ) ৬. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মো),৭. আওয়ামী লীগ (মিজান), ৮. একতা পার্টি, ৯. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল,
১০. সাম্যবাদী দল (নগেন), ১১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ১২. ওর্য়াকাসপার্টি, ১৩. গণ আজাদী লীগ, ১৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, ১৫. মজদুর পার্টি

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াতে ইসলামী

এ দু জোটের পাশাপাশি যুগপৎভাবে জামায়াতে ইসলামী ও সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

৫ দফা দাবী প্রণয়ন

১৫ দল ও ৭ দল সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতি ক্রমে ৫ দফা দাবী প্রণয়ন করেন। সব জোটই ৫ দফা দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৮৮

১৯৮৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। তবে এ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও সংর্ঘষের ফলে বহু হতাহত ও প্রাণহানি ঘটে। ফলে অনেক কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করতে হয়।

পৌর কর্পোরেশন নির্বাচন ১৯৮৮

এরশাদ সরকার ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ একই দিনে জাতীয় সংসদ ও পৌর কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন ঘোষণা করেন। ৩রা মার্চ ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এ নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহুলোক আহত হন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৮

এরশাদ ১৯৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হলে প্রধান বিরোধী জোট ও দলগুলো নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। এ নির্বাচনে ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল, ঐক্যজোট, জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণ না করায় নির্বাচনের প্রতি জসাধারণের আগ্রহে ভাটা পড়ে। বিরোধী জোট ও দলসমূহ এ নির্বাচনকে ভোটার বিহীন নির্বাচন ও প্রহসন বলে উল্লেখ করেন। ১৯৮৮ সালের ১০ই এপ্রিল সরকারীভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী

১৯৮৮ সালের ১১ই মে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার জাতীয় সংসদে একটি বিল উপস্থাপিত হয়। এ বিল সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী নামে খ্যাত, বিলটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গ্রহিত হয়। এ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানে নতুন অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ করা হয়। এতে বলা হয় যে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে। ঐ বিলে কুমিল্লা, চটট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ১টি করে স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের জন্য সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নতুন করে ১০০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করা হয় ।

বাংলাদেশ সংবিধানের নবম সংশোধনী

১৯৮৯ সালের ৬ই জুলাই বাংলাদেশ সংবিধানের নবম সংশোধনী[৪২] বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ। ১১ই জুলাই রাষ্ট্রপতি এ বিলে সম্মতি প্রদান করেন।

১৯৯০-এর গণআন্দোলন

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এক অভিনব গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। র্সবদলীয় ছাত্র ঐক্য ছিল এ গণআন্দোলনের রূপকার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো সর্বদাই এরশাদ

---

[৪২] *নবম সংশোধনী আইন* সংবিধান আইন, ১৯৮৯ (নবম সংশোধনী) পাস হয় ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে। এই সংশোধনী দ্বারা রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান করা হয়; রাষ্ট্রপতির পদে একই ব্যক্তির দায়িত্ব পালন পর পর দুই মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় (প্রতি মেয়াদকাল ৫ বছর)। এই সংশোধনীতে আরও বলা হয় যে, শূন্যতা সৃষ্টি হলে একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা যেতে পারে, তবে সেই নিয়োগের পক্ষে জাতীয় সংসদের অনুমোদন আবশ্যক হবে।

Dhaka University Institutional Repository
সরকারের পতন চাইলেও কখনো ঐকমত্যে পৌছাতে পারেনি। ১৯৯০ সালে সালের শেষ দিকে প্রথম বারের মত বিরোধী জোটসমূহ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে ঐকমত্যে উপনীত হয়। যার পরিণতিতে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

১৯৯০ সালের জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ৫,৭,৮ দলীয় জোট ও জামায়াতের যুগপৎ র্কমসূচীতে জণগণের সর্মথন লক্ষ্য করা গেল। ১০ই অক্টোবর বিরোধী জোট ও দলগুলোর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসুচী দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে পেলে। এ দিন মিছিলের উপর গুলিবর্ষিত হলে জাহিদ, হাসান ও মনোয়ার নামের তিন জন তরুণ নিহত হয়। ১১ই অক্টোবর পুলিশের লাঠিচার্জে আবার ও আহত হয় ছাত্র ঐক্যফ্রন্টের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতা। এর পর থেকে ছাত্র ঐক্য আন্দোলন চরমরূপ ধারণ করে। লাগাতর আন্দোলনের র্কমসূচী গ্রহীত হয়। বিরোধী জোটগুলো ছাত্রঐক্যের আন্দোলনের সাথে মিলিত হয়। ২৪শে অক্টোবর তিনটি জোটের সমাবেশ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সরকার পতনের দৃঢ় শপথ গ্রহণ করা হয়। নভেম্বরের ১লা তারিখ থেকেই ব্যাপকভাবে সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল চলে। ১০ নভেম্বর সারা দেশে সফল সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল শেষে ১১ থেকে ১৯শে নভেম্বর একটানা সমাবেশ ও মিছিলের ঘোষণা দেয়া হয় গোটা দেশে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯শে নভেম্বর তিন জোটের বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার ঘোষণা সরকার বিরোধী আন্দোলনকে নতুনভাবে রূপদান করে।

২০শে নভেম্বর বিরোধী জোট ও দলগুলোর ডাকে ২৪ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। সরকার ১৪৪ দ্বারা জারি করে এবং জনতার মিছিল ১৪৪ দ্বারা ভঙ্গ করে। ২৫শে নভেম্বর থেকে ২৭শে নভেম্বর ছাত্রঐক্য আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ২৭ শে নভেম্বর বি, এম ,এ মহাসচিব ডা: শামছুল আলম মিলনের এ মৃত্যুর পর দেশের চিকিৎসকরা অবিরাম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ রাতেই এরশাদ সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। কিন্তু জণসাধারণ জরুরী অবস্থা ও কারফিউ অমান্য করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল বের করে। ৩০শে নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট আন্দোলনের নির্দেশাবলী ঘোষণা করে। এ নির্দেশ অনুসারে ১লা ডিসেম্বর হরতাল পালিত হয়। ২রা ডিসেম্বর গণবিক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিক ইউনিয়ন পত্রিকা প্রকাশনা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আইনজীবীরা আদালত বর্জন করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যসহ শিক্ষক পদত্যাগ করে। গণঅভ্যুত্থানের চাপে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগের ঘোষণা দেয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুযায়ী বিরোধী দলগুলো সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দেয়। ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন ফলে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ

এরশাদ সরকারের পতনের ক্রান্তিলগ্নে জাতির এক মহাদুর্দিনে রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর সম্মিলিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৯৯০সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ[৪৩] অস্থায়ী

---

[৪৩]. **সাহাবুদ্দিন আহমদ, (জাস্টিস)** বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার হেমুই গ্রামে ১৯৩০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তালুকদার রেসাত আহমদ ভূঁইয়া ছিলেন এলাকার একজন খ্যাতনামা সমাজসেবক ও জনহিতৈষী ব্যক্তি। শাহাবুদ্দিন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে অর্থনীতিতে (সম্মান) স্নাতক এবং ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমী থেকে সাফল্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসন বিষয়ে একটি বিশেষ কোর্সে অংশগ্রহণ করেম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এবং পরে গোপালগঞ্জ ও নাটোরের মহকুমা প্রশাসক পদে কিছুকাল চাকরির পর শাহাবুদ্দিন আহমদ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৬০ সালের জুন মাসে তাঁকে বিচার বিভাগে বদলি করা হয় এবং প্রশাসনের নির্বাহী বিভাগে তাঁর চাকরির সমাপ্তি ঘটে। তিনি ঢাকা ও বরিশালে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৯০দিনের মধ্যে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অঙ্গীকার করেন। অবশেষে সকল দলের সাথে আলোচনা করে ১৯৯১ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। তিনি সুপ্রিম কোর্টের তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিটি গঠন করেন এবং ১৭ জনকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের পঞ্চম নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এটাই ছিল প্রথম নির্বাচন। সংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অতীতে এভাবে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। জনগণ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে নিয়ম শৃংখলা বজায় রেখে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৬,১৮,৫৪৩৫ জন এবং ভোট দিয়েছে ৩,৩০,৮৮,৪৬০ জন ২৯১টি আসনে মোট প্রার্থী ছিল ২৭৭৪ জন এবং ভোট কেন্দ্র ছিল ২৪১৪২টি। নির্বাচনে সব কটি আসনে আওয়ামী লীগ এবং বি, এন, পি মনোনয়ন প্রদান করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নৌকা, বি এন পি ধানের শীষ, জামায়াতে ইসলামী দাঁড়ি পাল্লা ও জাতীয় পার্টি লাঙ্গল প্রতীক গ্রহণ করে। এ নির্বাচনে বি, এন, পি সর্বাধিক আসন লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বি,এন,পি সরকার গঠন করে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণ ও বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল

বেগম খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ

১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ সময় সরকার গঠনের প্রশ্নে বি এন পি কে জামায়তে ইসলামী নিঃশর্ত সমর্থন দান করায়

নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি তাঁকে বাংলাদেশ হাইকোর্টের বিচারক পদে উন্নীত করা হয়। তিনি প্রেষণে নিযুক্ত হয়ে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১৯৭৩-৭৪)। এরপর তিনি বিচারপতি হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শাহাবুদ্দিন আহমদকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারক নিয়োগ করা হয়।

১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারি শাহাবুদ্দিন আহমদকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। এ সময় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনের ফলে দেশে এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন এবং বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। ঐ দিনই রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করে নবনিযুক্ত উপরাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি সরকার প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তিনি ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেন। সরকার-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ বেশ কিছুসংখ্যক আইন সংশোধন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন। এরপর নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণের পর শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯১ সালের ১০ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে সুপ্রিম কোর্টে ফিরে যান। ১৯৯৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেনবিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুলাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালের ৯ অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় অতি সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর পাঁচ বছরের শাসনকালে রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং বিবেকবুদ্ধির জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেন। ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [হেলাল উদ্দিন আহমদ এবং কাজী এবাদুল হক]

Dhaka University Institutional Repository

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯১ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বেগম খালেদা জিয়া[৪৪] প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ২০শে মার্চ।

---

[৪৪]. **খালেদা জিয়া** প্রধানমন্ত্রী (১৯৯১-৯৬, ২০০১-) ও বাংলাদেশজাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন। বেগম খালেদা জিয়া ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ইস্কান্দর মজুমদার ব্যবসা উপলক্ষ্যে দিনাজপুরে বসবাস করেন। তাঁর আদি নিবাস ফেনী জেলার ফুলগাজী থানায়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর জলপাইগুড়িতে চা ব্যবসা ছেড়ে তিনি দিনাজপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দিনাজপুর মিশনারী স্কুলে বেগম খালেদা জিয়া তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে ১৯৬০ সালে দিনাজপুর গালর্স স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ঐ বছরই তৎকালীন ক্যাপ্টেন এবংপরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। খালেদা জিয়া ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন এবং ঐ সময়ই তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন।দলের এ সংকটকালে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে বেগম জিয়া দলের সহসভাপতি এবং ১৯৮৪ সালের ১০ মে চেয়ারপার্সন পদে নির্বাচিত হন। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৮৩ সালে সাতদলীয় জোট গঠন করে জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ৯ বৎসরের দীর্ঘ সংগ্রামে বেগম জিয়া অবৈধ সরকারের সঙ্গে কোন আপোষ করেন নি। বিভিন্ন সময়ে নিষেধাজ্ঞামূলক আইনের দ্বারা তাঁর স্বাধীন গতিবিধিকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। আট বছরে সাত বার তাকে অন্তরীণ করা সত্ত্বেও বেগম জিয়া অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে ক্রমাগত চাপ অব্যাহত রাখেন।

অবশেষে বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সম্মিলিত জোট কর্তৃক সংগঠিত গণঅভ্যুত্থানের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়। বেগম জিয়া সংসদ নির্বাচনে পাঁচটি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবগুলি আসনেই বিজয়ী হন। পরবর্তী দুটি সাধারণ নির্বাচনেও তিনি অনুরূপ সাফল্য অর্জন করেন। একটানা তিনটি সাধারণ নির্বাচনে পাঁচটি আসনে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী হওয়া দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত বটে।

১৯৯১ সালের ২০ মার্চ বেগম জিয়া দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খালেদা জিয়ার উদ্যোগে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা থেকে সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় উত্তরণে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে সংবিধানের ঐতিহাসিক দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় খালেদা জিয়া ১৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

বেগম খালেদা জিয়ার সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে। তাঁর সময়ে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ালেখার সুযোগ, ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়। তাঁর সময়ে বৃক্ষরোপণ দেশব্যাপী একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। তাঁর সরকারই যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাকে (সার্ক) আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি জয়যুক্ত হওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়া দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। অবশ্য অপরাপর প্রধান রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন করেছিল। উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনসমূহ পরিচালনার জন্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে সংযোজনের পর ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং বেগম জিয়া ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি সামান্য ব্যবধানে আওয়ামী লীগের নিকট পরাজয় বরণ করে।

আওয়ামী লীগ সরকার আমলে (১৯৯৬-২০০১) সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বি.এন.পি নেতৃত্বাধীন চার-দলীয় জোট সংসদের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে বিজয় অর্জন করে। ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর খালেদা জিয়া তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

[হেলাল উদ্দিন আহমদ]

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রিসভা গঠন

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভের পর বেগম জিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তার মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রীর সংখ্যা ২২ জন প্রতিমন্ত্রী ১৫ জন এবং উপমন্ত্রী ৩ জন।

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৬ই এপ্রিল আহ্বান করেন। নির্ধারিত তারিখে সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে বি এন পি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস স্পীকার পদে এবং শেখ রাজ্জাক আলী ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত হন। সংসদের প্রথম অধিবেশন ৪১ দিন স্থায়ী হয়। সংসদ অধিবেশন চলাকালে ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ংকারী ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় এলাকাতে আঘাত হানে এতে প্রায় ২ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। ৩০শে এপ্রিল খালেদা জিয়া উপকূলীয় এলাকা পরিদশর্ন করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের একাদশ সংশোধনী

১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিচার পতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দায়িত্ব গ্রহন করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশে অবাধ, সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সাল থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ এবং উপরোক্ত সময়ে কৃত এবং গৃহীত কাজকর্ম অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ জন্যই ১৯৯১ সালের ৬ই আগস্ট সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল উথাপিত হয়। আওয়ামী লীগ এ বিল সম্মতি জ্ঞাপন করেন। জাতীয় পার্টি এবং এনডিপি সদস্যগণ ভোটদানে বিরত থাকে। উপস্থিত বি এন পি, আওয়ামী লীগ, জামায়ত ইসলামী দলীয় সদস্যগণের অভূতপূর্ব সমোঝোতা আনন্দঘন ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে বিলটি পাসে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এর ফলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে সাহাবুউদ্দিন আহমদ-এর সকল কার্যকলাপ বৈধ বলে স্বীকৃত হয়। তার স্বপদে যাবার পথ প্রশস্ত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর পর থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমানের এবং জেনারেল এইচ এম এরশাদের শাসনামলেও তা বলবৎ ছিল। ১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তিন জোটের যৌথ ঘোষণাতে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ছিল। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই ১৯৯১ সালের ২রা জুলাই জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ২ দিন পর ৪ঠা জুলাই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর একটি বিল উপস্থাপন করা হয়। উভয় দলের প্রস্তাবে কিছু মৌলিক প্রার্থক্য থাকায় সমোঝোতার ভিত্তিতে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। ২৮শে জুলাই বাছাই কমিটি সংসদে বিলটি পেশ করে। সমঝোতার মাধ্যমে বাছাই কমিটি বিলটি উথাপন করলেও ঐ বিলটি পাসের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। একই কারণে আওয়ামী লীগ ইনডেমনটি আইন উপস্থাপনের দাবি জানায়। অবশেষে সকল দ্বিধাশংসয় ও মতবিরোধের অবসান ঘটিয়ে দ্বাদশ সংশোধনী[৪৫] বিলটি সংসদে পাস হয়।

---

[৪৫] *দ্বাদশ সংশোধনী আইন* বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিকাশের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে খ্যাত এই সংশোধনী আইন পাস হয় ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট। এর দ্বারা সংবিধানের ৪৮, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৭০, ৭২. ১০৯, ১১৯, ১২৪, ১৪১ক এবং ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন ঘটে; রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান হন; প্রধানমন্ত্রী হন রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী; প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ হয়; উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়, জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয়। তাছাড়া,

Dhaka University Institutional Repository

গণভোট, ১৯৯১

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিলটিতে যেহেতু সংবিধানের ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৯২ক, ও ১৪২ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংশোধনের প্রস্তাব ছিল। সে জন্যই রাষ্ট্রপতি বিলটি গণভোটে পেশ করেন। ১৯৯১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী

১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী[৪৬] আনয়ন করা হয়। এ আইন দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান করা হয়।

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিরোধীদলসমূহের সাথে বি. এন. পির সুসম্পর্ক ছিল না বল্লেই চলে। বিশেষ করে অধিকাংশ সময়ই বিরোধী দলগুলো জাতীয় সংসদের অধিবেশন থেকে 'ওয়াক আউট' করেছিল। বিরোধীদলীয় সদস্যগণ এক সময়ে স্থায়ীভাবে পার্লামেন্টের অধিবেশন বর্জন করে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। বিরোধী দলগুলো দাবী করে ১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর গণআন্দোলন চলাকালে ১৫,৭, ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট যে যৌথ ঘোষণা করেছিল, ক্ষমতায় বসে তার কিছুই বি এন পি কার্যকরী করেনি। বিএনপি সরকার এ আন্দোলনের মধ্যে ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে। এ নির্বাচন ছিল ভোটার বিহীন । এ প্রহসনমূলক নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে ২৬শে মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস হয়। বেগম খালদা জিয়া ৩০শে মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য দীর্ঘ দু বছর রাজপথে আন্দোলনের পর বি এন পি সরকার ১৯৯৬ সালের ২১শে মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলটি পাস করতে বাধ্য হয়। ৩০শে মার্চ আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান[৪৭] প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। দেশের ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এই আইনে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যা দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

[৪৬] *ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন* সংবিধান আইন, ১৯৯৬ (ত্রয়োদশ সংশোধনী) পাস হয় ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ। এর দ্বারা একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান করা হয়, যা একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন হিসেবে কাজ করবে এবং সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। একজন প্রধান উপদেষ্টা ও অনূর্ধ্ব ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিতব্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে এবং নতুন সংসদ গঠনের পর নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের তারিখে বিলুপ্ত হবে। [এমাজউদ্দীন আহমদ]

[৪৭]. **মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, (জাস্টিস)** শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও বিচারক। হাবিবুর রহমান ১৯৩০ সালে মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে ইতিহাসে বি.এ (অনার্স) এবং ১৯৫১ সালে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে বি. এ (অনার্স) (১৯৫৮) ও এম. এ (১৯৬২) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি ডিগ্রি লাভ করেন। হাবিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের লেকচারার হিসেবে ১৯৫২ সালে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬০ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে আইন অনুষদের ডীন (১৯৬১) ও পরে ইতিহাসের রিডার (১৯৬২-৬৪) হিসেবে তিনি ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

পরে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। এ সময় তিনি সহকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল (১৯৬৯), হাইকোর্ট আইনজীবী সমিতির সহসভাপতি (১৯৭২) এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য (১৯৭২) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হাইকোর্ট

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। মাত্র ১২ সপ্তাহের মধ্যে একটি নির্বাচন উপহার দেন। বিচার পতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নেন ২৩ শে জুন।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬

১৯৯১ সালের ১২ই জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন । এই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন সর্বমোট ভোট কেন্দ্র ছিল ২৫৯৫৭টি । সর্বমোট ৮১ টি রাজনৈতি দল এতে অংশগ্রহণ করেছিল। এ নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিলেন ২,৫৭৪ জন এবং এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ২৭৯ জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৩৬ জন। প্রায় ৩৫ হাজার দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭৩ আসনের ফল প্রকাশ করা হয়। ২৭টি আসনের ১১২টি ভোট কেন্দ্রে সহিংসতার কারণে পুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। ২৭৩টি আসনের যে ফলাফল ঘোষণা করা হয় তাতে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১৩৪টি আসন, বি, এন, পি ১০৪টি আসন, জাতীয় পার্টি ২৯টি, জামায়াত ৩টি, ঐক্য জোটি ১টি, জাসদ ১টি আসন, স্বতন্ত্র ১টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে।

আওয়ামী লীগের সরকার গঠন

শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ

১৯৯৬ সালের ২২শে জুন বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান হয়। প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস ২৩ শে জুন বাংলাদেশের দশম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনাকে শপথ বাক্য পাঠ করান। শেখ হাসিনা ১১ জন মন্ত্রী, ৮ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে সরকার গঠন করেন।

জাতীয় ঐকমত্যের সরকার

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি তাঁর সরকারকে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বলে আহবান করেন। এ জন্য জাতীয় পাটির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং জাসদ-এর আব্দুর রবকে মন্ত্রী করেন।

বিভাগের বিচারক (১৯৭৬-৮৫), সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক (১৯৮৫-৯৫), ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি (১৯৯০-৯১) এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি (১৯৯৫) পদে কর্মরত ছিলেন। অ্যাডমিরাল্টি জুরিসডিকশন, সংবিধানের সংশোধনী, নাগরিকত্ব, হেবিয়াস কর্পাস, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও কোর্টের এখতিয়ার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বহু রায়ে তাঁর প্রদত্ত অভিমত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিচারক হিসেবে তাঁর দক্ষতার পরিচায়ক।হাবিবুর রহমান ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে তাঁকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্য ও জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষক ও লেখক হাবিবুর রহমানের রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *Law of Requisition* (১৯৬৬), রবীন্দ্র-প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার (১৯৬৮), যথাশব্দ (১৯৭৪), মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৩), কোরানসূত্র (১৯৮৪), বচন ও প্রবচন (১৯৮৫), গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ (১৯৮৫), রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা (১৯৮৬), রবীন্দ্রকাব্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য (১৯৮৬), *On Rights and Remedies*, আমরা কি যাব না তাদের কাছে যারা শুধু বাংলায় কথা বলে (১৯৯৬)। হাবিবুর রহমানকে ১৯৮৫ সালে সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো, বাংলা একাডেমীর ফেলো, লিংকন্‌স ইন-এর অনারারি বেঞ্চার।

[মুয়ায্‌যম হুসায়ন খান]

Dhaka University Institutional Repository

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি[৪৮] শেখ হাসিনা সরকারের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীনতার পর থেকে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে যে শান্তি বাহিনী গঠিত হয় তার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালের ১৪ ই অক্টোবর সরকার ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে কয়েক দফা বৈঠক করে। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর একাট শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শেখহাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন

অনেক ভাল ভাল কাজের প্রতিশ্রুতি আর অতীতের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেও ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সব ভুলে যায়। দেশে সন্ত্রাস, মারামারি, হানাহানি, খুন ইত্যাদি চরম আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় বিরোধীদলগুলো চারদলীয় জোট গঠন করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হাসিনা সরকারের পতন হয়।

চারদলীয় জোট গঠনে আব্বাস আলী খানের ভূমিকা

চারদলীয় জোট গঠনে আব্বাস আলী খানের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী বাকশালী সরকারকে হটিয়ে একটি ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এই জোটের নেতৃত্বে থাকলেও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আব্বাস আলী খান বার বার উপলব্ধি করতেন যদি চারদলীয় জোট গঠন না হয়, তাহলে এদেশে ইসলামী শক্তির পক্ষে ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই বিএনপি, জাতীয় পার্টি,

---

৪৮. **পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ১৯৯৭** বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত চুক্তিতে ১৯৮৯ সালের আইনের কয়েকটি ধারা সংশোধন করে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের গঠন কাঠামো নিম্নরূপ: চেয়ারম্যান ১, সদস্য (আদিবাসী) পুরুষ ১২, (আদিবাসী) মহিলা ২, (অ-আদিবাসী) পুরুষ ৬, (অ-আদিবাসী) মহিলা ১। আদিবাসী পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা এবং ১ জন করে মুরং ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে ১ জন চাকমা এবং অপর জন অন্য আদিবাসী থেকে নির্বাচিত হবেন। অ-আদিবাসী সদস্যের ক্ষেত্রে প্রতি জেলা থেকে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন। তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। এই পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙখলা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে। উপজাতীয় আইন এবং সামাজিক বিচারকার্য এই পরিষদের অধীনে থাকবে। পরিষদ এনজিওদের সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় করবে এবং ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেবে। পরিষদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করবে।

চুক্তিতে একজন উপজাতিকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কার্যক্রম দেখাশুনার জন্য একটি উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের কথাও বলা হয়েছে। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, আঞ্চলিক পরিষদ একটি প্রতীকী প্রতিষ্ঠান। এর ক্ষমতা ও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও তদারকি ধরণের। জেলা পরিষদগুলির ক্ষমতা ও কার্যক্রম পূর্বের মতো রয়েছে; তবে এগুলিকে আরও কার্যকর করার জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, উপজাতীয়দের ভূমি মালিকানা অধিকার নির্ধারিত হলে তাদের ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সেমতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমির উপর মালিকানা নির্ধারণের জন্য ভূমি জরিপব্যবস্থা পরিচালিত হবে।

বর্তমান চুক্তির অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে, স্থায়ী সেনানিবাসও বহাল থাকবে। বিডিআর ছাড়া কেবল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প, আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দেশের অন্যান্য স্থানের মতো বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা যাবে। আঞ্চলিক পরিষদ প্রয়োজনে এ ধরণের সাহায্য সহযোগিতার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাতে পারবে। [আমেনা মোহসিন]

Dhaka University Institutional Repository
জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের ভরাডুবির মধ্য দিয়ে এই জোটই সরকার গঠন করে।

বর্তমান বাংলাদেশ : আব্বাস আলী খানের প্রত্যাশা

বর্তমানে বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আজও আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। খান সাহেব চেয়েছিলেন এমন একটি সুন্দর দেশ, যেখানে কোন সন্ত্রাস, দরিদ্রতা, বেকারত্ব, দুর্নীতি থাকবে না। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে নবী সা. মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে সমাজে কোন অভাব ছিল না। দূনীতির কোন স্থান ছিল না। সমাজটি শান্তিতে ভরপুর ছিল।

'আব্বাস আলী খান রাসূলের অনুকরণে সে ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। অপার সম্ভাবনার এ বাংলাদেশ অবশ্যই একদিন সুখী, সমৃদ্ধশালী, দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে গড়ে উঠবে-এ প্রত্যাশায় শেষ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : উপসংহার

বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ আব্বাস আলী খান ছিলেন নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ। ইসলামী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক আপোষহীন সিপাহসালার। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের সংগ্রামে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

১৯১৪ সালে জয়পুরহাট জেলার পারুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ইসলাম প্রতিষ্ঠার এ অগ্রসেনানীর জন্ম। তাঁর পিতা আব্দুল আজীজ খান ও তদীয় পিতা সুবিদ আলী খান এর পূর্বপুরুষদের কোন একজন মুসলিম বিজয়ী বীর হিসেবে বহুকাল পূর্বে আফগানিস্তান থেকে এ দেশে আগমন করেন। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার রূপে মুগ্ধ হয়ে এ দেশেই স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন।

পারিবারিক পরিসরে ধর্মীয় শিক্ষকের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবনের শুভসূচনা ঘটে। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন ধার্মিক। ধর্মীয় পরিবেশে তিনি তার শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। শৈশবে তিনি কুরআনের সবক গ্রহণ করেন এবং আযান সহ ইসলামের প্রাথমিক বিষয়গুলো রপ্ত করেন। ছোটবেলা থেকে তিনি অত্যান্ত মেধাবী ছিলেন। নিজ গ্রামের নিকটবর্তী হানাইল মাদরাসায় তিনি ২য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পযর্ন্ত লেখাপড়া করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পযর্ন্ত তিনি হুগলী নিউস্কিম মাদরাসায় লেখাপড়া করেন এবং কৃতিত্বের সাথে সেকেন্ডারী এডুকেশন সম্পন্ন করেন। এরপর রাজশাহী কলেজ ও কারমাইকেল কলেজে তিনি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ পাশ করেন। এরপর কিছুদিন তিনি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পড়ালেখা করেন।

তিনি ছিলেন বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারি সরকারি চাকরি নিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। এরপর শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এর পি.এসের দায়িত্বপালন, প্রধানশিক্ষক হিসেবে শিক্ষাব্রতী, জাতীয় পরিষদ সদস্য, প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী সর্বোপরি সমাজসেবক হিসেবে তাঁর কর্মময় জীবন ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী মানুষকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা যোগাবে।

১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল তথা মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পযর্ন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি একজন খাঁটি দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে একামতেদ্বীনের দায়িত্ব পালন করেন । এ দেশের জনগণের ঘরে ঘরে ইসলামের আহবান পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা সমূহের আহবানে দ্বীনি ইলম ও দ্বীনের আলোক বিতরণের সুমহান দায়িত্ব পালনে তিনি বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পঞ্চাশের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পযর্ন্ত নির্যাতিত নিপীড়িত মজলুম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন।

অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির অধিকারী এ মহান মনীষী ইসলামী দাওয়াত এর প্রচার প্রসারে সফলতার সাথে মসি ধারণ করেন। অনুবাদ করেন, গবেষণা করেন, রচনা করেন প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় লিখেন আমৃত্যু। তাঁর রচনাসমগ্র ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য যুগ যুগ ধরে পাথেয় হয়ে থাকবে। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাললাহ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামীতে ১৯৫৪ সালে তিনি যোগদান করেন। এরপর বিভাগীয় আমীরের দায়ীত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে খান সাহেবকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৫ বছর তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন । তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তরে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়েছেন। সংগঠিত কর্মীবাহীনিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাদের চরিত্র গঠন নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আলোচনা রেখেছেন। আন্দোলনের কর্মীদের তৈরি করার জন্য নিজ পরিবারের সদ্যদের মতো নিবিড় তত্বাবধান করেছেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী তথা ইসলামী আন্দোলন এদেশের গণমানুষের প্রিয় সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৯৯ সালের ৩রা অক্টোবর দুপুর ০১.১৫ মিনিটে এ মহান ব্যক্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে প্রিয় প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে পাড়ি জমান মহাজীবনের পথে । বিংশ শতাব্দীর আপোষহীন নেতা, ইসলামী বিপ্লবের সাহসী সৈনিক, সমাজ সংস্কারক, আল কুরআনের ধারক ও বাহক আব্বাস আলী খান এ দেশের কোটি কোটি মানুষের ও অনাগত প্রজন্মের জন্য প্রেরণার উৎস। তিনি ছিলেন পবিত্রতা, পরিছন্নতা নিয়্যতের নিষ্ঠা ও ইখলাস, তাকওয়া, পরহেযগারী, আদল ও ইহসান, ইবাদত, বন্দেগী ও ইত্তেবায়ে রাসূলের ক্ষেত্রে অগ্রগামীদের অগ্রগামী। তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল এদেশে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করা। তাঁর স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব বঞ্চিত ,দরিদ্র, নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। খান সাহেবকে আল্লাহ জান্নাতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করুন আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'আব্বাস আলী খান : রাজনৈতিক সহকর্মীদের অনুভূতি

জনাব শামছুর রহমান[৪৯]

আমার প্রিয় ভাই আব্বাস আলী খান ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও স্বল্পভাষী। কিন্তু সবসময় তার কথার মধ্যে হাস্যরসের মিশ্রণ থাকত। তিনি যে এককালে ফুরফুরার পীর সাহেবের খলিফা ছিলেন এর জন্য তাঁর মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়নি। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। আব্বাস আলী খান সাহেব ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। তিনি বড় সমাজ সেবকও ছিলেন। উত্তরবঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি তালিমুল ইসলাম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এ ট্রাস্টের পরিচালনায় চলছে একটি আদর্শ স্কুল এবং কলেজ। আমার কাছে সব সময় তাকে একটি বিরাট বট গাছের মতো মনে হয়েছে। মনে হয়েছে যেন তার ছায়াতলে নির্বিঘ্নে ইসলামী আন্দোলনের পথ অতিক্রম করছি।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী[৫০]

পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাস আলী খান ছিলেন লক্ষ লক্ষ ইসলামী জনতার মহান শিক্ষকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। গতানুগতিক অর্থে তিনি কেবল একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, তাঁর কাছ থেকে হাজারো লাখো জনতা অনেক অনেক কিছু শিখেছে। তাঁর পরও মনে হয় আরো অনেক শেখার ছিল তাঁর নিকট । শিক্ষা জীবন শেষে তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা হয়েছিল শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী চাকুরী করলেও সেখান থেকে ফিরে যান মহান শিক্ষকতায়। ইসলামী আন্দোলনের তাকিদে ছাড়তে হয়েছিল এ শিক্ষকতার পেশাও। কিন্তু এই পেশার নৈতিক ছাপ ছিলো তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ অবধি। মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদ (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে্ শিক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধনের। প্রিয় নবীর স্বার্থক উত্তরসূরী উম্মতের জীবনে এই বৈশিষ্ট্যের পরিস্ফুটন ঘটাই স্বাভাবিক। আব্বাস আলী খান ছিলেন উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ঐতিহ্যের জীবন্ত স্বাক্ষী। তিন বিশাল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য তাঁকে ধন্য করেছিল। বিংশ শতাব্দদীর প্রথমার্ধের ১৫/২০ বছরের ঘটনা প্রবাহের তিনি ছিলেন জীবন্ত সাক্ষী। এ সময়ের মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে যেমন তিনি কাছে থেকে দেখার এবং জানার সুযোগ পেয়েছেন। তেমনি শির্ষস্থানীয় ওলামা মাশায়েখগণের সাহচর্য লাভেরও তিনি দুর্লভ সুযোগ পান। বিশেষ করে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পান। অপরদিকে সে সময়কার বাংলা ও আসামের অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক পুরুষ শাহে সুফী আবু বকর সিদ্দিকীর এবং তার সুযোগ্য পুত্র আব্দুল হাই সিদ্দিকীর ও ফুরফুরার সিলিসিলাভুক্ত অসংখ্য আলেম ওলামা এবং পীর মাশায়েখের সাথে উঠা বসার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান। পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময় তিনি সম্পৃক্ত হন এ যুগের অন্যতম শেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ এবং

---

৪৯. শামসুর রহমান, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর ছিলেন।
৫০. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আন্দোলনে পথিকৃত সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর চিন্তাধারা এবং তার নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল। তাঁকে আল্লাহ সুন্দর একটি কণ্ঠ দান করেছিলেন। তাঁর আওয়াজের বলিষ্ঠতা ও মাধুর্য সব সময়ই ভাল লাগত। তিনি সুন্দর কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তাঁর তেলাওয়াত শুধু কণ্ঠে নয়, হৃদয়ের পরতে পরতে সৃষ্টি করেছিল অদ্ভূত শিহরণ।

মকবুল আহমদ[৫১]

আলাহ তায়ালা তার মধ্যে অগনিত গুণের সমহার ঘটিয়েছিলেন। যিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চলতেন। তাঁর কাপড় চোপড়, টেবিল-পত্র সুন্দর করে গুছানো থাকতো। তার কক্ষে গেলে বুঝা যেতো তিনি একজন রুচিশীল মানুষ। সময়ানুবর্তিতায় তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। খান সাহেব প্রকৃতিগতভাবে একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু আলাপ শুরু করলে বুঝা যেতো কতো রসিক ব্যক্তি ছিলেন।

বদরে আলম[৫২]

লেখক ও সাহিত্যিক হিসেবে আব্বাস আলী খান এর আলাদা মর্যাদা ছিল। তিনি বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং আরবী, ফার্সি ভাষাও জানতেন। তিনি বহু বই অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া নিজেও অনেক বই লিখেছেন। দেখা গেছে অবসর সময়ে তিনি হয় বই পড়তেন, না হয় লিখতেন । ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর লেখা বই পত্রে এর প্রমাণ মিলে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে খুবই আবেদ পরহেজগার ছিলেন। আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও তাঁর অনেক উচ্চমান ছিল। স্থানীয় মসজিদে সব সময়ে প্রথম কাতারে নামাজ পড়তে দেখেছি। চলাফেরার মধ্যে কোন অহংকারের লক্ষণ দেখিনি। বেশীরভাগ সময় গম্ভীর থাকতেন। কথাবার্থা কম বলতেন। আব্বাস আলী খান খুবই ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। কোন সময় কোন অভিযোগ তার থেকে শুনিনি। সবচেয়ে বড় ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার পারিবারিক জীবনে। খান সাহেবের স্ত্রী বহু বছর যাবৎ প্যারালাইসড অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এ অবস্থায় স্ত্রীকে রেখে ইসলামী আন্দোলনের জন্য সারাদেশে ও বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন কারো কাছে স্ত্রীর অসুখের কথা প্রকাশ করতেন না।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান[৫৩]

আব্বাস আলী খানের মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল চমৎকার সবগুণাবলীর। একাধারে তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। শিক্ষাবিদ, লেখক, সুবক্তা এবং বড় মাপের একজন আলাহ ওয়ালা ও দেশ প্রেমিক বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কণ্ঠছিল যুবকের মত পরিচ্ছন্ন এবং আকর্ষণীয়। অনেক বার তাকে অসুস্থ অবস্থায় অনেকটা জোর পূর্বক হাজির করেছিল জন সভায় কিন্তু যখন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা শুরু করতেন তার সাবলীল বাচনভঙ্গী ও ওজস্বি বক্তব্য বিমোহিত হয়েছে ছাত্র-জনতা, জগন্নাথ হলের ছাদ ধ্বসে পড়লে সেদিন যে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা দেখতে তিনি রাতেই ছুটে গিয়েছিল জগন্নাথ হলে। শোকার্ত ছাত্র শিক্ষকদের পাশে গিয়ে দাড়িয়েছিলেন । অনুরূপভাবে ভারতে মুসলিম হত্যার জন্য ঢাকায় সম্প্রদায়িক

---

৫১. মকবুল আহমদ, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন।

৫২. বদরে আলম, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ফাইন্যান্স সেক্রেটারী ছিলেন।

৫৩. কামারুজ্জামান, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন এবং সম্পাদক সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তেজনা দেখা দিলে আব্বাস আলী খান নিজে ছুটে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে এবং আশ্বস্থ করেছিলেন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে।

আবদুল কাদের মোল্লা[৫৪]

জনাব খান আকার আকৃতিতে খুব বড় দেহের লোক ছিলেন না ; কিন্তু হাটা চলায়, কথা বলার ধরণে, তার চাহনীতে মনে হতো যেন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। ভাষার গাঁথুনি, বলার ভঙ্গি, যেখানে যে শব্দের উপর যতটা জোর দেয়া দরকার তা দিতেন খুব মজবুতভাবে। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সুগভীর। বাংলা ছাড়াও ইংরেজী ও উর্দুভাষায় তাঁর দখল ছিল প্রায় মাতৃভাষার মত। আরবীতে ও তাঁর দখল এতোটা ছিল যে একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক হওয়ার পরও জুমুআর নামাযে খুতবা দেয়ার অনুরোধ আসলে কোন দিধা-দন্ধ ছাড়াই উঠে পড়তেন মিম্বরে। খুতবা দিতেন একজন যোগ্য আলেমের মতোই। নামাযে ইমামতি করতেন অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করে। ইতিহাসের উপর তাঁর দখল ছিল দারুন রকমের। তাঁর লিখিত "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" ইতিহাসের প্রতি তাঁর দখেলের অন্যতম দলীল।

অধ্যাপক মুজিবর রহমান[৫৫]

খান সাহেবে নিজ হাতে আতিথেয়তা করতে ভাল বাসতেন। কখনো কখনো তাঁর কক্ষে গেলে নিজ হাতে চা বানিয়ে খাওয়াতেন। তার কক্ষে চা বানানোর প্রয়োজনীয় উপাদান থাকত। তাঁকে কখনো আলাদাভাবে খেতে দিলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। খাবার টেবিলে সফর সঙ্গীদের মধ্যে ডাইভারও অন্তর্ভুক্ত থাকত। খান সাহেব অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন প্রায় সময় তাকে চিন্তা করতে দেখতাম। দেশ, জাতি সমাজ সম্পর্কে গভীর চিন্তা করতেন, আক্ষেপ করে বলতেন সমাজে বিভিন্ন রকম শিরক ও বেদায়াতে ছেয়ে যাচ্ছে। সঠিক ইসলামের প্রচারের চেয়ে শিরিক বিদায়াতের প্রচারই বেশী হচ্ছে। আব্বাস আলী খান ইসলামের এ সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করতেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম[৫৬]

তিনি বয়সের দিক দিয়ে আমার মুরুব্বী ছিলেন। দ্বীনের ইলম, মজবুত ঈমান, উন্নত নৈতিক চরিত্র, তাকওয়া, দ্বীনদারী, আলাহর খাঁটি প্রেমিক হিসেবেও আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আলাহ তায়ালা তাঁর মধ্যে অনেক গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। একজনের মধ্যে এতসব গুণ খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। প্রথমত: তাঁকে আমি সত্যের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সঠিক মনে করি। জামায়াতে ইসলামীতে আসার পূর্বে তাসউফের লাইনে অগ্রসর হয়ে ফুরফুরা শরীফের খলীফা হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা স্বত্বেও ইসলামী আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসতে সামান্য দ্বিধাও অনুভব করেননি। তাসাউফের সাথে সাথে তিনি দ্বীনি

---

৫৪. আব্দুল কাদের মোল্লা, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পাবলিসিটি সেক্রেটারী ছিলেন।

৫৫. অধ্যাপক মুজিবর রহমান, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন।

৫৬. অধ্যাপক গোলাম অযম, খান সাহেবের মৃত্যুকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীরের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইলমের চর্চা করতেন। তাই ইকামতে দ্বীনের ডাকে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি উচ্চমানের একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর "স্মৃতি সাগরের ঢেউ" বইতে সাহিত্যিক রসিক হিসেবে তাঁর পরিচয় মেলে। তিনি নিজেও যে বেশ রসিক ছিলেন তাঁর পরিচয় ও এ বইতে যথেষ্ট রয়েছে। পাঠকের নিকট কোন বক্তব্য উপভোগ্য আকারে পেশ করার যে যোগ্যতা তাঁর ছিল তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

তৃতীয়তঃ আলাহ তায়ালা তাঁকে বিরল স্মৃতি শক্তি দান করেছিলেন। তিনি বয়সে আমার মুরব্বী হওয়ার কারণে এবং পরহেজগার হিসেবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম বলে প্রায়ই জামায়াতের সমাবেশে তাঁকে আমি ইমামতি করতে দিতাম। তিনি কুরআনের এমন সব জায়গা থেকে নামাজে আয়াত পড়তেন যা আমার মুখস্তের বাইরে ছিল হাফেজ ছাড়া আর কাউকেও এ ধরনের UnCommon জায়গা থেকে তাকে আয়াত পড়তে দেখিনি।

চতুর্থতঃ সকল ব্যাপারেই তিনি সুশৃংখল ছিলেন। কোন বিষয়ে তিনি অনিয়ম করতেন না। কোথাও অনিয়ম দেখলে প্রতিবাদ না করে ছাড়তেন না। তিনি তাঁর ২৪ ঘন্টার রুটিনে যে নিয়ম মেনে চলতেন তাতেই মনে হয় তিনি আজীবন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন।

পঞ্চমতঃ আলাহর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা থাকার কারণে পার্থিব দুঃখ কষ্ট। বিপদ আপদে তিনি কখনো পেরেশান হয়ে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেননি।

আবদুস শহীদ নাসিম

আব্দুস শহীদ নাসিমের[৫৭] অনভূতিতে খান সাহেবের জীবনের যে দিকগুলো ফুটে উঠেছে তা হল- তিনি সাংগঠনিক ময়দানে অনুসরনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন । ব্যক্তিগত জীবনে পুরোপুরি স্বচ্ছ ছিলেন। পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। দায়িত্বশীলদের প্রতিপূর্ণ আনুগত্য ছিল পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। সময়ের প্রতি ছিলেন খুবই সচেতন। বাগ্মীতা ছিল তাঁর অনেক বৈশিষ্টের মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান বৈশিষ্ট। তিনি যখন আলোচনা রাখতেন তখন আলোচনায় এতো আবেদন সৃষ্টি করতেন যে, উপস্থিত দর্শক শ্রোতা আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলত। নিজের কাজ স্বহস্তে করে বেশি আনন্দিত হতেন। অধঃস্তনদের নানান অধিকারের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ছিলেন। কারো মনে কষ্ট দিয়ে কোন কথা বলতেন না । কারো সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা মনে করলে সামষ্টিক ভাবে সংশোধনে প্রয়াসী হতেন। সহকর্মীদের সাথে খুবই ভালো এবং চমৎকার আচরণ করতেন। মানবতার কল্যাণে আজীবন তিনি নিবেদিত ছিলেন। সৃষ্টিশীল কাজে ব্যাপৃত ছিলেন আমৃত্যু। মওদূদী রিসার্চ একাডেমি নির্মাণের প্রস্তাবক এবং নির্মানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন খান সাহেব। নানান ব্যস্ততার মাঝে থেকেও তিনি জন্মস্থান জয়পুরহাটকে মোটেও ভুলেননি। তা,লীমুল ইসলাম ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষানিকেতন নির্মান করে জয়পুরহাটে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে নিবেদিত ছিলেন। আজীবন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত এ মহান ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন – এ কামনাই করছি।

---

[৫৭] আবদুস শহীদ নাসিম বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব। সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত। সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমি ঢাকার ডিরেক্টর। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর-সেন্টার ফর পলিসি স্ট্যাডিজ, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, মেম্বার শরিয়াহ কাউন্সিল- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, মেম্বার অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'আব্বাস আলী খান : পরিবারের সদস্যদের অনুভূতি

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা আব্বাস আলী খান। খান সাহেবের বর্ণাঢ্য কর্মময় সফল জীবনকাল সম্পর্কে জানতে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনসহ শুভানুধ্যায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। খান সাহেবের সবচেয়ে আপনজন ও কাছের পরিজন হচ্ছেন তার একমাত্র সন্তান খান জেবুন্নেসা চৌধরী। খান জেবুন্নেসার সাথে আলাপচারিতায় মরহুম খান সাহেবের পূর্বপুরুষ ও পরিবারের অনেকের পরিচয়সহ তাঁর জীবনের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে। এই আলাপচারিতার সময় উপস্থিত ছিলেন খান জেবুন্নেসার একমাত্র ছেলে ও দুই মেয়ে অর্থাৎ খান সাহেবের নাতি, দুই নাতনি এবং দুই নাতনি জামাতা। তারাও খান সাহেবের জীবনকালের নানাবিধ তথ্য জানতে সহায়তা করেন।

খান সাহেবের পূর্ব পুরুষ ও পরিবার পরিজনের পরিচয় -

পিতামহ: সুবিদ আলী খান

পিতা : আবদুল আজিজ খান

মাতা : ছবিরুন্নেসা

শ্বশুর : পীর কামেল হাজী সায়েম উদ্দীন আহমেদ (ফুরফুরা শরীফ)

শাশুড়ী : মেহেরুন্নেসা

দুইচাচা: ১. আবদুল কাদের খান ২. রায় চাঁদ খান

বোন : ৫ জন, কোন ভাই নেই। তন্মধ্যে সাজেরুন্নেসা জীবিত আছেন।

স্ত্রী : খাদিজা। তিনি ব্লাড প্রেসারে ও প্যারালাইজডে আক্রান্ত হয়ে ১০ বছর শয্যাশায়ী থেকে ইন্তেকাল করেন।

মেয়ে : খান জেবুন্নেসা চৌধরী। তিনি খান সাহেবের একমাত্র কন্যা।

খান জেবুন্নেসার জবানীতে বাবা 'আব্বাস আলী খান

খান জেবুন্নেসা চৌধুরী[৫৮] বাবা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, দাম্পত্য জীবন খুবই সুন্দর ও সুখের ছিল। স্ত্রী প্যারালাইজডে আক্রান্ত হয়ে জয় পুর হাটে অবস্থান কালে খান সাহেব ঘন ঘন সেখানে যেতেন। দেখে গেছে তিনি স্ত্রীকে আগে সালাম দিয়ে কথা বলা শুরু করতেন। খান সাহেব ছোট বেলা একবার বরই গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ৭ দিন অসুস্থ ছিলেন। তখন চিকিৎসক কবিরাজ খান সাহেব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করে বলেন 'এই শিশু একদিন একজন বড় মানুষ হবে'। হানাইল মাদরাসায় খান সাহেব বাল্যকালে পড়াশোনা করেন। তিনি ৭ বার হজ্জ করেছেন। সাংগঠনিক কাজকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতেন। নিষ্ঠা, সততা, ঐকান্তিকতা ও সচেতনতা নিয়ে সকল কাজ সম্পন্ন করতেন। সংগঠনের সকল কিছু গাড়ি, ফোন, সম্পদ ইত্যাদিকে আমানত মনে করে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সদ্ব্যবহার করতেন। দেখা গেছে, কোন প্রোগ্রামে যাবার সময় সংগঠনের গাড়িতে নিজের পরিবার পরিজনদের কাউকে হয়তো নিয়ে গেলেন, কিন্তু তাদের নিকট থেকে তেল খরচ বাবদ টাকা নিয়ে নিতেন। সমাজ সেবার উদ্দ্যেশে তিনি

---

[৫৮]. খান জেবুন্নেসা চৌধুরী ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে জয়পুরহাট সদর থানার খঞ্জনপুর গ্রামে নানা বাড়িতে জন্মগ্রহন করেন। ১৯৫৩ মালের ২৩ জুন খঞ্জনপুরে আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর পুত্র আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সাথে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হন। আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও খান জেবুন্নেসা চৌধুরীর ঔরসে ১ ছেলে ৩ মেয়ে যথাক্রমে হাবিবুল হাসান চৌধুরী মাসুম, নাসিমা আফরোজা, লায়লা নাসরিন ও শামীমা পারভীন জন্মগ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

"সাদাকা ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করেন। যার বর্তমান নাম আব্বাস আলী খান ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন থেকে ছাত্রদেরকে বৃত্তি দেয়া হয়। সর্বসাধারনের জন্য এ ফাউন্ডেশনের একটি লাইব্রেরি আছে। খান সাহেব ব্যক্তিগত ভাবে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে অনেককে পড়াশোনার খরচ দিতেন।

সমস্যাগ্রস্তদেরকেও নিয়মিত সহযোগিতা করতেন। এমন ভাবে টাকা পয়সা দিতেন, দান করতেন কিংবা সহযোগিতা করতেন দেখে মনে হতো যেন মাসিক বেতন দেয়া হচ্ছে। দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন খান সাহেব। ১৯৭১ সালে ১ বছরেরও বেশি কিছু সময় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পূর্ব পযর্ন্ত জেলখানায় ছিলেন। জেলখানা থেকে বের হবার পর আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব মন্ডল খান সাহেবকে ঢাকা থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে স্বপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন খুবই আতিথিপরায়ণ। যেভাবেই হোক মেহমান, পরিজন-স্বজন এবং সহকর্মীদের আপ্যায়ন করতেন। তিনি নিজ হাতে আপ্যায়ন করাতে খুবই পছন্দ করতেন। সকলের সাথেই খুব সুন্দর করে কথা বলতেন মনে হতো যেন তিনি গল্প করছেন। সময়ের ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। রাতে তাড়াতাড়ি শুতেন এবং ভোর বেলায় তাড়াতাড়ি ওঠতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। সুযোগ পেলেই পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। খুব সুন্দর করে তেলাওয়াত করতেন এবং অনেক সময় বিছানায় শুয়ে শুয়েও তেলাওয়াত করতেন।

একমাত্র নাতি হাবিবুল হাসান চৌধুরী মাসুমের অনুভূতি

হাবিবুল হাসান চৌধুরী মাসুম[৫৯] খান সাহেবের নাতি। তিনি তার নানার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন- খান সাহেব কঠোর ভাবে নিজের রুটিন মেনে চলতেন। কোন জরুরি কাজ না থাকলে এশার পরেই বাসায় ফিরতেন। খাওয়া দাওয়া শেষে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যেতেন। কথা- বার্তায় রাশভারী, গুরুগম্ভীর হলেও ছোট বড় সকলের কথাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এছাড়া পারিবারিক সদসদেরকে নিয়ে এক সাথে নাশতা করতেন এবং নাশতার টেবিলে সবার সাথে কথাবার্তা বলতেন। এছাড়া পারিবারিক বৈঠক ডেকে সেখানে নিয়মিত ইসলাম এবং পারিবারিক বন্ধন নিয়ে কথা বলতেন। এক কথায় খান সাহেব ছিলেন অতুলনীয় একজন মানুষ।

বড় নাতনি নাসিমা আফরোজ এর অনুভূতিতে নানা আব্বাস আলী খান

নানা আব্বাস আলী খান এর অনুপ্রেরণায় নাসিমা আফরোজা সংগঠনের দাওয়াত গ্রহন করেন। সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে বর্তমানে তিনি রমনা থানার বায়তুল মাল সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৭৬ সালে আমেরিকা যান। দীর্ঘদিন অবস্থান শেষে আবার দেশ ফিরে আসেন এবং সহযোগী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হন। খান সাহেব একজন আপোষহীন নেতা ছিলেন। তার লেখনী প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁর দখল ছিল বিভিন্ন ভাষায়। তিনি বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফারসি ভাষায় সমান ভাবে পারদর্শী ছিলেন। তিনি হাফেজ ছিলেন না কিন্তু কুরআনের যে কোন জায়গা মুখস্ত বলতে ও বুঝতে পারতেন।

খান সাহেব যে নিষ্ঠা,সততা ও অনুভূতি নিয়ে কাজ করেছেন, সবাই যদি সেভাবে কাজ করতো তাহলে আন্দোলন আরো অনেক বেশি অগ্রসর হতো।

মেঝ নাতনি লায়লা নাসরিন এর অনুভূতিতে নানা 'আব্বাস আলী খান

স্বামীর কর্মসূত্রে লায়লা নাসরিন চট্রগ্রামে অবস্থান করতেন। সেসময় খান সাহেব ঢাকা থেকে টেলিফোনে প্রায়ই যোগাযোগ করতেন এবং প্রতিটি বিষয়ে খোঁজ খবর নিতেন। লায়লা নাসরিন বলেন নানা-নানু দুজনই মা-বাবার চেয়েও বেশি ভালবাসেন। আর নানাও নাতি-নাতনি সবাইকে সমানভাবে আদর করতেন। বিশেষ করে বাচ্ছাদের সাথে খান সাহেবের খুব ভাব ছিল। সর্বাবস্থায় সবর করার জন্য পরামর্শ দিতেন।

---

[৫৯]. হাবিবুল হাসান চৌধুরী মাসুম ১৯৫৫ সনে জন্মগ্রহন করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি ২ কন্যা ও ১পুত্র সন্তানের জনক। বর্তমানে তিনি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে কর্মরত আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খান সাহেব পোষাক-পরিচ্ছদে একজন স্মার্ট মানুষ ছিলেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন, Security problem ছাড়া নিয়মিত জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করতেন। ফজর শেষে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিতেন। আছরের নামাজ শেষে অফিসে যেতেন এবং এশার নামাজ শেষে বাসায় ফিরে আসতেন। খাওয়া দাওয়া শেষে দশটা/ সাড়ে দশটায় ঘুমিয়ে যেতেন।

খান সাহেব ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ। কিন্তু তাকে দেখে তা বুঝা যেত না,কারণ তিনি কখনই লোক দেখানো কিছু করতে না। সবসময় একটা কথা বলতেন এমন ভাবে জীবন যাপন কর যেন দুনিয়ার মত পরকালেও আমরা এক সাথে থাকতে পারি।

ইঞ্জিনিয়ার মু. সিরাজুল ইসলামের অনুভূতিতে আব্বাস আলী খান

ইঞ্জিনিয়ার মু. সিরাজুল ইসলাম[৬০] মরহুম আব্বাস আলী খানের ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি খান সাহেবের বড় নাতনির জামাতা। খান সাহেব সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, পারিবারিক জীবনে 'আব্বাস আলী খান পরিবারের সদস্যদের জন্য ছিলেন বটবৃক্ষের ন্যায় একজন অভিভাবক। একজন বন্ধু, একজন পিতা ও একজন আদর্শবান পথিকৃত। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেকের কাছে তাঁকে কঠিন বা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী মনে হতো কিন্তু তিনি ছিলেন শিশু হৃদয়ের অধিকারী একজন সাদাসিধে পুরুষ। তিনি কম কথা বলতেন। পরিবারের সবার সাথে খুব গভীর সম্পর্ক রাখতেন। নিয়মিত পারিবারিক বৈঠক করতেন। নিজ হাতে নিজের সব কাজ-কর্ম করতেন মৃত্যু অবধি। পরিবারের সকল কাজ কর্মও নিজে দেখাশোনা করতেন। এসকল কাজকর্মের পাশাপাশি আবার আল্লাহর ধ্যানেও মশগুল থাকতেন, জিকিরে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। সাংগঠনিক জীবনে তিনি একজন সফল সংগঠক। তাঁর সুউচ্ছ কণ্ঠের সুন্দর, সাবলীল ও দৃঢ় বক্তৃতা মুগ্ধ হয়ে শ্রোতারা শুনতো। প্রতিটি প্রোগ্রামে তিনি একেবারে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে যেতেন। সংগঠনের প্রতিটি আদেশ, নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই গোছালো একজন মানুষ। পরিমিত খাবার খেতেন। খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন, নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিজেই ইস্ত্রি করতেন। অনেক সময় নিজেই রান্না করে ফেলতেন। পরিবার-পরিজন এবং আন্দোলনের কর্মীদের পরকালে মুক্তির জন্য টেনশন করতেন। এককথায় তার জীবন ধারণ ছিল সাজানো-গোছানো ও পরিকল্পিত। তিনি ছিলেন উত্তম আচরণের অধিকারী। সময়ের সদ্ব্যবহারে তিনি ছিলেন উদাহরণ স্বরূপ। আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি বয়োবৃদ্ধ হয়েও একজন বলিষ্ঠ সৈনিক। এদেশের সকল আন্দোলনে রেখেছেন অসীম ভূমিকা। তিনি আন্দোলন ও আন্দোলনের কাজকে এক নম্বর Priority দিতেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে একদিন তিনি Arrest হয়েছিলেন। তিনি এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই জানতেন খান সাহেব Arrest হয়ে যাবেন। এরপরও খান সাহেবের মনে বিন্দু পরিমাণ কোন ধরনের দুশ্চিন্তা পরিলক্ষিত হয়নি। নিঃস্বার্থভাবে তিনি আন্দোলন করে গেছেন আমৃত্যু। পার্থিব কোন লোভ-লালসা তাকে কখনো প্রলুব্ধ করতে পারেনি। এজন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকারের মন্ত্রী হবার প্রস্তাব তিনি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সমাজসেবামূলক কাজে তিনি সময় পেলেই আত্মনিয়োগ করতেন। যেকোন সমস্যায় যেকোন সময়ে তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সমস্যা সমাধানে নিজের সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টার পাশাপশি অন্যদেরকে সংশিষ্ট করে উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতেন। খান সাহেবর লেখনী প্রতিভা তাকে প্রথিযশা একজন লেখক ও সাহিত্যিকে পরিণত করেছে। তার প্রচণ্ড স্বরণশক্তি লেখনী কাজে তাঁকে সহায়তা

---

৬০. ইঞ্জিনিয়ার মু. সিরাজুল ইসলাম খান সাহেবের বড় নাতনির সাথে ১৯৭৬ সালে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন থেকে খান সাহেবের ইন্তেকাল অবধি তিনি তার সাহচর্যে ছিলেন। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানায় তার পৈতিক নিবাস। পেশাগত জীবনে সিরাজুল ইসলাম একজন Bsc Mechanical Engeneer এছাড়া তিনি Dairy Science এ যুক্তরাষ্ট্রে MS করেন। দীর্ঘদিন Milk Vita তে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্যানটেক এজেন্সিজ এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তিনি যখনই সময় পেতেন লিখতে বসে যেতেন। অযথা সময় নষ্ট না করে সে সময়টা লেখার কাজে ব্যয় করতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে প্রচুর অধ্যয়নও করতেন। কোন নতুন বই পেলেই পড়ে ফেলতেন এবং সে বই থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী Note করে নিতেন। অনেক সময় দেখা যেত তিনি বই পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে যেতেন। আচার-আচরণ ও স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি সহকর্মীদের কাছেও ছিলেন পরিবারের সদস্যদের মত প্রিয়ভাজন। তাঁর সাক্ষাতে কোন সহকর্মী বা আন্দোলনের কর্মী আসলে তিনি পরম আতিথেয়তায় তাদের মুগ্ধ করতেন। আপ্যায়নের পরে তিনি বাকি কাজ শুরু করতেন। দ্বীন কায়েম এর অবিরত সাধনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরই দিকনির্দেশনায় ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম আমেরিকায় Muslim student Association প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং আমেরিকায় জুমা চালু রাখতে ও জুমার খুতবা পড়াতে উৎসাহী হয়েছিলেন। এভাবে তিনি বাংলাদেশের আনাচেকানাচে দ্বীন কায়েমের তাগিদ দিয়েছেন সকলকে।

কাজী মোরতুজা আলীর অনুভূতিতে খান সাহেব

কাজী মোরতুজা আলী[৬১] 'আব্বাস আলী খানের মেজো নাতনির জামাতা। তাঁর অনুভূতিতে 'আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন সাদাসিধে মানুষ। এক কথায় He was to very simple life. তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করতেন। সবাইকেই যে কোন বিষয়ে কিংবা যার যার প্রয়োজনীয় বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতেন। বটবৃক্ষের ন্যায় সবাই তাকে অনুসরণ করতো এবং মেনে চলতো। তিনি পরিবারের সদস্যদেকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করতেন। আমাকে তিনি প্রায়ই লেখালেখী করার তাগিদ দিতেন। বিশেষ করে মওদূদী রহ. এর বই অনুবাদের কথা বলতেন। প্রায়ই খান সাহেব পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতেন, তা হল- "এমন কাজ কর যেন ইহকালের ন্যায় পরকালেও আমরা সবাই একসাথে অবস্থান করতে পারি।"

সাংগঠনিক জীবনে তিনি ছিলেন কর্মীদের জন্য একজন পথিকৃত। তিনি লোকজনকে সংগঠনে অন্তর্ভূক্তি এবং সংগঠনের অধীনস্থদের মান উন্নয়নের জন্য সর্বদা তাগিদ দিতেন। সংগঠনের সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করতেন। তিনি ইংরেজী বা আরবি কিংবা উর্দুতে Diary Maintain করতেন এবং সে মোতাবেক কাজকর্ম সুন্দরভাবে শেষ করতেন। নানাবিধ কর্মসূচি বা কার্যক্রর্ম সম্পাদনে তিনি সার্বক্ষণিক টেবিলে থাকতেন, মনে হতো যেন-তার ঘরটিও অফিসের একটি অংশ। সংগঠনের কাজর্মের পাশাপাশি তিনি সমাজসেবামূলক কার্যক্রমেও নিজেকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। নিজ এলাকায় তিনি "শাহ ওয়ালী উল্লাহ পাঠাগার " স্থাপন করেন, যাতে এলাকার যে কোন শ্রেণী-পেশার লোকজন পাঠাগারে বসার সুযোগ পায় এবং পাঠ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর একটি সংস্থা হচ্ছে Talimul Islam Trust এ ছাড়া তিনি Family member দের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন Sadaquuah Foundtion । বর্তমানে তার পরিবার-পরিজন এ Foundation পরিবর্তন করে নাম দিয়েছেন Abbas Ali Khan Foundation" তিনি এ Foundation এর অধীনে সকল কার্যাবলিকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন যেন সেবা দেয়ার পাশাপাশি লোকজনকে দ্বীন কায়েমে সংশ্লিষ্ট করা যায়। খান সাহেবের ছিল অসাধারণ গুনাবলী। তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন ঠিক তেমনি সম্পর্ক রাখতেন সহকর্মী এবং আন্দোলন কর্মীদের সাথেও। তিনি

---

৬১. ১৯৮২ সালে খান সাহেবের মেজো নাতনির সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার পর থেকে তিনি তাঁর সাহচর্য লাভ করেন। রাজশাহী জেলায় কাজী মোরতুজা আলীর পৈতৃক নিবাস। ২ ছেলে ১ মেয়ের জনক কাজী মোরতুজা আলী একজন সাংবাদিক, ব্যাংকার ও বীমাবীদ। তিনি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর জেনারেল ম্যানেজার এর দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে Prime Islami Life Insurance Limited এর Managing Director হিসাবে কর্মরত আছেন।

Dhaka University Institutional Repository
সহকর্মীদের সাথে কখনো রাগ করতেন না। মাঝে মাঝে বকা-ঝকা করলেও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। কর্মচারীদের সাথে তিনি প্রভূ-ভৃত্যের কোন ব্যবধান না করে এক টেবিলে বসেই খাবার খেতেন এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুবই গোছালো-পরিপাটি ছিলেন। খুব বেশি নিয়ম মেনে চলতেন এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার করতেন। নিজ হাতে নিজের এবং পরিবারের কাজ করতেন। তাঁর লেখনী প্রতিভা ছিল সর্বজন প্রশংসিত। তিনি যখন কারমাইকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন তখনই তাঁর একটি English Article কলেজ বার্ষিকীতে ছাপা হয় এবং প্রশংসিত হন তিনি। আরবি, ইংরেজি, উর্দু এবং বাংলায় সমভাবে পারদর্শী থাকায় তিনি যে কোন বই পড়তে ও বুঝতে পারতেন এবং নিজেও লিখতেন। এভাবেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল কুর'আনুল কারীম

অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫।

আকরাম খাঁ মাওলানা : মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস।

আকরাম খাঁ মাওলানা : বাংলা সাহিত্যের কথা।

অধ্যাপক আব্দুল মা'বুদ : আসহাবে রাসুলের জীবন কথা,ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯সাল।

আবুল কাশেম : মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট

আবুল আসাদ : কালো পঁচিশের আগে ও পরে

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : পর্দা ও ইসলাম অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী,৭ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৩।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-৫ খণ্ড), সম্পাদনা- আব্বাস আলী খান ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৩।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০২।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : বিকালের আসর (১ম-২য় ভাগ), সম্পাদনা- আব্বাস আলী খান ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-৮৭।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : আদর্শ মানব,

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি, অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রিচার্স একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর '৮৪।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : ইসরা ও মিরাজের মর্মকথা অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, জয়পুরহাট : রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর '২০০৪।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা :

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা বিভাগ- জা. ই. বা.
প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৮ইং।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : ইসলামী অর্থনীতি
সহ অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা :
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রিচার্স একাডেমী
প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৪ই।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : পর্দার বিধান
অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা :
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,
প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯১।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার
অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা :
আধুনিক প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ,
চতুর্থ প্রকাশ,মে ১৯৯৭।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ : তাফহীমুল কুরআন ১ম খণ্ড-১৯তম খন্ড, ঢাকা :
অনুবাদ- আব্দুল মান্নান তালিব,
সম্পাদনা- আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী।

আবদুল মওদূদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর।

আবদুল মওদূদ : ওহাবী আন্দোলন।

আবদুল মওদূদ : সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী : শহীদ তিতুমীর।

আবু জাফর : স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

আব্বাস আলী খান : জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, ঢাকা :
বই কিতাব প্রকাশনী,
প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৬ ইং।

আব্বাস আলী খান : জামায়াতে ইসলামীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা :
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রিচার্স একাডেমী,
৩য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

আব্বাস আলী খান : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা :
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,
প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৪ সাল।

আব্বাস আলী খান : মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন একটি
ইতিহাস একটি আন্দোলন, ঢাকা :
প্রকাশনা বিভাগ, জা. ই. বা.,
প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭ ।

আব্বাস আলী খান : মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান, ঢাকা :

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দী প্রকাশনী,
প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৫।

আব্বাস আলী খান : মৃত্যু যবনিকার ওপারে, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, নবম প্রকাশ, আগষ্ট ২০০৫।

আব্বাস আলী খান : ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংক্ষিত মান, প্রকাশনা বিভাগ, জা. ই. বা., ঢাকা : প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৩।

আব্বাস আলী খান : ঈমানের দাবী, ঢাকা : বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৫।

আব্বাস আলী খান : ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

আব্বাস আলী খান : একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ : তার থেকে বাচার উপায়, ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, জা. ই. বা., প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৮।

আব্বাস আলী খান : ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৭।

আব্বাস আলী খান : সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক,ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রিচার্স একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯।

আব্বাস আলী খান : স্মৃতি সাগরের ঢেউ, ঢাকা : বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬।

আব্বাস আলী খান : বিদেশে পঞ্চাশ দিন, ঢাকা : শৌমী প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৭।

আব্বাস আলী খান : যুক্তরাজ্যে একুশ দিন।

আব্বাস আলী খান : বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী, ঢাকা : বই কিতাব প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ,

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট, ১৯৮৭।

আব্বাস আলী খান : ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী, ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, জা. ই. বা., প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৮ ।

আব্বাস আলী খান : দেশের বাইরে কিছুদিন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৫ ।

আব্বাস আলী খান : কুরআনের আলো

আব্বাস আলী খান : সুফী সাহেবের জীবনী

আব্বাস আলী খান : পাক কালিমা

আব্বাস আলী খান : তালিমে তরিকত

আব্বাস আলী খান : তরী হলো পার, ঢাকা : খেলাফত পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৫ ।

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস : সাইয়েদ কুতুব : জীবন ও কর্ম

আমীন আহসান ইসলাহী মাওলানা : দাওয়াতে দ্বীন ও তাঁর কর্মপন্থা, অনুবাদ-মুহাম্মদ মুসা, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৫ ।

আবু মনযুর শায়খ আহমদ মাওলানা : তাসাউফ ও মাওলানা মওদুদী, অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিচার্স একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৭।

আব্দুল মান্নান মোহাম্মাদ : আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, ঢাকা : দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

ইউসুফ ইসলাহী মাওলানা : আসান ফেকাহ, অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৮৩।

আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা : ১৯৭৫

আব্দুলহক : ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব, ঢাকা : ১৯৭৬।

ইউসুফ ইসলাহী মাওলানা : আল কুরআনের শিক্ষা-১।

ইউসুফ ইসলাহী মাওলানা : আল কুরআনের শিক্ষা-২।

ইবনে তাইমিয়া ইমাম : ইবাদাতের মর্মকথা।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী : সহীহ বুখারী।

ইমাম মুসলিম : সহীহ মুসলিম।

ইবনে কাসীর, হাফিজ : তাফসীরে ইবনে কাসীর।

ইমাম তিরমিযী : জামি' আত্ তিরমিযী।

এমাজউদ্দীন আহমদ ডঃ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৬৪।

এম.এ.রহিম ডঃ : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস।

এস .এম. আনসার আলী ডা. : বাড়ির কাছে আরশী নগর ঃ জয়পুরহাট জেলার হিন্দু মুসলীম স্মৃতি, প্রথম প্রকাশ,সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সাল।

এস .এম. আনসার আলী ডা. : জয়পুর হাটের সাহিত্য-শিল্প।

এ. বি.এম খালেক মজুমদার : শিকল পরা দিনগুলো।

এ. এফ. এম. আমীনুল হক : মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান, ইফাবা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২।

এম. এ. ভূঁঞা মেজর(অব.) : মুক্তিযুদ্ধে নয়মাস।

ওয়াকিল আহমদ : বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ সাল।

কুতুব, সাইয়েদ, শহীদ : ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা, ঢাকা : অনবাদ-আব্দুল খালেক, ইফসু, ১৯৮১ সাল।

খুররম মুরাদ : ইসলামী নেতৃত্বের গুনাবলি, অনুবাদ-আব্দুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, আগস্ট ২০০০।

গোলাম আযম অধ্যপক : জীবনে যা দেখলাম, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০২।

গোলাম রসুল মেহের : সাইয়েদ আহমদ শহীদ।

জুলফিকার আহমদ কিসমতী : দার্শনিক শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (র.) ও তাঁর চিন্তাধারা, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, মে ১৯৯৪।

নাজমুস সায়াদাত : আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম, ঢাকা : প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৬।

মাজহারুল ইসলাম অধ্যাপক : স্মৃতির পাতায় জননেতা মরহুম

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাস আলী খান ।

মওদুদ আহমদ : বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসন কাল, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লি ঃ, ১৯৮৩।

মফিজ চৌধুরী ড. : বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় ।

মাসুদুল হক : বাঙালী হত্যা ও পাকিস্তানের ভাঙ্গন।

মোহর আলী ড. : সিরাজউদ্দৌলার পতন।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ : আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ।

মিজানুর রহমান চৌধুরী : রাজনীতির তিনকাল ।

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ড. : ইমাম তাহাভীর জীবন ও কর্ম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৮৮।

মুহাম্মদ আজরফ দেওয়ান : ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ ১৯৯৫।

মো. মোজাম্মেল হক : বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা : হাসান বুক হাউস,প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯১।

সদরুদ্দীন ইসলাহী মাওলানা : ইসলামের পূর্নাঙ্গ রূপ, অনুবাদ-আব্বাস আলী খান, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি

Abbas Ali Khan	:	Muslim Ummah, Dhaka : Sayyed Abul Ala Moudoodi Research Academy, First Editio October 1984.
A. K. Azad Maulana	:	India wins Freedom.
A.R. Mallick	:	British Policy and the Muslims in Bengal.
Abdul Hannan Shah	:	A Major Figure in Islamic Movement.
Muin-Ud-Din Ahmad Khan	:	History Of the fara'idi Moveme Dhaka, 1984.
Munshi Abdul Halim	:	(MS) Haji Shariatullah (Bengali ASB Collection, Dhaka.
Mustafa Nurul Islam	:	Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengali Press 1901-1930.
Durr-I- Muhammad	:	Faraizi Puthi in Bengali, ASB Collection, Dhaka.
Govt. of India, Speeches by Lord Hardinge of Penhurst	:	Vol. 1. pp-203-20,Calcutta, 191
Justice Syed Shameem Husain Kadir	:	Creation of Pakistan, P.192.
Choudhury Rahmat Ali	:	P.172.
I.H.Qurishi	:	The Struggle for pakistan.
Rafiqul Islam Major(Rett)	:	A Tale of Millions.
W.W. Hunter	:	The Indian Mussalmans.
Pandit Jawaheralal Nehru	:	The Discovery of India.
Richard Symonds	:	The Making of Pakistan.
Waheed Quraishy	:	Ideological Foundations of Pakistan.
M. Fazlur Rahman	:	The Bengali Muslims & Englisl Education.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১ম খণ্ড- ২৫শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ

বাংলাপিডিয়া : ১ম খণ্ড-১০ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা : প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৪০৯/ মার্চ ২০০৩।

পত্রিকা ও সাময়িকী

আব্দুশ শহীদ নাসিম সম্পাদিত : মৃত্যুহীন প্রান, আব্বাস আলীখান স্মারক গ্রন্থ, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রিচার্স একাডেমী, প্রকাশকাল, ১৯৯৯।

আবুল আসাদ সম্পাদিত : দৈনিক সংগ্রাম : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭১।

আবুল আসাদ সম্পাদিত : দৈনিক সংগ্রাম : ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

প্রফেসর ড. এ. বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী সম্পাদিত : ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, যুক্ত সংখ্যা : জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬, প্রকাশ কাল : ২০০৭।

Professor Dr. A.B.M Habibur Rahman Chowdhury (Editor-incheif) : ISLAMIC STUDIES JOURNAL OF DR. SERAJUL HOQUE ISLAMIC RESEARCH CENTRE, DR. SERAJUL HOQUE CENTRE FOR ISLAMIC RESEARCH YUNIVERSITY OF DHAKA. Published in 2007.

Editor-incheif : Economis, 17 May 1947. Sunday Times, 01June 1947.

Editor-incheif : Manchestar Gurdian, 15 August 1947.

Dhaka University Institutional Repository

হস্তলিপির স্মারক

আত্মীয় স্বজন ও বংশধরদের উদ্দেশ্যে খান সাহেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত

ABBAS ALI KHAN
Senior Naibe-Ameer
Jamaati Islami Bangladesh

505 Elephant Road
Bara Moghbazar
Dhaka, Bangladesh
Phone : 401581, 417670, 401239 (O)
: 835440 (R)

Date 23. 3. 97
১৩ই জিলকদ, ১৪১৭ হিজরী

অসিয়ত

আমার ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের জন্য নিম্নলিখিত অসিয়ত করছি:

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

Abbas Ali Khan dead

by Staff Reporter

Abbas Ali Khan, Senior Nayeb-e-Ameer of the Jamaat-e-Islami, died at a city hospital yesterday. He was 85.

Abbas Ali Khan was suffering from liver cirrhosis. He was admitted to the Ibne Sina Hospital on September 29 and breathed his last at 1 : 15 pm yesterday.

The Namaj-e-Janaza (funeral prayer) of Abbas Ali Khan will be held at the Paltan Maidan in the city at 2 pm today. Then the body will be taken to Joypurhat and buried at the family graveyard there.

Born in Joypurhat town in the then Bogra district in 1914, Khan obtained his BA degree from the Calcutta University with distinction in 1935. He was elected Member of the National Assembly of Pakistan in 1962. He was also provincial Education Minister of the erstwhile East Pakistan.

Abbas Ali Khan was the acting Ameer of the party from 1979 to 1992. Again, he served as the acting chief of the Jamaat for 16 months when Jamaat Ameer Prof Ghulam Azam was arrested. Abbas Ali Khan contributed much as an opposition leader during the anti-autocratic movement from 1983 to 1990.

A writer and translator of nine books, including one on the history of the Muslims in Bangladesh, Khan left behind his only daughter and four grand children and a host of relatives and admirers to mourn his death.

Death condoled

BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia expressed her profound shock at the death of Abbas Ali Khan.

In a condolence message yesterday, she recalled the contribution of Khan in the movement to establish democracy in the country. Begum Zia prayed for the departed soul and conveyed sympathy for members of the bereaved family.

Abbas Ali Khan passes away

Moulana Abbas Ali Khan, senior Nayeb-e-Ameer of Jamaat-e-Islami, died of liver cirrhosis in Dhaka on Sunday at the age of 86, reports UNB.

He was suffering from liver ailments and admitted to Ibne Sina Hospital in the city in pre-coma state on September 29. He

Contd on page 12 col 1

Khaleda shocked

BNP-Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia on Sunday expressed her deep shock at the death of Jamaat leader Abbas Ali Khan, reports BSS.

In a statement, Begum Zia recalled the contribution of Abbas Ali Khan to the establishment of democracy in the country. She expressed her deep sym-

Contd on page 12 col 1

Abbas Ali Khan

Contd from page 1

breathed his last at 1:15 PM on Sunday.

Born in Joypurhat town, the Moulana was provincial Education Minister of then East Pakistan and Member of the National Assembly of Pakistan in 1962.

He had played an important role for his party as its acting Ameer for a long time when Jamaat Chief Prof Ghulam Azam had been in Pakistan after liberation of Bangladesh.

Moulana Abbas Ali Khan, who wrote several books, including one on the History of Bangladesn, is survived by his only daughter, relations and wellwishers.

Khaleda shocked

Contd from page 1

pathy to the members of the bereaved family and prayed for eternal peace of the departed soul.

Abbas Ali Khan dead

Staff Correspondent

Abbas Ali Khan, Senior Naeb-e-Ameer of Jamaat-e-Islami, Bangladesh died at Ibne Sinha Clinic at 1.15 p.m. on Sunday. He was 85. He was suffering from liver cirrhosis.

Abbas Ali Khan is survived by his only daughter, four grand children and a host of relatives, admirers and well-wishers to mourn his death.

His Namaj e Janaza will be held today (Monday) at Paltan Maidan at 2 p.m. The body of Khan will be taken to his village home at Jaipurhat where he will be buried at the family graveyard after another Namaj-e-Janaza there.

Born in a respectable Muslim family in Jaipurhat in 1914, Khan passed matric examination from Hoogly New Schem Madrasha in 1930. He took Bachelor of Arts (B.A.) degree with distinction

(See Page 16 Col. 8)

Golam Azam to lead janaza of Abbas Ali

Staff Correspondent

Ameer of Jamaat-e-Islami, Bangladesh Professor Golam Azam left the holy Mecca for Dhaka on hearing the death news of the party Senior Naeb-e-Ameer Abbas Ali Khan.

Prof Golam Azam is expected to arrive in Dhaka today (Monday) at 10 a.m. The Jamaat Ameer prof Azam will lead the namaj-e-janaza prayer of Abbas Ali Khan at Paltan Maidan at 2 p.m. as last desire of the Senior Naeb-e-Ameer of the party.

Jatiya Party Chairman Hussain Mohammad Ershad in a statement on Sunday, deeply condoled the death of Jamaat Senior Naeb-e-Ameer Abbas Ali Khan.

Hussain Mohammad Ershad expressed his sympathy to the members of the bereaved family and prayed for the salvation of the departed soul.

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

জানাযাপূর্ব সমাবেশে অধ্যাপক গোলাম আযম

আব্বাস আলী খান ছিলেন 'সোর্স অব ইন্সপিরেশন'

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে গতকাল সোমবার দুপুরে মরহুম আব্বাস আলী খানের নামাযে জানাযার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, খান সাহেব ছিলেন আমাদের জন্য 'সোর্স অব ইন্সপিরেশন'। এত বয়সেও যে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করা যায় সেটা প্রমাণ করে গেছেন আব্বাস আলী খান।

তিনি বলেন, খান সাহেব ছিলেন একজন মর্দে মুমিন। এ সময় সমবেত জনতা সমস্বরে বলে ওঠেন আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে আব্বাস আলী খান তাঁর নিজের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমি তাঁর জানাযায় ইমামতি করছি আর নিজামী সাহেব লাশ কবরে নামাচ্ছেন। তার এই স্বপ্নই অন্তিম ইচ্ছা হিসেবে প্রকাশ করে গেছেন তিনি। এই অন্তিম ইচ্ছার কথা আমি জানতাম না। গতকাল ইন্তেকালের পরই জানলাম। তখন সবেমাত্র মক্কায় পৌঁছেছি। কিভাবে এই জানাযায় আসবো- এটা ছিল আমার কাছে এক বিরাট পাহাড়সম প্রতিবন্ধক। তখনও নিশ্চিত হতে পারিনি এই জানাযায় শরীক হতে পারবো কিনা। হয়তো মরহুম খান সাহেবের ইচ্ছা পূরণের জন্য এভাবে

(১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন)

আসতে পেরেছি। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে নিজামী সাহেবই লাশ কবরে নামাবেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তাঁর সমস্ত ভাল কাজগুলো যেন কবুল হয়।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, আব্বাস আলী খান ছিলেন আমাদের পিতৃতুল্য নেতা। তার সমসাময়িক এবং আমরা যারা বয়সে তার চেয়ে ছোট সবাইকেই তিনি ভালবাসতেন। তিনি আমাদের যেমন ভালবাসতেন আল্লাহ যেন সেভাবেই তাঁকে ভালবেসে তাঁর কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের একজন মানুষ।

অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল কালেমা শাহাদাত ॥ মাইকে পবিত্র কালামে পাক ॥
ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বেদনা বিধুর শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ

আব্বাস আলী খানের জানাযায় লাখো মানুষের ঢল

শহিদুল ইসলাম ঃ প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার, সুসাহিত্যিক জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের নামাজে জানাযা গতকাল সোমবার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে বিশাল পল্টন ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। শোকার্ত জনতার অযুত কণ্ঠে কালেমা শাহাদাতের ধ্বনি পল্টনের আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পল্টন ময়দানে ইতিপূর্বে এতোবড় জানাযার নামাজ আর কখনো হয়নি বলে অভিজ্ঞ মহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন। আজ মঙ্গলবার জয়পুরহাটে মরহুমের দ্বিতীয় জানাযা শেষে তার দাফন সম্পন্ন হবে পারিবারিক গোরস্থানে। বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানতাপস জামায়াত নেতার মৃত্যু সংবাদ রোববারই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রাজধানী ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকা এমনকি দূরের জেলা থেকেও অনেক জামায়াত নেতা-কর্মী এবং মরহুমের ভক্ত অনুরক্তরা ছুটে আসে। জানাযার জামাত বেলা ২টায় শুরু হওয়ার কথা পূর্বেই ঘোষণা করা হয়। বেলা ১টা থেকে পল্টন ময়দানে লোক আসা শুরু হয়। আস্তে আস্তে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। চারিদিক থেকে হাজারো মানুষের স্রোত নামে পল্টন অভিমুখে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, পল্টন মসজিদ, ডিআইটি মসজিদসহ আশপাশের মসজিদ থেকে জোহরের নামাজ শেষে মানুষের আগমন শুরু হয় পিপীলিকার সারির মতো। বেলা ২টা বাজার আগেই কানায় কানায় ভরে যায় পল্টন ময়দান। যে যার মতো কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় যেখানে জায়গা মেলে সেখানেই। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম পল্টন ময়দানে উপস্থিত হন বেলা পৌনে ২টায়। ঠিক তার ৩ মিনিট পরেই মরহুম আব্বাস আলী

(১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন)

আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে দেশের বিশিষ্ট আলেমবৃন্দের শোক জ্ঞাপন

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে দেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, মাওলানা আবদুস সুবহান, মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা খলিলুল্লাহ আতাহারী, মাওলানা ইলিয়াস, মাওলানা কামাল উদ্দিন খান, মাওলানা আবদুল কাদের, মাওলানা সরদার আবদুস সালাম, সাবেক এমপি মাওলানা মুফতি আবদুস সাত্তার, মাওলানা কফুল জাতীয় সংসদের কুমিল্লা-৯ আসন থেকে

(২য় পৃঃ ৩-এর কলামে দেখুন)

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পত্রিকায় আব্বাস আলী খানের মৃত্যু সংবাদ, শোকবার্তা ইত্যাদি

মরহুম আব্বাস আলী খানের মত নির্লোভ ও গুণী মানুষ সমাজে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর

—অধ্যাপক গোলাম আযম

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, বরেণ্য রাজনীতিবিদ মরহুম আব্বাস আলী খান স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ একটি আধুনিক, প্রগতিশীল ও কল্যাণধর্মী ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হোক। এজন্য তিনি আমৃত্যু খালেছভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর মত অসাধারণ, বিরল ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইসলামী চিন্তাবিদ, ত্যাগী, নির্লোভ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিকের মৃত্যুতে জাতীয় জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, আত্মত্যাগী, আল্লাহর খালেছ বান্দা হিসেবে মরহুম আব্বাস আলী খানের মত এমন নির্লোভ ও গুণী মানুষ আমাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

জামায়াতে ইসলামীর প্রাক্তন সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম আব্বাস আলী খান স্মরণে গতকাল (শনিবার) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আযম এ কথা বলেন। ঢাকা মহানগরী জামায়াত আয়োজিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের নায়েবে আমীর শামসুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মতিন চৌধুরী, মুসলিম লীগের মহাসচিব আলহাজ্ব জমির আলী, এনডিএ সভাপতি নূরুল হক মজুমদার, জামায়াতের প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক নজির আহমদ, এডভোকেট শেখ আনসার আলী, আব্দুস শহীদ নাসিম, মাওলানা এটিএম মাসুম, শিবির সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ, সাবেক শিবির সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ। জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা এ কে এম ইউসুফ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। সভায় মরহুম আব্বাস আলী খানের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মহানগরী জামায়াতের আমীর এটিএম আজহারুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ২৫... ১০.১০.৯৯

আব্বাস আলী খান স্মরণে আলোচনা সভা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খানের মত বহুমুখী প্রতিভা ও গুণের অধিকারী ইসলামী চিন্তাবিদ ত্যাগী-নির্লোভ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিকের মৃত্যুতে জাতীয় জীবনের যে শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে তা সহজে পূরণ হইবার নয়। জামায়াত নেতা বলেন, আব্বাস আলী খান দীর্ঘ ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে যেভাবে আল্লাহর রাহে নিবেদন করিয়াছিলেন এজন্য তিনি প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবেন। গতকাল শনিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম আব্বাস আলী খানের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়ার মাহফিলে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই দোয়ার মাহফিলে আরো বক্তব্য রাখেন অন্যতম নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আব্দুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক নাজির আহমদ, এ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী, মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম, মাওলানা আবু তাহের মোঃ মাছুম, শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ, রফিকুল ইসলাম খান, বিএনপি নেতা আব্দুল মতিন, মুসলিম লীগ নেতা জমির আলী, এনডিএ নেতা নূরুল হক মজুমদার প্রমুখ। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

THE BANGLADESH OBSERVER
DHAKA TUESDAY OCTOBER 5 1999

Abbas Ali Khan will be buried at Joypurhat today

Jamaat-e-Islami Bangladesh Naeeb-e-Amir Abbas Ali Khan (86) will be buried today (Tuesday) at his family graveyard at Joypurhat after Namaz-e-Janaza there, reports BSS.

The octogenarian politician died on Sunday at the Ibnesina Hospital in Dhaka. He was suffering from old-age ailments.

Earlier on Monday his first Namaz-e-Janaza was held at the Paltan Maidan led by Amir of Jamaat Prof. Golam Azam. It was attended by former President Hussein Muhammad Ershad, BNP leaders Messrs. Shamsul Islam, Abdul Matin Chowdhury, Islami Oikya Jote leaders, other political leaders, diplomats and a huge number of people. Later his coffin was taken to Joypurhat escorted by his party Secretary General Moulana Matiur Rahman Nizami and other leaders

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা এরশাদ শায়খুল হাদীসসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের শোক

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে সারাদেশে শোকের ছায়া

ষ্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে সারাদেশে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গতকাল রোববার তাঁর ইন্তেকালের খবর জানার পর সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে দোয়ার, মাহফিল ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন।

খালেদা জিয়া

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল এক শোক বার্তায় আব্বাস আলী

(১ম পাতার [illegible])

মরহুমের অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানান।

পৃথক পৃথক শোক বার্তায় জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, যুগ্ম মহাসচিব মির্জা আব্বাস, ঢাকা মহানগরী বিএনপির আহবায়ক সাদেক হোসেন খোকা এমপি, আব্দুল আলীম এমপি আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

এরশাদ

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গতকাল এক বিবৃতিতে আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিবৃতিতে তিনি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, আব্বাস আলী খান একজন আদর্শবাদী রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ন্যায় নিষ্ঠ জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁর মতো আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদের মৃত্যুতে দেশের ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গতকাল রোববার সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গমন করে মরহুম আব্বাস আলী খানের মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। তিনি জামায়াত কার্যালয়ে উপস্থিত জামায়াতে ইসলামীর শোকাহত নেতা-কর্মীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মাওলানা সাঈদী

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী গতকাল এক বার্তায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

প্রদত্ত শোক বাণীতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, প্রবীণ জননেতা আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে করেছেন আল্লাহ যেন তা কবুল করেন সেই দোয়াই করি এবং আল্লাহপাক যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস এর মেহমান বানিয়ে নেন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের যে ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও মহান নেতাকে হারালো। আমি তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আল্লাহপাক যেন সকলকে এই শোক কাটিয়ে উঠার তওফীক দেন এবং পরকালীন জিন্দেগীতে তাঁকে উত্তম জাযা দান করেন। আমীন।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস

সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস গতকাল এক শোক বার্তায় আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোক বার্তায় তিনি বলেন, আব্বাস আলী খান তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন।

জাপা (মিজান)

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক শোকবার্তায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন।

নেতৃদ্বয় তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

শায়খুল হাদীস

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, জনাব খানের মৃত্যুতে জাতি একজন প্রবীণ রাজনীতিককে হারালো। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি দেশ ও জাতির জন্য যে সেবা করেছেন তার বিনিময় নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট পাবেন।

শায়খুল হাদীস তার রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি মরহুমের সন্তান আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন।

ইসলামী ফোরাম ইউরোপ

ইসলামী ফোরাম ইউরোপের সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন ফারাজী এবং সেক্রেটারী জেনারেল হাবিবুর রহমান লন্ডন থেকে প্রেরিত এক যুক্ত বিবৃতিতে জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ইসলাম ও সেক্রেটারী মাওলানা আবু তাহের মোঃ মাছুম এক শোক বাণী প্রদান করেছেন।

শোক বাণীতে নেতৃদ্বয় বলেন, আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন প্রজ্ঞা ও মেধাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে হারালো যা সহজেই পূরণ হবার নয়। মরহুম আমৃত্যু এদেশে ইকামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার আদায়ে যেভাবে বিরামহীন কোরবানী ও ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে মেধা ও শ্রম দিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তার যাবতীয় নেক আমল ও দ্বীনী খেদমতকে কবুল করে আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

নেতৃদ্বয় বলেন, আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে তাঁর পরিবারের যে অপূরণীয় ক্ষতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে আল্লাহ যেন পরিবারের সকল সদস্যদের ধৈর্য ও মনোবল দান করেন।

জামায়াত মহিলা বিভাগ

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে সংগঠনের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী জাহানারা আজহারী এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

তিনি আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে ইসলামী আন্দোলনে মরহুমের অসাধারণ অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন যে, আল্লাহ যেন মরহুমের নেক আমলসমূহ কবুল করে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন।

মতিন চৌধুরী

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী এক শোক বার্তায় আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোক বার্তায় তিনি বলেন, আব্বাস আলী খান এই দেশে ইসলামী আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সৈনিককে হারালো।

জাগপা

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান শোক বার্তায় বলেছেন, আব্বাসে আলী খানের মৃত্যুতে বাংলাদেশই শুধু নয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একজন মহান নেতা ও মনীষাকে হারালো। দেশের এই নিদানকালে সমগ্র জাতি যখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তখন এমন একজন প্রজ্ঞাবান, অভিজ্ঞ ও সৎ রাজনীতিকের অভাব পূরণ হবার নয়।

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগের সভাপতি এনডিএর চেয়ারম্যান এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার ও মহাসচিব অধ্যাপক আঃ মোত্তালিব আখন্দ এক শোক বাণীতে দেশের অন্যতম রাজনীতিবিদ আব্বাস আলী

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দোয়ার মাহফিল ও শোক প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর বর্ষীয়ান রাজনীতিক মাওলানা আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে বিভিন্ন দেশে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মাওলানার রুহের মাগফিরাত করে পবিত্র হারামাইন শরীফে বিশেষ দোয়ার মাহফিলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

মক্কা শরীফে মোনাজাত

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে সৌদি আরবের প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় সময় সকাল পৌনে এগারটায় দেশ থেকে এই মৃত্যু সংবাদ মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র মক্কা আল-মোকাররমায় এসে পৌছায় এবং সাথে সাথে তা সৌদি আরবের সমস্ত জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের এই বর্ষীয়ান নেতার সুচিন্তিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইসলামী সাহিত্য ভান্ডার থেকে হেদায়াত লাভকারী বাংলাদেশীগণ এই অপূরণীয় ক্ষতির সংবাদে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এই সময় সৌদি সরকারের বিশেষ মেহমান হিসেবে সৌদি আরবের বড় বড় শহরগুলোতে কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের কন্টকাকীর্ণ পথে দীর্ঘদিন এক সাথে পথচলাকারী ডানহাত সমতুল্য এই বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে অধ্যাপক গোলাম আযম অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন। সম্মানিত আমীর তার গুরুত্বপূর্ণ সফর কর্মসূচী বাতিল করে দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

হারামাইন শরিফাইন এর প্রেসিডেন্সির প্রধান এবং মসজিদুল হারামের সম্মানিত প্রধান ইমাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন সুবাইলকে সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের মৃত্যু সংবাদ জানান হয়। শ্রদ্ধেয় ইমাম জনাব খানের রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

মক্কা শরীফে অবস্থানরত বাংলাদেশীগণ মাগরিবের সময় থেকেই মসজিদুল হারামে জমায়েত হতে থাকেন। তওয়াফ, নামায, কুরআন তিলাওয়াত, তাছবিহ পাঠের মাধ্যমে সবাই এশা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। সালাতুল এশার পরে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাত পরিচালিত হয়। জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য আবু নাছের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠতম স্থান হারামাইন শরীফে খান সাহেবের রুহের মাগফিরাতের জন্য জান্নাতে সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদা লাভের জন্য তার জীবনের সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমার জন্য জীবনব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের জন্য ত্যাগ-কুরবানীর যে নমুনা পেশ করেছেন তা কবুল করার জন্য অন্তরের সমস্ত আকুতি ঢেলে ফরিয়াদ জানানো হয়। জনতার কান্নাকাটিতে মসজিদুল হারামে উপস্থিত অন্যান্য দেশের মুসল্লীদের মাঝেও ভাবাবেগ জেগে ওঠে এবং তারাও নিঃশব্দে এই মোনাজাতে শরীক হয়ে ব্যথিত হৃদয়ের

বিভিন্ন মসজিদে এবং ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানীসহ ইউরোপের বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। শত শত মুসল্লি উক্ত দোয়ায় শরিক হন। মরহুমের স্মরণে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের কমিউনিটি সেকশন আগামীকাল অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ইসলামিক ফোরাম ইতালী

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ ইতালী শাখার সভাপতি জাকিরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম গভীর শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে জাতি একজন সুদক্ষ রাজনীতিক, চিন্তাবিদ ও সু-সাহিত্যিক হারালো। ইসলামী আন্দোলন হারালো একজন বড় নেতা ও সংগঠককে।

তিনি জামায়াতে ইসলামীর মত একটি বড় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন দলের সংকট ও ক্রান্তিকালে। এ মৃত্যুতে জাতি ও ইসলামী আন্দোলনের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তা সহজেই পূরণ হবার নয়।

সংযুক্ত আরব আমীরাত বাংলাদেশ সমিতি

সংযুক্ত আরব আমীরাতের বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রফিক শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান আজাদ গত সোমবার এক বিবৃতিতে আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তাঁরা মরহুমের বহুমাত্রিক প্রতিভা ও কর্মময় জীবনের উল্লেখ করে মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ইসলামিক কালচারাল সেন্টার ইউএই'র

গত সোমবার জননেতা আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে মুদ্দাসসির আলীর পরিচালনায় ইসলামিক কালচারাল সেন্টার হলে এক শোক সভা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন ইসলামিক কালচারাল সেন্টার ইউ,এ,ই-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আব্দুর রহীম কাজী (ভারত) বাংলা সার্কেল এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবু আহমদ (বাংলাদেশ) উর্দু সার্কেলের সভাপতি প্রকৌশলী মিসবাহ সিদ্দিকী (পাকিস্তান) বাংলাদেশ সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রফিক শিকদার, সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান আজাদ ও মাওলানা শাহ আলম প্রমুখ।

শারজায় দোয়ার মাহফিল

গত ৩রা অক্টোবর বর্ষীয়ান জননেতা আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালের খবরে গোটা আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমীরাতের শারজায় বাংলাদেশীরা ঐ দিনই রাত-১০টায় স্থানীয় ইসলামিক সেন্টারে কুরআন খানি ও দোয়ার মাহফিলে শরীক হয়। বিপুল সংখ্যক শোকাহত জনতার উপস্থিতিতে মাহফিল পরিচালনা করেন এডভোকেট মহিউদ্দিন চৌধুরী।

মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন আবদুর উদ্দিন চৌধুরী, রুহের মাগফিরাত

মুসলিম লীগ (আশরাফ)

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন এক শোক বাণীতে জননেতা আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, এদেশের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে জনাব খানের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কৃষক শ্রমিক পার্টি

কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এডভোকেট এম এ লতীফ মজুমদার এক বিবৃতিতে আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক জ্ঞাপন করে বলেছেন, জাতি একজন আদর্শবান রাজনীতিবিদকে হারাল।

ইঃ শাসনতন্ত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাই, আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি একজন রাজনীতিকই ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন ইসলাম দরদী মানুষ। তাঁর ইন্তেকালে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

পৃথক অপর এক বিবৃতিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা নুরুল হুদা ফয়েজী এবং যুগ্ম মহাসচিবদ্বয় মাওলানা আঃ লতিফ চৌধুরী ও অধ্যাপক এ টি এম হেমায়েত উদ্দিন আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

ইসলামিক পার্টি

বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল এনডিএ'র মহাসচিব এডভোকেট আবদুল মোবিন, যুগ্ম-সম্পাদক মোঃ শাহজাহান চৌধুরী ও এমএ রশিদ প্রধান এক যুক্ত বিবৃতিতে আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ, শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলনের একজন পরীক্ষিত ব্যক্তিত্ব।

চাষী কল্যাণ সমিতি

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক আবুল মোকারেম মুহাম্মদ মোসলেম আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। শোকবাণীতে নেতৃদ্বয় বলেন, তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাসের উপর অনেক বই লিখে জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়ার অকৃত্রিম প্রচেষ্টা করেছেন।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান এবং ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার ও ঢাকা মহানগরীর সভাপতি মোঃ আনিসুর রহমান চৌধুরী আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন মরহুম আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে জাতি তার এক অমূল্য সম্পদকে হারালো। তারা বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান তার গোটা জিন্দেগী ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে উৎসর্গ করে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Abbas Ali Khan dead

Maulana Abbas Ali Khan, senior Nayeb-e-Ameer of Jamaat-e-Islami Bangladesh, died of liver cirrhosis in the city yesterday. He was 85, reports UNB.

He was admitted to Ibne Sina Hospital in the city in pre-coma state on September 29. He breathed his last at 1:15 pm yesterday.

Namaj-e-janaza for Maulana Abbas will be held at Paltan Maidan at 2 pm today. He will be buried at his family graveyard in Joypurhat.

Born in Joypurhat town in 1914, he was provincial Education Minister of then East Pakistan and Member of the National Assembly of Pakistan in 1962.

He was also secretary to the Prime Minister of undivided Bengal, Shere-e-Bangla AK Fazlul Haq, a party press release said.

Former President Abdur Rahman Biswas expressed his deep shock at the death of Maulana Abbas Ali Khan.

In a condolence message, Biswas recalled the long political career of Abbas and his devotion to establish Islamic society.

He prayed for eternal peace of the departed soul and expressed sympathy to the members of the bereaved family.

BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Khaleda Zia also condoled the death of Maulana Abbas.

In a condolence message she prayed for the salvation of the departed soul. She also recalled his contribution in establishing democracy in the country and expressed sympathy to the bereaved family members

Khaleda shocked

BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia on Sunday expressed her deep shock at the death of Jamaat leader Abbas Ali Khan, reports BSS.

In a statement on Sunday, Begum Zia recalled the contribution of Abbas Ali Khan to the establishment of democracy in the country.

She expressed her deep sympathy to the members of the bereaved family and prayed for eternal peace of the departed soul.

In separate statements, Deputy Leader of the Opposition Prof. A.Q.M. Badruddoza Chowdhury, BNP Secretary General Abdul Mannan Bhuiyan, Joint Secretary General Mirza Abbas and City BNP Convenor Sadek Hossain Khoka also condoled the death of the Jamaat leader.

Meanwhile City Jamaat-e-Islami Ameer has expressed condolences at the death of Jamaat senior Nayeb-e-Ameer Moulana Abbas Ali Khan.

In a condolence message, City Jamaat Ameer ATM Azharul Islam and Secretary Moulana Abu Taher M Masum recalled the contribution of the late leader in establishing democracy in the country and paid deep respect to his memory.

In his death, they said, the nation lost an experienced and mentorious leader of Islamic movement.

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে ইরান ও লিবিয়ার রাষ্ট্রদূতের শোক

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ সাদেক ফায়াজ, লিবিয়ার চার্জদ্যা এক্কেয়ার্স মাহফুজ রজব রাহীম, গতকাল সোমবার পৃথক পৃথক দু'টি শোক বার্তা পাঠিয়েছেন।

(১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন)

তারা মরহুমের মাগফিরাত কামনা করেন ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে-এর পরিচালক অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ এবং দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের আমীর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ও সাবেক আমীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম পৃথক পৃথক শোকবাণী পাঠিয়েছেন। তারা মরহুমের মাগফিরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে কুয়েতে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক এম, রহমান, রমযান আলী, এইচ, করিম, জাতারে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক আবদুর রশীদ চৌধুরী, শামসুল আলম, ওমানে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক এম, আয়, কামালী, ফজলুল করিম, সৌদি আরবে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক আবুল কাসেম, আবদুর রশীদ, বজলুর রশীদ, আনিস, আবদুল মালেক, মোক্তার হোসাইন, ডাঃ আনোয়ার এবং বাহরাইন থেকে মাওলানা জমির উদ্দিন পৃথক পৃথক শোকবাণী পাঠিয়েছেন। তারা মরহুমের মাগফিরাত কামনা করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Abbas Ali

(From Page 1 Col. 8)

from Calcutta University in 1935. Abbas Ali Khan was in government service from 1935 to '47. He also served as secretary to the then Chief Minister of undivided Bengal late Sher-e-Bangla A.K. Fazlul Huq.

Later, the senior Naeb-e-Ameer served the Jaipurhat High School and Hilly High School as headmaster from 1952-'62. He joined Jamaat-e-Islami, Bangladesh in 1955. He also held the post of Ameer of Jamaat-e-Islami, Rajshahi Division from 1957 to '68. Later Khan was elected member of the then Pakistan national assembly in 1962 and was leader of Jamaat parliamentary group in the Jatiya Sangsad.

He performed the responsibility of the Senior Naeb-e-Ameer till his death since Jamaat e Islami, Bangladesh was reconstituted after liberation.

Khan also acted as Acting Ameer of Jamaat-e-Islami, Bangladesh till 1992. Later he also performed the responsibility of Ameer of the party for another 16 months after the arrest of Ameer Azam in 1992. The

An eminent Islamic thinker and a writer, Khan has a number of publications. He performed holy Hajj and Umrah on a number of occasions.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালের খবরে লন্ডন ম্যানচেষ্টারসহ সমগ্র বৃটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কমিউনিটি ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর ইন্তেকালের খবর লন্ডনসহ ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এই লন্ডন মসজিদ, নর্থ লন্ডন ইসলামিক সেন্টার মসজিদসহ বৃটেনের

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা রবিবার ২৫ আশ্বিন ১৪০৬, ১০ অক্টোবর ১৯৯৯

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM
ঢাকা ॥ মঙ্গলবার ২০শে আশ্বিন ১৪০৬ ॥ ৫ই অক্টোবর ১৯৯৯

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকাল

আমরা শোকাভিভূত

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সুলেখক ও সাহিত্যিক, জনমানুষের প্রিয় নেতা আব্বাস আলী খান গত রোববার দুপুর সোয়া একটায় রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি লাখ লাখ ভক্ত-অনুরক্ত, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে গেছেন। জনাব খান বেশকিছু দিন যাবত বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। সবশেষে তার লিভার সিরোসিস রোগ ধরা পড়ে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮৫ বছর।

বয়সের দিক থেকে জনাব আব্বাস আলী খান, বলতে হয়, পরিণত বয়সেই ইন্তেকাল করেছেন। তবুও তার মৃত্যু অত্যন্ত শোকের ও বেদনার। কারণ, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে জনাব খান যেমন এক বর্ণাঢ্য জীবন ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের অধিকারী ছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রবীণ রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা। বাংলাদেশকে আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিলো জনাব খানের স্বপ্ন। তিনি একাধারে লেখক, চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক হিসেবে জাতির বিরাট খেদমত করে গেছেন; ইসলামী আন্দোলনসহ জাতীয় বিভিন্ন সংকটকালে পালন করে গেছেন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা যা ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। তার জীবন ও কর্ম তাকে অমর করে রাখবে লাখো ভক্ত-অনুরক্ত ও নেতা-কর্মীর হৃদয়ে। নানাভাবে তিনি হবেন আলোচিত এবং হয়ে থাকবেন স্মরণীয়। শিক্ষা, অনুশীলন, শালীনতা, আদর্শবাদিতা, নীতিনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, শ্রদ্ধা এবং খোদাভীরুতায় তিনি ছিলেন একজন সুন্দর মানুষ, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

আমরা মরহুম আব্বাস আলী খানের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। মহান আল্লাহ জনাব খানের পরিবারসহ তার ভক্ত-অনুরক্তদের শোক সহ্য করার তাওফিক দিন এবং তার শূন্যস্থান পূরণে ইসলামী আন্দোলনকে সাহায্য করুন। আর মরহুম আব্বাস আলী খানের জন্য নসীব করুন জান্নাতুল ফেরদৌস- আমীন।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান দীর্ঘ ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে যেভাবে আল্লাহর রাহে নিবেদন করতে পেরেছিলেন, এ জন্য তিনি প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। তিনি মরহুম আব্বাস আলী খানের মত জিহাদী জজবা, ত্যাগ ও কুরবানীর মানসিকতা নিয়ে এ দেশে ইক্বামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিজয়ী করে মরহুম নেতার অসমাপ্ত কাজকে বিজয়ী করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ রাজনীতিবিদ। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম, তখন আব্বাস আলী খান জামায়াতের পক্ষ থেকে দু'টি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সকল নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে করতে হবে। তার নাম এ দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আজ তার মত নেতার বড় প্রয়োজন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে কর্মীদের জন্য আব্বাস আলী খানের সমগ্র জীবন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে তিনি ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করে গেছেন।

জনাব জমির আলী বলেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পক্ষে ভূমিকা পালনে মরহুম আব্বাস আলী খান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জাতির দুর্দিনে আজ জামায়াতে ইসলামীকে মরহুম আব্বাস আলী খানের মত ভূমিকা রাখতে হবে।

গতকাল রাতে আবুধাবী থেকে ড. শামসুদ্দীন দৈনিক সংগ্রামে টেলিফোনে এক শোক বার্তা পাঠান। তিনি মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকবিধুর স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পিএনপি

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান খায়রুন নাহার খানম ও মহাসচিব এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী গতকাল দেয়া শোক বিবৃতিতে বলেন, আব্বাস আলী খানের মত একজন বিজ্ঞ রাজনীতিক, স্পষ্ট ভাষী, ইসলামী আন্দোলনের জন্য উৎসর্গিত ব্যক্তির এই আকস্মিক ইন্তেকালে ইসলামী আইন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার বাণী

ঢাকা : মঙ্গলবার ২০ আশ্বিন ১৪০৬ Tuesday 5 Octo[ber] 99

দৈনিক মানবজমিন

মঙ্গলবার ● ৫ অক্টোবর ১৯৯৯

আব্বাস আলী খানের জানাজা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ... জামাতে ইসলামীর সিনিয়র নায়ে[বে] আমীর মরহুম আব্বাস আ[লী] ... জানাজা ... মাজে ... গহর ...

আব্বাস আলী খানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (সোমবার) বাদ জোহর পল্টন ময়দানে জামায়াত নেতা মরহুম আব্বাস আলী খানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। নামাজে জানাজায় সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ, বিএনপি নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া, আব্দুল মতিন চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী, ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দীন সরকার, লেঃ জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, মেঃ জেনারেল (অবঃ) মুবিন আলী ভুঁইয়া, জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব মনিরুল হক চৌধুরী, প্রেসিডিয়াম সদস্য এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী, যুগ্ম-মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী প্রমুখ অংশ নেন। ইহাছাড়া সৌদী আরব, ফিলিস্তিন ও লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত, পাকিস্তান ও ইরানের কূটনৈতিক প্রতিনিধি, বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশার লোকজন নামাজে জানাজায় যোগ দেন।

আজ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন

বিশিষ্ট জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খানের জানাযা সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার ইসলামী রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম আব্বাস আলী খানের নামাজে জানাযা গতকাল বেলা ২টা ১০ মিনিটে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম আব্বাস আলী খানের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম মরহুমের নামাজে জানাযার ইমামতি করেন। গতকাল রাত ৯টায় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে একটি টীম মরহুম আব্বাস আলী খানের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ী জয়পুরহাটের উদ্দেশে রওয়ানা করে। পথে গভীর রাতে বগুড়া বনানী মাঠে মরহুমের দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হবার কথা। আজ

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে ১৯ অক্টোবর স্মরণসভা

স্টাফ রিপোর্টার : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী রিসার্চ একাডেমীর সাবেক চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে একাডেমীর উদ্যোগে আগামী ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।

বেলা সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আহূত এই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করবেন জাতীয় অধ্যাপক ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান। সভাপতিত্ব করবেন রিসার্চ একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বক্তব্য রাখবেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আবুল আসাদ, প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান, এ. টি. এম. আজহারুল ইসলাম এবং মতিউর রহমান আকন্দ।

আজ আব্বাস আলী খানের স্মরণসভা

আজ মংগলবার বিকেল সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর সাবেক চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মরহুম আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য এই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করবেন জাতীয় অধ্যাপক ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান। সভাপতিত্ব করবেন একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বক্তব্য রাখবেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আবুল আসাদ প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান, এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম এবং মতিউর রহমান আকন্দ প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাস আলী খান

(১৯১৪-১৯৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

জয়পুরহাট হাইস্কুল

জয়পুরহাট হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকগণের তালিকা।
তালিকায় আব্বাস আলী খানের নাম ৫ নম্বরে

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাস আলী খান প্রতিষ্ঠিত তা'লীমুল ইসলাম একাডেমিক স্কুল এন্ড কলেজ

অফিস কক্ষে কর্মরত আব্বাস আলী খান

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়ে আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সফররত
WAMY মহাসচিব ড. মানে আল জুহহানীর সংগে আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

সাইয়ে আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর সেমিনারে ভাষণ দান রত আব্বাস আলী খান

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিশেষ সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানে আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

সাইয়ে আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সফররত সহকারী মহাসচিব ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতীবের সংগে আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাস আলী খানের এক মাত্র কন্যা খান জেবুন্নেছা চৌধুরী,
নাতি হাবিবুল হাসান চৌধুরী, নাতনি নাসিমা আফরোজ ও লায়লা নাসরিন

ছোটমনিদের মাঝে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আব্বাস আলী খান

Dhaka University Institutional Repository

পল্টন ময়দানে মরহুম আব্বাস আলী খানের প্রথম জানাযা

পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জানাযার আর একটি দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

মরহুম আব্বাস আলী খানের কফিন

মরহুম আব্বাস আলী খানের কফিন দাফন করার জন্য
কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে